# নারী ও পরিবার

## বামাবোধিনী পত্রিকা

(১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

সংকলন ও সম্পাদনা
ভারতী রায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

প্রকাশক
গোপা দাশশর্মা
অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি
নবার্ক। ৫৮/৪৭ বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলকাতা ৭০০০৪৫

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

. অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা প্রথম অর্ঘ্য পাবেন:

যাঁদের প্রচেষ্টায় বামাবোধিনীর জন্ম সম্ভব হয়েছিল এবং বামাবোধিনীর সম্পাদকমণ্ডলী ও লেখক-লেখিকাবৃন্দ

যিনি পরামর্শ দিয়েছেন:

অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য

যাঁরা সহায়তা করেছেন:

নির্মল মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি ও ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি কর্মীবৃন্দ

যাঁরা অনুলিপি লিখেছেন:

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা চক্রবর্তী ও লতিকা দত্ত

যিনি প্রচ্ছদপট এঁকেছেন:

সুব্রত চৌধুরী

যাঁরা প্রকাশনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন:

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ

# সূচি

# ভূমিকা

## প্রাক্-কথন

সন ১৮৬৩। বঙ্গাব্দ ১২৭০, মাস ভাদ্র। জন্ম নিল *বামাবোধিনী পত্রিকা*। অন্তঃপুরে নারীশিক্ষা প্রসার প্রকল্পে। উদ্যোক্তা কিছু ব্রাহ্ম বিদ্যানুরাগী অবলাবান্ধব। সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত (জ. ১৮৪০)। কাহিনীর এখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। 'সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।'[১] *বামাবোধিনী*-র জন্ম-প্রস্তুতি।

*বামাবোধিনী পত্রিকা*-র উদ্দিষ্ট পাঠিকাগোষ্ঠী ছিল উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বামাকুল। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার নারীমহলে বহু যুগসঞ্চিত। সেই কবে, বিস্মৃতপ্রায় শতকে, বেদ-অধ্যয়ন ও পঠনপাঠনের অধিকার মেয়েদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হারিয়েছিলেন তাঁরা উপনয়নের অধিকার। ক্রমে এসেছিল গৃহবন্দী-প্রথা। অবশ্য উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মেয়েদের জন্য। খেটে-খাওয়া নিম্নবিত্ত নিম্নবর্ণ পরিবারের মেয়েরা মাঠে-ঘাটে কাজ করতেন বৈ কি! চিরকালই। নইলে তাঁদের চলবে কেন? কিন্তু বিত্তবান পুরুষেরা ক্রমশ অন্দরমহল বহির্মহলের বিভাজনরেখা এমনই কঠিন করেছিলেন যে সে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করা কোনও সীতা-শক্তিতে কুলোত না। উনিশ শতকে অন্দরমহলেও মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ ছিল না। বোরকা আবশ্য পরতে হয়নি, কিন্তু আধবুক ঘোমটা টেনে চলতে হত। নিজ অভিজ্ঞতার সে গল্প প্রথম শুনিয়েছেন রাসসুন্দরী দেবী (জ. ১৮০৯)। 'আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত... কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।'[২] রাসসুন্দরী একা নন। বড় দুঃখে কৈলাসবাসিনী দেবী (জ. ১৮৩৭) ক্রন্দন করেছিলেন, এদেশের মেয়েরা পশুর জীবন যাপন করে।[৩] শিক্ষা ও বন্দীত্বের অন্ধকার এমন মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে অসূর্যম্পশ্যা-প্রায় প্রাণীদের অধিকাংশের বুঝি আলোর অভাব বোধ হয়নি।

আলো তবু জ্বলল একদিন। বলা চলে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই আলো জ্বলার ইতিহাস, *বামাবোধিনী*-যুগ পরিচিতি এবং সমসাময়িক অন্দরমহল ও বহির্মহলের চিত্ররূপ আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি আমার *সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪) গ্রন্থে।[৪] কয়েকটি জরুরি কথা সংক্ষেপে আরেকবার বলা দরকার।

ইংরেজ বণিক যখন রাজদণ্ডধারী হয়ে উঠল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, তখন নতুন জয় করা দেশের কৃষ্টির প্রতি মৃদু আকর্ষণ বোধ করেছিল। তাছাড়া শাসনব্যবস্থা কায়েমি করার জন্য শাসিত মানুষের ভাবনা-ধারণা-চিন্তা-বিশ্বাসের ধারাকে অনুধাবন করা

প্রয়োজন। জোনস ও কোলব্রুক প্রমুখ 'ওরিয়েন্টালিস্ট'রা তাই ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতাকে মর্যাদার সঙ্গে বিচার করার কষ্টসাধন করেছিলেন।[৫] কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, যখন সাম্রাজ্য মজবুত হতে থাকল, দুর্ধর্ষ মারাঠারা পর্যন্ত কাবু হলেন, রাজপুতরা হলেন পদানত, মহীশূরের শৌর্য আগেই বিলীন, তখন নির্মম অশ্রদ্ধার আঘাত এল ভারতীয় সভ্যতার ওপর। 'ইউটিলিটেরিয়ান'রা এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা একসুরে ঘোষণা করলেন, এমন নিম্নমানের কৃষ্টিকে উচ্চমানে উত্তরণ করাতে হবে। সাদা মানুষের এটি একটি গুরু দায়িত্ব। উচ্চতর সভ্যতার দায়। তাঁরা বললেন, ভারতের সভ্যতা যদি না নিম্নমানের হবে, তবে এ দেশে মেয়েদের এমন করুণ অবস্থা কেন? জেমস মিল গলা মেলালেন, বলা চলে 'থিওরি' লিপিবদ্ধ করলেন,

> The condition of women is one of the most remarkable circumstances in the manners of nations. Among rude people, the women are generally degraded, among civilized people, they are exalted.[৬]

ভারতে মেয়েদের কি নিদারুণ নির্যাতন! একদল মরছেন 'সতী' হয়ে, আর একদল বিধবা হয়ে অশ্রুমোচন করছেন। এঁদের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের শিকার।

আমাদের দেশের 'নব্যশিক্ষিত' পুরুষেরা, অর্থাৎ যাঁরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমী সভ্যতার পরিচয়পুষ্ট, বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক, 'নব উদ্ভূত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রমাদ গণলেন। ইংরেজের হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইতিপূর্বে চলে গেছে। বহির্মহলের সদর দরজার চাবি তাঁদের কুক্ষিগত। এখন আঘাত এল একেবারে অন্দরমহলে, ভারতীয় পুরুষের মর্মস্থলে। এবারের সংঘর্ষ পলাশির আম্রকুঞ্জে নয়, বাঙালির ঘরে ঘরে। দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। বিজেতা প্রমাণ করতে চান, শুধু ধনে বা বীর্যে বা ক্ষমতায় নয়, তাঁরা নৈতিকতার মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠতর। উনিশ শতকের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নব-আক্রমণের রণক্ষেত্র হল ভারতীয় সভ্যতা, মুখ্য 'টার্গেট' বা লক্ষ্য হল ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি।

এই আক্রমণে পিছু-হটা চলে না। করা চলে না হার স্বীকার। বহির্জগতে পরাজিত জাতি যখন রাজনৈতিক হীনম্মন্যতায় ভুগছিল, তখন 'পরিবার' প্রতীক হয়ে দাঁড়াল জাতীয় মর্যাদাবোধের। এই একটি ক্ষেত্রে ভারতীয়—বিশেষ করে বাঙালি—বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, অনন্য। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে বিদেশি বণিক-মালিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু পরিবারে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। পারবেও না। হিন্দু পরিবার অম্লান জ্যোতিতে চিরসমুজ্জ্বল। সে জ্যোতি বৈদিক যুগের হোমাগ্নিপূত, আর্যধর্মের মহিমামণ্ডিত।

নারীর অবস্থানের পশ্চিমী বিরূপ সমালোচনাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এদেশের নবীন নেতৃত্ব সৃষ্টি করলেন এক অভিনব দ্বিমুখী ধারা। এক মুখ বর্তমানের পশ্চিমে, অন্যমুখ অতীতের ভারতে। তাঁরা একদিকে শুরু করলেন অতীত ভারতগৌরব কীর্তন, এবং দাবি করলেন যে, প্রাচীন ভারতের 'স্বর্ণযুগে' নারীর অবস্থান ছিল সুউচ্চ। প্যারীচাঁদ মিত্র (জ. ১৮১৪) ছিলেন এই কীর্তনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গায়েন। অন্যদিকে এঁরা

পশ্চিমী সমালোচনাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করলেন বিভিন্ন কারণে বর্তমান সমাজ সাময়িক রোগে আক্রান্ত। এ অবস্থার উপশম চাই।

শুধু পাশ্চাত্যের প্রভাবেই যে সংস্কারের জোয়ার এসেছিল ভারতে, এ বক্তব্য কিন্তু ইতিহাসের অতি সরলীকরণ। যাঁরা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হননি, বিদ্যাসাগর (জ. ১৮২০), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (জ. ১৮১৭ ) প্রমুখ এদেশি বহু মনীষী সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের মাটিতে নবচেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বহু যুগের সঞ্চিত কুসংস্কার এবং কুপ্রথার বিলোপ এবং যুগোপযোগী নতুন প্রথা প্রবর্তনের ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছিল । বলা চলে, পশ্চিমের সঙ্গে এদেশের ভাবের আদান-প্রদানের ফলে এসেছিল সংস্কার ও পরিবর্তন।

উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য নারী।[৭] মুখ্য আইনসমূহ নারীনির্যাতন-বিলোপ সূচক। রামমোহন (জ. ১৭৭২) বন্ধ করলেন সতীদাহ, বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন বিধবাবিবাহ চালু করতে এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে। খ্রিস্টান মিশনারিরা নারীশিক্ষার কাজটা আরম্ভ করেছিলেন, এবারে ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজেদের হাতে। বেথুন স্কুল স্থাপিত হল (১৮৪৯), গড়ে উঠল আরও কয়েকটি নারীশিক্ষামন্দির। প্রথম দিকে ব্রাহ্ম মেয়েরাই বেশি স্কুলে যেতেন। অল্পদিনের মধ্যে কিছু হিন্দু মেয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি বেথুন স্কুলে পড়িব। বেথুন স্কুলে পড়িলেই আমি সুখী হইব।'[৮] ১৮৬৩ সনে, *বামাবোধিনী* প্রকাশকালে, বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫টি, ছাত্রীসংখ্যা ১,১৮০।[৯]

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ হিন্দু মেয়েদের জন্য আগে সুগম হয়নি। যে সব মেয়েরা অল্প বয়সে বিবাহের জন্য, অথবা পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে স্কুলে যেতে পারতেন না, তাঁদের জন্য 'অন্তঃপুর শিক্ষা' প্রবর্তিত হল। পরবর্তী কালের বেশ কিছু নামী মহিলা—ব্রহ্মময়ী দেবী (জ. ১৮৪৫), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (জ. ১৮৫২), স্বর্ণকুমারী দেবী (জ. ১৮৫৫), প্রসন্নময়ী দেবী (জ. ১৮৫৭), কৈলাসবাসিনী দেবী প্রমুখ লেখিকা, সমাজ সেবিকারাও—ঘরে বসে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন।[১০] অন্তঃপুরে একটি একটি করে দীপ জ্বলে উঠল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তাঁদের ছিল মানবসেবার প্রেরণা, নারীজাতির মঙ্গলকামনা, ভারতগৌরব বৃদ্ধিসংকল্প। কিন্তু আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ যে মধ্যবিত্তশ্রেণী, যাঁদের সমর্থন ছাড়া আন্দোলন এগোতে পারত না, তাঁরা তদানীন্তন শাসনব্যবস্থায় যতটা সম্ভব অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মুখপত্র *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৩১) তাঁদের কথা গুছিয়ে বলেছিল। যতদিন না 'সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে' এদেশি শিক্ষিত মানুষদের নিয়োগ করা হবে না, ততদিন 'বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না।'[১১]

মধ্যবিত্ত পুরুষেরা চাননি অষ্টাদশশতকসুলভ অশিক্ষিতা পত্নী। তাঁদের আবশ্যক ছিল শিক্ষিতা, সংস্কৃতা, সহকর্মিণী পত্নী, যিনি ইংরেজ-শাসিত বাংলাদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবেন। বাংলা লিখতে পড়তে পারবেন, সম্ভব হলে কিছু ইংরেজিও বলবেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণী (জ. ১৮৬১) তাঁর *শুভবিবাহ* উপন্যাসে নবমানস উদ্ঘাটিত

'দিদি, ছেলেরা ইংরেজী শিক্ষিত বৌ চায়। কি মুশকিল! শুনে গা শিউরে ওঠে।'[১২]

স্ত্রীরা ইংরেজি শিখলে ভাল হয় সত্যি, কিন্তু তাঁরা 'বিবি' হবেন না, হবেন না ব্যতিক্রমী চরিত্র। পা বাড়াবেন না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-কাঠামোর বাইরে। সেজন্যই তো জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পারিবারিক রীতি লঙ্ঘন করে স্বামী ব্যতিরেকে একলা গভর্নমেন্ট হাউসের ভোজসভায় গিয়েছিলেন বলে প্রসন্ন ঠাকুর ক্ষোভে লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়েছিলেন।[১৩] মোট চাহিদাটা এই যে, মেয়েরা একদিক দিয়ে পাশ্চাত্যের মেয়েদের মতো শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুপালন করবেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে স্বামী-সহায়তা করবেন, অন্যদিকে প্রাচীন আর্যনারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবা করবেন, শিশুমানস গঠন করবেন এবং আপন চরিত্রমহিমায় সমগ্র পরিবার ধর্ম-আলোকিত করবেন।[১৪]

এই চিত্রকল্পের আরও একটু পরিবর্তন হল, 'পরিবার'এর গুরুত্ব আরও একটু বাড়ল, যখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার এল দেশে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। সুঠাম ও সুষ্ঠু রূপ দিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৮৩৮) এবং রমেশচন্দ্র দত্তর (জ. ১৮৪৮) লেখনী।[১৫] তাঁদের পথ ধরে জাতীয়তাবাদী নেতারা এক জোরালো বক্তব্য প্রচার শুরু করেন। সে হল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জয়গান, যে সভ্যতা পশ্চিমের ভাবধারা থেকে আমদানি হয়নি, ভারতের যা নিজস্ব জাতীয় সম্পদ, এই মাটিতেই গড়ে ওঠা। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বললেন, পশ্চিমের সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক (material), ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক (spiritual), আত্মিক। পশ্চিমের ক্ষমতার আস্ফালন বাইরের জগতে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্য পরিবারের অভ্যন্তরে।[১৬] এ ধারা আর্যযুগ থেকে বয়ে আসছে। এখানেই ভারতীয়ত্বের যথার্থ স্বরূপ (identity)। এই আত্মিক ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পশ্চিমের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

আর্যধর্মভিত্তিক ভারতীয় স্বরূপতার এবং সুপ্রাচীন সুমহান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক 'পরিবার'। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু নারী, পরিবার ধারণ ও পালন করেন নারী। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘাতের কঠিন মুহূর্তে তাই জাতীয়তাবাদী নেতারা নারীদের উপর ভার দিলেন ভারতীয়ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য, আত্মিক ধর্ম রক্ষণের, গৃহে ও পরিবারে। তাঁরা নির্দেশ দিলেন, আর্যপ্রণালীতে গৃহধর্ম পালন করতে হবে মেয়েদের। বিলাসী হলে চলবে না, চলবে না তাস খেলে বা গল্প-পরিহাসে বা নাটক-নভেল পড়ে সময়ের অপব্যয়। আর্যমতে নারী হলেন 'গৃহলক্ষ্মী'। স্বর্গের দেবী লক্ষ্মীর মতো মর্তের লক্ষ্মীরা গৃহে সুধাবর্ষণ করবেন, শক্তি, সমৃদ্ধি ও ধান্যভাণ্ড পরিপূর্ণ করবেন।[১৭]

মাত্র কিছুদিন আগে ইংরেজ মেয়েদের গৃহনৈপুণ্যের প্রশংসা হয়েছিল। এখন শুরু হল অতীতের প্রাচ্য ও বর্তমানের প্রতীচ্য রমণীদের পার্থক্য বিশ্লেষণ। 'আমরা' আর 'ওরা'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ. ১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* পর্যন্ত ভর্ৎসনা করল ইংরেজি আদর্শ প্রভাবিত মেয়েদের ইংরেজরমণীসম বিলাসিতা ও গৃহকর্মে অমনোযোগিতার জন্য।[১৮] তাঁদের শিক্ষিতা ও সংস্কৃতা করার উদ্দেশ্য তো সুমাতা, সুভার্যা এবং সুগৃহিণী তৈরি করা। সেটি দেশি পদ্ধতিতে হওয়া

চাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'কে ক্ষমতার শীর্ষে তুলে ফিরিয়ে আনলেন সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পাদনায়, এমনকি সতীনের সঙ্গে একত্রবাসে।

> এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও— আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন'...।[১৯]

ধর্মরক্ষার জন্য, সর্বগুণসমন্বয়সত্ত্বেও পুরাপদ্ধতিতে সংসারধর্ম উদ্‌যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'।

উনিশ শতকের শেষার্ধে আরো বেশ কয়েকজন লেখক নারীর 'নতুন' ভূমিকা এবং পরিবারে নারীর কর্তব্য নিয়ে উপদেশমালা রচনা করেছিলেন। তাঁদের লেখাগুলি শুধু নারীর পারিবারিক দায়িত্বাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নারীদের সমগ্র জীবন, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ধরন, এমনকি তাঁদের গৃহস্থালির নিজস্ব জগৎ নির্ণয়ন এবং নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা ছিল প্রকাশিত পুস্তিকা ও প্রবন্ধরাশিতে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যচরণ মিত্রর *স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ* (১৮৮৪), গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *গৃহলক্ষ্মী* (১৮৮৭), জয়কৃষ্ণ মিত্রর *রমণীর কর্ত্তব্য* (১৮৯০)[২০] এবং ঈশানচন্দ্র বসুর বহু পঠিত *নারী-নীতি* (১৮৮৪)।[২১] তবে সকলের চেয়ে জোরালো হুকুমনামা দিলেন বোধকরি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (জ. ১৮২৭) তাঁর *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২) রচনায়।

> আর্য্যপ্রণালীতে ধর্ম্মভাবের আধিক্য, ইউরোপের প্রণালীতে ভোগসুখের আধিক্য। আর্য্যপ্রণালীতে স্ত্রী দেবী, ইউরোপের প্রণালীতে স্ত্রী সখী এবং সহচরী।...ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছেন, মেয়েরা ইংরাজী না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল।... গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটি হইয়া যায়, যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রকায়, স্বল্পবল, রুগ্নদেহ হইয়া জন্মে, সর্ব্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ু হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।[২২]

স্ত্রীশিক্ষায় ভূদেবের অমত নেই, বিদেশি প্রথা অনুসরণকারী গৃহস্থালিতে আছে। 'গৃহকার্য্যের পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি রাখা উচিত।' এই রীতি বজায় রাখার জন্য ভূদেব তাঁর *পারিবারিক প্রবন্ধ*-তে লজ্জাশীলতা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, সন্তানশিক্ষা প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ে স্ত্রীলোকের কার্যকারণ সম্বন্ধে বিধান দিলেন।

বিদেশি সংস্পর্শে এদেশি মেয়েরা নিজেদের অতীত ভুলে যেতে বসেছে। নইলে এসব চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, পুরাকালের উত্তরাধিকার। ভারতীয় মেয়েদের সনাতনী আদর্শ আবহমান বিরাজমান। সতী-সীতা-সাবিত্রী-কুন্তী-গান্ধারী-দময়ন্তী। সে কথা বিবেকানন্দর (জ. ১৮৬৩) চেয়ে কে আর সুন্দরভাবে বলতে পেরেছিল?

> The women of India must grow and develop in the footprints of Sita. Sita is unique. She is the very type of the true Indian woman. ... Any

attempt to modernise our women, if it tries to take our women away from that ideal of Sita, is immediately a failure as we see everyday.[২৩]

এ যুগের মেয়েরা সে যুগের মেয়েদের মতো ধর্মবলে বলবতী হবেন, চরিত্রে বীর্যবতী হবেন, গার্হস্থ্যনীতি পালন করবেন, এবং আজকের দুঃসময়ে বিদেশি প্রভাবিত বহির্জগতে বিচরণকারী স্বামীদের গৃহে ও পরিবারে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করবেন।

অবশ্য তাঁদের সর্ববৃহৎ কর্তব্য সন্তানপালন। মাত্র একটি বাক্যে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিলেন, 'পশ্চিমের মেয়েরা প্রধানত পত্নী, এদেশের মেয়েরা মূলত মা।'[২৪] মাতৃত্ব ভারতীয় মেয়েদের আসল স্বরূপ। এই স্বরূপ রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাযুক্ত হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের কারণে। বাঙালিরা ক্ষীণবল, ক্ষীণ আয়ু বলেই বারবার মার খায় বিদেশি আক্রমণকারীদের হাতে।[২৫] মায়েদের কর্তব্য স্বাস্থ্যবান, শৌর্যপরায়ণ, দেশপ্রেমিক, আর্যজনোচিত সুসন্তান গঠন।[২৬] বিদেশির বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের জন্য সাহসী, শক্তিশালী সুপুত্র চাই। বিদেশির বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষা ও পরিবার পালনের জন্য সুকন্যা আবশ্যক। দেশের চাহিদা মেটাবার ভার মায়েদের, অর্থাৎ মেয়েদের। মাতৃত্বের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন রাজনৈতিক নেতারা, চিন্তাশীল লেখকরা এবং নামজাদা পত্রিকাসকল— *তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ*। নারী-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিও—*ভারতী* (১৮৮৪), *অন্তঃপুর* (১৮৯৮), *ভারতমহিলা* (১৯০৫) —আর্যধর্ম অনুসরণ, প্রাচীন আদর্শ বহন এবং সুসন্তান সৃজনের জন্য উদ্বুদ্ধ করল পাঠিকাদের।[২৭] *বামাবোধিনী*-তে ক্রমে ক্রমে সোচ্চার হয়ে উঠল সেই সুর।

এখানে কয়েকটি কথা বলা দরকার। উনিশ শতকের ইংরেজ মহিলাদের গুণাবলী এবং সামাজিক উচ্চমানের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন 'ইউটিলেটিরায়ন'রা, শাসকশ্রেণী, এবং এদেশের সংস্কারপন্থীরা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম যুগে, সেটি মোটেই বাস্তবানুগ ছিল না। ইংরেজ মধ্যবিত্ত মহিলারা যে স্বর্গসুখে ছিলেন না তা সেকালের মেরী উইলস্টোনক্র্যাফটের রচনায় এবং একালের ব্রাঙ্কা প্রমুখ গবেষকদের গবেষণায় ধরা পড়েছে।[২৮] তেমনি আর্যনারীদের যে চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছিল সংস্কারসূচনায় এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সেটিও যথাযথ ছিল কিনা, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[২৯] তাছাড়া এঁদের অনেকেই ছিলেন পৌরাণিক কাহিনীর কল্পিত নারীচরিত্র। রক্তমাংসের মানুষী নন। আরও বড় কথা এই যে প্রাচীন যুগের যেসব নারীদের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হত, তাঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের আর্যনারী। তাঁদের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে ছিলেন অগণিত নারী। যে বিশাল নারী সম্প্রদায় সমাজে ছিলেন অবহেলিত, ছিলেন দরিদ্র, নিম্নবর্ণের, শূদ্রজাতীয়, সেইসব দাস-নারীদের কথা সেদিন কারুর মনে পড়েনি।[৩০] *বামাবোধিনী*-ও সেকালের বা নিজ কালের নিম্নবর্গ নারীজীবনালেখ্য স্পর্শ বা প্রতিফলিত করতে পারেনি। চরিত্র বিশ্লেষণে *বামাবোধিনী* মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণ ব্রাহ্ম-হিন্দু নারী-পত্রিকা।

নারী মহলের আর একটি সুর *বামাবোধিনী*-তে ধরা পড়েনি। উনিশ শতকের মেয়েরা নিজ নিজ পরিবারে, বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবারে, একটা মেয়েমহল তৈরি করে নিয়েছিলেন অন্তঃপুরের অন্দরে। সেখানে তাঁদের নিজস্ব একটা জগৎ ছিল। তাতে হাসি ছিল, গান ছিল, কৌতুক ছিল, ছিল স্ত্রী-আচার, মেয়েলি খেলা-ধুলো, হাস্য-পরিহাস। সে মহলের ছিটে-ফোঁটা স্বাদগন্ধ বহির্মহলে পৌঁছত না। কখনও হঠাৎ তার অস্তিত্বের মৃদুমন্দ

ইশারা পেলে পুরুষ-ওষ্ঠে দেখা দিত তুচ্ছতার বক্র বিদ্রূপরেখা বা প্রশ্রয়ের ক্ষীণ হাসি। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত সংস্কারপন্থী বা জাতীয়তাবাদী নেতারা এ-মহলের গুরুত্ব অনুভব করেননি। পশ্চিমী সমালোচনা মেনে নিয়ে অন্তঃপুরের সব কিছু কুসংস্কার ও চিন্তার দীনতা বিবেচনা করে ওপর থেকে নারীজীবনের দিকনির্ণয় করেছিলেন। তার ফলে মেয়েদের নিজস্ব জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হল। সে জগতের কথা কিছু বলেনি *বামাবোধিনী*। তার অল্পস্বল্প পরিচয় আছে সমসাময়িক বটতলার উপন্যাসে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে লেখা রাধারানী দেবীর (জ. ১৯০৩) কাব্যগ্রন্থে[৩১] এবং অধুনা সুমন্ত ব্যানার্জির গবেষণায়।[৩২]

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। সমসাময়িক মুসলমান নারীসমাজ *বামাবোধিনী*-তে প্রায় অনুপস্থিত।[৩৩] *বামাবোধিনী* চলাকালীন মুসলমান সমাজে 'জাগরণ' ও 'আধুনিকীকরণ' প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আনিসুজ্জামান ও ওয়াকিল আহমদের মতে আঠারোশ সত্তরের দশক থেকে।[৩৪] মুসলমান মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ও 'হীনদশা' নিয়ে আলোচনা চলছিল *মিহির ও সুধাকর* (১৮৮৯), *কোহিনূর* (১৮৯৮) এবং *নবনূর* (১৯০৩) নামক পত্রপত্রিকায়। মুসলমান মেয়েরা ধীরে ধীরে বিদ্যানিকেতনে যেতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের জন্য রচিত হয়েছিল একাধিক নির্দেশিকা সাহিত্য।[৩৫] মেয়েরা নিজেরা কলম তুলে নিচ্ছিলেন। নবাব ফৈজুন্নেসা চৌধুরাণী (জ. ১৮৩৪) *'রূপজালাল'* প্রকাশিত করেছিলেন ১৮৭৬ এ, খৈরুন্নেসা (জ. ১৮৭০) লিখতেন *নবনূর* পত্রিকায় এবং মনস্বিনী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের (জ. ১৮৮০) আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর চমক লাগানো *মতিচূড়* প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৪, দুঃসাহসী *Sultana's Dream*-এর প্রকাশ সাল ১৯০৫।[৩৬] এঁরা কেউ লেখেননি *বামাবোধিনী*-তে। *বামাবোধিনী*-ও তাঁদের কথা অথবা সেকালের মুসলমান মেয়েদের কথা তেমন করে বলেনি।

*বামাবোধিনী*-র উদ্দিষ্ট ছিল ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের মেয়েরা। লক্ষ্য ছিল স্থির। ঝোড়ো হাওয়া পশ্চিম সমুদ্র থেকে আছড়ে পড়েছে। ভারতীয় হিন্দু-ব্রাহ্ম সমাজতরীতে হাল ধরার দায়িত্ব মেয়েদের। তাই তাঁদের আবশ্যকীয় জ্ঞান আহরণ ও গুণ অনুশীলন করতে হবে। যাঁরা জ্ঞানদান করবেন, তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন ও প্রত্যাশা *বামাবোধিনী*-র ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। সে অর্থে *বামাবোধিনী* নির্দেশমূলক সাহিত্য।

*বামাবোধিনী*-র ষাটবছর আয়ুষ্কালের মধ্যে নারীজগতে পরিবর্তন এসেছিল বৈকি, যেমন এসেছিল বহির্জগতে। সে পরিবর্তনের ছাপ যে পত্রিকায় কোথাও পড়েনি এমন নয়, কিন্তু নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে *বামাবোধিনী*র বক্তব্য মূলত পাল্টায়নি। কেননা, পাল্টায়নি বামাবোধিনী-গোষ্ঠী নেতৃত্বের পিতৃতন্ত্র-সুলভ মনোভাব।

## বামাবোধিনী-কথা

*বামাবোধিনী পত্রিকা*-টি প্রকাশ করেছিল 'বামাবোধিনী সভা', যে সভা গঠন করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (জ. ১৮৩৮) প্রভাবিত উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (জ. ১৮৪১) প্রমুখ কয়েকজন নবীন ব্রাহ্ম যুবক নারীদের 'মানসিক উন্নতি সাধন' প্রকল্পে। ১৮৬৩ সনে, কলকাতার 'রঘুনাথ চাটুয্যের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটিতে বামাবোধিনী সভার কার্যালয়' থেকে পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। মূল্য ছিল মাত্র এক আনা, মুদ্রণ সংখ্যা

এক হাজার, প্রথম গ্রাহিকা ভুবনমোহিনী বসু, পত্রিকার মূল্য বর্দ্ধিত হয়ে তিন আনা পর্যন্ত উঠেছিল, গ্রাহিকা সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় 'পাঁচ ছয় শত'।[৩৭] মূল্য অনাদায়ের জন্য বারবার নিদারুণ অর্থসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল *বামাবোধিনী*কে। একবছর, ১২৮৫-৮৬ বঙ্গাব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্তর্হিত হতেও হয়েছিল। কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী (জ. ১৮২৭) প্যারীচরণ সরকার (জ. ১৮২৩ ) প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব (জ. ১৮১১) প্রমুখ ব্যক্তিদের অর্থ ও নানাবিধ সহায়তার জন্য পত্রিকাটি বেঁচে থাকতে পেরেছিল। উমেশচন্দ্র দত্ত একাদিক্রমে চল্লিশ বছর সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে সুকুমার দত্ত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন (১৯০৭-৯), সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী ঊষাপ্রভা দত্ত, সন্তোষকুমার দত্ত ও দেবকুমার দত্ত (১৯০৯-১৪), দেবকুমার দত্ত, কুমারী ঊষাপ্রভা দত্ত ও ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৯১৪-২২) এবং সবশেষে আনন্দকুমার দত্ত (১৯২৩) পত্রিকা পরিচালনা করেন।[৩৮]

ভারতে তথা সমগ্র এশিয়ায়, *বামাবোধিনী* প্রথম নারী উদ্দিষ্ট পত্রিকা। এর আগে অবশ্য *মাসিক পত্রিকা* নামে একটি পত্রিকা (১৮৫৪-৫৫) মেয়েদের জন্য বেরিয়েছিল। কিন্তু সেটি বেশিদিন সূর্যালোক দেখেনি। *বামাবোধিনী* বেঁচে ছিল দীর্ঘ ষাট বছর। যে কোনও পত্রিকার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্ব এবং প্রকৃত চাহিদা ও গুরুত্বের পরিচায়ক।

পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যাতেই স্পষ্ট বিবৃত হয়েছিল। 'অন্তঃপুরমধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ না করিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না।' শুধু বিদ্যালোক উদ্ভাসন নয়, অন্তঃপুরচারিণীদের বিভিন্ন বিষয়ে 'প্রকৃত জ্ঞানের উদয়' এবং 'উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি বিকাশ' সম্বন্ধেও পরিচালকমণ্ডলী সজাগ ছিলেন।

> কথাবার্তা এবং উপন্যাস ও উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে।[৩৯]

ভাষা হবে 'কোমল ও সরস', 'বামাগণের বোধসুলভ'। রচনা, উপন্যাস, দুই সখীর কথোপকথন এবং কবিতার আঙ্গিক অবলম্বনে অবোধ বামাকুলের বোধ সঞ্চারিত করা হবে। দেওয়া হবে, 'তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানসকল'।[৪০] অর্থাৎ সেইসব বিষয়ে, যা পরিচালক মণ্ডলী এবং লেখকগোষ্ঠীর বিচারে, নারীদের পক্ষে 'প্রয়োজনীয়'। *বামাবোধিনী*-র উদ্দেশ্য স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ হল তার পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময়ে।

> বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য, এইজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।...জ্ঞানপ্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণবিধান করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এইজন্যই পাঠকপাঠিকার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রথম হইতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।[৪১]

ধর্মভিত্তিক জ্ঞানবিতরণ উদ্দেশ্য হলেও, পরিচালকমণ্ডলী কোনও 'সাম্প্রদায়িক

ধর্ম্মমত অথবা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন' করতে চাননি। 'উদার ও অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাবসকলের আলোচনা' করতে চেয়েছিলেন।[৪২] কিন্তু যে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন এবং যে ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছিলেন তা আর্যধর্ম।

*বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় অবশ্য বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত। থাকত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, গল্প-উপন্যাস, কবিতা-চিত্রকলা, বিজ্ঞান বিশ্লেষণ, বিদেশি নারী সাফল্য কাহিনী, শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বাস্থ্যজ্ঞান, শিশুপালন পদ্ধতি, ধর্ম-আলোচনা এবং গার্হস্থ্যপ্রসঙ্গ। প্রধানতম বিষয়বস্তু ছিল তিনটি : শিক্ষার প্রয়োজন ও সার্থকতা, শিশুপালনসংক্রান্ত নিয়মাবলী, এবং পরিবারে রমণীর কর্তব্য ও স্থান। প্রথম বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধাবলী আমার *সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা* গ্রন্থে সংকলিত করেছি। দ্বিতীয় বিষয়টি রইল ভবিষ্যতের সন্ধানী গবেষকদের জন্য। তৃতীয় বিষয়সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী এই সংকলনের উপজীব্য। রচনাগুলি আমরা একটি একটি করে হাতে লিখে অনুলিপি তুলেছি দুর্লভ পুরাতন *বামাবোধিনী* পত্রিকাগুলি থেকে, বিভিন্ন সংগ্রহশালা পরিভ্রমণ করে। লেখাগুলো যেমন ছিল তেমন তুলেছি। পুরোনো বানান, ছাপার ভুল ও অশুদ্ধ বানান আছে। যেমন, 'শ্বশ্রু'। ব্যাকরণও সব লেখায় ত্রুটিমুক্ত নয়। আমরা কোনও পরিবর্তন করিনি। আরেকটি জরুরি কথা বলে রাখা দরকার। একই প্রসঙ্গ ও যুক্তির পৌনঃপুনিকতার জন্য আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবন্ধ নির্বাচনে বাধ্য হয়েছি। বেশিরভাগ প্রবন্ধের অনুলিপি আছে এই সংকলনে। যেগুলি গ্রথিত হয়নি তাদের নাম ও প্রকাশকাল লিপিবদ্ধ করা হল 'পরিশিষ্ট খ'-তে, ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রয়োজন সম্ভাবনায়। প্রবন্ধগুলির হাতেলেখা অনুলিপি রইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী গবেষণা কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে। যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এই সঙ্কলনে, তাঁদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে 'পরিশিষ্ট ক'-তে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক লেখিকাদের সম্বন্ধে আমরা কোনও তথ্যই সংগ্রহ করতে পারিনি। প্রবন্ধাবলীর সিংহভাগ লেখক ছিলেন পুরুষ। কিন্তু না জানি কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁরা বেশিরভাগ নিজেদের নামোল্লেখ করেননি। মেয়েরাও লিখেছেন *বামাবোধিনী*-তে । পত্রিকাটি প্রথম থেকেই নারীলিখিত অবদান যাচনা করেছে। মেয়েদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছিলেন নামী। অধিকাংশ অনামী গৃহবধূ। তাঁদের দ্বিধাজড়িত লেখাগুলি 'বামারচনা'য় প্রকাশিত হত। হাত পাকাবার জন্য, নিজ ভাবনা ব্যক্ত করার জন্য, পাঠিকাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য, মেয়েরা লিখতেন।

এই সংকলনের রচনাগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। কিছু রচনা দাম্পত্য সম্পর্কীয়, কয়েকটিতে মাতৃত্বের দায়িত্ব বিবেচিত হয়েছে, অধিকাংশ গার্হস্থ্যনীতি আলোচনা করেছে, আর কয়েকটি আছে 'বামারচনা'। লেখাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবকটিরই উপজীব্য পরিবারে ও সমাজে নারীর কর্তব্য ও স্থান। তখনকার দিনে যে আদর্শ নারীপ্রকৃতি রচিত হয়েছিল, *বামাবোধিনী* তার প্রতিবিম্ব।

### দাম্পত্য সম্পর্ক

এদেশের নারী পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলেছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই। অশিক্ষিতা নারী ও শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে ছিল না সহমর্মিতা ও ভাবসাযুজ্য।

পুরুষ অনেক সময়েই বাইরে নারীসঙ্গ অন্বেষণ করতেন। এমনকি উপপত্নী পোষণ সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৩] অসহায়া পত্নীরা কেমন নিঃশব্দে তা মেনে নিতেন আশাপূর্ণা দেবী (জ. ১৯০৫) তাঁর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে (১৩৭১) তার একটি চিত্র অঙ্কিত করেছেন।[৬৪] সহমর্মিতা যে অনেক সময়ে উচ্চশিক্ষিত স্বামী এবং সাধারণ শিক্ষিতা পত্নীর মধ্যেও ছিল না, তার অনবদ্য কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জ. ১৮৬১) *নষ্টনীড়* (১৯০১)। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রহসনে নারীপুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের ফাঁক এবং ফাটল নিয়ে আছে অসংখ্য রচনা।[৬৫]

*বামাবোধিনী*-তে পতি-পত্নীর মধ্যে সহমর্মিতা গঠনের সক্রিয় এবং সজাগ প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। 'বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ।' (পৃ. ২৯) স্ত্রী ও স্বামী একযোগে বিশুদ্ধ ধর্মপালন করবেন এবং 'ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন' করবেন, এই বামাবোধিনী গোষ্ঠীর প্রথম বক্তব্য—স্পষ্টতই ব্রাহ্মদর্শনের প্রতিফলন। দাম্পত্য সম্পর্ক কিন্তু *বামাবোধিনী*-তে সমমনোবৃত্তিসম্পন্ন দুটি প্রাণীর সমবন্ধুত্ব নয়। পত্নী ছাত্রীস্বরূপা, পতি আচার্যস্বরূপ। স্ত্রীগণ উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে স্বামীর কাছে 'ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে।' (পৃ. ৩০) পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাই আমরা দেখি 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।' স্বামী স্ত্রীকে সুনীতিপালনে এবং সচ্চরিত্রগঠনে পরামর্শ দিচ্ছেন। সরলতা, সত্যকথন, কৃতজ্ঞতা, দয়া, প্রভৃতি গুণ নারীর অলংকারস্বরূপ। সকলের চেয়ে দামী ভাব ধর্মভাব। 'কিন্তু সকল হইতে ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ গুণ' (পৃ. ২৮)। এবং পরিবারে আর্যধর্ম রক্ষা ও পালন মানুষীর প্রধান করণীয়।

> বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীচরিত্রে পূর্ব্বের ন্যায় গুণসকল দেখিতে পাওয়া যায় না। আলস্য বিলাসিতা, কুটিলতা, হিংসা, বাচালতা প্রভৃতি নানাপ্রকার হীনভাব এক্ষণে স্ত্রীচরিত্রকে ক্রমশঃ মলিন করিতেছে। তাই আর্য্যসংসারে এতদূর অবনতি হইতেছে। (অগ্রহায়ণ, ১৩০৮)

আর্যরমণীদের গুণগুলি নারীদের অন্তরে পুনর্জাগ্রত করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে ধর্মের সঙ্গে পতিভক্তি অচ্ছেদ্যবন্ধনে সম্পৃক্ত। 'স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র পতিব্রতা ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে... প্রশংসনীয় বিষয় আর কিছুই নাই।' (ভাদ্র, ১২৭৬) 'সতী স্ত্রী পতিকে' নিত্যভজনা করিবেন।'

> যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে হরিভাবদ্বারা ভজন করেন, তিনি পরলোকগামিনী হইয়া হরিরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বসুখ সম্ভোগ করেন (বৈশাখ, ১৩১১)

কেবলমাত্র স্বামীভজনা নয়, স্বামী অনুগমন ও অনুসরণ। স্বামীগণ স্ত্রীগণের 'একমাত্র অবলম্বন'। স্ত্রীরা সর্বদা স্বামীর আশ্রয়ে থেকে তাঁদের 'সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে' (পৃ. ৩০)। স্বামীদের উৎসাহ, বল, কর্মদক্ষতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি

সদ্‌গুণ অনুকরণ কর্তব্য। কিন্তু যে পুরুষদের এই গুণগুলি নেই, তাঁদের পত্নীরা কি করবেন? সে প্রশ্ন পুরুষ লেখকরা আলোচনা করেননি?

করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন সজোর হল, *বামাবোধিনী* তখন বললেন যে পুরুষেরা যদি পশ্চিমের দিকে মন দেন, তাঁদের পূর্বমুখিন করবার দায়িত্ব পত্নীদের। স্বামীকে অনুগমন করা দরকার। কিন্তু পত্নী

> তাহা বলিয়া স্বামীর ভ্রমপ্রমদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহাকে সদসৎ বিবেচনা শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকামিনী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন। (আশ্বিন, ১২৭৬)

*বামাবোধিনী*-তে তবে পত্নীর পড়ুয়াপদ থেকে সখীত্বে উত্তরণের পথনির্দেশও ছিল! শুধু উপদেশ নেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়ারও দরকার—প্রয়োজনবোধে। পাতিব্রত্যের মহিমা *বামাবোধিনী* শেষপর্যন্ত প্রচার করেছেন সত্যি,—না করে উপায়ই বা ছিল কি? যে আর্যরমণীদের বা পৌরাণিক নারীদের উপমা সর্বদা দেওয়া হত তাঁরা সকলেই ছিলেন সতীশিরোমণি। তবে *বামাবোধিনী* সচেষ্ট ছিলেন পতিপত্নীর দূরত্ব সংকোচনে, প্রেমবন্ধন দৃঢ়করণে এবং নারীর পত্নীরূপ সম্প্রসারণে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, পরিবার আর্যধর্ম পরায়ণ করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ পারিবারিক সংহতি। এবং সে সংহতির জন্য স্বামী স্ত্রীর একমন, একমত এবং একযোগে কর্মসাধন আবশ্যক। অন্তত কিছু পরিমাণে। *বামাবোধিনী*-র জীবদ্দশায় আজকের দিনের দাম্পত্য সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলি, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনশৈথিল্যের বা বিবাহ বিচ্ছেদের আইনানুগ পন্থা অবলম্বনের কথা ওঠেনি। বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা ছিল অবশ্য *বামাবোধিনী*-র সংখ্যায় সংখ্যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে Age of Consent (১৮৯১)-এর আলোচনা অথবা বিলটি প্রসঙ্গে সারা দেশে যে তুমুল ঝড় উঠেছিল[১৬] তার কোনও সংকেত নেই পত্রিকায়।

## মাতৃত্ব

শিশুপালন যে মেয়েদের সবচেয়ে বড় কাজ, এ কথা *বামাবোধিনী* প্রথম থেকে বলেছে। শিশু একটি 'অমর আত্মা' আর মাতা তাহার সেই আত্মাকে অমরত্বের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণকর্ত্রী' (পৃ. ৩১)। মাতাই 'প্রকৃত শিক্ষালাভের স্কুল', 'উত্তম মাতার যত্নে উত্তম মনুষ্য প্রস্তুত হয়' (পৃ. ৩১) এবং 'মার দোষেই ছেলে... খারাব হয়' (পৃ. ৭৪)। জননী যে কেবল অন্নদানে সন্তানের শরীর গঠন করেন, তা নয়।

> সন্তান জননীর চলাফেরা কথাবার্ত্তা ও হাবভাবের অনুকরণ করিয়া যেমন চলিতে শিখে, বলিতে শিখে, তেমনি জননীর প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে, প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারে অন্তরের যে সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্তান তাহারও অনুকরণ করে। (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৩)।

এইজন্য জননীর চরিত্র উন্নত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাসের নজির সন্ধান করলে দেখা যাবে, 'জগতের উন্নত চরিত্র সাধুপুরুষদিগের জননীগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মশীলা ও

বুদ্ধিমতী ছিলেন।' এ যুগে জননীর দায়িত্ব পুরাযুগের চেয়ে অনেক বেশি। কেননা একালের পিতারা ইংরেজ শাসনের দাপটে অর্থোপার্জন চেষ্টায় পরিশ্রান্ত, পরিশুষ্ক।

> মুনসেফবাবু বল, ডেপুটিবাবু বল, ডাক্তারবাবু বল, সকল বাবুরই এক দশা। আপিশে গাধার খাটুনি খাটিতে হয়। বাসায় আসিয়া রায় লিখিতে হয়, আইন পড়িতে হয়, বাহিরের কাজের চিন্তা করিতে হয়। কেরানীরাও আপিশের সাহেবদের কাছে মাথা বিক্রয় করিয়াছে।[৪৭]

তাঁদের সময় কোথায়? কেমন করে তাঁরা সন্তানের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন? কাজেই সন্তানপালনের ভার একমাত্র মাতার উপর ন্যস্ত। *বামাবোধিনী*-র পাতায় পাতায় তাই মাতার প্রতি উপদেশ, প্রবন্ধে প্রবন্ধে বক্তব্য 'মাতা যেরূপ সন্তান সেরূপ।' সন্তানপালন পদ্ধতি নিয়ে অজস্র লেখা আছে পত্রিকাটিতে। আছে সন্তান রুগ্ন হলে গৃহচিকিৎসাপ্রণালী। আছে সন্তানকে নৈতিক শিক্ষাদানের পথনির্দেশ।

আগেই বলেছি, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মাতৃত্বের বন্দনা চলছিল। *বামাবোধিনী* সুষ্ঠুভাবে পূজা-উপচার উপস্থাপন করেছে। মাকে একাধারে জন্মদাত্রী, অন্নদাত্রী, শিক্ষাগুরু ও গৃহচিকিৎসকের ভূমিকায় দেখেছে *বামাবোধিনী*। স্বভাবতই এমন সর্বগুণসমন্বিতা মাতা সন্তানের চোখে দেবীতুল্যা। সন্তানের মুগ্ধনয়নে মাতৃমূর্তি দর্শন এবং মাতৃস্তুতি *বামাবোধিনী* র দেহবল্লরী বারংবার সুশোভিত করেছে।

যদিও সন্তান উৎপাদনে পিতা-মাতা উভয়ে অংশভাগী, সন্তানপালনের সর্বভার অর্পিত হয়েছিল একমাত্র জননীর ওপর। মাতৃত্বের এই ভূমিকা সম্পর্কে অধুনা নারীবাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন।[৪৮] *বামাবোধিনী*-র কালে নারীবাদ তেমন রূপ পরিগ্রহণ করেনি; মায়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও লেখক বা লেখিকা সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেননি। মোটামুটি সকলেই মেনে নিয়েছিলেন যে, নতুন যুগোপযোগী সন্তান তৈরি করবেন 'নব্য মায়েরা'।

## গার্হস্থ্য

উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, পরিবার নারী নির্ভর এবং পরিবার পরিষেবায় গৃহস্থালীর স্থান কেন্দ্রীয়। *বামাবোধিনী* তাই গৃহিণীপনায় বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছে। গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে,

> রাজা যেরূপ রাজ্যের এবং সেনাপতি সৈন্যদলের সকল ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী সেইরূপ গৃহের সকল বিষয় অবগত থাকিয়া তাহার সুনিয়ম করিবেন (পৃ. ৩৬)।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা, অতিথিসেবা, দাসদাসীর যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত, রান্নাঘরের ব্যবস্থা, শয়নকক্ষের আয়োজন, সবই গৃহিণীর দায়িত্ব। ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়ে। 'গৃহকর্ত্রীর নিজের কাজ সব'।[৪৯] মনে পড়ে দীনেশ সেনকেও। 'গৃহিণীর উপরই গৃহ-সুখ নির্ভর করে।...গৃহের যাহা কিছু, তিনি তাহার সকলের নিয়ন্ত্রী'।[৫০] নির্দ্বিধায় একই নীতি প্রচার করেছে *বামাবোধিনী*। সংসারের প্রতিটি কাজের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছে। এবং

বলেছে, সংসারে যেখানে যা ত্রুটি হবে, যার কাজে যা অসম্পূর্ণতা থাকবে, তা পরিপূর্ণ করবেন গৃহিণী। তাই তো পুরাকালে বলা হত 'গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে।' গৃহিণীর থাকতে হবে সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, পরিচালনাশক্তি এবং বিশেষ করে মিতব্যয়িতা। 'মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন্যা' (পৃ. ৩৭)। সদ্য-উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমাজশীর্ষে আরোহণের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সে কারণে, গৃহিণীর মিতব্যয়ী হওয়া চাই।

তবে গৃহিণীদের বহির্জগতে প্রবেশ করে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টার দরকার নেই। ঘর ও বাহির, অর্থোপার্জন এবং গৃহমার্জন, এই দুইয়ের বিভাজনরেখা সুস্পষ্ট ছিল বামাবোধিনীগোষ্ঠীর দর্শনে। পুরুষের অর্থোপার্জ্জনই প্রধান কার্য্য। সুতরাং সাংসারিক সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, তাহার সমস্ত ভারই গৃহিণীর উপর পড়ে।

সেকালে মেয়েরাও কেউ বাইরে বেরিয়ে রোজগার করার দাবি তোলেননি—একমাত্র বেগম রোকেয়া ছাড়া। *বামাবোধিনী*-র লেখিকাবৃন্দ একমত ছিলেন যে, ঘরের সৌকর্য নারীর হাতে এবং শিক্ষিত হলেও মেয়েদের প্রধান কাজ গার্হস্থ্য। স্বর্ণপ্রভা বসু 'নারীর গৃহধর্ম্ম' প্রবন্ধে পরিশীলিত ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন,

> পুণ্যজ্যোতি বিভাসিত গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। (পৃ. ২৪০)

তবে দুঃস্থ মেয়েদের ঘরের মধ্যে বসে অর্থ উপার্জনের অনুমতি মিলেছিল। কৃষ্ণভাবিনী দাস (জ. ১৮৬৪) তাঁর 'স্ত্রীলোকের কাজ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিভিন্ন ঘরে-বসে-করা কাজের তালিকা দিয়েছিলেন। তবে ইংল্যান্ড ঘুরে আসা এই বঙ্গমহিলার মতে শিক্ষিকা ও শুশ্রূষাকারিণীর ব্রতও নারী-উপযোগী ছিল।[৫১] তাছাড়া মধ্যবিত্ত মেয়েদের যদি ঘরের বাইরে বেরুতে ইচ্ছে হয় এবং যদি গৃহ-কর্তব্য পরিপূর্ণ সম্পাদনের পরেও অবসর মেলে, তবে তাদের জন্য সমাজসেবার পথ খোলা রইল। কেননা, পরিবার তো সমাজেরই অঙ্গ। সমাজসেবা পরিবারসেবার নামান্তর। যিনি বুদ্ধিমতী, সুদক্ষা, সুশিক্ষিতা, যিনি স্বীয় গৃহকার্য এবং সন্তানপালন যথাযথ নিয়মে অথচ অল্প সময়ে সমাধা করতে পারেন, তিনি সমাজের কল্যাণে—বৃহত্তর পরিবারের কল্যাণে—আত্মনিয়োগ করবেন বৈ কি! অমৃতলাল গুপ্ত উপদেশ দিয়েছিলেন 'জনসমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য করার'[৫২]। লাবণ্যপ্রভা বসু অনবদ্য রচনায় 'পৃথিবীর মঙ্গল সাধন' করার জন্য জ্ঞানদীপ্ত মহিলাদের উদ্দীপিত করেছিলেন। (পৃ. ৮৭)

## বামারচনা

বামারচনাগুলি *বামাবোধিনী*-র এক বিশেষ সম্পদ। *বামাবোধিনী* চলাকালীন বেশ কয়েকজন লেখিকা নাম করতে শুরু করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবী চৌধুরাণী (জ. ১৮৭২) সম্পাদনা করতেন বিখ্যাত *ভারতী* পত্রিকা। ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট *ভারতী*-তে অনেক নামী লেখক ও লেখিকা স্বভাবতই লিখতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের (জ. ১৮৬১) লেখাও মাঝে মাঝেই বেরোত ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জ. ১৮৭৬) *বড়দিদি* উপন্যাস *ভারতী*-তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। এঁরা কেউ *বামাবোধিনী*-তে লেখেননি। *বামাবোধিনী* ছিল নব্যশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণীদের কাগজ। প্রসন্নময়ী দেবীর (জ. ১৮৫৭) জলদগম্ভীর ভাষা অনুধাবন করার শক্তি অথবা সরলা দেবীর সিংহনাদ শুনবার কান হয়তো বা *বামাবোধিনী* পাঠিকাদের তৈরি হয়নি। সে প্রশ্ন বিচার করার অবকাশ অবশ্য দেননি নারী লেখকলেখিকাকুল। মাত্র দু-চারজন নামজাদা লেখিকা লিখেছেন *বামাবোধিনী*-তে, যেমন জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনীদ্বয়, লাবণ্যপ্রভা বসু ও স্বর্ণপ্রভা বসু, এবং কৃষ্ণভাবিনী দাস ও শৈলবালা ঘোষজায়া (জ. ১৮৯৩)। যে গুটিকয়েক নবাগতা পরবর্তী জীবনে খ্যাতনাম্নী লেখিকা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানকুমারী বসু (জ. ১৮৬৩)।

*বামাবোধিনী*-তে যেসব মেয়েরা লিখতেন স্বনামে বা ছদ্মনামে,[৫] তাঁরা ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে ও বৌ। এতই বৈশিষ্ট্যবিহীন যে বহুচেষ্টাতেও তাঁদের জীবনী সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ সম্ভব হয়নি। আবার এঁদের মধ্যে যাঁরা নব্যশিক্ষিতা এবং নব্য লেখনী-ধারণ-করা, তাঁদের লেখা ছাপা হত 'বামারচনা'য়। তাঁরা শুনিয়েছেন সাধারণ শিক্ষিত মেয়েদের মনের কথা আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ে সম্পর্কে। তুলে ধরেছেন নিজেদের সংশয়, জিজ্ঞাসা, আনন্দ, বেদনা, সমালোচনা, উচ্ছ্বাস। বামারচনাগুলির এখানেই অপ্রতিম ঐতিহাসিক অবদান।

অধিকাংশ বামারচনালেখিকা পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, বিশেষ করে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলিতে। গার্হস্থ্য সম্বন্ধে, মাতৃত্ব সম্বন্ধে, dominant মত প্রতিফলিত করেছেন নবাগতা প্রবন্ধরচয়িত্রীরা।

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে অনুবীক্ষণ বিশ্লেষণ করলে ব্যতিক্রমী সুর ধরা পড়ে। সম্মুখীন হতে হয় কয়েকটি জিজ্ঞাসার। গৃহকর্ম নারীর। সুচরিতা হবে নারী। আর পুরুষ? তাঁদের কোনও কর্তব্য নেই? নেই চরিত্রগঠনের আবশ্যক? পরিবার তো শুধু নারীসমষ্টি নয়, হতে পারে না শুধু নারীনির্ভর। গৃহস্থালীতে নারীর কর্তব্য গৃহিণী হিসেবে। কর্তব্য ঠিক ততখানিই পুরুষের, গৃহস্বামী হিসেবে। 'সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।' গৃহকর্তা যদি অসাধু হন। কার্য যদি তাঁর অপবিত্র হয়, বাক্য যদি হয় অশ্লীল, কি শিখবে তাঁর কাছে পরিজনেরা? (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) শুধু পুরুষ 'শুদ্ধ' হলে অথবা স্ত্রীলোক 'শুদ্ধ' হলে সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না। যে পরিবারে উন্নতির পথে স্ত্রী পুরুষ 'উভয়ের হস্ত থাকে', সেটি আদর্শ পরিবার। সেই পরিবারে যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত ও সেই উন্নতির কার্য্য প্রকৃত উন্নতিতে পরিণত হয়' (পৃ. ৫২)।

আরও কথা উঠেছিল। 'বামারচনা'তেই। অধীনতা-স্বাধীনতার গুরুতর জিজ্ঞাসা। এই যে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে মেয়েদের, তাঁদের যে যোগ্য মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হচ্ছে না, এই অন্যায়ে পুরুষের হাত নেই? সৌদামিনী খাস্তগিরি লিখলেন,

> অস্মদ্দেশীয় অবলাকুল পুরুষজাতি কর্ত্তৃক অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ ও দাসীর ন্যায় ব্যবহৃতা হইয়া আসিতেছেন, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশীয় পুরুষেরা মনে করেন যে স্ত্রীজাতি শুদ্ধ গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ ও পার্থিব সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, উন্নতি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে তাহাদের অধিকার নাই। এই

কারণেই ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অন্যান্য সভ্যদেশীয় মহিলা অপেক্ষা উন্নতি সম্বন্ধে এত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। (পৃ. ৫২)

উনিশ শতকে ভারতীয় নারীদের নিম্নমান সম্বন্ধে পশ্চিমী সমালোচনার এবং সংস্কারপন্থী রোদনের যোগ্য প্রত্যুত্তর মিলল নারীমহল থেকে। নারীদের যে হীনাবস্থার কথা সরবে প্রচার চলছিল, তা অনেকাংশেই সত্যি। কিন্তু সেজন্য দায়ী মেয়েরা নন—পুরুষেরা। যে সমস্যাগুলি নিয়ে পুরুষবৃন্দ বিচলিত—স্ত্রীশিক্ষার অভাব, সুমাতার অপ্রাচুর্য্য, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যসম্পর্কে অপূর্ণতা—সেগুলো তো তাঁদেরই সৃষ্টি। মেয়েদের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখলে সুমাতা, সুপত্নী মিলবে কোথায়? যতদিন পুরুষ না বুঝবেন যে 'দয়াময় জগদীশ্বর উন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষকে সমান অধিকার দান করিয়াছেন', এবং স্ত্রীদের 'নিজ অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত না করিবেন,' ততদিন ভারতীয় সমাজের উন্নতি অসম্ভব। কেননা, স্ত্রীশিক্ষা উন্নতির একটি সোপান বটে,

> স্বাধীনতা উন্নতি লাভের আর একটি প্রধান উপায়। ইহা না থাকিলে মানব জীবনই বৃথা। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদের এইটি নাই। (পৃ. ৫৩)

সৌদামিনী সাহসিনী, কিন্তু একাকিনী নন। চারুমতি দেবী অভিযোগ করেছিলেন, 'নারী দুর্ব্বলা ও অধীনা, আবহমান কাল পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত ইচ্ছানুসারে চালিত' হয়েছে বলেই এমন দুর্দশায় উপনীত হয়েছে।[৫৪] ভাটপাড়ার প্রসন্নতারা গুপ্ত যে লেখা পাঠালেন 'বামারচনা'য় তার শিরোনামা 'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা।'

> ঈশ্বর এই পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই স্বাধীন প্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার একের স্বাধীনতার উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব করা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ।... কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত। আমাদের দেশে পুরুষের যেমন স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের আবার তেমনিই অধীনতা। (পৃ. ৫৩)

অধীনতা-স্বাধীনতার প্রশ্নটির মধ্যে অবশ্য জড়িত ছিল এক গভীর রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা। ঔপনিবেশিক শাসনে পুরুষও স্বাধীন ছিলেন না। তবে মেয়েদের অধীনতা ছিল দ্বিবিধ—রাজনৈতিক অধীনতা ইংরেজের কাছে, সামাজিক অধীনতা পুরুষের কাছে। এই দুই অধীনতার মধ্যে সাযুজ্য ও সম্পৃক্ততা প্রসন্নতারা গুপ্তর মনে প্রতিভাত হয়নি। অনেকের মনেই তখনও হয়নি।[৫৫] কিন্তু সামাজিক অধীনতার গোড়ার কথাটি পিতৃতন্ত্রের মূল সূত্রটি তাঁরা কয়েকজন উপলব্ধি করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'সবলা'র (১৯২৮) আগমনধ্বনি তখনও শোনা যায়নি। 'চারুলতা'-রা অধিকাংশই বঙ্কিমনিমগ্না।[৫৬] মাত্র কিছু বামাচরণের কিঙ্কিণীনিনাদে ভিন্ন বোল রণিত হয়েছিল।

একথা বলা সঠিক হবে না যে ১৮৬৩ সনে নারী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং *বামাবোধিনী*-র প্রথম থেকেই তার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। কিন্তু একথা বলা চলে যে, *বামাবোধিনী*-র পাতায় প্রতিবাদী সুর বেজেছে। হয়ত সংখ্যায় স্বল্প, হয়তো বা নিম্নগ্রামে,

কিন্তু অশ্রুত নয়। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে মোটামুটি বর্তমানের নারী আন্দোলনের সূচনা।[৫৭] বামাবোধিনী তখন চলমান। স্বদেশি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের আবেদন ও বিবরণ জোরালো *বামাবোধিনী*-তে। বহু লেখক-লেখিকা উদ্দীপ্ত ভাষায় ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন পাঠিকাদের।[৫৮] এই অতি প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পাশাপাশি অন্য যে আরেকটি রাজনৈতিক আন্দোলন ধীরে, অতি ধীরে, বলা চলে প্রায় জনমানস, এমনকি পাঠক-পাঠিকা-লেখক-লেখিকা অগোচরে গড়ে উঠছিল বাংলার নারীমহলে তারও ইশারা মেলে *বামাবোধিনী*-তে।

ইতিহাসের বিচারে সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে *বামাবোধিনী* তুঙ্গস্থানীয় অবদানের অন্যতম দাবিদার। একদিক দিয়ে উনিশ শতকের সংস্কারপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতবাদ, নারী প্রতিকৃতি সৃজন এবং সমাজে ও পরিবারে নারী-ভূমিকার মূল্যায়ন রূপায়িত করেছে *বামাবোধিনী*। রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠিকামানস প্রভাবিত করেছে। সেদিনের রূপায়ণের মূল্য এই যে, আজও তার রেশ মেলায়নি। স্বাধীন দেশের অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা, চিত্র-চিত্রায়ণ, নাটক-ছায়াছবি-দূরদর্শন আজও উনিশ শতকীয় প্রভাবশালী ভাবাদর্শ বহুল পরিমাণে বহন করে চলেছে। আবার অন্যদিকে নব ইতিহাসের, নব যুগের, বিশ শতকের শেষ এবং একবিংশ শতকের গোড়ায় নারী-ভাবনা ও সংগ্রামের 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' *বামাবোধিনী*-তে। সংগ্রামের ভবিষ্যৎ প্রকৃতি ও পরিণতি, নর ও নারী চেতনায় সমাজে ও পরিবারে নব্যনারীর নব্যভূমিকার সঠিক রূপলেখা আজ অচেনা। তবু এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্কেত অস্পষ্ট নয়। একাধারে শক্তিশালী অতীতের ভাবাদর্শের স্বাক্ষর এবং সম্ভাবনাময় এক ঐতিহাসিক সূচনার ইঙ্গিত বহন করছে *বামাবোধিনী*।

*বামাবোধিনী* নিজেই ইতিহাস।

**ভারতী রায়**

২০০০ নতুন দিল্লী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগাযোগ', *রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ*, নবম খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫৩।

২। রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, প্রথম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯ ও ৩৯। এই গ্রন্থটিব অধুনা বিশ্লেষণের জন্য দ্র.—Tanika Sarkar ,*Words to Remember: Rasasundari Devi: Amar Jiban:A Modern Autobiography*, Delhi, 1999.

৩। কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, কলিকাতা ১৮৬৩, পৃ. ৬১।

৪। ভারতী রায় (সম্পাদিত), *সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা*, কলিকাতা ১৯৯৪, পৃ. ১৭-২৯।

৫। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র.—David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Calcutta 1969.

৬। James Mill, *The History of British India* , London 1840, pp 445-47.

৭। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন—Nemai Sadhan Bose, '*Indian Awakening and Bengal*', Calcutta 1976; Charles Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton 1964. তদানীন্তন সমসাময়িক বিবরণ আছে Shivanath Shastri, *History of the Brahmo Samaj*, 2 vols, Calcutta 1911.

৮। অমৃতলাল গুপ্ত, 'সমাজসমস্যা', *ভারতমহিলা*, ভাদ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

৯। Kalidas Nag (ed ), *Bethune College and School Centenary Volume*, *1849-1949*, Calcutta 1950,

pp 24-25. See also Malavika Karlekar, *Voices from Within*, Delhi 1991, pp 150-91.

১০। Ghulam Murshid, *Reluctant Debutante*, Rajshahi 1983, p. 39.

১১। সম্পাদকীয়, *'সংবাদ প্রভাকর'*, ৯.৮.১২৬০ বঙ্গাব্দ, বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত) *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, কলিকাতা ১৯৬৬, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৩।

১২। শরৎকুমারী চৌধুরাণী, *শুভবিবাহ*, কলিকাতা ১৯০৬, পৃ. ২০।

১৩। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, *পুরাতনী*, কলিকাতা ১৮৭৯ পৃ. ৩৩।

১৪। প্রসঙ্গটির তথ্যবহুল আলোচনার জন্য দেখুন Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905*, Princeton 1984, pp 26-108.

১৫। দ্রষ্টব্য—Ramesh C. Dutt, *A History of Civilization in Ancient India'*, Reprint, Delhi 1972 বঙ্কিমের মতবাদের আলোচনার জন্য দ্র.—Tapan Ray Chaudhuri, *Europe Reconsiderd*, Delhi 1988, pp 103-203; Amiya P. Sen, *Hindu Revivalism in Bengal 1872-1905*, Delhi 1993, pp. 86-128.

১৬। Partha Chatterjee, 'The Nationalist Resolution of the Women's Question' in Kumkum Sangari & Sudash Vaid (eds.), *Recasting Women*, Delhi 1997, pp 237-43.

১৭। দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'The Difference-Deferral of a Colonial Modernity' in David Arnold and David Hardiman (eds ), *Subaltern Studies, VIII*, Delhi 1994.

১৮। 'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, নভেম্বর ১৮৭৮, পৃ. ১৫৪-৬।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দেবী চৌধুবাণী ', *বঙ্কিম রচনাবলী*, কলিকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮৭২।

২০। বই তিনটিব বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য দ্র.—Judith Walsh, 'The Virtuous Wife and the Well-ordered Home: the Reconceptualization of Bengali Women and their Worlds' in Rajat Kanta Ray (ed.), *Mind Body and Society*, Delhi 1995, pp 331-63, Judith Walsh, 'As the Husband So the Wife. A Discussion of Satyacaran Mitra's *Strir Prati Svamir Upadesh'* in Bharati Ray (ed.), *The Journal of Women's Studies*, 2 : 1, 1997, pp. 19-42.

২১। উল্লেখ করা যেতে পাবে যে মেয়েদের নির্দেশনামা পুস্তকগুলির মধ্যে পরবর্তী কালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তীর *ললনা সুহৃদ* (কলিকাতা, ১৯১১)। শুধু হিন্দু মেয়েদের জন্য নয়, মুসলমান মেযেদের জন্যও এই বইটি বিশেষভাবে সুপাবিশ করেছিলেন মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা।

২২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'পারিবাবিক প্রসঙ্গ', প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, *ভূদেব বচনা সম্ভাব*, কলিকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫৬, ৪৯০। বইটিব প্রথম প্রকাশ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।

২৩। *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Mayavati Memorial Edition, 1962, vol 3, p. 255

২৪। পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৬।

২৫। প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন ইন্দিবা চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে *The Frail Hero and Virile History Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Delhi 1998 দ্রষ্টব্য, John Rosselli, 'The Self Image of Effeteness . Physical Education and Nationalism in 19th Century Bengal' *Past and Present*, February 1980। সমসাময়িক বিবরণেব জন্য দ্রষ্টব্য —ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'পারিবারিক প্রসঙ্গ', পৃ. ৪৮৫, সবলা দেবী চৌধুবাণী, 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল', 'বাঙ্গালীর পিতৃধন', *ভারতী*, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১০; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'লোকরহস্য', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১-১৩।

২৬। সমসাময়িক বহু গ্রন্থে শিশুপালন পদ্ধতি, শিশুস্বাস্থ্যরক্ষণ এবং শিশুচিকিৎসা নিয়ে আলোচনা আছে। দীনেশ সেন *গৃহশ্রী* পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছেন ডাক্তার গিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম ডি. লিখিত 'গৃহ-চিকিৎসা'। *গৃহশ্রী*, ৩য় সংস্করণ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮২-২৩৪।

২৭। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য হেমলতা সরকার, 'নারীজাতির শিক্ষা', *ভারতমহিলা*, আষাঢ় ১৩১৪, শতদলবাসিনী বিশ্বাস, 'আমাদের শিশু', *ভারতমহিলা*, বৈশাখ ১৩১৮; প্রবোধিনী ঘোষ, 'সন্তানশিক্ষা', *অন্তঃপুর*, বৈশাখ ১৩১০; সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'অভয়মন্ত্র', *ভারতী*, পৌষ ১৩১৬।

২৮। Mary Wollstonecraft, *Vindication of the Rights of Women*, London 1875; P Branca, *Silent Sisterhood Middle Class Women in the Victorion Home*, London 1977

২৯। দ্রষ্টব্য—Sukumari Bhattacharyya, *Literature in the Vedic Age*, Calcutta 1984.

৩০। Uma Chakravarti, 'Whatever Happened to the Vedic Dasi?' in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (eds.), *Recasting Women*, pp. 78-79.

৩১। অপরাজিতা দেবী, 'পিসিমা,' 'মাসিমা,' 'কাকিমা', 'ঠানদিদি', *পুরবাসিনী*, কলিকাতা ১৯৩৫।

৩২। Sumanta Benerjee, *The Parlour and the Street,. Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Bengal*, Calcutta 1989; চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, কলিকাতা ১৯৮৪, অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরঙ্গ

চিত্রলিপি অঙ্কিত করেছে।

৩৩। বিবি তাহেরণ নেছা নামে একজন লিখেছিলেন *বামাবোধিনী*-র ফাল্গুন ১২৭১ সংখ্যায়। কখনও কখনও পত্রিকাটি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করেছে। দ্রষ্টব্য—বৈশাখ ১২৯৬; মাঘ, ১৩১৪; কার্তিক ১৩১৩।

৩৪। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৭৫৭-১৯১৮*, কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ৩৮৪; ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ঢাকা ১৯৮৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬-৮৪। আরও দ্রষ্টব্য—Zoya Hasan (ed.), *Forging Identities*, New Delhi 1994.

৩৫। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. Gail Minault, *Secluded Scholars : Women's Education and Muslim Social Reform in Colonial India*, Delhi 1998, pp 33-54; Sonia Nishat Amin, 'The Orthodox Discourse and the Emergence of the Muslim *Bhadramahila* in Early Twentieth Century Bengal', in Rajat Kanta Ray (ed.), *Mind Body and Society*, pp 403-10

৩৬। Sonia Nishat Amin. 'The Early Muslim *Bhadramahila* : The Growth of Learning and Creativity, 1876 to 1939 in Bharati Ray (ed.) *From the Seams of History · Essays on Indian Women*, Delhi 1998, pp 107-47। মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ৪১-৫৬।

৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, কলিকাতা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯০।

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৩।

৩৯। উপক্রমণিকা, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

৪০। পূর্বোক্ত।

৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, কলিকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯২।

৪২। পূর্বোক্ত।

৪৩। রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল আর একাল*, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ.৭৮; অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলন*, কলিকাতা ১৯৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

৪৪। আশাপূর্ণা দেবী, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, কলিকাতা ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮১-৮৮।

৪৫। দেখুন—সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে*, কলিকাতা ১৯৯৫।

৪৬। এই ঝড়ের বিবরণের জন্য দেখুন—*Report of Native Newspapers (Bengal). 1887-1891*, West Bengal State Archives, Kolkata.

৪৭। ভারতী রায়, *সেকালের নারীশিক্ষা*, পৃ ২৫৩।

৪৮। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—Maithreyi Krishnaraj, 'Motherhood · Power and Powerlessness' in Jasodhara Bagchi (ed ), *Indian Women Myth and Reality*, Calcutta 1995, pp 34-43.

৪৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'পারিবারিক প্রবন্ধ,' *ভূদেব রচনা সম্ভার*, পৃ. ৪৯১।

৫০। দীনেশ চন্দ্র সেন, '*গৃহশ্রী*' পৃ. ১ ও ৫।

৫১। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, শ্রাবণ, মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৮।

৫২। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

৫৩। সেকালে অবশ্য অনেক সময়ে পুরুষেরাও মেয়েদের ছদ্মনাম ধারণ করে লিখতেন। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনও কোনও পুরুষের লেখা মেয়েদের ছদ্মনামে বা বেনামে থেকেও থাকতে পারে *বামাবোধিনী*-তেও, কিন্তু সে বিষয়ে সঠিক কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

৫৪। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কার্ত্তিক, ১৩২২; দ্রষ্টব্য ভারতী রায়, *সেকালের নারীশিক্ষা*, পৃ. ৩১০।

৫৫। এই সম্পর্কটি নারী সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথম সোচ্চার করেছিল *জয়শ্রী*, *বামাবোধিনী পত্রিকা* অন্তর্ধানের প্রায় বছর আষ্টেক পরে, যখন দলে দলে মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিলেন। দ্রষ্টব্য—শান্তিসুধা ঘোষ, 'পথের ইঙ্গিত', *জয়শ্রী*, আষাঢ় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *নষ্টনীড়* (১৩০৯) কাহিনীর চিত্রায়ণ 'চারুলতা' ছায়াছবিতে পরিচালক সত্যজিত রায় প্রথম কয়েকটি অনবদ্য দৃশ্যে শিক্ষিতা নায়িকা চারুলতার বঙ্কিম প্রীতি প্রস্ফুটিত করেছেন। অবশ্য কাহিনীতে এবং ছায়াছবিতে চারুলতা শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম-নির্ণীত পথে চলেননি।

৫৭। দ্রষ্টব্য—Bharati Ray, 'The Freedom Movement and Feminist Consciousness in Bengal, 1905-1929' in Bharati Ray (ed.), *From the Seams of History*, pp.174-218.

৫৮। দ্রষ্টব্য—*বামাবোধিনী পত্রিকা*, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর, বিশেষ করে গান্ধীজীর আবির্ভাবের এবং অসহযোগ আন্দোলনে অগণিত নারীর যোগদানের চিহ্ন তেমন পড়েনি *বামাবোধিনী*-তে। অবশ্য ততদিনে, ১৯২০-২১-এ, *বামাবোধিনী* বিলুপ্তির পথে।

# স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ*

## ১ সরলতা

আমরা আবশ্যক মতে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিব, এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বাক্‌শক্তি এবং ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় দিয়াছেন। তাহা এ কারণে নহে যে আমরা মিথ্যা কহিয়া বা মনের যথার্থ ভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কাহারও অপকার বা আপনার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিব। অতএব মনের যা যথার্থ ভাব, তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা হয়। যাহার কথা ও মনের ভাব, বিশ্বাস ও আচরণ একই, তাহাকে সরল কহে। সরল ব্যক্তি সকলেরই প্রশংসনীয়, কারণ সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। আরও সরল ব্যক্তি সকলের প্রিয় হয় ও সর্ব্বদা মনের সুখে থাকে। তুমি সর্ব্বদা সরল থাকিবে। সরলতা হীন কখন হইও না।

যাহার মনে এক প্রকার কথায় আর এক একপ্রকার ভাব, যাহার বিশ্বাস একরূপ, আচরণ অন্যরূপ, তাহাকে কপট বা ভণ্ড কহে। কপটতা ঈশ্বর ও লোক উভয়ের নিকটেই ঘৃণিত। কেহ কেহ অন্তরে পাপে পূর্ণ হইয়া বাহিরে সাতিশয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে, তাহারা স্পষ্ট পাপী অপেক্ষা অধম। ঈশ্বর অন্তর দেখিয়া বিচার করেন। অতএব তুমি কখন কপটচারী হইও না, মনে পাপ পূর্ণ কিন্তু বাহিরে বিলক্ষণ ধার্ম্মিক, দেখাইবে না। ঈশ্বর তোমার মন দেখিয়া শাস্তি দিবেন বরং কপটতার জন্য অধিকতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভ্যাস, ভয় লোভ এবং অহঙ্কারাদি কুপ্রবৃত্তির বশ হইয়া লোকে কপটাচারী হয়। কিন্তু কপটতা মাত্রই জঘন্য ও পরিত্যজ্য। মনে করিও না যে কোন কোন সময়ে তোমার কপট না হইলে চলে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সে আপনার ভাব হয় যথার্থরূপ প্রকাশ করিবে, নয় একেবারে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু কপট ব্যবহার স্বভাববিরুদ্ধ।

যাহারা হিংসা বা কোন দুরভিসন্ধি সাধনার্থ কপটাচারী হয়, তাহাদিগকে খল কহে। খলেরা সর্পের ন্যায় দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অন্তরে বিষময়। তুমি ত নিজে খল হইবে না ও খলের সহিত সহবাসও করিবে না। বরং অন্যকে সাবধান করিয়া দিবে যেন খলের সহিত সহবাস না করে। স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা খল বন্ধু শত গুণে ভয়ানক।

অত্যন্ত পাপী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সরল হয়, সে অতি শীঘ্রই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কারণ সরল না হইলে কোন উপদেশ কার্য্যকারক হয় না; অতএব সর্ব্বাগ্রে সরল হইতে শিখ। সরলতা কিছু বহু কষ্টসাধ্য নহে; বরং কপটতা অনেক চাতুরীর কর্ম্ম।

* কোন ব্যক্তি তাঁহার পত্নীর প্রতি নীতি বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ দেন। তদ্দ্বারা সাধারণের উপকারের সম্ভাবনা এই ভাবিয়া তাহার এক একটি করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

যাহা যথার্থ মনের ভাব, তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে তজ্জন্য আর আয়াস করিতে হয় না। বাল্যকাল হইতে সরল হও, নতুবা মহা অনিষ্ট হইবে। তুমি যদি সরল হইতে পার তাহা হইলে সহজেই অন্যান্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে; নচেৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সরলতা দুই প্রকার, সত্যকথন ও সত্য ব্যবহার।

১। **সত্যকথন**—সত্য কথা কহা যে লোকমাত্রেরই উচিত তাহা বলা বাহুল্য। তুমি কখনই মিথ্যা কহিও না। এমন কি উপহাস ছলেও মিথ্যা কহিবে না। কারণ তাহা হইলে কুঅভ্যাস জন্মিবে। যদি সকলেই তোমার উপর রাগপ্রকাশ করে, যদি সকলেই তোমাকে ভর্ৎসনা করে, ভয় দেখায়, তথাপি সত্য কথা কহিতে ক্ষান্ত হইবে না, তুমি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সত্যবাদী হইবে; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তা বলিয়া নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন অপ্রিয় সত্য কহিয়া কাহারও মনে মিছামিছি কষ্ট দিবেনা। মিষ্ট কথা কহিবে, সত্য কথা কহিবে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অপ্রিয় সত্য বাক্য কহিবে না। কিন্তু মিথ্যা সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। যদি একটী মিথ্যা কহিলে কোন এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয় বা আপনার প্রাণরক্ষা হয় তাহাও কহিবে না। যদি কোন একটী সত্য কহিতে গেলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এমন কি আপনার প্রাণ সংশয় হয়, তথাপি প্রয়োজন হইলে সত্য কহিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

যদি কোন দোষ কর, তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিবে। যাহা কিছু করিবে বলিয়াছ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই পালন করিবে। প্রতিজ্ঞা অবহেলা করা পাপ। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন না করে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। তুমি এরূপ সত্য কহিতে অভ্যাস রাখিবে, যেন লোকে তোমার কথাকে কখন মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করিতে পারে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে। শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিও না; পালন করিতে পারিবে কিনা আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে। যাহা নিশ্চয় জান না এমন কথা কহিতে গেলে "বোধহয়" এইরূপ কথা ব্যবহার করিবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে তুমি তাহা নিশ্চয় জান না।

শুদ্ধ বাক্যদ্বারাই যে মনের ভাব প্রকাশ হয় এমত নহে, আকার ইঙ্গিত দ্বারাও হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা যেরূপ মিথ্যা ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভঙ্গিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যথা, যদি তুমি একটী দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেল, আর যাহার জিনিস সে তোমাকে সন্দেহ না করিয়া কহে, যে 'তুমি কখন এমন কর্ম্ম কর নাই' সে সময় তুমি যদি চুপ করিয়া থাক তাহা হইলে এই বুঝা যাইবে যে, তুমি যেন বলিতেছ তুমি নষ্ট কর নাই। তুমি মনে করিয়া রাখিতে পার যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কহিবে; সুতরাং কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়া তুমি নিস্তব্ধ রহিয়াছ, তাহাতে পাপ কি? কিন্তু বাস্তবিক সে স্থলে তোমার মিথ্যা কথা কহা হইল। সুতরাং কথা দ্বারাই হউক বা ভাব ভঙ্গির দ্বারাই হউক, অন্য লোকে যেন তোমার নিকট হইতে অযথার্থ বিশ্বাস না পায়। তুমি স্পষ্ট বল বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশ কর, লোকে তোমার নিকট সত্য জানিতে না পারিলে অনেক সময় তোমারই দোষ বলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্ট করিয়া হউক বা অস্পষ্ট করিয়া হউক কখন মিথ্যা আচরণ করিও না।

২। **সত্য ব্যবহার**—তোমার মনের বিশ্বাস যেরূপ সেইরূপ কার্য্য করিবে। লোকের

মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বা লোক ভয়ে স্বীয় দৃঢ়প্রত্যয় অনুসারে কার্য্য না করা কপটতা মাত্র। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জান, তুমি যাহা বিশ্বাস কর, লোকের কথায় তাহা লুকাইয়া রাখিও না। সরলতা ধর্ম্মের প্রথম কার্য্য। কখন ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের কাছে ভাণ করিবে না। আপনি যেরূপ, সকলের নিকটই সেইরূপ দেখাইবে। যাহাকে যেরূপ ভালবাস তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; যাহাকে যথার্থ সম্মান না কর বা ভাল না বাস, তাহার নিকট বলিয়া বেড়াইও না যে "আমি তোমার কথা শুনিয়া থাকি, তোমাকে ভাল বাসি।" ইহা বলিয়া আবার বাড়াবাড়ি করিও না, কাহাকেও বিরক্ত করিও না। সকল লোকের সহিত শিষ্টাচার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তিকে তুমি যথার্থ ভক্তি না কর, তাহার প্রতি কপট ভক্তি প্রকাশ করিও না। কিন্তু যাঁহারা গুরুলোক, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি না থাকা পাপ। অতএব যদি কোন গুরুলোকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে ভক্তি হয়।

সরল ব্যবহার বন্ধুতার মূল। সরলতা না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার, যশ পাইতে পার, কিন্তু বন্ধুতা লাভ করিতে পার না। মনের বন্ধু মনের ভাব চায়, কেবল মুখের নহে। অতএব বন্ধুর নিকট কখনই কপটতা করিও না। যদি তাহার উপর তোমার কোন বিরাগ জন্মিয়া থাকে স্পষ্ট বলিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। বন্ধুও সরলভাবে ভর্ৎসনা করিলে বিরক্ত হইও না। সরল ব্যবহার করিতে গেলে অনেক সময়ে ভাল লাগিবে না বটে, কিন্তু তাহা না হইলে বন্ধুতা থাকে না। মাতা যেরূপ সন্তানের নিকট কপট স্নেহ প্রকাশ করেন না, কার্য্যে স্নেহ দেখান; সেইরূপ তুমি বন্ধুর নিকট মুখে কপট ভালবাসা দেখাইবে না; যথার্থ ভালবাসিবার কার্য্য করিবে। বস্তুতঃ যেমন আপনার মনের ভাব, ঠিক সেইরূপটি অন্যের নিকট কি কথায় কি কার্য্যে প্রকাশ করিবে। উচিত বোধ হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পার, কিন্তু বিপরীত প্রকাশ কখনই করিবে না। এরূপ আচরণ করিলে তুমি সরল হইবে।

ঈশ্বরের নিকট ত কেহই কপটতা দ্বারা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তথাপি পাপিলোকে তাঁহার নিকট সরল হয় না। তুমি পাপ করিলে তাঁর নিকট গোপন করিতে যাইও না। তাহা স্বীকার করিবে। যেমন সাধু লোকের নিকট কাতর হইয়া দোষ স্বীকার করিলে তিনি ক্ষমা করেন, সেইরূপ দুঃখের সহিত পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরও পাপীকে ক্ষমা করেন। তুমি যদি কৃতপাপের জন্য সমুচিত দুঃখপ্রকাশ করিয়া আর সেরূপ পাপ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে সে পাপ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু শুদ্ধ মুখেতেই কিছু হইবেক না; সরল হইয়া দুঃখ ও প্রতিজ্ঞা করিতে চাই ও সর্ব্বদা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইতে হইবেক। অতএব প্রতি সন্ধ্যাকালে সমস্ত দিনে যে যে পাপ করিয়াছ তাহা একে একে মনে করিয়া সেই পাপের উপর যাহাতে ঘৃণা পড়ে, তাহার জন্য যাহাতে দুঃখ হয়, এরূপ করিবে; এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে যেন আর সেরূপ না হয়। যখন হঠাৎ কোন পাপ করিয়া ফেলিবে তখনি 'কেন করিলাম' বলিয়া ক্ষোভ করিবে; এবং আর না হয় এমন প্রতিজ্ঞা করিবে; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে ক্ষমা করুন ও প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বল দেন।

(ক্রমশঃ)

আশ্বিন ১২৭০

# স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## ২ কৃতজ্ঞতা

যিনি কাহারও উপকার করেন তাঁহাকে উপকারী কহে; এবং যিনি উপকার প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে উপকৃত ব্যক্তি কহে। উপকারীর প্রতি উপকৃত ব্যক্তির যে সদ্ভাব, তাহাই কৃতজ্ঞতা। সাধু লোক কিছু মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলেই আপনাকে উপকারীর প্রতি চির বাধিত মনে করেন, এবং সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহার ভাল হয়। তিনি সুযোগ পাইলেই উপকারীর প্রতি উপকার করিতে ক্রুটি করেন না। এইরূপ উপকারীর প্রতি উপকার করাকে প্রত্যুপকার কহে।

প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক প্রধান চিহ্ন। মাতা যেরূপ স্বয়ং সন্তানের কোন সুখ সাধন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তদ্রূপ নিজে প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সাতিশয় সুখী হয়েন। কিন্তু মাতৃ স্নেহ যে রূপ যে কোন প্রকারেই হউক সন্তানকে সুখী দেখিলেই চরিতার্থ হয়, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপকারীর ভাল হওয়া দেখিলে কৃতজ্ঞতা সে রূপ চরিতার্থ হয় না। এ জন্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সুযোগ দেখেন কিসে প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হন। অতএব যদি কৃতজ্ঞ হইতে চাহ সতত প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক মাত্র কার্য্য—প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে কৃতজ্ঞ হওয়া হয় না। এমন অনেক স্থল আছে যেখানে হাজার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুপকার করা যায় না; এবং অনেক লোক আছে যাহাদের উপকার করা নিতান্ত দুষ্কর। সচরাচর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং দরিদ্র লোকদিগের প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা অনেক স্থলে থাকে না। তবে কি নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের প্রতি, দরিদ্র ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারে না? না প্রজা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না? কখনই নহে। উপকারী ব্যক্তিকে মান্য করা, তাঁহার কথার বশ হওয়া এবং যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কৃতজ্ঞতার কার্য্য। ঈশ্বর তোমার অশেষ উপকারী, সুতরাং অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তাঁহার কোন অভাব নাই যে তুমি পূরণ করিয়া প্রত্যুপকার কর, তবে কি তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার না? তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, তাঁহাকে সর্ব্ব সুখ দাতা বলিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করাই কৃতজ্ঞতার কার্য্য।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে কহে ও ইহার কার্য্য কি তাহা শুনিলে। কিন্তু ইহা সুদ্ধ শুনিবার কথা নয়, ইহা ভাবে পরিণত করিতে হয়। যে রূপ উপদেশ পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি পশুতুল্য; মনুষ্য মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনই অকৃতজ্ঞ হইও না। যিনি তোমার কিছু মাত্র উপকার করিবেন তুমি তাঁহার ভাল করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে, এবং তাঁহাকে মান্য করিবে। একটুকু উপকার পাইলেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, কারণ উপকার যত অল্প হউক না কেন উপকারী সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতার পাত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে ভাল বাসিয়া, তোমার ভাল চেষ্টা করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাঁহাকে তুমি পরম বন্ধু বলিয়া মান্য করিবে; তাঁহার প্রতি বাধিত থাকিবে। যাহাতে উপকারী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকেন এমন কার্য্য করিতে

চেষ্টা করিবে। উপকার পাইবা মাত্র 'নমস্কার' বা অন্য কোন বাক্য বা ভাবভঙ্গি দ্বারা আপনাকে বাধিত জানাইবে।

কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সততই উপকার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়; যথা পিতা, মাতা, গুরু ও ঈশ্বর।

তুমি জন্মাবধি যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, নিদ্রার সময় শয্যা ও ইচ্ছানুযায়িক বস্ত্রালঙ্কার পাইয়াছ, যাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার ভাল চেষ্টা করিতেছেন, এমন যে পিতামাতা তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিবে। রোগের সময় কে তোমাকে ঔষধ দিয়া তাহার শান্তি করিয়াছেন? নিতান্ত শিশুকালে, সেই অসহায় অবস্থাতে, কে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? পিতামাতা। এমন পিতামাতার সহিত বিবাদ করা, তাঁহাদিগকে ভাল না বাসা, তাঁহাদের ভাল করিতে চেষ্টা না করা ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। এখন যদি তাঁহারা তোমার সহস্র দোষ ধরেন, তথাপি তুমি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইও না। শত বৎসরেও পিতা মাতার ধার শোধা যায় না। কাহার যত্নে তুমি পৃথিবীতে রহিয়াছ, নানা সুখপ্রদ এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ, বন্ধু বান্ধব ভাই ভগ্নী স্বামী ও ঐশ্বর্য্য তাবৎপ্রাপ্ত হইয়াছ? পিতামাতা শৈশবকালে তাদৃশ যত্ন না করিলে তুমি কোন সুখেরই অধিকারিণী হইতে পারিতে না। অতএব তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহাদিগকে কখনই কটু কথা কহিবে না ও তাঁহাদের প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করিবে না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে। যাহাতে তাঁহাদের ভাল হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখী হন এরূপ কার্য্য করিবে। তাঁহাদের তাবৎ অভাব মোচন করিবে; এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে।

যেমন শরীর রক্ষাকারী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তেমনি আবার যিনি মনকে ভাল করেন তাঁহাকেও মান্য করিবে। যিনি তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দেন, যিনি ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। পিতামাতা তোমার শরীরের ভাল করেন, যাহাতে তুমি এই সংসারে সুখী থাক এমন করেন। গুরু তোমার মনের ভাল করেন, যাহাতে তুমি জ্ঞানবতী হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে পার ও তাঁহাকে জানিয়া ইহকালে ও পরকালে সুখী থাক। উভয়ই অশেষ উপকারী। অতএব গুরুকে ভক্তি করিবে; তাঁহার কথার বশ থাকিবে, তাঁহার উপকার করিতে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নশীলা থাকিবে। পিতা মাতা ও গুরু উভয়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র। সচরাচর পিতামাতা বালকদিগের গুরু হয়েন। জ্ঞানী পিতামাতা সন্তানের শরীর, মন, ঐহিক, পারত্রিক উভয়েরই প্রতি সমান যত্ন লন। এরূপ পিতামাতা অশেষ ভক্তি ভাজন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরমেশ্বরের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহার প্রসাদেই শরীর, মন, জীবন ও তাবৎ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছ। তিনিই পিতামাতার মনে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারই নিয়মানুসারে পিতামাতা এরূপ আশ্চর্য্য যত্নের সহিত সন্তানকে লালন পালন করিতেছেন। তিনি যদি মাতার মনে স্নেহ না দিতেন মাতা কখনই তোমাকে তাদৃশ যত্নে লালন পালন করিতেননা। দেখ, পরমেশ্বর লোকের হিতের জন্য সর্পকে অপত্য স্নেহ দেন নাই, সুতরাং প্রসব করিয়াই সর্পমাতা স্বীয় সন্তানগণকে ভক্ষণ করে। তদ্রূপ যদি তিনি পিতাকে স্নেহ না দিতেন পিতাও তোমাকে এরূপ যত্নে রক্ষা করিতেন না। দেখ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বীয় শাবকদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি যদি একবার

তোমাকে ভুলেন তুমি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাও। কে গুরু দ্বারা তোমাকে জ্ঞানবতী করিতেছেন? গুরুর সাধ্য কি তোমাকে উপদেশ দেন যদি পরমেশ্বর তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা এবং সাধু ইচ্ছা না দিতেন। ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, গুরু তাঁহার উপলক্ষ্য, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস মাত্র। তিনি পিতামাতার পিতামাতা, গুরুর গুরু। যদি পিতামাতার কথা অবহেলা করা পাপ, তবে পরমপিতার অবাধ্য হওয়া কি ভয়ানক পাপ। যদি গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তবে পরম গুরুকে ভক্তি করা কত অধিক উচিত। পরমেশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করিবে। আগে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে তবে পিতামাতা ও গুরুর আজ্ঞা শুনিবে। তিনি নিষেধ করিলে কোন কাজই করিবে না; তিনি আজ্ঞা করিলে বাপ মার কথায় তাহা কদাপি অন্যথা করিবে না। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া হইল।

তুমি যখন নিদ্রা যাও ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেন, তোমার শরীর ও মনকে সুস্থ করেন। অতএব প্রাতঃকালে উঠিয়াই অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। নূতন দিবসের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন বল পাইলে; অদ্যাবধি জীবন ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার নব দিবসের সুখ ভোগ করিতে চলিলে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। আবার সমস্ত দিনে তুমি যত সুখ পাইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম;—সমস্ত দিনে যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য প্রতি সন্ধ্যাকালে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিবে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

(ক্রমশঃ)

পৌষ ১২৭০

## স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

### ৩ দয়া ও স্নেহ

বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি দয়া করিতে হয় বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। কি ইতর প্রাণী, কি মনুষ্য, নিষ্ঠুরতা কাহারও পক্ষে বিধি নহে। অনর্থক কোন জীবকে যাতনা দেওয়া নিষ্ঠুরতা। যাহারা পরকে কষ্ট দিয়া আপনাদিগকে কেবল তাহাতেই চরিতার্থ মনে করে তাহারা নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতা সকলের নিকটই ঘৃণিত। কেহ কেহ মনে করেন যে মনুষ্যের উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করা পাপ; কিন্তু ইতর জন্তুর (পশু পক্ষী কীটের) উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করিলে দোষ নহে। যদিও অচেতন ও উদ্ভিদের উপর নিষ্ঠুরতা হয় না কারণ তাহাদের বোধ নাই, তাহারা কষ্ট বোধ কারিতে পারে না, কিন্তু কি অতি ক্ষুদ্র কীট, কি বৃহদাকার পশু যাহাদের প্রাণ আছে, যাহারা কষ্ট বোধ করিতে পারে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেই নিষ্ঠুরতা হয়। সদুপদেশ হীন বালকেরা প্রায় কীট পতঙ্গাদি ও পশু পক্ষীর উপর নির্দ্দয় হয়। পিপীলিকাকে কষ্ট দিয়া অনেক শিশু আমোদ

করে। কেহ চড়ুই ধরিয়া কেহ বেঙ্ মারিয়া অথবা মাছ্ ধরিয়া আমোদ করে। শৈশব কালে এই রূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া নির্দ্দয় হইয়া উঠে; ক্রমে মনুষ্যের উপরও অত্যাচার করিতে শিখে।

কেহ কেহ মনে করেন যে দোষী ও পাপী লোককে ইচ্ছামত যাতনা দেওয়ায় কোন পাপ নাই; এবং তদনুসারে চোর দেখিলেই যাহার যত ইচ্ছা সে তত প্রহার করে। মাতালকে মারিতে কেহই নিষেধ করে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে সুদ্ধ যাতনা দেওয়া অথবা সেই যাতনা দেখিয়া আপনাকে সুখী বোধ করা নৃশংসের কার্য্য। আত্মরক্ষা ও শাস্তি হেতু লোককে কষ্ট দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আর এক প্রকার। কেহ কেহ পাগল লইয়া খেলা করে, তাহাকে কষ্ট দিয়া তামাসা দেখে; কিন্তু যেমন অবলা পশুকে যাতনা দেওয়া পাপ, সেই রূপ অজ্ঞান পাগলকেও কষ্ট দেওয়া নিষ্ঠুরতা। তুমি কখনই নিষ্ঠুর হইও না। কি কীট পতঙ্গ কি পশু পক্ষী, কি দোষী ব্যক্তি, বস্তুতঃ জীব মাত্রেরই উপর কখন অত্যাচার করিও না।

খাইবার জন্য মৎস্য ও পশু মারা দোষ কি না তাহা নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু তা বলিয়া হাতের সুখের জন্য ছিপে মাছ ধরা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কাজ। টীপ পরিবার জন্য টীপ-পোকার ডানা কাটিয়া লওয়া পাপ; কারণ মিছামিছি টীপ পরিবার জন্য একটী জীবকে নষ্ট করা কোন মতেই উচিত নয়। শুদ্ধ প্রাণহত্যা ও প্রহার করাই যে নিষ্ঠুরতা এমন নহে। কোন জীবের খাওয়ার কষ্ট দেওয়া, বস্তুতঃ তাহাদের সুখের হানি করা নিষ্ঠুরতা। মনুষ্যের উপর আরও অনেক প্রকার নিষ্ঠুরতা আছে। যেমন মনুষ্যের শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ; তেমনি আবার তাহার মনকে কষ্ট দেওয়া পাপ। অনেক সময় মনের কষ্ট অত্যন্ত অসহ্য। অপমান, পরিহাস ও নিন্দায় লোকের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব সাবধান এরূপ কাজ করিও না। কটু কথা কহিলে লোকের মনে ক্ষোভ হয়; অতএব লোককে মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছু কহিবে না। যদি নিতান্ত প্রয়োজন না হয়, যদি কর্ত্তব্য না হয়, তা হইলে কখনই এমন কার্য্য করিও না যাহাতে কাহারও মনোদুঃখ হয়। সংক্ষেপে এই উপদেশ যে অকারণে কাহাকেও কষ্ট দিও না।

নিকৃষ্ট লোকের মধ্যে কতকগুলির অভাব পূরণ করিতে হয় ও কতকগুলিকে সুদ্ধ স্নেহ করিতে হয়। পিতা-মাতা বর্ত্তমান এমন শিশুর অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আদর করিতে হয়। যাহাতে তাহারা প্রফুল্ল থাকে এমন করিবে। দাস দাসীগণের বিশেষ কোন অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে স্নেহ করিবে; কখন তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না; অনর্থক তাহাদের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে না। কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কিছুই করিতে হয় না যথা অজ্ঞাত লোক, অভাবরহিত ব্যক্তি। কিন্তু কাহারও অপকার করা কোনমতেই উচিত নহে।

সুদ্ধ যে কাহারও অপকার করিবে না, কখনও নিষ্ঠুর হইবে না এমন নহে; দয়াবান হইবে, বৃদ্ধ, অতুর, অন্ন বস্ত্রাভাবে শীর্ণ ভিক্ষুক দেখিয়া কি চুপ্ করিয়া থাকা উচিত? রোগে কাতর ও বিপদে আপন্ন ব্যক্তি দেখিয়া কি উপেক্ষা করা যায়? কে না তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ করিতে চায়? ফলতঃ অভাব বিশিষ্ট লোক দয়ার পাত্র। পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন যে অভাগা লোকের অভাব পূর্ণ করিবে; তোমাকে ধন দিয়াছেন, যে তুমি নির্ধন দরিদ্রকে সাহায্য করিবে; তোমাকে সুস্থ রাখিয়াছেন যে রোগীর সেবা করিবে; তোমাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মে ভূষিতা করিয়াছেন যে মূর্খ ও পাপীকে উপদেশ

দিয়া রক্ষা করিবে। দয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দয়াহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। যাহার দয়া নাই সে পশুতুল্য। যাহার মন দয়া দ্বারা আর্দ্র না হয়, তাহার পাষাণ মন। দয়ার পাত্র দেখিলেই দয়া করিবে। মুখের গ্রাসও দরিদ্রকে দিয়া তাহার উপকার করিবে। পরের দুঃখ দেখিলেই দুঃখী হইবে ও তাহা যেন আপনার দুঃখ এই মনে করিয়া মোচন করিবে। বিপদগ্রস্ত লোক দেখিলেই তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। পর দুঃখে যে কাতর না হয় সে নিতান্ত নিষ্ঠুর।

দয়ার পাত্র এই কয় জন—দরিদ্র, রোগী, শোকার্ত্ত, বিপদগ্রস্ত, মূর্খ, ও পাপী।

সুদ্ধ মনে দয়া করিলেই হয় না, কার্য্যে প্রকাশ করাও চাই। কেবল মুখে দয়া হয় না। পর দুঃখ মোচন করাই দয়ার কার্য্য। আপনার ধন থাকিলে, তাহা পর দুঃখ মোচনে সার্থক হয়। অতএব পরোপকারে ধন দান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। দরিদ্রজনকে ধন দিবে ও অন্ন বস্ত্র দিবে, যে খাইতে পায় না তাহাকে অন্ন দিবে, যে পরিতে পায় না তাহাকে বস্ত্র দিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যত্নশীল থাকিবে। আপনার কষ্ট করিয়াও পরের দুঃখ মোচন করিবে।

রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে অথবা ঔষধ কিনিবার মূল্য দিবে। নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও পরোপকার করা যায়। রোগীকে সেবা করা অতীব কর্ত্তব্য। রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহার যাহাতে রোগ যাইয়া স্বাস্থ্য হয় এমন চেষ্টা করিবে। যে কোন লোক হউক না কেন, যে কোন প্রকারে পার রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন লইবে।

শোকগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা করিবে। বিপদে পতিত লোকের যাহাতে উদ্ধার হয় এমন করিবে। কি অর্থ কি শারীরিক পরিশ্রম বিপদগ্রস্ত লোকের উপকারার্থ কিছুরই ত্রুটি করিবে না। মূর্খ লোককে লেখা পড়া শিখাইতে কষ্ট বোধ করিও না। পাপী লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। তুমি যাহা জান তাহা তাহাকে শিখাইবে।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুন ১২৭০

## স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ

(পূব্ব প্রকাশিতের পর)

### ৪ ভক্তি ও সম্মান

যেরূপ কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিবে না, সেই প্রকার কাহারও অপমান করিবে না। শ্রেষ্ঠ লোককে যথেষ্ট মান্য না করিলেই তাঁহাদের অপমান করা হয়। অতএব যাহার যেরূপ মান তাহাকে সেই রূপ মান করিতে ত্রুটি করিও না। মান্য ব্যক্তির সহিত সমান সমান কথা কহিবে না। অর্থাৎ তাহাদের নিকট নম্র ভাবে কথা কহিবে। তাঁহাদের কোন দোষ দেখিলে কর্ত্তৃত্ব করিয়া উপদেশ দিতে যাইও না; তাঁহাদের কোন অভিপ্রায় খণ্ডন

করিতে হইলে নম্র ও বিনীতভাবে কথা কহিবে। মান্য ব্যক্তির প্রতি কখন 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিও না। বিশেষ কোন কর্ত্তব্য না হইলে মান্য ব্যক্তির আজ্ঞা অবহেলা করিও না। তাঁহাদের সম্মুখে পরিহাস, বিকট হাস্য ইত্যাদি করিবে না। যে কথায় কোন প্রয়োজন নাই, তাহাদের সম্মুখে এ রূপ কথা বলা মূর্খতা ও অভদ্রতা মাত্র। মান্য ব্যক্তি অপেক্ষা কোন এক বিষয় শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার সম্মানের ক্রুটী করা উচিত নয়। অবশ্য, মনুষ্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ না হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি কোন এক বিষয়ে তাহাকে মান্য করিবে না? তাবৎ গুরুজনকে মান্য করিতে হয়। আপনা হইতে যিনি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সেই বিষয়ের জন্য মান্য করা উচিত।

কিন্তু সুদ্ধ বাহ্যিক আচরণে মান্য করিলেই যে শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি যথার্থ ব্যবহার করা হইল এমন নহে। বিশেষ গুণ বিশিষ্ট লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়। যেরূপ কাহারও অভাব দেখিলে সহজেই মনে দয়া উপস্থিত হয়, সেই রূপ কাহার কোন বিশেষ গুণ দেখিলে স্বভাবতঃ ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি মানসিক ভাব, ভক্তি অন্তরের, বাহিরের নহে। ভক্তি-ভাজন লোকদিগকে বাহিরে মান্য করিলেই হয় না মনে মনে তাঁহাদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিতে হয়। ভক্তি প্রকাশকে সম্মান কহে; ভক্তির কার্য্য সম্মান। সম্মান না থাকিলে কখনই ভক্তি করা হয় না। কিন্তু ভক্তি না থাকিলেও সম্মান করা হয়। সম্মান বাহ্যিক, ভক্তি আন্তরিক।

সম্মান বাহ্যিক; অতএব সাংসারিকগুণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা মান্য ব্যক্তি। যাঁহারা সুদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ অথবা ধন, মান, যশ ও সাংসারিক্ ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে মান্য করা উচিত। তাঁহারা যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ও অন্যান্য মানসিক গুণহীন হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তি না করিতে পার, কিন্তু কখনই অমান্য করা যাইতে পারে না। ভৃত্য প্রভুকে ভক্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি প্রভু দোষী হয়েন, পাপী ও মূর্খ হয়েন, তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি আসিবে? মানসিক গুণ না দেখিলে ভক্তি আইসে না। কিন্তু তা বলিয়া কি সে প্রভুকে মান্য করিবে না? না, তাহার সহিত সমান সমান ব্যবহার করিবে? ফলতঃ ভক্তিরহিত সম্মানও অনেক স্থলে আবশ্যক। নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ কতকগুলিকে সুদ্ধ স্নেহ করিতে হয় ও কতকগুলিকে দয়া করিতে হয়; সেইরূপ শ্রেষ্ঠজনের মধ্যে কতকগুলিকে সুদ্ধ সম্মান করিতে হয় এবং কতকগুলিকে ভক্তি করিতে হয়। যদ্রূপ স্নেহপাত্রকে দেখিলে আদর করিতে হয়, সেইরূপ মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হয়। তিনি নিকটে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে হয়।

কিন্তু মানসিক সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সুদ্ধ সম্মান করিলেই হয় না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হয়। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, প্রভু হউক বা ভৃত্য হউক, বৃদ্ধ হউক বা বালকই হউক, সদ্‌গুণ যাহার আছে তিনি ভক্তির পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, যথা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদি; বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ—শিক্ষক, বিদ্বান; ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ—ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সাধু-লোক, ঈশ্বর-পরায়ণ লোক; এবং বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ যথা—দেশহিতৈষী, উদার-স্বভাব ব্যক্তি ইত্যাদি।

সম্বন্ধে-শ্রেষ্ঠ লোক যদি বিদ্যা ও ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ না হন তথাপি তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। পিতামাতা যদি নিতান্ত মূর্খ ও পাপী হয়েন তথাপি তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে।

অবিচক্ষণ পিতামাতার কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ভক্তি থাকা আবশ্যক। শ্বশুর শাশুড়ীও পিতামাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। তাঁহাদের সেবা করা আবশ্যক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা-ভগ্নীগণ পিতামাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। স্বামী ও স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগ্নীও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও ভক্তিভাজন হয়েন। এতদ্ভিন্ন মামা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। ইহাদিগকে মনের সহিত ভক্তি করিবে।

মনুষ্য পশু হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ; অতএব জ্ঞান মনুষ্যের এক প্রধান গুণ। অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠলোক। এই জন্যই লোকে বিচক্ষণ প্রাচীনদিগকে ভক্তি করে। ফলতঃ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ মাত্রেই পূজ্য। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানের সুন্দর-রূপ আলোচনা হয়; চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি উভয়ই প্রবল হয়, অতএব বিদ্বান ব্যক্তি ভক্তি-ভাজন। এই জন্য গুরু এত পূজ্য। বিদ্বান্ ব্যক্তি বয়সের ছোট হইলেও ভক্তি-ভাজন হয়েন। ধনী বা নির্ধন, বিখ্যাত বা অপরিচিত যাহা হউন না কেন, বিদ্বান্ ব্যক্তির গৌরব কখনই হ্রাস হয় না। অতএব বিদ্বান্ লোককে ভক্তি করিবে। তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিবে।

কিন্তু সকল হইতে ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য। সুতরাং ধর্ম্মেতেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। পাপিলোক সকলেরই ঘৃণিত। এবং ধার্ম্মিক লোক সকল অবস্থাতেই আদরণীয় ও পূজ্য। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, যশ এবং বিদ্যাও ইহার তুল্য নহে। যেরূপ গন্ধহীন পুষ্প ও জলশূন্য সরোবর শোভা পায় না সেইরূপ ধর্ম্মহীন বিদ্বান্ যথার্থরূপ ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি নিতান্ত দরিদ্র বা মূর্খ হয়েন তথাপি তিনি অধার্ম্মিক ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। একজন ধার্ম্মিক চাষা ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য। বস্তুতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি সকল হইতে পূজ্য। অতএব তুমি ধার্ম্মিক লোককে সর্ব্বদাই ভক্তি করিবে। তাঁহাদের অর্থ নাই বা মান নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করিও না। সকল অর্থ হইতে ধর্ম্মই প্রধান অর্থ; সকল মান হইতে ঈশ্বরের আদরই শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিক লোকের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি যে রূপ ধার্ম্মিক তিনি সেইরূপ পূজ্য। ধার্ম্মিক ও সাধু লোকের পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের আরও অনেক বিষয়ে অদ্বিতীয় গুণ আছে যাহার নিমিত্ত তাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ অর্থাৎ ভক্তি-ভাজন হয়েন। কোন কোন লোক স্বদেশকে এরূপ ভালবাসেন যে তাহার হিতের জন্য তিনি আপনার সুখ, মান ও প্রাণও ত্যাগ করিতে দুঃখিত হন না। দেশীয় লোকের সুখে তাঁহাদের সুখ ও তাহাদের দুঃখে তাঁহাদের দুঃখ হয়। এরূপ লোককে দেশহিতৈষী কহে। দেশহিতৈষী লোকের প্রতি সম্মান ও ভক্তি করা উচিত। ইঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক প্রকার লোক আছেন—যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ ও যাবতীয় মনুষ্যকে স্বপরিবার মনে করেন; এরূপ লোক অবশ্যই ভক্তি-ভাজন।

ঔদার্য এক মহৎ গুণ। উদার ব্যক্তি কুটিল স্বার্থপরতার অধীন নহেন। তিনি কাহার প্রতি বিরক্ত হয়েন না। উদার ব্যক্তি সকলকেই ভালবাসেন ও শত্রুকেও ক্ষমা করেন। এরূপ ব্যক্তিকে মহানুভব কহে এবং ইঁহাকেই মহাশয় বলা যায়। উদার ব্যক্তি সকলেরই পূজ্য।

এরূপ অনেক প্রকার সদ্‌গুণ আছে। সেই সকল সদ্‌গুণ বিশিষ্ট লোককে ভক্তি

করিবে। তোমার যে গুণ নাই কিন্তু অন্যের সেই সদ্‌গুণ আছে এরূপ লোক তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব এরূপ লোককে সেইগুণের জন্য ভক্তি করিবে।

যাবতীয় সদ্‌গুণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে রহিয়াছে, তিনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করা উচিত। মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; কিন্তু তিনি তোমা অপেক্ষা সকল গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব কদাপি তাঁহাকে ভক্তি করিতে ত্রুটি করিও না। অপবিত্র মনে ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়।

চৈত্র ১২৭০

## স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ

পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার জগতের কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ উভয় জাতির মনোবৃত্তি সকল ভাল রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে উভয় জাতি পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে, ধর্ম্মের পথে ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই স্ব স্ব উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবে, কারণ যে কোন প্রকারে হউক মনের উন্নতি সাধন করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তিসঙ্গত। বাহ্যাড়ম্বর বা কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী নীচ আমোদের সহিত বিবাহের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ। এই হেতু স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ কোন প্রকার অস্থায়ী সাংসারিক সম্বন্ধ নহে। তাহাদিগের সম্বন্ধ পরম বিশুদ্ধ সম্বন্ধ।

এদেশের কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ লোকেরা স্ত্রী ও স্বামীর যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া লয়। অনেক অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, স্ত্রীরা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন স্ত্রীরা কেবল দাসীর ন্যায় দিনরাত্রি গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হায়! তাহাদিগের কত ভ্রম! তাহারা যথার্থ সম্বন্ধ নিজে বুঝিতে অক্ষম হইয়া পরম পবিত্র সম্বন্ধকে অস্থায়ী সাংসারিক সুখের মধ্যে গণ্য করিয়া লয়।

স্ত্রীর আর একটি নাম সহধর্ম্মিণী; স্ত্রী ও স্বামী একসঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ইহাই তাহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন, এক সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, একসঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন

করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

স্ত্রীরা উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়, স্বামীকে আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে; অধ্যয়ন ও ধর্ম্মোপদেশের সময়, ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে; গৃহকার্য্যানুষ্ঠানের সময়, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিবে; বিপদুদ্ধারের সময় উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় কৃতজ্ঞ হইবে। এই সংসারের মধ্যে স্বামীরাই স্ত্রীগণের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীরা সর্ব্বদা স্বামীদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে।

স্ত্রীরা স্বামীদিগের উৎসাহ, বল, কর্ম্মদক্ষতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আত্মাকে উৎসাহী, বলীয়ান, কর্ম্মদক্ষ, অধ্যবসায়ী করিবেন; এবং স্বামীরাও স্ত্রীগণের কোমলতা, বিনয়, লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আপনাদিগের আত্মাকে কোমল, বিনয়ী, সলজ্জ, মধুর, প্রীতিপূর্ণ, দয়ালু, স্নেহান্বিত; সানুনয় করিতে যত্নশীল থাকিবেন।

স্ত্রীরা বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীর হিতের নিমিত্ত গৃহকার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিবে এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার শরীর ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে কায়মনে যত্ন করিবে। আবার স্বামীরাও তাহাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। এই প্রকারে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

আশ্বিন ১২৭১

## স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য

যখন প্রতি গৃহবাসিনী জননীর হৃদয়ের প্রীতিকর কোমল শক্তি সন্তানের প্রকৃত উন্নতি সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীত হইল, তখন জনসমাজের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি রমণীকুলের সাহায্য সাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে বিশ্বনিয়ন্তা মাতা ও সন্তানের মধ্যে কেমন আশ্চর্য সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার কি অনুপম স্নেহ! তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি কেমন স্বাভাবিক প্রীতিতে অনুরক্ত। একের যেমন চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য; অপরের তেমনই সহিষ্ণুতা, নম্রতা। মাতা কখন স্বীয় বিজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ করিয়া সন্তানের অজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। প্রীতির বিশুদ্ধ ও কমনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার উন্নত বিদ্যাবুদ্ধির প্রখর ভাব অদৃশ্য হইয়া যায়। ফলতঃ স্ত্রী স্বভাবের যে সমস্ত ভাবকে তাঁহাদিগের দুর্ব্বলতা বলিয়া সচরাচর উল্লেখ করা হয়, সেই সমস্ত ভাব থাকাতেই এইরূপ ভিন্ন প্রকৃতি উভয় আত্মার এমন দৃঢ় সম্মিলনের উপায় হইয়াছে।

শিশুর অন্তঃকরণ মধ্যে প্রথমতঃ ভাবের সঞ্চার হয় এবং তৎপশ্চাৎ জ্ঞানোদয় হইয়া

থাকে। জননীর সহাস্য আনন দর্শনে শিশুর যে প্রথম হাস্য, তাহাই তাহার জ্ঞানরূপ আলোকময় দিবাগমের পূর্ব্ববর্ত্তী ঊষাস্বরূপ। মাতার প্রসারিত কোমল বাহুর আলিঙ্গনে শিশুর প্রথম আলিঙ্গন দানই তাহার ভাবানুভব করিবার নিদর্শন।

ভাবের সঞ্চার হইতে জ্ঞানের অভ্যুদয় আরব্ধ হয়; তজ্জন্য যিনি প্রথমতঃ মনোমধ্যে ভাবের ও কোমলতার উদ্দীপন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শক্তি সমূহের অধিকারিণী হইয়াছেন। পুণ্য কি ইহা শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের কার্য্য নহে, কিন্তু সেই পুণ্যের ভাবকে মনোমধ্যে উদ্দীপিত করিয়া দেওয়াই স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

মাতা সন্তানকে যেরূপ পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, একমাত্র প্রীতি দ্বারা তিনি তাহাই সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ করিতে স্বতঃই মন বাধিত হয়, সুতরাং অনেক সময়ে স্বয়ং না জানিয়াও তাঁহারি ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

একজন শিক্ষকের সহিত তাহার শিশুছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটি অজ্ঞ জীব, শিক্ষক তাহার জ্ঞান শিক্ষা দাতা।

একজন মাতার সহিত তাহার শিশুছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটি অমর আত্মা, মাতা তাহার সেই আত্মাকে অমরত্বের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ কর্ত্রী।

উপরে যেরূপ শিশুর সহিত শিক্ষকের ও মাতার সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা হইল, তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে যে শিক্ষক শিশুকে কেবল নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেন, কিন্তু মাতা শিশুকে এরূপ শিক্ষা দেন যাহাতে তাহার সেই শিক্ষিত জ্ঞান তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যায়। উত্তম শিক্ষকের যত্নে 'উত্তম ছাত্র' প্রস্তুত হয়। কিন্তু উত্তম মাতার যত্নে 'উত্তম মনুষ্য' প্রস্তুত হয়। সংক্ষেপে এই বাক্য দ্বারা শিক্ষকের ও মাতার কার্য্যের বৈষম্য বুঝা যাইতেছে। অতএব মাতাই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভের স্কুল।

শিশুকে প্রকৃত অর্থে মনুষ্যের ন্যায় উন্নত করিবার জন্য তৎপ্রতি যত্ন ও মনোযোগ প্রকাশ করা; আর শিশুর মনোভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম স্বীকার করা; এই দুইটি বিভিন্ন কার্য্য। প্রথমটীকে যথার্থ শিক্ষা দান কার্য্য বলা যায় এবং দ্বিতীয়টীকে তাহার আংশিক কার্য্য মাত্র বলিতে হইবে। একটীর প্রধান লক্ষ্য যাহাতে শিশুর সমুদয় মানসিক বৃত্তি সমঞ্জসরূপে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহারই উপযোগী শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করা, অপরের লক্ষ্য যাহাতে শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞান রাশি লাভ করিয়া জনসমাজে আপনাকে বহুজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে তাহারই উপযুক্ত বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া।

যে মাতা এই দুইটীর প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় সন্তানের শিক্ষা দান ভার অন্যের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে জানিবেন তাঁহার শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভ পক্ষে অধিক বিড়ম্বনা উপস্থিত হইবে।

ফলতঃ শিক্ষকের যত্নে তাঁহার শিশু নানাবিষয়ের জ্ঞান লাভ দ্বারা "উত্তম ছাত্র" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু সে উত্তম মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে কি না তৎপক্ষে অধিক সন্দেহ রহিয়াছে। "প্রকৃত শিক্ষা" দানের ভার অর্থাৎ যাহাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ভাব, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমঞ্জসী প্রভূতরূপে উন্নতি হয়, তদ্রূপ শিক্ষা দান কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা চিরদিন এক ব্যক্তির হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সে শিক্ষার কোন সময়ে বিরাম হইবে না, যখনই তাহা

স্থগিত থাকিবে বা হস্তান্তরে অর্পিত হইবে তখনই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তাহার বিদ্যালয় ও গৃহভেদে কোন প্রভেদ হইবে না। তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়ে অবিশ্রাম চলিবে।

যাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ এবং যাঁহার অন্তকরণ ধর্ম্মভাবে শোভিত এবং যিনি অনায়াসে আপনার শিক্ষাধীন শিশুগণের মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ, তিনিই উত্তম শিক্ষক নামে খ্যাত হয়েন।

এই সকল গুণের মধ্যে কোনটী না স্ত্রীস্বভাবসুলভ বলিয়া বোধ হয়? বস্তুতঃ মাতা অপেক্ষা কে আমাদিগকে গুণের প্রতি সম্মাননা, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি শিক্ষা দান এবং সকল মঙ্গলের নিদান ও অনন্তের উৎসের প্রতি আত্মাকে সমুন্নত করিতে অধিক সমর্থ?

সাধারণ শিক্ষক নীতি বা অপর কোন সদ্বিষয় লইয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, যাহা তিনি আমাদিগের স্মৃতি কোণে রক্ষা করিতে দেন, মাতা তাহা আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেন। শিক্ষক যাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন, মাতা তাহাতে আমাদের অনুরাগ আনয়ন করেন। সেই প্রীতির গুণেই আমরা পুণ্য পথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হই। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক বা অন্য কোন বিষয়ের স্বংস্ক্রিয়া হউক, সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধন আমাদিগের বিবেক শক্তির বিশুদ্ধতা ও প্রকৃতিস্থতার উপর নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কে আমাদিগের বিবেককে স্বাভাবিক বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে অধিক সমর্থ?

মাতৃ হৃদয়ের এই মহোপকারিণী শক্তি সর্ব্বস্থানে সুপ্রাপ্য। রাজপ্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে, সকল স্থানে ইহা অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলের সুশাসন এবং চরিত্র সংগঠন করিতেছে। ফ্রান্সের অধিপতি নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন "সন্তানের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য কেবল মাতার উপর নির্ভর করে।" তিনি সর্ব্বদা আহ্লাদপূর্ব্বক কহিতেন, তাহার মাতাই তাঁহার উন্নতি লাভের একমাত্র কারণ।

আশ্চর্য্য কৌশলময় মাতার হৃদয়।
মহত্ত্বের উৎস ঐ প্রেমের নিলয়।

(ক্রমশঃ)

আষাঢ় ১২৭৫

## স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শক্তি মনুষ্যচরিত্রের উপর বিশেষরূপে কার্য্যকারিণী। জনসমাজের অবস্থা তন্নিমিত্ত স্ত্রীজাতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক মহত্ত্বলাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের অধিকাংশের মাতার একটী একটী অসাধারণ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

মাতৃ-প্রকৃতি যে এক আশ্চর্য্য নিগূঢ় শক্তি প্রভাবে সন্তানের হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে পুত্র ও কন্যা সন্তানের চরিত্রগত প্রভেদ দর্শন করিলেই ইহা নিঃসংশয় হইবে। কন্যাদিগের অপেক্ষা পুত্রদিগকে শৈশবাবস্থায় অতি অল্পকাল মাতৃ-তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিদ্যালয়স্থ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। যে পুত্র যত শীঘ্র এইরূপ শিক্ষক হস্তে ন্যস্ত হয় তাহার উন্নতি সাধনের উপায় তত শীঘ্র অবলম্বিত হইল এইরূপ বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকটীর বিদ্যাবুদ্ধির সুখ্যাতি থাকিলেই তিনি শিশুর শিক্ষাভার গ্রহণে সম্যক্ উপযুক্ত বোধ করা হয়। সুনীতি শিক্ষা দ্বারা শিশুর চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে তিনি কিরূপ উপযুক্ত তদ্বিষয় বিবেচনার মধ্যেই গ্রহণ করা হয় না। বালক অল্পকালের মধ্যে যদি অনেকগুলি পুস্তকের পাঠ সম্পন্ন করিতে পারে তাহা হইলে শিক্ষকের উপযুক্ততা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। শিশু একটী কর্কশ কথা বলিল কিম্বা ভগ্নীদিগের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিল, তাহা শিক্ষা-দোষের কোন লক্ষণ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। কারণ পিতামাতার এইরূপ সংস্কার যে পুত্র সন্তানের ঐরূপ ব্যবহার দূষণীয় নহে। কিন্তু কন্যার যদি সেরূপ কোন অশিষ্ট আচরণ মাতা দেখিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধনে তিনি তৎপর হন। কন্যা কিছু লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও মাতার নিকট তাহার চরিত্র সম্বন্ধীয় কোন দোষ পুত্রের দোষের ন্যায় উপেক্ষণীয় হয় তাহা নহে, প্রত্যুত তদাবস্থায় তাহার সেরূপ দোষ আরো অধিকতর ঘৃণাকর বোধ করা হয়। কন্যাকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইলে পিতামাতা অগ্রে শিক্ষকের স্বভাব কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। শিক্ষকের সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক না হইলে তাঁহার হস্তে তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিতে চাহেন না, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এই কুরীতি এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে এমন বিদ্যালয় অতি দুর্লভ যাহাতে ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতি বিধান একমাত্র প্রধান লক্ষ্য না হইয়া ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রতি যথোচিত যত্ন প্রদর্শিত হয়।

যাঁহারা পুত্রদিগের সুনীতি শিক্ষার প্রতি নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করা অনুচিত জ্ঞান করেন, তাঁহারাও যথোচিতরূপে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করেন তাহা নহে। মানসিক যে সকল অপ্রকাশ্য ক্ষুদ্র দোষ জনসমাজে পুত্রের মান প্রতিপত্তি লাভের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না, কিন্তু তাহার আত্মার শান্তি ও পবিত্রতার ব্যাঘাত করে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন না।

ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির প্রকৃতিতে পাপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইবার এবং তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার যদি কোন বিশেষ স্বতন্ত্র শক্তি প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের বাল্যকালের অভ্যস্ত দুর্নীতি ভবিষ্যত জীবনের সুখ ও উন্নতির প্রতিবন্ধক না হইত তাহা হইলে এইরূপ আচরণ কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারিত।

শৈশবকালে পুত্রদিগের শুদ্ধ জ্ঞানোন্নতির প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া অপরাপর মনোবৃত্তির যথাবিধি পরিচালনায় উপেক্ষা অমনোযোগ প্রকাশ করায় তাহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই সকল অসংযত মনোবৃত্তির সহিত সংসার পথে পদার্পণ করে তখন যে তাহাদিগের দ্বারা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশা অতি অল্পই থাকে তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ সেই সকল চঞ্চলপ্রকৃতি পুরুষ নানাকারণে সংসার সুখের বিষম শত্রু হইয়া দুঃখ ও দুর্দ্দশার একমাত্র হেতু হইয়া উঠে এবং আপনার ও অন্যের অকল্যাণ সাধন করে।

স্ত্রীর পক্ষে যে কার্য্য গুরু পাপ জ্ঞান করা হয়, পুরুষের পক্ষে সে কার্য্য সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার নিবন্ধন পুত্র ও কন্যার মধ্যে এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুত্রী জনসমাজে চিরকলঙ্কিত দুরপনেয় অপরাধে অপরাধী হয়েন, নিয়ত সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও পুত্র তথাপি "ভদ্রআ্যাখ্যাধারী" হইয়া সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিয়াও যে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে তাহাদিগের মানসিক শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি সকল পুরুষদিগের ন্যায় কুশিক্ষা দ্বারা সহসা বিকৃত হইতে পায় না। মাতৃ-প্রকৃতির স্বাভাবিক পালনী শক্তিতে তাহা যথাবিধি অনুসারে পরিকল্পিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও ভ্রাতাদিগকে ধর্ম্মপথে ভগ্নীদিগের অপেক্ষা এত পশ্চাৎবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবাস্থা হইতে যে স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির অবিশ্রাম দাসত্ব করা হইয়াছে তাহারা এক্ষণে হৃদয় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া নিয়ত আধিপত্য প্রচার করিতেছে, তজ্জন্য ভ্রাতাদিগের হৃদয় ধর্ম্মসাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া আছে।

বাল্যকালে যে দোষ অল্প আয়াসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, পশ্চাৎ তাহা পরিত্যাগ করা বহু কষ্টসাধ্য হয়।

ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক তুমূল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি রূপ শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে না পারিলে বাল্যাভ্যস্ত পাপ সকল হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ ডাক্তার জনসন বলিয়াছেন যে ব্যক্তি অগ্রে সংখ্যারাশিগুলি শিক্ষা করে নাই, তাহার পক্ষে গণনা শিক্ষা যেমন সম্ভব, যে শিশু বাল্যাবস্থায় মাতার নিকট ধর্ম্মের ভাব কিছু শিক্ষা না পাইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের পথে পদার্পণ করাও সেইরূপ সম্ভব। ইহা মাতৃশক্তির এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। যাঁহারা বহুকাল ভ্রম ও অসত্যের পথে থাকিয়া পুনরায় সত্যের ও ধর্ম্মের পথে আসিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই বলেন মাতার প্রদত্ত বাল্যোপদেশ তাঁহারা একেবারে কখনই হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন নাই। অতএব যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যার ন্যায় পুত্রেরও শিক্ষাভার মাতার হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুন ১২৭৬

## স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈশবে মাতৃসন্নিধানে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা না হইলে সন্তানের মনে ভবিষ্যতে ধর্ম্মানুরাগ স্থাপন করা যখন দুষ্কর হইতেছে তখন সন্তানকে যত অধিক দিন মাতার নিকট রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, অনভিজ্ঞ জননীরা

তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন তত শীঘ্র কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হইলে মনে করিয়া থাকেন। স্নেহময়ী বিশ্বজননী তাঁহাদিগের হস্তে যে সুমহৎ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অন্য কর্ত্তৃক কখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। যে বৃক্ষ যে ভূমির উপযোগী তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি তাহাতেই হইয়া থাকে, অন্যত্র তাহার উন্নতির সম্যক ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের শরীর পালন জন্য মাতা ঈশ্বরের নিকট যেরূপ দায়ী তাহার আত্মোন্নতির নিমিত্ত তদপেক্ষা অল্প দায়ী নহেন। সেই মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে জননীরা বিশিষ্টরূপে মনোযোগী হউন। অন্যের হস্তে সে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

যদি কোন মাতা পীড়িত সন্তানকে চিকিৎসালয়ের নানা রোগীদিগের মধ্যে রাখিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার আচরণ কেমন গর্হিত বলিয়া বোধ হয়। অতএব একটী সন্তানের অবিনশ্বর আত্মাকে পাপরোগগ্রস্ত অসুস্থ আত্মাদিগের সংসর্গে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তদপেক্ষা অধিক গুণে অনিষ্টকর ও অনুচিত কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জননীরা অসন্দিগ্ধচিত্তে ইহা সচরাচর করিতে দেন। শরীরে রোগ যেমন সংক্রামক দোষে বিস্তৃত হইয়া থাকে আত্মার রোগের সংক্রামক তদপেক্ষা অধিক প্রবল ও অহিতকর। "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"। যেমন সংসর্গ সেই অনুসারে মনুষ্যের দোষ বা গুণ হয়। দৃষ্টান্তের দোষ বা গুণ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী এমন আর কিছুই নয়, যদি শিশুগণ আমাদিগকে সর্ব্বদা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে বা কর্কশ বচন বলিতে দেখিতে পায়, তবে ভাল কথা বলিয়া বা অন্যপ্রকারে আদর প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে কোমল স্বভাব ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করা বৃথা। মুখের বাক্য ও উপেক্ষা অপেক্ষা কার্য্যের ও আচরণের দ্বারা শিশুর চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হয়। অতএব জননীদিগের কর্ত্তব্য স্ব স্ব জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুদিগের হৃদয়ে এমন সকল উন্নত ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন যে তাহা চিরস্মরণীয় থাকিয়া সংসারের পাপ প্রলোভন মধ্যে তাহাদিগকে পবিত্র পথে রক্ষা করিতে পারিবে এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল ভাব যত অধিকতর উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে মাতৃ চরিত্রের মহত্ত্ব তাহাদিগের তত হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মাতাদিগের অপর এক বিষয়ে মনোনিবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। জননীরা স্বভাবতঃ যে সকল উন্নত ও পবিত্র গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহাদিগের যথাবিধি পরিচালনা দ্বারা তাঁহারা সন্তানদিগের নিকট যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন ইহা সত্য বটে, তাঁহাদিগের ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যেমন এক সময়ে শিশুর মাতা রহিয়াছেন, আবার কিছুদিন পরে উন্নত জ্ঞানবুদ্ধিশালী মনুষ্যের মাতা হইবেন। তন্নিমিত্ত শিশুকালে তাঁহারা মাতৃহৃদয়ের যেমন উৎকৃষ্ট ভাব ও পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ মনের উন্নত জ্ঞানের পরিচয় দিতে না পারিলে শিশুর জ্ঞানোন্নতির সহিত তৎপ্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়া অসম্ভব নহে।

মনুষ্য যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে প্রখর জ্ঞানের প্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজস্বিতাবশতঃ বিবেচনা নিরপেক্ষ হইয়া সহসা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হয় । সে অবস্থায় পিতা প্রভৃতি রুক্ষ প্রকৃতি উন্নত জ্ঞানশালী পুরুষদিগের উপদেশ তাহাদিগের অহঙ্কার স্ফীত চিত্তকে বশীভূত করিতে পারেনা, কিন্তু মাতা যদি পুত্রাপেক্ষা

জ্ঞানে উন্নত হয়েন তাহা হইলে তিনি তৎকালে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ আশ্চর্য্য বশীকরণ গুণে অক্লেশে যৌবনের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু অনেক মহিলাকে এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যটীতে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানেরা যেমন বয়োবৃদ্ধির সহিত দিন দিন উন্নত জ্ঞানসোপানে উত্থিত হইতে থাকে, তাঁহারা তেমনই নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বিদ্যালোচনা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকেন। ভবিষ্যতে বয়োঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের শিক্ষাদানে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবেন এবং এক্ষণে তৎকার্য্যে তাঁহাদিগের যে পরিমাণ যোগ্যতা আছে, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইলে তাহাও যে তাঁহারা হারাইবেন ইহা তাহারা মনে করেন না।

শৈশবে মাতৃ উপদেশে সন্তানেরা যেরূপ শিক্ষিত হইতে থাকে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা মাতা দ্বারা সেরূপ শাসিত বা প্রতিপালিত হয় না, ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে মাতা তৎকালে স্বীয় জ্ঞানের অনুন্নতিবশতঃ সন্তানের শিক্ষাদানের অনুপযক্ত হন। সুতরাং তাহাদিগের উপর তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না, মাতৃহৃদয়ের অকপট স্নেহ ও পবিত্রতার সহিত যদি উজ্জ্বল জ্ঞানের সংযোগ হয় তাহা হইলে তদ্দারা সন্তানের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয় এবং শিশুকালে যেমন মাতার প্রতি তাহার অকপট শ্রদ্ধা থাকে তখনও তাঁহার উন্নত জ্ঞান ও শক্তির প্রতি সেইরূপ সংমাননা থাকে, তজ্জন্য মাতার উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সন্তানের জীবনের আদর্শ স্বরূপ হইয়া তাহার হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকে এবং যাবজ্জীবন তাহাকে ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং পবিত্রতার পথে লইয়া যায়।

আষাঢ় ১২৭৭

## গৃহিণীর কর্ত্তব্য

সলোমন নামক একজন ইহুদীদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"কার্য্যদক্ষতা এবং সম্মান গৃহিণীর অলঙ্কার; তিনি ভবিষ্যৎ সময় ভাবিয়া আনন্দিত হয়েন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য জ্ঞান পূর্ণ এবং তাঁহার রসনা দয়ার আধার। তিনি গৃহে সমুদায় কার্য্য উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করেন এবং আলস্যের অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁহার সন্তানগণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার গুণগান করে এবং তাঁহার স্বামীও আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।"

১। গৃহের সমুদায় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য। রাজা যেমন রাজ্যের এবং সেনাপতি সৈন্য দলের সকল ব্যবস্থা করেন, গৃহিণী সেইরূপ গৃহের সকল বিষয় অবগত থাকিয়া তাহার সুনিয়ম করিবেন। সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং কল্যাণ তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে জানিবেন। তিনি অলস বা অমনোযোগী হইলে পরিবারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং দাস দাসী হাজার থাকিলেও তাহা নিবারণ হইবে না। গৃহিণীর দোষে যেমন গৃহ কার্য্যের গোলযোগ ঘটে, সেইরূপ পরিবারের সকলেই তাহার কুদৃষ্টান্তে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, গৃহিণী সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইলে

পরিবারের সকলে তাহার সৎদৃষ্টান্তে সাধু হইতে পারে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুণ যত দেখা যায়, এত আর কোন দেশে নয়। কিন্তু আজিকালিকার অনেক রমণী যেরূপ সুখবিলাসী হইয়া গৃহকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতেছেন তাহাতে বড় সুলক্ষণ বোধ হয় না। ইংরাজদের স্ত্রীলোকদের যে এত সৌখিনতা তথাপি তাহাদের গৃহিণীর কার্য্য শিখিতে হয়। এক জন্য সুবিজ্ঞ সাহেব লিখিয়াছেন;—বিনীত কুমারী, বিবেচক স্ত্রী এবং যত্নশীল গৃহিণী দ্বারা পরিবারের যে উপকার হয়, খোসপোসাকী ভোগবিলাসী আড়ম্বর প্রিয় অলস স্ত্রীগণ দ্বারা তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। যে রমণী স্বামীকে পাপ পথ হইতে নিবারিত এবং সন্তানগণকে ধর্ম্মপথে সুশিক্ষিত করিয়া সুখী করিতে পারেন, ইতিহাস ও উপন্যাস বর্ণিত বীরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা তাঁহার মাহাত্ম্য অধিক। ইহারা লৌহবাণ বা নয়নবাণ দ্বারা কত শত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রাণবধ করে, তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া কত আত্মাকে চিরকল্যাণ পথে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

২—গৃহিণী অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে এবং সকল কার্য্য গুছাইবার সময় পাওয়া যাইবে। গৃহিণী যদি এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, পরিবারের অন্যান্য লোক দুই প্রহরে উঠিবে এবং প্রাতঃকালের কার্য্য সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হইবে। এরূপ গৃহে আলস্য, রোগ এবং দুঃখ চিরকাল বাস করে। কিন্তু যে গৃহে গৃহিণী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে উঠেন, সে গৃহের সকল কার্য্য সুসময়ে সম্পন্ন হয় এবং সকল পরিবার সুস্থরূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিবার সময় অনেক পান।

৩— গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যাঁহার দাস দাসী আছে তিনি তাহাদিগের দ্বারা গৃহ পরিষ্কার সম্পন্ন করিবেন, যাঁহার নাই নিজে করিবেন। স্নানাদি ও পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান করিয়া যেমন আপনার শরীরকে প্রফুল্লিত করিবেন, তেমনি পরিবারের অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহিণী ম্লেচ্ছ রূপে থাকিতে ভালবাসিলে সে গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হয়। এবিষয়ে অল্প অমনোযোগে অনেক অনিষ্ট হয়, নিশ্চয় জানা আবশ্যক।

৪—মিতব্যয়িতা গৃহিণীর একটী প্রধান ধর্ম্ম। আমরা ব্যয় বিষয়ে যে নিয়ম কয়েকটী নির্দ্দেশ করিয়াছি, গৃহিণীর তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। মহাপণ্ডিত জনসন বলেন "মিতব্যয়িতা বিজ্ঞতার কন্যা, মিতাচারিতার ভগিনী এবং স্বাধীনতার প্রসূতি। যিনি অপরিমিত ব্যয়শীলা, তিনি শীঘ্র দুঃখে পড়েন, দুঃখ হইতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইলে পাপ আপনা হইতে অধিকার করে।" আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ব্যয় আয় ছাপাইয়া গেলে ঋণগ্রস্ত এবং অশেষ দুঃখভাগী হইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রাবণ ১২৭৭

# গৃহিণীর কর্ত্তব্য
## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬*— সুশীতলা গৃহিণীর একটী প্রধান অলঙ্কার । গৃহিণী শান্ত ধীর প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল হইবেন এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। যে পরিবারে এইরূপ গৃহিণী সে পরিবারের সকলেই সুশীল হয় এবং পরিবার কেবল শান্তির আলয় বোধ হয়। লোকে কথায় বলে, পাঁচ জন লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলেই পাঁচরকম জ্বালা সহিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীকে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া চলিতে হইবে, তখন পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হইবার অনেক কারণ আছে। যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এ সকল সহ্য করিতে না পারেন, তবে তিনি গৃহিণী নামের উপযুক্ত নহেন। তাঁহাকে শত শত বার যন্ত্রণা সহিয়াও সকলের প্রতি সমান স্নেহ ও অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃতি উগ্র হইলে আপনারও কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই, তাহার উপর, পরিবারের সকল লোকেই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া শীঘ্র সেইরূপ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে গৃহ কোলাহল ও বিবাদে পূর্ণ হয়। কোন কোন পরিবার যে অতি সুন্দর প্রকৃতি এবং কোন কোন পরিবার যে দুষ্ট স্বভাব দেখা যায়, গৃহিণীর গুণ বা দোষই তাহার প্রধান কারণ। নারীগণ সুশীলতা দ্বারা সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন।

৭—অতিথি সেবা। প্রাচীন হিন্দুরা যেমন অতিথি সেবক তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও তাঁহাদিগের অনুরূপ। আমরা এমন স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, আহার করিতে যান, এমন সময়ে অতিথির নাম শুনিয়া আপনার গ্রাসের অন্ন তাঁহাকে দিয়া উপবাস করিয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রতিদিন অতিথিকে আহার না করাইয়া জলগ্রহণ করেন না। শত্রুও অতিথি হইলে তাহাকে দেববৎ পূজা করেন। অতিথি সেবা একটী মহৎ ধর্ম্ম। ইহাতে নিঃস্বার্থভাব, উদারতা এবং ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা হয়। যে পরিবারে অতিথি আদৃত হয়, সে পরিবারের লোকের অধিক দয়া ও স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু অতিথি সেবা যাহাতে অনাবশ্যক আড়ম্বর পূর্ণ এবং অতি ব্যয়-জনক না হয়, তাহার প্রতিও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি অতিথির প্রতি মিষ্ট বাক্য ও কোমল হৃদয় প্রকাশ করিয়া সামান্যরূপ সেবা করা যায় তাহাতে যে ফল লাভ হয়, অনাদরে ক্ষীর ভোজন করাইলে তাহা হয় না।

৮। দয়া। গৃহিণী যেমন পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহ করিবেন, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা করিবেন, সেইরূপ দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিবেন, দীনদুঃখীদিগের জন্য যে দান করা হয়, দয়াময় ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করেন। ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে জল, রোগীকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান এবং পাপীকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এ সকলই দয়ার কার্য্য এবং এ সকল বিষয়ে সকলের সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত। অনেক স্থলে আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়াও দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগের সেবা করিতে হয়। গৃহিণী যদি এইরূপ শুভ অনুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, পরিবারের অতি ক্ষুদ্র বালক বালিকাও পরোপকার অভ্যাস করিতে থাকে এবং নিজের

* *বামাবোধিনী*-তে ৫নং নেই।

সুখে যেমন সুখী হয়, অন্যের দুঃখ দূর করিয়া সেইরূপ সুখী হইয়া থাকে। এই কারণে গৃহে দুঃখীদিগের জন্য একটী দানাধার রাখা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

ভাদ্র ১২৭৭

## গৃহিণীর কর্ত্তব্য
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৯—দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার গৃহিণীর একটী গুরুতর কার্য্য। এদেশে অধিকাংশ স্থলে ভৃত্যদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বকালে ভৃত্যগণ চিরক্রীত হইয়া থাকিত। এখন যদিও সামান্যতঃ সে প্রথা নাই তথাপি তাহার ভাব অনেকটা রহিয়াছে। ভৃত্যদিগের প্রতি কটূক্তি ও তাড়নার কথা না শুনা যায় এমন গৃহই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলন্ডে ভৃত্য আছে, কিন্তু ভৃত্য বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা বিহীন নহে। তাহারা যে যে কার্য্যের জন্য দায়ী, সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে, প্রভুর নিকট আপনাদের সমুদয় সময় বা জীবন বিক্রয় করে না। আমাদিগের দেশে যেমন স্বামিগণ অপিরিমিত ভার্য্যা সেবা চান, সেইরূপ প্রভুগণ ভৃত্য সেবাও চাহিয়া থাকেন। সাধারণত মনুষ্যের কেমন স্বভাব, অধিক ক্ষমতা পাইলেই তাহার অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন। এই কারণেই নারীগণ কত দুরবস্থা ভোগ করেন, দাসদাসীগণও অনর্থক নিপীড়িত হয়। গৃহিণী যখন ধর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার না হয় তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকিবেন। কিন্তু এ বলিয়া ভৃত্যগণ যাহা অনুগ্রহ করিয়া করে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন কথা বলিতে নাই এমত নহে। তাহাদিগকে পরিবারস্থ সন্তানগণের ন্যায় দেখিয়া স্নেহ দয়া করিতে হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, রোগের সময় ঔষধ এবং বিপদের সময় সাহায্য দান করিতে হইবে। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে রাখা, তাহা যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক দাসদাসীর এমত দুষ্ট স্বভাব যে তাহারা আলস্য বা ছল করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে; দুই একটী কার্য্য লইয়া সকল সময় কাটায়, প্রভুকে কাজে ও টাকাকড়ীর বিষয়ে ঠকাইতে চায়; অথবা শঠতা করিয়া অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পায়। যাঁহারা অনেক দিন ভৃত্য লইয়া কাজ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা তত প্রতারিত হন না, কিন্তু যাঁহারা নূতন, তাঁহারা বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করেন। যাহা হউক ভৃত্য দ্বারা তাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার প্রয়োজন কি? 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারা' কতক্ষণের কাজ। যদি ভৃত্যকে শিক্ষা দিতে হয় তবে এমন শিক্ষা দিবে যাহাতে কাজে টের পায়। কাহার কাহার এ প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার যে ভৃত্যকে কটু বাক্য না বলিলে প্রহার না করিলে কাজ ভাল পাওয়া যায় না। যদি ভৃত্যকে তাহার কর্ত্তব্য সকল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, কি প্রকারে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার উপায় সকলও দেখাইয়া

দেওয়া হয় এবং সময় সময় স্নেহভাবে তাহার সাহায্য করা যায় তাহাতে যত কাজ পাওয়া যায় অত আর কিছুতেই নয়। এই জন্য গৃহিণীকে কেবল খোস পোসাকী হইয়া থাকিলে চলিবে না, কিন্তু করুন আর না করুন ভৃত্যের সকল কাজগুলি শিখিতে হইবে। লোকে অজ্ঞলোকদিগেরই চক্ষে ধূলি দেয়, বিশেষজ্ঞদিগের হাত সহজে এড়াইতে পারে না। কর্ত্রী অল্প দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে সকল বিষয়ে নিজের চখে দেখিলে যত কাজ হয়, দশ জন ভৃত্য রাখিয়া তাহা হয় না। উপদেশ দৃষ্টান্ত ও সাহায্যে ভৃত্যকে চালাইতে হইবে। তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে কি ফল লাভ? তাহাব মন চটাইয়া দেওয়া হয় এবং নিজের প্রকৃতিকেও মন্দ করিয়া ফেলা হয়। যেখানে ভদ্রতা প্রদর্শন করিলে দশ গুণ কাজ পাওয়া যায়, সেখানে নিজের দোষে অনেক কাজ হারাইতে হয়। একটী সামান্য কথা বা সামান্য কাজের ক্রটী যাহা অনায়াসে ক্ষমা করা যায়, তাহা লইয়া সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, ক্ষমতাতীত কাজ দেওয়া তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহার কারণ বিবেচনা না করিয়া তিরস্কার করা, ভৃত্যদিগের শরীর মনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সকল সময়েই কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করা কখনই ন্যায়সঙ্গত ও ইষ্টকর নহে। প্রভুর যত্ন, স্নেহ ও সহৃদয়তা বুঝিলে ভৃত্য আপনা হইতে প্রাণ দান করিয়াও তাঁহার কার্য্য সাধন করে। তাহাকে যদি পরিবারের মধ্যে গণ্য করা যায় এবং আপনার জন বলিয়া স্নেহ করা যায়, সেও পরিবারকে আপনার জানিয়া তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। ভৃত্য যত পুরাতন হয়, ততই ভাল, ততই তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অল্প বেতনে নূতন দাসদাসী নিযুক্ত করা অপেক্ষা অধিক বেতনে পুরাতন ভৃত্য দ্বারা অধিক উপকার লাভ করা যায়। কিন্তু যে ভৃত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ হয়, যে কোনও মতেই বাধ্য হইয়া কাজ না করে এবং পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে তাহাকে বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ। নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিবার সময় সে যাহার যাহার নিকট কাজ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট গোপনে লিখন বা কথোপকথন দ্বারা ভৃত্যের স্বভাব জানিতে পারিলে ভাল হয়। যত বহুদর্শী এবং সচ্চরিত্র ভৃত্য পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। দাস দাসী গৃহে থাকিলেও যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান, কার্য্য-দক্ষতা এবং ধর্ম্মের উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করাও গৃহিণীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক ১২৭৭

## সরমা ও সুশীলার কথোপকথন

সরমা। ভাই, আজিকালি মেয়েমানুযে লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছে। শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়ী ননদ দেখিয়া একটু ভয়সমীহ করে না। আর অধিক কি বলিব, স্বামীর সঙ্গে নির্লজ্জ হয়ে কথাবার্ত্তা কয়।

সুশীলা। সরমা মেয়েমানুষেরা কি গারোদে বাঁধা চোর? দেখ দেখি, ঈশ্বরের এতবড়

জগতে সকল জীবজন্তু ইচ্ছায় ভ্রমণ করিয়া মনের সুখ লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে চারি পাঁচিলে ঘেরা অন্তঃপুরের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়। পাখীরা যে পিঁজরাতে বদ্ধ থাকে, তার মধ্যে তাহাদের একটু স্বাধীনতা আছে, চারি পাঁচিলের মধ্যেও নারীগণ একটু স্বাধীনতা না পাইলে তাদের বাঁচিয়া থাকা কেবল যন্ত্রণা মাত্র। আর আমি বলি কেবল ঘোমটা দিয়া জুজু হইয়া থাকিলেই যে মেয়েমানুষ খুব ভাল হইল তাহা নয়। যাহার রীত চরিত্র ভাল, তাকেই ভাল বলি।

স। তোমরা কালের মত মেয়ে। তোমাদের ভাব গতিক আলাদা। কোন্ কালে মেয়েরা বেহায়া হলে ভাল রীত চরিত্র আবার দেখাতে পেরেছে? কোন্‌কালে আবার মেয়েরা লজ্জা খেয়ে গুরুলোকের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কয়ে বেড়ায়েছে?

সু। যথার্থ লজ্জা, নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা তাহা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি মনে সেরূপ ভাল ভাব না থাকে, বাহিরের লজ্জা কি কোন কাজের হয়? কত মেয়ে খুব লজ্জা দেখাত, কিন্তু দুঃখের কথা কি বল্‌বো তারা অনায়াসে আবার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, খুব তিলক ফোঁটা কাটিয়া যারা বাহিরে ধার্ম্মিক দেখায়, তাদের মধ্যেই ভণ্ড বেশী। যাহা হউক তুমি জেন, এখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেরূপ ভণ্ড লজ্জা দেখা যায়, পূর্ব্বকালে এ রূপ ছিল না। সীতার ন্যায় সতী কে? কিন্তু তিনি রামচন্দ্র বনে গেলে কাহার কথা না শুনিয়া পতির অনুসরণ করিলেন এজন্য ত কেহ তাঁহাকে বেহায়া বলিল না। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি যত বিখ্যাত রমণীর কথা শুনা যায়, কেহ ত পরিবারের মধ্যে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিলেন না, অথচ তাঁহাদের ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা ও গুণবতী রমণী কোথায় দেখা যায়? বেদ পুরাণ ও আর আর প্রাচীন শাস্ত্র যত পাঠ করা যায়, ততই দেখা যায় শাশুড়ী ননদ স্বামী কি শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা কহা পাপ বিবেচনা করিতেন না। আজি কালি মেয়েদের ভাল গুণ থাকুক না থাকুক তাঁহারা বাহিরে লজ্জা দেখাইয়া বাহাদুরী করিতে চান!!

স। আমরা রামায়ণ মহাভারতের এ সব কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তুমি বল দেখি সে কালের ব্যাভার কি একালে খাটে? আর এরকম না কল্লেই বা ক্ষতি কি?

সু। এই তুমি বলিতেছিলে কোন্ কালে মেয়েরা এরূপ ছিল, কথা উল্টাইয়া লইলে। ভাল, পূর্ব্বকালে এখনকার মত ভণ্ড লজ্জা দেখাইবার প্রথা ছিল না তাহা ত বুঝিয়াছ। সেকালের ভাল প্রথা একালে ঘটিবে না কেন তাহাত বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান প্রথায় কি ক্ষতি, বলিতেছি। জগদীশ্বর মুখ দেছেন কেননা মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। মেয়ে মানুষেরা কথা কহিতে পায় না বলিয়া ত তাঁহাদের মন চুপ করিয়া থাকেনা। মনের কথা কাহার সঙ্গে প্রকাশ করিতে না পাইলে তার চেয়ে দুঃখ কি আছে? কত সময় তাহাদের পীড়া ও অনেকপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, প্রথমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া শেষে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। বাঘা শাশুড়ী ননদের ঘরে নববধূদিগের যে দুরবস্থা, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই কারণে অনেকের অপঘাত মৃত্যু ও অপথে পদার্পণও হইয়া থাকে। আর মনে কর হিন্দুর ঘরের ৮/১০ বৎসরের একটী শিশু বাপ মা ভাই ভগিনী সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরগৃহে আসিল। সেখানে সে যদি আপনার লোক না পায়, তাহাকে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে হয়, কাহার মুখপানে চাহিয়া স্নেহ পাইবার আশা না থাকে সে কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারে? অনেক গৃহে নববধূদের যে কষ্ট তাহা তাহারাই জানে আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। শাস্ত্রমতে পতির গৃহই

স্ত্রীলোকের গৃহ, পতির পিতা মাতা ভাই ভগিনী তাহারাও পিতামাতা ভাই ভগিনী। তবে তাহাদের নিকট এত লজ্জা কেন? লজ্জা পর বা পাপ বোধ করাইবার চিহ্ন। গৃহ, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী আপনার সামগ্রী সকল যাহা দ্বারা পর বোধ হয়, এমন লজ্জার ন্যায় শত্রু আর কে আছে? আর পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয়গণের নিকট সরল ভাবে মনের কথা প্রকাশ করিলে তাহাতে যে পাপ আরোপ করে তাহার ন্যায় কু আচার বা জগতে কি আছে?

লজ্জা থাকাতে যাহার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালন করিবার অনেক ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীলোকেরা যদিও হীনবল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অশেষ প্রকারে পরিবারের সাহায্য করেন ও করিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় কুৎসিত লজ্জা আসিয়া আপনার মত অতি আত্মীয় জনের বিপদ পীড়া ও দুর্ঘটনার সময় সাহায্য করিতে দেয় না। কত সময় বধূ বা ভাদ্রবধূদের সম্মুখে শ্বশুর বা ভাসুর যদি প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তাহার হস্ত প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, একটী সান্ত্বনার কথা বলিবার উপায় নাই। একি সামান্য দুঃখের কথা! এসকল শাস্ত্র ছাড়া—যুক্তি ছাড়া।

স। লজ্জা দ্বারা অনেক ক্ষতি হয় তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু তুমি যে বলিলে ইহা শাস্ত্র ছাড়া, যুক্তি ছাড়া তবে সকলে ইহা ধরিয়া চলেন কেন?

সু। এতদিন স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখত না কেন? হিন্দুরা জাহাজে চড়িয়া বিদেশ যাইত না কেন? বিধবা বিবাহ মন্দ ও সহমরণ ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল কেন? দেশাচার ও কুসংস্কারে কিনা করে? তবে যে প্রথাটী হয় তাহার একটা না একটা কারণ থাকে। স্ত্রীলোকের নম্রতা থাকা উচিত ইহা বেশী করিতে গিয়া এবং পুরুষেরা একটু আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইতে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে জুজু করিয়া ফেলিয়াছেন। এ প্রথা কোন দেশে নাই এদেশেও থাকিবে না।

স। আচ্ছা, বাড়ীর আর আর লোকের সঙ্গে কথা কহুক, কিন্তু বল দেখি বৌ হইয়া স্বামীর সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্ত্তাটা কি ভাল দেখায়?

সু। পতিই স্ত্রীলোকের গতি, পতিই সুহৃদ্ বন্ধু সকলই। পতির ন্যায় আত্মীয় কে হইতে পারে? পূর্ব্বকালে সতীরা পতির জন্য কি না করিয়াছেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য একেলে সংস্কার! এমন পরম আত্মীয় পতির সহিত কথা কহাও দূষ্য। পতি ও পত্নীর মধ্যে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে তাহা না দেখিয়া লোকে কুৎসিত ভাব গ্রহণ করে এবং তাহারাও পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জিত হন ইহা অপেক্ষা আমাদের সমাজের জঘন্যতার পরিচয় আর কি আছে? আমি তোমাকে পূর্ব্বকালের যে সকল সতী রমণীর কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেরই চলা উচিত। স্বামীর সঙ্গে এক হৃদয় হওয়াই সতীর লক্ষণ, স্বামীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ বোধ করা, ছায়ার ন্যায় সকল কার্যে, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হওয়া এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম করা, শাস্ত্রমতে এই ত সতীর প্রধান ধর্ম্ম। যদি স্বামী ও পত্নীর মধ্যে লজ্জা আসিয়া পরস্পরকে পর করিযা দেয় এবং পাপের ভার সঞ্চার করে তাহা হইলে প্রকৃত দাম্পত্য ধর্ম্ম কোন রূপেই রক্ষা পাইতে পারে না। আজি তোমাকে এই অবধি বলিলাম, পরে আর আর কথা বলিব, আমার ইচ্ছা স্ত্রীলোকেরা এরূপ জঘন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে স্বাধীনভাবে আত্মীয়গণের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করুন। ইহা কি তোমার ইচ্ছা নয়?

স। তুমি যে কথাগুলি বলিলে তাহা অকাট্য এবং তাহার মত যতদিন আমরা চলিতে

না পারি ততদিন আমাদের ভণ্ডামী এবং সকল বিষয়েই কষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা এই সকলই প্রকৃত লজ্জা যে তুমি বলিলে তাহা সত্য এবং তাহা কেবল সাত হাত ঘোমটা দিলেও হয় না, মুখে গো দিয়া থাকিলেও হয় না। ভাল কার্য্য দ্বারাই ভাল গুণ প্রকাশ পায়।

আষাঢ় ১২৭৮

## লজ্জা

### বামাগণের রচনা

লজ্জা দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে, অন্যটি স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকেরটি এই প্রকরণে লেখা যাইতেছে। "স্ত্রীলোকের লজ্জাবতী হওয়া উচিত।" এই কথা পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহারা অস্বীকার করেন। লজ্জা সকল দেশীয় স্ত্রীলোকের হৃদয়ে আছে। এই মাত্র বিশেষ যে, কাহার হৃদয়ে অধিক কাহারও হৃদয়ে অল্প। সামাজিক রীতিনুসারে উহা স্ত্রীলোকের নিয়ম দেশ ভেদে ভিন্নপ্রকার, এক দেশে যাহা লজ্জার চিহ্ন বলিয়া গণিত হয়, অন্য দেশে উহা নির্লজ্জতার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে নৃত্য গীতাদি করিলে তদ্দেশীয় স্ত্রীগণ প্রসংশনীয়া হন এবং তাঁহারা সকলের সহিত আলাপ ও প্রকাশ্য স্থানে গমানগমন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয়া স্ত্রীগণ তদ্রূপ করিলে প্রশংসনীয়া হওয়া দূরে থাকুক, জঘন্য রূপে নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের ও সকলের সহিত আলাপের পরিবর্ত্তে অগগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। কিন্তু অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া কাহারও সহিত আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে। বরং লোকের সহিত আলাপাদি না করাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকিতে পারে না এবং তাহা নম্রতা বিনয় সুশীতলতা শান্তভাব ইত্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা সম-অলঙ্কৃত হয়।

প্রকৃত লজ্জার অন্য একটি নাম শীলতা (Modesty) এবং যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের অন্য নাম লজ্জাশীলা। বঙ্গীয়া অনেক মহিলা সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থ ও লোক নিন্দার ভয়ে বাহ্যিক লজ্জা প্রদর্শন করেন কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যাঁহাদিগের হৃদয় সলজ্জ নহে, কেবল নিন্দা ভয়ে আপনাদিগকে লজ্জাবতী দেখান, তাঁহারা লোকের নিকট প্রশংসনীয় হন বটে। কিন্তু আপনাদিগকে কপটরূপ-পাপে লিপ্ত করেন। যাঁহারা বাস্তবিক লজ্জাবতী তাঁহারা কখন কপট হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের হৃদয় সারল্যগুণে বিভূষিত এবং তাঁহাদিগকে আচার ব্যবহার আলাপ প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রভৃত লজ্জার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু লজ্জাবতী হইবে বলিয়া একবারে অসভ্যের ন্যায় হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে কুৎসিত লজ্জা আসিয়া পড়ে।

বঙ্গীয়া অনেক মহিলা কুৎসিত লজ্জার বশবর্ত্তী। তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধাণ করিয়া থাকেন এবং অনাবৃত শরীরে দাস দাসী ইত্যাদি পরিজনের সম্মুখে অনায়াসে থাকেন। কোন মহিলা অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন, এদিকে আবার চিৎকার স্বরে কুৎসিত রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগ করতঃ কোন কোন ব্যক্তির সহিত এমন ভাবে বিবাদ করিতে থাকেন যে, যে ব্যক্তি কখন তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই তিনি তাঁহার বদন বিনিঃসৃত পুরুষ ভাষা শুনিতে পান। স্নান গাত্র মার্জন ইত্যাদিও প্রকাশ্য স্থানে সম্পাদিত হয়। অতএব এরূপ নিয়ম করা উচিত যে অনুমতি বিনা দাস দাসী কিংবা অন্যান্য পরিজনেরা সকল গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং স্নান ইত্যাদি গোপনীয় স্থানে সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচারে যে নারীগণ অনভিজ্ঞ, ইহা কেবল কুৎসিত লজ্জাবশতঃ হইয়া থাকে। কোন ভদ্র ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিতে আসিলে তাঁহারা মৌনী হইয়া থাকেন। অথবা সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। সভ্যতম প্রদেশে এরূপ আচরণ করিলে যৎপরোনাস্তি নিন্দনীয়া হইতে হয়। লোকের সহিত এরূপ ভাবে আলাপ করা উচিত যে তাহাতে মনে কোন কু ভাবোদয় না হয়।

আষাঢ় ১২৭৮ কুমারী সৌদামিনী।

# সরলতা ও পবিত্রতা

## অবলা ও সরলার কথোপকথন

অবলা। ভাই, তোমার নামটি যেমন সরলা তোমার হৃদয়ও সেইরূপ সরল, তাই সরলতা এবং পবিত্রতার বিষয় কিছু জান্‌তে এসেছি, আমাকে ভাই, এইটি ভাল করে বুঝ্‌য়ে দিতে হবে।

স। অবলে! তোমার এই মধুমাখা প্রশ্নটি শুনে আমি আজ বড় খুসি হলাম, এস ভগ্নি, কাছে এসে বস, এ সম্বন্ধে তোমার কি জানিবার আছে বল, আমি সাধ্যানুসারে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা কর্‌বো।

অবলা। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, ঠিক্ সরল এবং সাধু কাকে আমরা বল্‌তে পারি?

স। যাদের ভিতর বার সমান নয়, যাদের মনে একটা বাহিরে একটা, যারা বাহিরে খুব সরল ও সাধু ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে গরল পুষে রেখেছে, তারা বড় কপট, পাপ তাহাদের অঙ্গের আভরণ, ভাই তাদের অসাধ্য কিছুই নাই, তারা লোক মজাবার গুরুমশাই, তাদের বিশ্বাস কর্‌তে নাই, তাদের নাম শুনলে হৃৎকম্প হয়! আর যাঁহাদের অন্তর বাহির সমান, মনে এক রকম মুখে একরকম নাই, কুটিলতা-বিষ যাঁদের হৃদয়কে জড়াতে পারে না, যাঁদের পবিত্র হৃদয় মন্দিরে পাপের প্রবেশাধিকার নাই, পুণ্য-শশীর বিমল আলোক যাঁদের অন্তরাকাশকে আলো করে রেখেছে, যাঁদের শান্তমূর্ত্তি দেখ্‌লে— মনের মিষ্ট সরল কথাগুলি শুনলে প্রাণ জুড়্‌য়ে যায়, যাঁহারা পরমানন্দে কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার সুখের প্রশান্ত সাগরে দিবানিশি নিমগ্ন, তাঁহারাই

যথার্থ সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক।

অ। আমার বিবেচনায় সকলের কাছে সরলতা দেখান ভাল নয়, যে যে ভাবের লোক তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিলে সব দিক্ বজায় থাক্‌তে পারে। যে সরল, তার প্রতি সরল ব্যবহার কর্‌বো, প্রাণ মন সব তারে দিব, আর যে অসরল কপট তার কাছে মনের কথা খোলা কখনই উচিত নয়, তাহলে আমাদিগকে অত্যন্ত পশ্চাৎতাপ পেতে হবে। ভাই, তুমি ত এইমাত্র বল্‌লে যে 'কপট লোকদের বিশ্বাস কর্‌তে নাই, তারা লোকের সর্ব্বনাশ করে', ইটী ভাই ঠিক্ কথা, আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌তে পারি যে কত কুটিল পুরুষ ও কুটিলা কামিনী কপট সরলতা-বাণে কত শত সরলার প্রাণ বিদ্ধ করে আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করেছে।

স। ভাই ইটী তোমার অত্যন্ত ভ্রম, পূর্ব্বেইত বলেছি, প্রকৃত সরল যে সে ছদ্মবেশী নয়, সে আপনি আপনাকে চুরি কর্‌তে চায় না। যে যেমন লোক, তার সঙ্গে যদি সেইরূপ ব্যবহার করা যায় তাহলে আর সরল হওয়া সাধু হওয়া হলো কই? সে যে আত্মাপহারী চোরের কার্য্য, তার চেয়ে যে পাপ আর নাই। ভাই! সরল সাধু লোক যাঁরা, তাঁরা কি আপনাদের স্বভাবকে গোপন করে লোকের মন রাখা কথা কহিতে জানেন? তাঁদের প্রকৃতি যে নির্ম্মল জল তুল্য! যে ব্যক্তি যে অভিসন্ধিতে আসুক, যে যে ভাবে কথা কোক্, তাদের সে দুষ্ট অভিসন্ধি ও কপট ব্যবহার সাধু ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক সরস এবং পবিত্র ভাবে গ্রহণ করেন। তাহারা যে কপটবেশে তাঁহাকে ঠকাইতে ও কষ্ট দিতে এসেছে এরূপ বিশ্বাস তাঁর মনে একবারও আসে না। দেখ ভগ্নি, যাঁর চর্য্যা ভাল, যিনি সকলকে আপনার মত দেখেন, অহঙ্কারের বাষ্প যিনি জানেন না, যাঁর কোমল হৃদয় ভাল ভাল সদ্‌গুণগুলিতে সাজান, কুটিলতা প্রভৃতি অসদ্ভাব যাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং যাঁহার হৃদয় মন আত্মা সর্ব্বদা স্বর্গামৃতে সরস হয়ে রয়েছে, তাঁকে কি সংসার কষ্ট দিতে পারে? তিনি যে সংসার ছাড়া লোক, তাই তাঁর সকলই বিপরীত। আমরা মন্দকারীকে যেমন শত্রু মনে করি, তাঁর কাছে সে পরম মিত্র বলে আদর পায়! আমরা যাকে কদাকার নির্গুণ বলে ঘৃণা করি, কাছে আসিতে দিই না, তিনি তারে শিক্ষা-গুরু বলে মানেন এবং অম্লান বদনে তার চরণ সেবায় নিযুক্ত হন! যাকে আমরা নীচ নরাধম পাপাত্মা বলে জানি, সে তাঁর অতি আদরের ধন, তিনি এক মুহূর্ত্তের তরে তাকে চোকের আড় করেন না, যতক্ষণ না ভাল ভাল উপায় বিধান করে তার সকল রোগ দুর্ব্বলতা দূর কর্‌তে পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর আর আরাম নাই! আমরা কেবল আপন আপন স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হয়ে আপনাদিগকে সুখী করতে প্রাণপণ করি ও অনিত্য সুখের অন্বেষণে ঘুরে মরি, তিনি স্বার্থ শূন্য হয়ে পরের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেন! আমরা এক বিন্দু অসুখের মুখ দেখ্‌তে পারি না, দুঃখ নাম শুন্‌লে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল মনে করি, তিনি অব্যাকুল চিত্তে সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা আপনার মাথায় করে বহন করেন, তাঁর কাছে অসুখ সুখ রূপে, বিপদ সম্পদ রূপে আদর পায়! তিনি পর্ণকুটীরকে রাজবাটীর ন্যায় দেখেন, শাকান্নকে অতি উপাদেয় খাদ্য বলে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন, গাছের বাকলকে উত্তম পরিচ্ছদ বলে পরিধান করেন এবং অঞ্জলিস্থিত জল পান করে স্বর্ণ পাত্রস্থিত সুশীতল সুগন্ধযুক্ত পানীয় সেবনের তৃপ্তি সুখ লাভ করেন। একটী অনাথার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইয়া দিয়া তিনি যেরূপ বিমলানন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য সুখ তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, আমি

যে ধনের ভিখারী, যে সুখের অভিলাষী সংসার তা কখনই আমাকে দিতে পারে না, সে দিব বলে প্রবঞ্চনা করে, যার পর নাই কষ্ট দেয়, অবশেষে মেরে ফেলে। আমি তার স্বভাব বিলক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই তাকে এত ঘৃণা করি, কাছে এলে তাড়াইয়া দিই—তার মায়ায় আর ভুলি না। আহা! ধন্য সেই ঈশ্বরের সন্তান, যিনি অকপট হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারেন "আমি চাহি না সে সুখ—পদাঘাত করি সে সুখের মস্তকে, যে আমার পরম শত্রু, যে আমার আত্মার আনন্দ হরণ করে, যে আমাকে নরকের দুর্গন্ধময় পথে লয়ে যায়!"

অ। ভগিনি! তোমার কথাগুলি শুনে প্রাণ জুড়াইয়া গেল। ভাই, আমরা এমন কপাল কি করেছি যে এরূপ দেবতার মত জীবন পেয়ে মনুষ্য জন্ম সার্থক কর্‌তে পার্‌বো।

স। অবলে! আমাদের সেরূপ প্রাণপণ যত্ন কই, অধ্যবসায় কই? বিবেচনা করে দেখ দেখি, সংসারের একটী সামান্য কাজ যখন যত্ন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না তখন মানুষের মত কাজ করে মানুষ হওয়া—পবিত্র জীবন লাভ করা কি মুখের কথা? ভেবে দেখ দেখি পদে পদে আমাদের কত দুর্ব্বলতা! এই মাত্র শিক্ষক উপদেশ দিলেন, কঠিন হইও না, দয়া জলে হৃদয়কে ভিজাও, অপব্যয় করিও না, মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর, অকর্ম্মণ্য হইও না, সংসারের সকল কাজের উপর দৃষ্টি রাখ, অসারতা দেখাইও না, বিলাস ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, যে অর্থ দিয়া তোমরা বিলাস দ্রব্য ক্রয় কর তাহাতে কত দরিদ্রের দরিদ্রতা দূর হতে পারবে!' ভাই বাটীতে না আসিতে আসিতে অমনি সে সব ভুলে যই, আমোদ-প্রিয় হয়ে আমোদ এবং বড়মান্‌ষী দেখাবার জন্য কত টাকা অনর্থক নষ্ট করি, আবার তার একটু ক্রুটী হলে হয়ত পিতা, পতি প্রভৃতির উপর রাগ করিয়া বসি। কিন্তু বাটী এবং গ্রামের চারি দিকে যে কত অনাথ পেটের জ্বালায় দিবানিশি হাহাকার করিতেছে তার প্রতি একেবারে বধির হই, তাদের সে বিলাপ বচনে এ পাষাণ হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিগলিত হয় না! ভাই দুঃখর কথা আর কি বল্‌বো, সংসারের কাজ দূরে থাক্‌, এক এক জন আবার এরূপ শারীরিক উন্নতি করে তুলেছি যে সময়ে স্নান আহার কর্‌তেও কষ্ট বোধ হয়। এই শিক্ষক বলিলেন 'সাধ্বী হও পতিব্রতা হও, সাবিত্রী প্রভৃতি নারীকুল উজ্জ্বলা কামিনীদিগের পবিত্র জীবন পাইতে চেষ্টা কর, সকল প্রকার মলিনতা দূর করিয়া পবিত্র হৃদয়ে এবং প্রীতিসূত্রে সকল ভাই ভগিনীদিগকে একত্রে বন্ধন কর, নিশ্চয় কহিতেছি এরূপ না হইলে কখনই প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারিবে না।' ভাই, যাই সেই সমস্ত মধুর সদুপদেশ শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল, তার পরক্ষণে, কর্ণান্তর দিয়া সব একে একে বাহির হইয়া গেল! দেখ ভাই, এরূপ দুর্ব্বল যাদের প্রকৃতি তারা আবার কেমন করে আশা কর্‌তে পারে যে 'আমি সীতা হব, সাবিত্রী হব এবং পবিত্র জীবন লাভ কর্‌বো!' এক্ষণে আমরা দিন দিন যেরূপ শিক্ষা যেরূপ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, কই তার মত কাজে কয়জন ভগ্নী অগ্রসব হ্‌তে পেরেছি, যে সমস্ত অবলাবান্ধব মহোদয়গণ অবলাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিতেছেন, তাঁদের প্রতি কি আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ নয়নে চেয়ে দেখি? কখনই না। ভাই, আমাদের কিছুকাল পূর্ব্বের বড় বড় মান্‌ষের মেয়েদের সরল স্বভাবের বিষয় একবার স্মরণ করে দেখ দেখি। যদিও তাঁরা বিদ্যারসে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু শুনেছি তাঁদের মধ্যে অনেকের এরূপ সাধু প্রকৃতি ছিল যে অহঙ্কার, গর্ব্ব. বড় মান্‌ষী যে কাকে বলে তা তাঁরা জানিতেন না, সংসারের সমস্ত কার্য্য, দাসদাসীর মুখাপেক্ষা না করে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব

প্রতিবাসীদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, অতিথি সেবায় সাতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং সামান্য অশন বসনে সুখে দিনপাত করিতেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, যে প্রত্যহ স্নান করে পতির পাদোদক পান করিতেন, কোমল কেশপাশ দ্বারা তাঁহার আর্দ্র চরণযুগল মুছাইয়া দিতেন এবং পতির উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরম সুখে আহার করিতেন। ভাই তাঁদের সেই সুন্দর স্বভাবের বিষয় আলোচনা করিলে আর কি আমরা শিক্ষিতা বলে অভিমান করিতে পারি, না তাঁদের গুণের পক্ষপাতিনী হতে মন ধাবিত হয়? তাঁরা যদি একেলে মেয়ে হতেন, না জানি কত গুণে হৃদয়কে সাজাইয়া লোকের মন হরণ করিতেন! তাই যা বল যা কও, হাজার লেখা পড়া শিখ আর সভ্য দেখাও, নানা গুণে সজ্জিত হয়ে জগতের মন হরণ কর, আর অনেকের অনেক রকম অভাবই দূর কর, কিন্তু যতদিন না আমরা আপন আপন আত্মার অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব, যতদিন না তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা শান্তি করিতে সক্ষম হইব, যতদিন না হৃদয়কে পবিত্রতা-জলে ধৌত করিতে পারিব ততদিন পর্য্যন্ত এ অভাগিনীদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথ হারা হয়ে থাক্‌তে হবে, একটুকু আত্মপ্রসাদের জন্য, এক বিন্দু শান্তি জলের নিমিত্ত চিরকাল হাহাকার করে মর্‌তে হবে।

অ। ভাই, আজ তোমার কাছে এসে আমার হৃদয়ের অনেক ভার কমে গেল, অনেক অন্ধকার দূর হল, জানিলাম বুঝিলাম যে সরল ও সাধু জীবন না পেলে আমাদের আর মঙ্গল নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই এবং নিস্তারের আর অন্য পথ নাই। হে অবলার গতি ঈশ্বর! কবে পিতা তোমার এ দুর্ব্বল মেয়েগুলি সরল হয়ে পরস্পরে হাত ধরাধরি করে তোমার পথে দাঁড়াতে পার্‌বে! কবে নাথ জীবনে সেই শুভদিনের উদয় হবে, যে দিনে আদর করে তোমাকে হৃদয় মন্দিরে বসাইয়া প্রীতি-ফুল আর ভক্তি-চন্দন দিয়ে মনের সাধে দেব দুর্ল্লভ তোমার চরণ পূজা কর্ত্তে পার্‌বো! প্রেমময়! কেমন করে তোমাকে ভাল বাসিতে হয় তা ত' জানিনা, ভাল করিয়া শিখাইয়া দেও, পিতা চিরকালের জন্য আমাদিগকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখ!

ভাদ্র ১২৭৮

## স্ত্রীজাতির আদর্শ

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর চারিদিকেই স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। পুরুষ সমাজে স্ত্রীগণের বিশেষ সমাদর আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রী সমাজ পুরুষ সমাজের ভূষণ-স্বরূপ, নারী সমাজ জন সমাজের প্রধান অঙ্গ, স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য, ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। আজি কালিকার পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রধান গুরু ফরাসদেশীয় কুম্‌টি সাহেব মনুষ্য হৃদয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধন করিবার জন্য মাতা, স্ত্রী এবং দুহিতা এই তিন

স্ত্রী মূর্ত্তির পূজার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে নারীগণের প্রতি সীমাতীত ভক্তি ও পক্ষপাত প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু নারীগণের প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বর্গীয় ভাব তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন মিল সাহেব স্ত্রী জাতিকে সমাজের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিবার জন্য কতই প্রয়াস পাইতেছেন। এই উনবিংশ শতাব্দির মনুষ্য সমাজের ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে বর্ত্তমান আন্দোলন একটী প্রধান ঘটনা বলিয়া ভবিষ্যতে পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাই হউক জনসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে গেলে নারীজাতির প্রাকৃতিক উপাদান তাহার প্রধান একটী উপকরণ। উভয় জাতির স্বর্গীয় উপাদানের উপর জনসমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত। পৃথিবীর মধ্যে যে দেশে যে সমাজের মধ্যে স্ত্রীজাতি অনাদৃত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে, সেই দেশের সেই সমাজ অতি জঘন্য, সে সমাজ অজ্ঞানতা অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ পুরুষজাতির উন্নতির উপর নারীজাতির মঙ্গল নির্ভর করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতির উন্নতির উপরে পুরুষজাতির কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। উভয়জাতির পরস্পর এত গূঢ় ঘনিষ্ঠ যোগ, যে একের উন্নতি অবনতির উপর অপরের উন্নতি অবনতি সংস্থাপিত। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে নারী জাতির বিষয় লইয়া এত আন্দোলন। এখন সকল দেশের জ্ঞানচক্ষু অল্প অল্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, সুতরাং অনেকদেশের লোকের অবলাজাতির উন্নতিকল্পে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রকৃত হিতকামনা করিতে গেলে তাহাদের জীবনগত পরীক্ষিত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধুনা অনেককে নারীদিগের হিতৈষী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেরূপ হিতৈষণা অনেকটা ভাবগত, প্রকৃত জীবন-গত নহে। তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে গেলে নারীদিগের বিশেষ উপযোগিতা, বিশেষ প্রবৃত্তি ও বিশেষ বিশেষ দুর্বলতার সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য, নতুবা সহস্র সহস্র সাধু উপায় নিশ্চয় বিফল হইয়া যাইবে। প্রকৃত হিতার্থী সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ এই নিয়ম প্রতিজনের সম্বন্ধে অবলম্বন করেন। ইহার অভাবেই অনেকে স্ত্রীহিতৈষী হইয়াও তাঁহাদের উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। ইহাদের জীবনের উপকার করিতে গেলে যুগপৎ দুটী উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, একটী ভাব পক্ষের, আর একটী অভাব পক্ষের। প্রথমটী উন্নতি বিধায়ক, দ্বিতীয়টী অবনতি বিনাশক। প্রথমটী জীবনের সামঞ্জস্য সম্পাদক, দ্বিতীয়টী তাহার বিভিন্নতা ভঞ্জক। প্রথমটী আত্মার প্রত্যেক স্বাভাবিক সাধুভাবের স্ফূর্ত্তি বিধায়ক, দ্বিতীয়টী বিরুদ্ধ ভাবের গতিরোধক। প্রথমটী বাহ্য সমস্ত অবস্থার অতীত, দ্বিতীয়টী কতকগুলিন অনুকূল অবস্থার অনুগত। প্রগাঢ় চিন্তার সহিত এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নারীদিগের যথার্থ উন্নতির পথ অতিশয় দুরূহ ও দুষ্প্রবেশ্য। এই দুরবগাহ্য প্রহেলিকার মীমাংসা সুকঠিন বলিয়া বোধ হয়। বিলাতেরও অনেক বড় বড় জ্ঞানী লোক তাঁহাদের উন্নতির বিরোধী। রমণীদিগের স্বর্গীয় উচ্চ আদর্শ যাহারা উপলব্ধি না করে, তাহারাই তাঁহাদের উন্নতির বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণ বশতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে সপক্ষ কি বিপক্ষ উভয়দলই লক্ষিত হইয়া থাকে।

মানব সাধারণের উচ্চ লক্ষ্যের সহিত স্ত্রীজাতির আদর্শের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। পূর্ণ

মনুষ্যত্ব লাভ এই আদর্শে অনুসৃত রহিয়াছে। যে আপনার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, সে নারীগণের আদর্শের গভীরতার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদন করাই নারীজাতির উচ্চতর ভাব। কি সামাজিক কি পারিবারিক বিষয়ে বামাগণ সমাজের প্রধান অঙ্গ বলিলেই হয়। শরীরগত, ইন্দ্রিয়গত, পার্থিব সম্বন্ধ নিবন্ধন মনুষ্য সমাজে নারীগণের আবশ্যকতা স্বীকার করা অতি নীচ ভাব। এ ভাব বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিকট অনাদৃত ও অলক্ষিত হয়; কিন্তু উচ্চভাব অন্যতর। নারীদিগের প্রকৃত আদর্শ পবিত্রতার উজ্জ্বলতা, ভাবের মধুরতা, ভক্তির কোমলতা ও জীবনের সৌন্দর্য্য এই সকল ভাব মনুষ্যাত্মাকে প্রদান করাই নারীজাতির জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। যে সমাজ নারীর কোমল সহবাস হইতে বঞ্চিত, সেই সমাজ পবিত্রতার প্রকৃত ভাব লাভ করিতে পারে না, সে সমাজ জীবন-গত পরীক্ষিত পবিত্রতা অনুভব করিতে পারে না, সে সমাজের লোক সামান্য প্রলোভনে মানসিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। পাঠিকাগণ' তোমাদের বিশেষ গুরুতর কার্য্য ভার উপলব্ধি কর। সাংসারিক সম্বন্ধ পরিহার করিয়া আপনার জীবনের বিশেষ উপযোগিতা প্রত্যক্ষ কর। যখন খৃষ্ট ধর্ম্ম অতি শুষ্ক কঠোর হইয়া আসিল, তখনি মেরির পূজা আরম্ভ হয়, তখনি ঈশ্বরের জননী এই কথা বলিয়া মেরির উপাসনা হয়। ইহার কুসংস্কার জঘন্যভাব পরিত্যাগ করিলে দেখিতে পাইবে যে লোকে কোমল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি সমাদর করিবার জন্য বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, সেই হইতেই খৃষ্ট সমাজে নারীদিগের প্রতি সম্মান করিবার ভাব প্রবেশ করিয়াছে। পাঠিকাগণ! তোমরা স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শ প্রতীতি কর, জগতে আদরণীয় হইবে এবং জন সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

আশ্বিন ১২৭৮

## গার্হস্থ্য দর্পণ

গৃহিণীর গুণদোষে সংসারের সুখাসুখ। তাঁহার কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে তাঁহার স্বামী, পুত্রকন্যা, অনুচরবর্গ সকলে সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে মনোযোগী ও যত্নশীল হয়েন। গৃহিণীর কার্য্যদোষে ক্লেশ বা অসুখ হওয়াতে কখন কখন সচ্চরিত্র গৃহস্বামীও ক্রমে অসচ্চরিত্র হইয়া পড়েন, কেননা যে পরিমাণে তাঁহার মন সংসারে পরিতৃপ্ত থাকে সেই পরিমাণে সংসারের সুখবর্দ্ধনেও তাঁহার মনোযোগ হয়, এবং সংসারের বিশৃঙ্খলাবশতঃ তাঁহার মনে ইহার প্রতি যতদূর বিতৃষ্ণা জন্মে, ততই তাঁহার নিজস্বভাবানুসারে হয়ত তিনি সুরাপায়ী বা বেশ্যাসক্ত হয়েন অথবা বৈরাগ্যবশতঃ উদাসীনের ন্যায় সংসারে বাস করেন। গৃহিণীর ব্যবহার দোষে যদি গৃহস্বামীর এমন দশা ঘটনার সম্ভবনা, তবে যে সকল সন্তানসন্ততির লালন পালন শিক্ষাদির সমস্ত ভারই গৃহিণীর হস্তে, তাহাদিগের যে কতদূর দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে তাহার

সীমা করা যায় না, সন্তানাদি শিষ্ট, বাধ্য, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইয়া কুলের গৌরব ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে, অথবা তাহারা দুষ্ট, অবাধ্য, মূর্খ ও দুশ্চরিত্র হইয়া কুলের কলঙ্ক ও দেশের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে। ইহার কারণও গৃহিণীর গুণদোষ। গৃহিণীর উপরেই তাঁহার নিজের, তাঁহার স্বামী প্রভৃতি সকল গুরুজনের এবং তাঁহার পুত্রকন্যা প্রভৃতি প্রতিপালিত সকলের হিতাহিত ও সুখস্বচ্ছন্দতা, অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সাংসারিক সুখ তাঁহারই হাত; তিনি কার্য্যে পটু ও আচারে লক্ষ্মী হইলে সংসারের সুখ ঐহিকের পরমসুখ বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিণীর গুণেই কোন কোন লোক সামান্য আয় দ্বারা বৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বহু সন্তানদিগকে লালনপালন ও কৃতবিদ্য করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার সংসারের এমন শৃঙ্খলা এবং সন্তানাদির এরূপ সচ্চরিত্র যে, তাহা দেখিয়া তাঁহার চতুর্গুণ ধনশালী ব্যক্তিও সেরূপ গুণশালিনী গৃহিণীর অভাবে সকল বস্তুরই অভাব ও বিশৃঙ্খলাবশতঃ অল্প পরিবার হইলেও সকলকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে বা সন্তানাদিকে সুশিক্ষিত করিতে না পারিয়া ঐ সুভার্য্যপুরুষকে আপন অপেক্ষা সহস্রগুণে ধনী বলিয়া বিবেচনা করেন।

গৃহিণীর স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা এবং সংসারের অবস্থা, এরূপ সূত্রে আবদ্ধ যে গৃহিণী ভাল হইলেই পরিবারের সকলে সুখী হইবে এবং সন্তানাদি সুশীল হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই।

ধন অধিক হইলে সামান্য অন্নস্থানে পলান্ন বা মোটা চাদরের স্থান শাল এইমাত্র বিশেষ হয়, অথবা বই বগলে ছাতি হাতে বিদ্যালয়ে না যাইয়া সন্তানাদি গাড়ি বা পালকিতে যাইতে পারে, কিন্তু সে ভিন্নতা দ্বারা মনে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং সুখী হওয়া উচিত, কেননা নিয়তই দেখা যায় যে সুবোধ মাতা যে বালকদিগকে কষ্টে প্রতিপালন করেন, তাহারাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেশের অলঙ্কারস্বরূপ হয়েন ও যথার্থ মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন, প্রচুর ধন না থাকিলে এবং দাস দাসী অনেক রাখিতে না পারিলে যে সংসারের কর্ম্ম সুচারুরূপে চলে না, অথবা পণ্ডিত শিক্ষক রাখিতে না পারিলে যে যে সন্তানাদির বিদ্যাভ্যাস ভাল হয় না, এ সকল কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। অল্পধন বা অপরের অল্প সাহায্যে যে গৃহিণী স্বীয় কার্য্যকৌশল ও সুনিয়মদ্বারা সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ গুণ এবং তাঁহারই যথার্থ সুখ। দরিদ্রপত্নী হইয়া কেহ রাজার মার ন্যায় শেষদশায় সুখে থাকেন, কেহ বা রাণীর ন্যায় সুখের অবস্থায় পড়িয়াও শেষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এই ভাগ্যচক্র যেমন পুরুষের দোষগুণে, তেমনি অনেক স্থলে গৃহিণীর দোষগুণেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এমন কথা কখন কখন শুনা যায়, যে অমুকের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি আছে কিছুতেই কুলান হয় না, সন্তানের স্থানে দোষ আছে তাই ছেলেরা রুগ্ন বা দুশ্চরিত্র, অথবা অমুকের ধনভাগ্য ও সন্তানভাগ্য উত্তম, ছেলেগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ও ঘরে বসিয়া দুদণ্ড তাদের সঙ্গে কথা কহিলে কেমন তৃপ্তি হয়! বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ভাগ্যের দোষগুণ অপেক্ষা কর্ম্মেরই দোষগুণ অধিক। কোন কোন সংসারে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব একত্রে বাস করিয়াও নির্ব্বিরোধে কালযাপন করিতেছে, আবার কোন কোন সংসারে কেবল ভর্ত্তা ও ভার্য্যার পরস্পর শাপে নেউলের মত বিবাদ বিসম্বাদ নিত্য ঘটিতেছে, ইহারও কারণ অনুসন্ধান করিলে কেবল গৃহিণীর দোষগুণমাত্র লক্ষিত হইবে। কোন নির্ধনী পুরুষের সংসারেও

আবশ্যক বস্তু চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, কোন কোন ধনবানের ঘরেও হয়ত সামান্য জিনিশের আবশ্যকতা হইলেই দোকানে লোক পাঠাইতে হয়—তাঁহার প্রয়োজন শেষ হইলে জিনিশে আর যত্ন থাকে না, দুদিন পরে আবার কিনিতে হয়। কোন কোন সংসারে শুনিবে যে অমুক জিনিষটি তিন পুরুষ ব্যবহার হইতেছে, কোন কোন সংসারে আজ সমুদায় জিনিশ নূতন বন্দোবস্ত করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিলে, পর বৎসর বা পর মাসে হয়ত তাহার দশটার মধ্যে একটা দেখিতে পাওয়াও ভার। এ সকল কেবল গৃহিণীর দোষ গুণের ফলমাত্র। ক্রিয়াকাণ্ডেও দেখা যায় কোন কোন স্থলে অল্প ব্যয়ে কত লোক আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কোথাও বা চতুর্গুণ খরচে তাহার অর্দ্ধেক লোককেও ভাল করিয়া ভোজন করাইতে পারা যায় না, প্রাত্যহিক আহারের আয়োজনেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক সামান্য ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহিণীর গুণেই কি সুখের সংসার হয় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গৃহিণীর গুণ না থাকিলে সংসার কি স্বামীর, কি সন্তান সন্ততির, কি অপরের না আহাব করিয়া, না আরাম করিয়া, না কোন কার্য্য করিয়া সুখ লেশমাত্র অনুভব হয়, কিন্তু গুণবতী গৃহিণী থাকিলে সংসারই স্বর্গতুল্য স্থান বোধ হয়।

স্বামী যদি যথেষ্ট ধনবান্ না হয়েন, তথাপি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যখন তিনি ঘরে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন গুণবতী গৃহিণীর ক্ষুদ্র কুটীরের পরিপাট্য দেখিয়া ও তাঁহার নিরলঙ্কার বদনশোভা, কমনীয়তা ও মধুরতাগুণে সন্তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিয়া যেরূপ সুখে কালাতিপাত করেন অনেক ধনবানের ভাগ্যে সেরূপ হয় না। সন্তানাদি যদিও অবস্থাক্রমে সুদূরস্থ বিদ্যালয় হইতে পুস্তকাদি ভারে ও আগমন ক্লেশে কষ্টে গৃহে প্রত্যাগত হয়, তথাপি তাহারা মাতার স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে তাবৎ ক্লেশ বিস্মৃত হয় এবং যথাহৃত সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া নিজ নিজ পুস্তকালাপ বা নানা হিতগর্ভ বাক্যালাপে মনোনিবেশ করে—কাহারও অণুমাত্র ক্লেশের কারণ থাকে না। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তন্মধ্যে গুণবতী গৃহিণী থাকিলে নিজ নিজ গৃহকে ইন্দ্রভবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নারীগুণ বিষয়ে মহাভারতে কথিত আছে, যথা—

"সংসারের মধ্যে নারী হয় শ্রেষ্ঠতর।
সর্ব্বসুখে সুখী নারী না জানে পামর ॥
নারী লয়ে নরলোক সংসারী বলায়।
নানাধন উপার্জ্জয় নারীর সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত মঞ্চে সস্ত্রীক হইয়া।
পিতৃলোক তুষ্ট করে পুত্র জন্মাইয়া ॥
রাজ্য ধন অট্টালিকা আছয়ে যাহার।
নারীশূন্য গৃহ তার শ্মশান আকার ॥
সংসার অসার সার রমণীর সঙ্গ।
যেহেতু পুরুষ-নারী হয় এক অঙ্গ ॥
গ্রহবশে নিজবাসে দুঃখী যেই জন।
কোন রূপে করে যেই উদর ভরণ ॥

গুণবতী নারীসহ যদি করে বাস।
তাহার নিকট স্বর্গবাস উপহাস ৷৷
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে নানা সুখ।
পরকালে কভু তার নাহি হয় দুখ ৷৷”

(ক্রমশঃ; দ্র. আশ্বিন ১২৭৯)

ফাল্গুন ১২৭৮

# বামাহিতৈষিণী সভার বক্তৃতা

## বামাগণের রচনা

এক্ষণে সুসভ্য জাতি মাত্রই নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে নিতান্ত যত্নশীল হইয়াছেন। পুরুষজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতি উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে যে জনসমাজ সম্যক রূপে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে না ইহা প্রায় সকল সভ্যজাতির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, এক্ষণে তাহা শুদ্ধ নারী জাতির অবনতির জন্য অন্যান্য সভ্য দেশের পশ্চাৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

অস্মদ্দেশীয়া অবলাকুল পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ ও দাসীর ন্যায় ব্যবহৃতা হইয়া আসিতেছেন ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশীয় পুরুষেরা মনে করেন যে স্ত্রীজাতি শুদ্ধ গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ ও পার্থিব সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। উন্নতি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে ইঁহাদের অধিকার নাই, এই কারণেই ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অন্যান্য সভ্যদেশীয়া মহিলা অপেক্ষা উন্নতি সম্বন্ধে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন।

মঙ্গলময় জগদীশ্বর স্ত্রীজাতিতে যাবদীয় স্নিগ্ধ ও কমনীয় গুণ নিয়ে বিধান করিয়াছেন, এবং পুরুষদিগকে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠোর গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা নরনারী জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নতি সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। যদ্যপি কোন পরিবারে শুদ্ধ পুরুষ থাকেন, তথায় যে সৎকার্য্যই করা হউক না কেন, যে জ্ঞানালোচনাই করা হউক না সকলই ন্যায়পরায়ণতা, কঠোর যুক্তি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পরিবারটির সর্ব্বত্রই প্রায় অনেকটা কঠোরতা দৃষ্ট হয়। আর যদি কোন পরিবারে শুদ্ধ স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহারা হয়ত সকল বিষয়ই দয়া, বিশ্বাস ইত্যাদি কোমল গুণ দ্বারা সম্পাদিত করিয়া থাকেন।

তদ্দ্বারা এই রূপই হইতে পারে, হয় সাংসারিক সকল বিষয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে, নয় পুরুষোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয় অনেকটা কঠিন ও উদ্ধত হইয়া পড়িবে, কিন্তু যে পরিবারে স্ত্রীপুরুষ একত্রে বাস করেন, যে উন্নতির কার্য্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হস্ত থাকে, সেই পরিবারের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত ও সেই উন্নতির কার্য্য প্রকৃত উন্নতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয়া স্ত্রীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ এই উভয় জাতির

পরস্পরের সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্ত্রীদিগের নিমিত্তই পুরুষেরা সম্যকরূপে উন্নতির পথে উত্থিত হইতে পারিতেছেন না।

দয়াময় জগদীশ্বর উন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া পুরুষজাতি স্ত্রীদিগকে আপনাদিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না বিমুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানে ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে না। পুরুষজাতি আপনাদের ভগ্নীদিগের প্রতি যতদিন পর্য্যন্ত না পবিত্র ভাবে দৃষ্টি ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারিবেন, প্রায় স্ত্রীলোকেরাও ভ্রাতাদিগের নিকট সম্মাননার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন জাতি সম্যকরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাশিক্ষা উন্নতির একটি প্রধান সোপান, যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় না।

স্বাধীনতা উন্নতি লাভের আর একটি প্রধান উপায়, ইহা না থাকিলে মানব জীবনই বৃথা! দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশীয় স্ত্রীদিগের এইটি নাই, ইহা পুনরায় লাভ করিতে ও ইহার সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতে প্রথমতঃ অন্যান্য প্রকার উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক করে। ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে অন্তঃপুরে নিবদ্ধা থাকাতে ও জড়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আসাতে তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ভাব অত্যন্ত প্রবল, এই জন্য তাঁহারা আপনার বিবেচনায় কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না, অতএব অধিক পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, ধর্ম্মোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি ও মানসিক স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যক করে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ শ্রীসৌদামিনী খাস্তগিরি।

## স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা

### বামাগণের রচনা

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এ বিশ্বরাজ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পুরুষ জাতিকে যেমন বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ প্রদান করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার উদার করুণা নিঃস্বার্থ ভাবে সকলকেই পালন করিতেছে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই স্বাধীন প্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার একের স্বাধীনতার উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব করা ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত। আমাদের দেশে পুরুষদের যেমন স্বাধীনতা; স্ত্রীলোকেদের আবার তেমনই অধীনতা। সত্য বটে এক পরিবারে থাকিতে হইলে সকলকেই সকলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, কারণ এক পরিবারে যদি প্রত্যেকে

স্বাধীন হইতে যায় তাহা হইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, এজন্য এস্থলে অধীনতা স্বীকার না করা অন্যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অধীনতার বিঘ্ন সহ্য করা বড় কষ্টকর। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কি ভাল, কি মন্দ, কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতার কি সুখ ইহা একেবারেই তাহারা অজ্ঞাত; নাই বিদ্যার বল, নাই ধর্ম্ম বল, কেবল অন্ধের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের জীবন কাটাইতেছে।

সংপ্রতি বামাকুল হিতৈষী মহোদয়গণ দুর্ভাগিনী বামাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য অশেষবিধ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এই মহৎ কার্য্যটী সংসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া কখন সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাদিগকে বাহিরের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে, স্ত্রীগণের মনের মলিনতা ভ্রম কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হইবে। বামাহিতৈষী মহোদয়গণ বামাগণকে যতদিন পর্য্যন্ত সুশিক্ষিতা করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই মহৎকার্য্য সংসাধনে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বামাগণ যে অবস্থায় আছেন, ইহাতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ অশিক্ষার প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে পরিণতও হইবে। এখানকার স্ত্রীগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাশিক্ষার অভাবে, সৎসঙ্গের অভাবে প্রায় প্রত্যেকের হৃদয় অতি নিকৃষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা ভিন্ন তাহাদের অবস্থা উত্তম হওয়ার অন্য উপায় নাই।

শ্রাবণ ১২৭৯

প্রসন্নতারা গুপ্তা।*
ভাটপাড়া।

# গার্হস্থ্য দর্পণ

## পতিসেবা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্মাবধি প্রায় যাহাদিগের কাহার সঙ্গে কাহার কোন সম্পর্ক নাই; এমন এক স্ত্রী ও এক পুরুষের একত্র বিবাহ হয় এবং তাহাদিগের উভয়কে এক হইয়া যাবজ্জীবন থাকিতে হয়। বিবাহ দ্বারা উভয়ের একত্র যে বন্ধনটী সম্পাদিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে উভয়ে এক হৃদয় হইয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখী হইবে। এই একত্র বন্ধনের রজ্জু মনের মিল অর্থাৎ এই ঐক্যের আদিকারণ প্রেম। অন্যান্য প্রীতি, স্নেহ বা সৌহার্দ্দ্য এই প্রেমের ছায়া মাত্র। এই প্রেম যে সংসারে নাই সেই সংসারের কখন শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কথিত আছে, "যেখানে ঐক্য, সেখানে লক্ষ্মী" কিন্তু "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা" সদৃশী অর্থাৎ স্বামীর যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ স্বভাববিশিষ্টা স্ত্রী পাওয়া কঠিন।

* প্রস্তাবটী সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছে। স

যাহা হউক স্বভাবতঃ যাহা দুর্লভ চেষ্টাদ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে সুলভ হইতে পারে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য কীসে হয়? এখন সেইটী আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

দুইটি বিষম পদার্থের মধ্যে একটির বৈষম্য খণ্ডন না করিলে উভয়ের সমতা হয় না, অতএব পতি ও পত্নী এই উভয়ের যদি মনের মিল না থাকে, তবে একজনের মন হইতে বৈষম্য দূর না করিলে সমতা হওয়া অসাধ্য। তবে কাহার মন হইতে বৈষম্য দূর করা যায়? ইহার উত্তর সহজ, মন্দকে ভাল করিয়া ভালর সহিত সমান করা উচিত, ভালকে মন্দ করিয়া মন্দের সহিত, সমান করা কদাচ উচিত নহে, মন্দ কি এবং ভাল কি তাহাও সহজে জানা যাইতে পারে। কিন্তু এমন গৃহিণী বা এমন পতি কোথায়, যে আপনার মনের দোষ স্বীকার করেন এবং তাহা ত্যাগ করিয়া অপরের মনের সহিত সমতা করেন? এরূপ বিষম সমস্যা পুরাণের উপায় একমাত্র, পক্ষপাতশূন্য আত্মপরীক্ষা; তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, ইতিপূর্ব্বেও এ বিয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহা হউক জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণার কৌশল, বিরুদ্ধ প্রকৃতির স্ত্রী আর পুরুষ বহুকাল একত্র সহবাস করিতে করিতে তাহাদের স্বভাবের বৈষম্য ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হয়। পরে সময়ের গুণে যেমন মাটীও প্রস্তর হয়, প্রস্তরও মাটী হয়, তেমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উভয়ের মনও সহবাস বশতঃ সমভাবাপন্ন হয়। তবে অমিলের কারণ কি? স্বামী কিছু বিদ্যাভিমানী, নারী অশিক্ষিতা, এমন কারণবশতঃ যে অনৈক্য, তাহা একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই দূরীকৃত হইতে পারে, কেন না স্বামী বিবেচনা করুন, যে অশিক্ষিতা নারীকে শিক্ষিতা করা, বা তাহার মনে জ্ঞান ও নীতির বীজরোপণ করা তাঁহার নিজেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা না করিলে তাহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপরেই দোষ পড়ে।

অমিলের আর একটি কারণ এই স্বামীর যেমন অবস্থা হউক না, প্রায় স্ত্রীমাত্রেরই, আকাঙ্ক্ষা যে অনেক অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়া ও অতি সুচিক্কণ বসন পরিধান করিয়া রূপবতীদিগের মধ্যে গণনীয়া হইব। যদিও অবস্থাবিশেষে এমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে; তথাপি সকল নারীরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে "নারীরূপং পতিব্রতা" অর্থাৎ পতিব্রতাই নারীর রূপ। একথাটি কবির মুখে আসিল বা ছন্দে মিলিল বলিয়া অথবা নারীদিগের ভুলাইবার জন্য লিখিত হয় নাই; এ কথাটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, নারীর সতীর ধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার রূপের হানি হয়। যে নারীর লজ্জা নাই, ধর্ম্ম নাই, তাহার শ্রী বা কান্তি কদাচ থাকিতে পারে না। মানুষের মনের ভার তাহার মুখ ও নয়নের ভঙ্গী বা কথার স্বরদ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং শরীরের স্বাভাবিক কদর্য্যতা অপেক্ষা মনের পাপজনিত শ্রীহীনতা অধিক ঘৃণাজনক। অতএব পতি পত্নীকে যেমন অবস্থায় রাখিতে পারেন, বা যেমন অবস্থায় রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, পতিব্রতা নারীরও কর্ত্তব্য যে সেই অবস্থাতেই তিনি প্রফুল্লিতচিত্তা হইয়া পতিসেবা করেন। "নারীণাং ভূষণ পতিঃ" পতিই নারীর ভূষণ, অতএব অবস্থাবশতঃ যদি সামান্য ভূষণ না পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান ভার্য্যাঞ্চ বিভব ক্ষয়ে" অর্থাৎ কার্য্যে প্রেরণ দ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা হয়, এবং নারীর পতিপরায়ণতা পরীক্ষার সুযোগ পতির দরিদ্রাবস্থা। পতিসেবা বা পতিপরায়ণতাকে আজিকার সভ্যাভিমানীগণ অসভ্যতা বা কুসংস্কার বলিতে পারেন এবং হিন্দুসমাজে "পতিরেকো গুরুস্ত্রীণাং" বলিয়া সেরূপ ভাব আছে তাহা ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু সেবার অর্থ কাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কল্যাণকর কার্য্য করা, পতির প্রতি সেরূপ

করাতে স্ত্রীর গৌরবই প্রকাশ পায়।

অমিলের আর একটী কারণ এই যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অনেক বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মতের ঐক্য না হইতে পারে, এমন স্থলে কি উচিত তাহা না জানিয়া মনের অনৈক্য হয়। অতএব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে ন্যায় এবং অন্যায় বিবেচনার স্থলে ন্যায়ের পক্ষে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সুবিধা ও অসুবিধা, লোকাচার ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে মান, অপমান, লাভক্ষতি ইত্যাদির দায় স্বামীর, সে স্থলে স্বামীরই কর্ত্তব্য মীমাংসা করা; এবং তাহাতে বশীভূত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য, শাসনের অধীনের থাকা সকলের পক্ষেই ঐশিক নিয়ম। সমাজ সম্বন্ধে যেমন রাজার শাসন, পরিবার সম্বন্ধে তেমনি পতির শাসন। রাজার অধীনতা স্বীকার না করা যেমন অন্যায়, পতির শাসনের অধীন না হওয়ায় তেমনি অন্যায়, রাজনীতি যেমন রাজকার্য্যের উপর শাসন, ধর্ম্মনীতি তেমনি গৃহকার্য্যের উপর শাসন। অতএব পতি যদি সেই নীতি অনুসারে শাসন করেন তাহাতে পত্নীর অধীনতা স্বীকার না করা অধর্ম্মাচরণ, অথবা যে সকল বিষয়ে পতি দায়ী, সে সকল বিষয়ে তাহার মতই গ্রাহ্য করা যুক্তিসিদ্ধ, সুশাসিতা স্ত্রী সংসারের সুখবর্দ্ধিনী। কিছু স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক লোকের মনে অনেক প্রকার সংস্কার ও ভ্রম আছে, অতএব এ বিষয়ে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যথেচ্ছাগমন, যথেচ্ছাচার কার্য্য, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারের নাম যদি স্বাধীনতা হয় তবে সে স্বাধীনতা দেশান্তরিত হউক, কিন্তু সে স্থলে স্ত্রীলোকের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা আছে, সেখানে স্বাধীনতার অভাব নাই। নীতি, যুক্তি ও সকল ধর্ম্মের অনুশাসন এই, যে পত্নী পতির অধীনে থাকিবেন।

যাহা হউক, কোন কোন স্থলে এদেশীয় রীতি ও শাস্ত্রদ্বারা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার যে হানি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। শাস্ত্রে নারীকে বিশ্বাস করিতে একেবারে বারণ, যথা "যোষিতাং নাবমন্যেত নশ্চাসং বিশ্বসেদ্বুধঃ। ন চৈবের্ষুর্ভবেত্তেষু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥" স্ত্রীলোকদিকে অবজ্ঞা করিবে না, বিশ্বাসও করিবে না, তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করিবে না এবং তাহাদিগের অধিকৃতও হইবে না, অর্থাৎ তাহাদিগের অধীন হইবে না, স্ত্রীলোক অধীনে থাকিবে বলিয়া অবজ্ঞা করা বা তাহাদের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে, এ উত্তম কথা, কিন্তু তাহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এ কথার তাৎপর্য কি? বোধহয় পূর্ব্বকালে অনেক স্থলে এরূপ শাসনের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু প্রকৃতাবস্থায় স্ত্রীলোককে এরূপ অবিশ্বাস করা কদাচ উচিত নহে। কারণাভাবে কাহাকেও বিশ্বাস করা যেমন দোষ, অবিশ্বাস করাও তেমনি দোষ। যাহার উপর বিশ্বাস নাই, তাহার সহবাসে থাকাও উচিত নহে, এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাহাকে অবিশ্বাস করিলে সেও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া যায় এবং অনর্থ ঘটিয়া উঠে; অতএব অবিশ্বাসের নিশ্চয় কারণ না থাকিলে অবিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবিশ্বাসের কারণ সেকালের পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, "ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গর সমঃ পুমান্" অর্থাৎ অগ্নির নিকট ঘৃত লইয়া গেলেই যেমন গলিয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীলোক অপর পুরুষের নিকট যাইলেই ধর্ম্মনষ্টা হইবার আশঙ্কা হয়। বাস্তবিক এদেশের স্ত্রী এবং পুরুষদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে একথা অসঙ্গত নহে এবং ব্যভিচার দোষ যেরূপ নিন্দনীয় তাহাতে সাবধানের ঘরে বিনাশ নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ শিক্ষা বিধেয় নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থে

স্বন্যমিকেতনে। ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রমাত্য বিবর্জ্জিতাং," লোকযাত্রার উপলক্ষে মহোৎসবে, তীর্থে এবং অন্য লোকের বাটীতে পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে না দিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীকে একাকিনী পাঠাইবে না। যাহা হউক ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যতদূর সাবধান হওয়া যাইতে পারে, ততদূর সাবধান হইবে, কিন্তু সাবধানতা ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু যাহার উপর বিশ্বাস নাই, তাহার সহিত সহবাস করা অসম্ভব, সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস জন্মিলে প্রেমের বিচ্ছেদ হয় এবং নানা দোষ ঘটে। অতএব ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনাদ্বারাই নারীরা যাহাতে অবিশ্বাসের পাত্র না হইতে পারে এমন যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ক্রমশঃ; দ্র. জ্যৈষ্ঠ ১২৮২)

আশ্বিন ১২৭৯

# এদেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার

বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা এদেশের অশেষ উপকার হইয়াছে এবং সভ্যতার ফললাভে সকলেই কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু কৃতবিদ্য যুবকেরা এক বিষয়ে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীর নিকটে শান্তি পান না, তাঁহাদের সংসার কষ্ট যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। ভদ্র বংশীয় যুবকেরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অনেক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইলেন, এবং অতি উচ্চ সত্য ও উন্নত ভাব সকল বহু আয়াসে উপার্জ্জন করিলেন, পরীক্ষাতে উপাধি পাইয়া, ধনসঞ্চয়ের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্রমে দশ টাকা ঘরে আনিতে লাগিলেন, উপার্জ্জিত ধন দ্বারা স্ত্রী পুত্র পরিবারের অভাব মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন—কিছুরই অভাব রহিল না। গাড়ি, ঘোড়া, চাকর, দ্বারবান, ধন, ধান্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, পারিষদ, বন্ধু, লোকের নিকটে মান সম্ভ্রম সকলই প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইল। সুবিদ্বান ও সুযোগ্য যুবকের মনে হইল যে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু হায়! অনতিবিলম্বে সে সুখ স্বপ্ন ফুরাইল। সুন্দর গোলাপেও কাঁটা আছে, এত সুখ সম্পদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীই জীবনের কণ্টক হইলেন। স্ত্রীর যতই বয়স হইতে লাগিল, যতই তিনি সংসারী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অসন্তোষ ও অশান্তি বাড়িতে লাগিল। স্বামী কষ্ট করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার আনিয়া দেয়, কিন্তু কিছুতেই ভার্য্যা পরিতুষ্ট হন না। ক্রমে মনের অনৈক্য কলহ বিবাদে পরিণত হইল। সন্তানাদি হইলে যেমন এক দিকে পিতা মাতার সুখ বৃদ্ধি হয়, তেমনি আবার তাঁহাদের মধ্যে বিবাদের অগ্নি ভয়ানকরূপে জ্বলিয়া উঠে। কত কত সুশিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে স্ত্রী কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে উৎপীড়িত হইয়া কষ্ট যন্ত্রণায় জীবন যাপন করেন। এমন কি কেহ কেহ পরিবারের সুখ কি তাহা এ জীবনে বুঝিতে পারেন না। এরূপ হইবার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যেখানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত অনৈক্য ও বিভিন্নতা, সেস্থানে এইরূপ বিবাদ ও অসুখ আশ্চর্য্য নহে। স্বামীর মন জ্ঞানগিরির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, স্ত্রীর মন ভ্রম ও বাল্য সংস্কারের ভূমিতে হামাগুড়ি দিতেছে। স্বামী

সেকস্‌পিয়ার ও মিলটনের ভক্ত এবং তাহাদেরই পুস্তক পাঠ করিতে তাঁহার সর্ব্বদা অভিরুচি। স্ত্রী লেখাপড়ার নাম শুনিলে খড়্গহস্ত হয় এবং পুস্তককে বিষজ্ঞান করেন। স্বামী রাজনীতি, বিজ্ঞান, বিলাতের ও ভারতবর্ষের দৈনিক ঘটনা এবম্প্রকার বিষয়ে কথোপকথন করিতে চান। স্ত্রী পাড়ার লোকে কি কি তরকারি খান, কিরূপ বেশ পরেন এই সকল কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। স্বামী প্রায় সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, স্ত্রী সংসারের কিছু কিছু কার্য্য সারিয়া আহারের পর প্রায় নিদ্রা দেবীর দোহাই দেন। স্বামীর লক্ষ্য ও আশা এই, কিসে বিদ্বান হইব, উচ্চ পদ পাইব ও কিয়ৎ পরিমাণে দেশের উপকার করিব। স্ত্রীর জীবনের উদ্দেশ্য এই স্বামীকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া রাখিব এবং বহু মূল্য বেশ বিন্যাস করিয়া ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নারী সমাজে গৌরব লাভ করিব। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। দুই জনের লক্ষ্য আশা সংস্কার রুচি কার্য্যে এবং প্রকৃতি এত বিভিন্ন যে তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ প্রণয় ও সন্তোষকর যোগ কিরূপে হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বরং বোধ হয় যে এ অবস্থায় তাঁহাদের সুখ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার। সকল স্ত্রী যে এইরূপ ও স্বামী অপেক্ষা এত নিকৃষ্ট তাহা নহে। এমন এমন স্ত্রীর কথা আমরা শুনিয়াছি যাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামী অপেক্ষা সমধিক গুণে বিশুদ্ধ, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আজ কাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন এবং কোন২ বিষয়ে উন্নত ভাবেরও পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না বরং ইহাতে দেশের ক্রমোন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। আমরা উপরে স্ত্রীলোকদিগের বিপক্ষে যাহা বলিয়াছি তাহা সাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এদেশের সাধারণ নারী-মণ্ডলীর ছবি উপরে চিত্রিত হইয়াছে; ইহা যে যথার্থ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন।

এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? হয় স্ত্রী উন্নত হইয়া স্বামীর কাছে আসুন, নয় স্বামী উন্নত ভূমি হইতে নামিয়া স্ত্রীর নিকটে গমন করুন। অনুন্নতি ও পতন কখনই প্রার্থনীয় নহে, সুতরাং আমরা স্ত্রীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা একটু অগ্রসর হউন। কেবল একটু লেখাপড়া শিখিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কিম্বা ইংরাজি পুস্তকের দুই পাতা পড়িলেই যে স্বামীর সঙ্গে মিল হইবে, এরূপ সম্ভব নহে। বিদ্যার অল্প জলে ফর্ ফর্ করা বরং আরও অধিক বিপদ ও যন্ত্রণার কারণ। স্ত্রীরা খুব ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখুন ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, অল্প শিক্ষায় গর্ব্বিত না হইয়া বিনীত মনে তাঁহারা যেন উত্তরোত্তর গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেন। পুস্তকের জ্ঞান ব্যতীত আরও কিছু চাই। হৃদয়ের প্রশস্ততা ভিন্ন স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন সম্ভব নহে। এ দেশের মহিলাগণ আর যেন খাওয়া পরাতে দৃষ্টিকে বদ্ধ না রাখেন এবং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারকে সর্বস্ব মনে না করেন। কাপড়ের পাড় ভাল হইল না, আধ ডজন সাবান না হইয়া কেবল ৪খানি ক্রয় করা হইয়াছে, কিম্বা অমুকের স্ত্রীর ন্যায় ঠিক চিক হার প্রস্তুত হয় নাই, কিম্বা বিদেশ হইতে স্বামীর প্রত্যাগমনে দিন দুই বিলম্ব হইয়াছে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ভাবিয়া স্ত্রীরা যদি মুখ ভার করেন এবং যেন সর্ব্বনাশ হইল এই রূপ মনে করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে স্বামীর নিস্তার নাই। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মৃতপ্রায় শরীর লইয়া স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাঁহার ভার্য্যা যদি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং রক্তবর্ণ চক্ষে তাকাইয়া কটূক্তি বাণ বর্ষণ করেন, তাহা হইলে

স্বামীর মনে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে কেবল হয়ত দুই ঘণ্টা অনেকের স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন হয়। এই অল্প সময় যদি কেবল দুর্ব্বাক্য ভর্ৎসনা ও সংসারের নিকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা এবং পরদ্বেশ ও পরনিন্দা শুনিতে হয় এবং একটীও ভাল বিষয়ের আলাপ না হয় তাহা হইলে স্বামীর মন যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। স্বামী সাধ্যানুসারে যাহা করেন, তজ্জন্য স্ত্রীর বিশেষ কৃতজ্ঞ ভাবও দেখা যায় না। এ সকল কষ্ট প্রায় সকল স্বামীরই অল্পাধিক সহ্য করিতে হয়। এ অবস্থায় আমরা স্ত্রীদিগের নিকট সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন স্বাভাবিক কোমলতা পরবশ হইয়া স্বামীর প্রতি সৎ ব্যবহার করেন এবং উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সহানুভূতি ও সাহায্য বিধান করেন। দোষ দেখিলেও তাঁহারা যেন অসহিষ্ণু বা ক্রোধান্ধ না হন। শান্তচিত্ত হইয়া যেন এই দোষ সংশোধন করেন। জীবন পথে স্ত্রী স্বামীর পরম বন্ধু, দুঃখ বিপদ ও পরীক্ষার সময়ে তিনি তাঁহার পরম সহায়। ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে কোমল প্রকৃতি দিয়াছেন এই জন্য যে তাঁহারা কোমল ও মধুর ব্যবহারে স্বামীদিগকে সুখী করিয়া পরিবারের কুশল বৃদ্ধি করিবেন এবং জন সমাজে পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও প্রেম বিস্তার করিবেন। ঈশ্বরের এই মঙ্গল অভিপ্রায় বঙ্গদেশীয় মহিলারা সুসম্পন্ন করেন, এই আমাদের ইচ্ছা ও প্রার্থনা।

বৈশাখ ১২৮০

## আদর্শ সতী স্ত্রী

সতী স্ত্রী সম্পর্কে এদেশে একটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রমমূলক সংস্কার রহিয়াছে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও ইহার আধিপত্য দেখা যাইতেছে। এদেশে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই সংস্কার এই, যিনি আপনার স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ মাত্রকেই পিতা সহোদর কিম্বা সন্তানের ন্যায় নির্ম্মল চক্ষে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ সতী। যদিও ইহা সতী-জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ, এবং ইহা ভিন্ন সতীত্ব অসম্ভব, কিন্তু কেবল ইহা দ্বারাই কেহ প্রকৃত রূপে সতী হইতে পারে না। মনে কর কোন স্ত্রী পর পুরুষকে কখন অপবিত্র চক্ষে দেখেন না, কিন্তু স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে প্রতিদিন তাঁহার অন্তরের ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, এবং অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এক এক সময় তিনি স্বামীর নিকটে এরূপ জঘন্য ভাব এবং হীনতা প্রকাশ করেন, যে নিতান্ত দুশ্চরিত্রা রমণী এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ থাকে না। পাঠিকাগণ! এরূপ স্ত্রীলোককে কি তোমরা সতী বলিয়া স্বীকার করিতে পার? অথবা মনে কর কোন পতিপ্রাণা নারী, স্বামীর জন্য আপনার প্রাণ দান করিতে পারেন এবং স্বামীর সুখের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া এমন কি ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহাতেই কি তিনি সেই স্বর্গীয় উপাধি, সতী নামের উপযুক্ত? এই ভারতবর্ষেই পুরাকালে অনেক স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই

ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের অনেকের হৃদয় ঈশ্বরবিহীন এবং নিতান্ত মলিন ও জঘন্য ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাদৃশ স্ত্রীলোকেরাও ভারতবাসী এবং ভারতবাসিনীদিগের দ্বারা সতী বলিয়া অভিহিতা হইত। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা এরূপ স্ত্রীলোককে আর সতী বলিয়া গ্রহণ করি না। এই বিষয়ে আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে। যে চক্ষে আমরা কোন পুরুষকে সাধু অথবা সৎ বলিয়া নির্ব্বাচন করি, সেই দৃষ্টিতেই কোন স্ত্রী আমাদের নিকট সাধ্বী কিম্বা সতী বলিয়া গৃহীতা হন। সাধু কে? এবং সাধুর লক্ষণ কি? যাঁহারা ইহার উপযুক্ত উত্তর জানেন, সতী কে? এবং সতীর লক্ষণ কি? তাহাও তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। আমাদের কোন কোন সুশিক্ষাভিমানী ভ্রাতা ভগিনী হয়ত বলিবেন, যে সকল পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য দেহ, মন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই সাধু এবং যে সমস্ত নারী চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান এবং সভ্যতা প্রচার করিয়া সমুদয় স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধনে বিব্রত, তাঁহারাই বাস্তবিক সাধ্বী নামের উপযুক্ত। আমরা এরূপ নর ও নারীগণকে যথাযোগ্য সম্মান দান করি, কিন্তু কেবল এই গুণে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সাধু বা সাধ্বী বলিতে পারি না। ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় এরূপ কতকগুলি মানবহিতৈষী পুরুষ এবং মানব হিতৈষিণী স্ত্রীলোকের বিষয় আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে তাঁহাদের সাধুতা এবং সতীত্ব চঞ্চল বালুভূমির উপর সংস্থাপিত। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই আত্মা ঈশ্বর শূন্য, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। আমাদের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন সতীত্ব কিম্বা সাধুতা অসম্ভব। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং জীবন দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করেন, সে পরিমাণে, তিনি সৎ এবং সাধু, অথবা সতী এবং সাধ্বী। প্রেমময় ঈশ্বর তাঁহার কন্যাদিগকে কোমল প্রকৃতি দান করিয়া পুরুষ জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতার প্রতি পুণ্যবতী ভগ্নীদিগের ভক্তি, প্রেম, এবং কৃতজ্ঞতা দেখিয়া, পুরুষদিগের হৃদয় সহজেই ঈশ্বরের পুণ্যালয়ে আকৃষ্ট হয়, ইহাতেই নারী প্রকৃতির যথার্থ গৌরব। ইহাতেই ভগ্নীদিগের প্রকৃত সতীত্ব। যতই তাঁহারা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া জগতের ভাই ভগিনীদিগকে সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ সিংহাসনতলে আকর্ষণ করেন, ততই তাঁহাদের আত্মা পুণ্য প্রভায় সমুজ্জ্বলিত হয়। অন্যথা, যে সমুদয় স্ত্রীলোকের হৃদয় নাস্তিক, অথবা যাঁহারা ঈশ্বর আছেন—মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু হৃদয়কে তাঁহার আজ্ঞাধীন করিবার জন্য কোন মতেই প্রস্তুত নহেন, সে সমুদয় কঠোর প্রকৃতি, ঈশ্বরবিহীন স্ত্রীলোক যদি আপাততঃ আপনাদিগকে সচরিত্র দেখাইয়া সহস্র প্রকারে পৃথিবীর উপকার করেন, তথাপি তাঁহারা সতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না কেননা সতীর একটি প্রধান গুণ এই যে তাঁহার কাছে বসিলেই পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরেয় সঙ্গে সম্মিলন হয়, এবং নিতান্ত পাষণ্ড এবং জঘন্য চিত্ত হইতেও ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতা এবং কঠোরতা বিদূরিত হয়। সতীর আত্মা হইতে অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের মহিমা, জ্ঞান, দয়া এবং পবিত্রতা নিঃসারিত হইতেছে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তিনি তিলার্দ্ধ বাঁচিতে পারেন না, সর্ব্বদাই ভক্তি, প্রেম এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ঘোর পাপিষ্ঠ কিম্বা কোন পাপীয়সীর সাধ্য কি, সতীর অন্তরের পুণ্যাগ্নি নির্ব্বাণ করে? তাঁহার চক্ষুর মধুময় নির্ম্মল কটাক্ষে মহাপাপীর অন্তরেও ধর্ম্মরাজ জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি [illegible] ভয়ের সঞ্চার হয়। সতীকে যেমন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ

যিনি সতীর সন্নিধানে বাস করেন, তাঁহাকেও অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য কোন দুরন্ত রিপু আক্রমণ করিতে পারে না। কথিত আছে, পুরাতন ভারতবর্ষের আদর্শ সতী সাবিত্রী এতদূর তেজস্বিনী ছিলেন, যে যমদূত তাহার ক্রোড়স্থ সত্যবানকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। অর্থাৎ সতীর এতদূর ক্ষমতা যে যদি কেহ তাহার শরণাপন্ন হয়, মৃত্যুও তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা ঊনবিংশতি শতাব্দীর জ্ঞান ও ধর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্রও আলোকিত, তাঁহারা অবশ্যই গুণবতী সাবিত্রীর সেই অলৌকিক শক্তি, অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু সূক্ষ্ম রূপে যাঁহারা নারী প্রকৃতির গূঢ়তম এবং উচ্চতম অধিকার সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে প্রকৃত সতী স্ত্রী, যথার্থই ঈশ্বর হইতে মৃত সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করেন। মলিন হৃদয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রীলোকেরা আপন আপন স্বামী এবং সন্তানদিগকে পাপ এবং মৃত্যুপথে অগ্রসর করে; কিন্তু পবিত্র হৃদয়, ঈশ্বর পরায়ণা সাধ্বী সতীরা, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই পরিত্রাণ এবং অমৃতত্বের দিকে লইয়া গিয়া, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করেন। এইরূপ সতী স্ত্রী ভিন্ন কোন জাতির কল্যাণ নাই। যদি গভীর পাপপঙ্ক এবং বর্ত্তমান নিতান্ত হীনাবস্থা হইতে কদাচ এই ভারতবর্ষ উদ্ধার হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে এই ঈশ্বরমূলক সাধুতা এবং সতীত্বের প্রয়োজন। হে বামাহিতৈষী এবং বামাহিতৈষিণী অবলা বান্ধবগণ! অতি কাতরে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর ঈশ্বর শূন্য জ্ঞান, সভ্যতা, দয়া এবং সদনুষ্ঠান লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, যাহাতে ভারতমহিলারা ভক্তিমতী, এবং পবিত্র-হৃদয় হইয়া কোমল প্রকৃতি নারী জাতির উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন, এবং প্রত্যেকেই প্রকৃত সতীত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসাদ সম্ভোগ করিতে পারেন, একবার সেই জন্য ব্যাকুলিত হউন। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হইবেন।

শ্রাবণ ১২৮০

## সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম

শাস্ত্রে কহে পাতিব্রত্যই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরাও আজীবন সকলের নিকট এই ধর্ম্মই শিক্ষা পায়। ইহা নারীর রূপ, ভূষণ এবং অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু ইহাই যে তাহার সকল ধর্ম্ম এবং ইহা ছাড়া যে আর ধর্ম্ম নাই এরূপ কথা কখন বলা যাইতে পারে না। এ দেশীয় সাধারণ জনগণের যেরূপ মত, তাহাতে কোন স্ত্রীলোক পতিব্রতা হইলে, তাহার কোন দোষই প্রায় ধর্ত্তব্য হয় না। নারীগণও এরূপ শিক্ষা পাইয়া এবং এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই সংস্কারানুসারে নারীগণ সকল দোষকে উপেক্ষা করে, এবং পাতিব্রত্য ব্যতীত অন্য কোন গুণার্জ্জনে তত যত্নশীলা হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া হিন্দুরমণীগণ স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, স্বামীর সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাহা গ্রাহ্য করে না। যে ব্রতে স্বামীর পূজা আদিষ্ট আছে, সেই ব্রতই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করে,

এবং সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সম্পূর্ণ দাসী হইয়া, মনুষ্য পূজার এক শেষ প্রকাশ করিতে থাকে।

এক দিকে ভার্য্যা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া যেমন স্বামীর নিতান্ত আনুগত্য প্রকাশ করে, স্বামীও তেমনি আপনাকে ভার্য্যার সম্পূর্ণ প্রভু জানিয়া তাহার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে, স্ত্রীকে স্বামী যত অবজ্ঞা করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্য্যাকে অবশ্য শুনিতে ও মানিতে হইবে। স্ত্রী জাতি এমন অজ্ঞ, এজন্য আমরা স্বীকার করি, স্বামীর আদেশানুযায়ী তাহাদিগের কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও সতী নারীর কথা শুনিবেন না, পত্নী তাঁহার অসৎ পরামর্শের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, স্বামীর মনে এতদূর প্রভুত্বের ভাব থাকা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রভুত্বের ভাব এত দূর প্রবল, যে গৃহে প্রবেশ মাত্র মনে সেই ভাবজনিত দম্ভ উপস্থিত হয়। তখন বোধ হয় তিনি যেন একটী বিশাল রাজ্যের রাজা, অমনি তাহার মেজাজ রুক্ষ্ম হইল, ভাঙ্গা কর্কশ স্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার বাহিরের ভাব গৃহে আসিয়া সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্ত্রীর প্রতি স্বামী হাজার নিষ্ঠুরাচরণ করুন, কেহ তত দূষিবে না, কিন্তু সাধু ব্যবহার করিলে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করিবে। পরস্পরের এইরূপ মনের ভাব যে কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা অনেকে জানেন না। জানিলেও পুরুষ জাতি প্রভুত্ব ছাড়িতে রাজি নহে। যাহার কোন খানে প্রভুত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রভু হইয়া মনের ইচ্ছা পরিতুষ্ট করেন, মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। এমন বিনা মূল্যের একাধিপত্য কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে? পূর্ব্বে দশ ভার্য্যার স্বামী হইয়া লোকে যে প্রভুত্ব করিত, এখন এক জনের উপর সেই প্রভুত্বের ভার নিপতিত হইয়াছে। স্ত্রীর এক সুখ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। সতীনের যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়া তাহার দাসীত্বের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের দূষিত সমাজের এরূপ ব্যবস্থা, যে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ সুখের আশা নাই। একটী আপদ হইতে নিস্তার পাও, অন্যদিক হইতে আর একটী আপদ প্রবল হইয়া উঠিবে।

লোকে বলে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহারা স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। তাহারা বাহিরে কিছু দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমরা যত দুর্ব্বলা বলি, তাহারা যে স্বভাবতঃ তত দুর্ব্বলা নয়, বলা বাহুল্য মাত্র। অনেক পরিমাণে আমরা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছি, অভ্যাস ও অজ্ঞতা তাহাদিগকে দুর্ব্বলা করিয়াছে, দেশের আচার ব্যবহার তাহাদিগকে দুর্ব্বলা ও অবৈধ পরিমাণে পরাধীন করিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রী জাতি যেরূপ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের উপর তাহাদের নির্ভর করা সমুচিত বটে। কিন্তু তাহা হইলেই কি পশ্বাদির ন্যায় তাহাদিগকে আমাদিগের সেবায় নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য? আমরা কি নীচ, যে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করি, আশ্রিতের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করি! আমরা কি মনে করিয়াছি, আমাদিগের এই নীচ ভাব চিরকাল সুরক্ষিত থাকিবে? পৃথিবীতে কি সাধু ভাবের উদয় হইবে না? সংসার রূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতির উপর নিপীড়ন করিব, ইহা কোন্ ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? স্ত্রীজাতিকে আমরা অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগের বিষয় বিজ্ঞতা ও পার্থিব বিজ্ঞতা জন্মাইবার শক্তি আমরা হরণ করিয়াছি। সাংসারিক কোন কার্য্যে তাহারা একটু অসাবধান হইল, কোন অপকর্ম্ম করিল,

আমাদিগের একটী আদেশ শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আমরা খড়্গ হস্ত হই। এইরূপে আমরা তাহাদিগের উগ্রতা প্রবল করিয়া দিয়াছি, এবং কেবল সেই ভীরুতার প্রশ্রয় লইয়া থাকি। আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, বলিলে তৎক্ষণাৎ তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়, সুতরাং নিরুপায় স্ত্রীজাতি বশীভূত না থাকিয়া কি করিবে?

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহারের বিষয় আর বলা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রীজাতির জ্ঞান নেত্র যত উন্মীলিত হইতে থাকিবে, তাহারা আপনাদিগের স্বত্ব ও অধিকার আপনারাই তত বুঝিয়া লইতে পারিবে। তখন তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবে, পাতিব্রত্য ও সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে অবৈধ পরাধীনতা এবং দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা বুঝিতে পারিবে, স্বামী জাতিরাই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সহিত দাসীত্বের শিক্ষা ও বিধান দিয়াছেন। পুরুষ জাতি স্বার্থপরতানুরোধে এ শৃঙ্খল হইতে কখন স্ত্রী জাতিকে মুক্ত করিতে চাহিবে না। বরং স্ত্রীজাতি এ শৃঙ্খল ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে নিরুদ্যম করিবে, এ কথা মুখে আনিলে তাহাদিগকে নিন্দা করিবে। স্ত্রীজাতিকে বলে এবং কৌশলে এই শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হইবে। দাসী হইয়া জীবিত থাকা আর না থাকা সমান কথা।

কিন্তু আমরা একথা বলি না, যে নারীর সতী ও পতিব্রতা হওয়া উচিত বা প্রধান গুণ নয়। আমরা বলি পাতিব্রত্য হইতে দাসীত্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পতির প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহাকেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বলা উচিত। কিন্তু আমরা এই দাসীত্ব সম্বলিত পাতিব্রত্য ধর্ম্মের এরূপ শিক্ষা দিয়াছি, যেন স্ত্রীজাতির আর কোন গুণ থাকা তত আবশ্যক নহে। এই রূপ শিক্ষা নিবন্ধন, তাহাদিগের মনে একটী বিকৃত ভাব উদিত হইয়াছে। স্ত্রীর কেন সহস্র দোষ থাকুক না, সতী বলিয়া খ্যাতি থাকিলে তাহার আর গর্ব্বের সীমা থাকে না। স্বামীর সহিত বচসা কলহ হইলে তিনি অনায়াসে আস্ফালন করিয়া বলিবেন, কেন, আমি তো নষ্ট দুষ্ট নই। এই বৃথা গর্ব্বে মন এত দূর স্ফীত হইয়া থাকে, যে তিনি আর কোন গুণ উপার্জ্জনে অথবা দোষ পরিমার্জ্জনে তত যত্নশীলা হয়েন না। ব্যভিচার দোষ পরিহার করা পতিপরায়ণা স্ত্রীর যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, পতির প্রতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করাও তাহার তদ্রূপ কর্ত্তব্য। কিন্তু এ দেশে ব্যভিচার দোষ পরিবর্জ্জনের নামই সতীত্ব ধর্ম্ম। ব্যভিচার দোষ পরিবর্জ্জন ব্যতীত যে সতী স্ত্রীর অন্যান্য লক্ষণ আছে তাহা অল্প লোকেই জানেন। সাধারণ গ্রাহ্য সতীত্ব ধর্ম্ম থাকা স্ত্রীজাতির পক্ষে যেমন, অন্যান্য ধর্ম্ম থাকাও তাঁহাদিগের পক্ষে তেমনি বিধেয়। স্ত্রীজাতির জানা উচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য লঙ্ঘনেও পাপ আছে। তাহাদিগের শুধু স্বামীর সহিত সম্বন্ধ আছে এরূপ নহে। তাহাদিগেরও পিতা মাতা পুত্র কন্যা, ভাই, বন্ধু, গুরু লঘু, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও ঈশ্বর সকলই আছে। পতিকে ভক্তি ও পূজা করিলেই তাহাদিগের পূজা শেষ হইল না; সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের পূজা ও উপাসনা পুরুষদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও কর্ত্তব্য। পুত্র কন্যাকে প্রীতি করিলেই তাহাদের প্রীতির শেষ হইল না, সকল মনুষ্য ও জন সমাজ তাহাদিগের নিকট হইতে সমান প্রীতি প্রত্যাশা করে। আমাদিগের স্ত্রীজাতি কি এ সকল বিষয় কিছু ভাবেন, না কেবল পতিপূজাতে নিয়তই অনুরক্ত রহিয়াছেন? তাহারা কি জানেন, যে পতি হইতেও ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের গাঢ়তর সম্বন্ধ, তাঁহাকেই অধিকতর প্রীতি করিতে হইবে? আত্মার সদ্‌গুণ ও মনের সৎভাব ধরিয়া যেমন পুরুষকে সৎ বলা যায়, তেমনি স্ত্রীলোককেও সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা সতী বলা বিধেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ বিচারে

এদেশের অনেক সতীত্বাভিমানী স্ত্রীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণতা ভিন্ন যে অন্যান্য ধর্ম্ম পালন করাও স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতির মনে এ প্রকার জ্ঞান এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান যত দিন না আরম্ভ হইবে, তত দিন তাঁহাদের দাসীত্ব ও অধীনতা কেহ বিমোচন করিতে পারিবে না। তাঁহারা জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি করুন, তাঁহাদিগের সাহস, বল এবং কর্ত্তৃত্বও বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা না মনে করেন, পুরুষজাতি সহজে তাঁহাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল বিমোচন করিবে। মনুষ্য সমাজ যদি কখন স্বার্থ শূন্য হয়, তবে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। স্ত্রীজাতির আপনাদিগেরই চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে ক্রমে তাঁহাদিগের অন্যায় অধীনতা বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। জ্ঞান লাভ দ্বারা যত তাঁহারা আপনাদিগের অধিকার এবং পুরুষ জাতির সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন, ততই তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে পুরুষজাতির সকল শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণীয় নহে, যে হেতু সেই সমুদায় উপদেশ কখন সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা পরিশূন্য হইতে পারে না।

আশ্বিন ১২৮০

## স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন

স্বা। প্রিয়তমা মোহিনি। আইস আমরা দুই জনে এই বৃক্ষতলে বসিয়া আত্মার মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করি। দেখ স্থানটী কেমন সুরম্য ও সুন্দর। পাখীরা গাছের উপর বসিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে। আহা! সম্মুখে গোলাপ ও বেলফুল গুলি কেমন ফুটিয়াছে, উহার সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে মন আমোদিত হইতেছে। এমন উৎকৃষ্ট স্থানে ইচ্ছা হয় তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে কিয়ৎ কাল আলাপ করি।

স্ত্রী। আমারও অনেক দিন হইতে এই রূপ ইচ্ছা যে তোমার নিকটে ধর্ম্মের কথা কিছু শুনি এবং উপদেশ গ্রহণ করি। সমস্ত দিন কেবল সংসার সংসার করিয়া ব্যস্ত থাকি, ভাল কথা কিছুই শুনিতে পাই না। আমার যাহাতে সাংসারাসক্তি চলিয়া যায় এবং ঈশ্বরেতে মতি হয় এমন উপায় যদি বলিয়া দেও, আমার বড় উপকার হয়।

স্বা। তোমার এরূপ ইচ্ছা শুনিয়া কত আনন্দিত হইলাম বলিতে পারি না। অনেক বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। কিসে তোমার সাংসারিক অভাব সকল মোচন হয় ও সুখ বৃদ্ধি হয় এজন্য অনেক চেষ্টা করিলাম। ধন দিয়া বস্ত্র দিয়া অলঙ্কার দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এত করিয়া না তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম, না আমি নিজে সুখী হইলাম। আমাদের সংসারে ধর্ম্মের পবিত্র সুখও নাই, সাংসারিক সুখেও আমাদের তৃপ্তি নাই। আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ প্রণয় না হইলে আমরা কিছুতেই সুখী হইতে পারিব না।

স্ত্রী। যথার্থ প্রণয় ভিন্ন সুখ হয় না ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু আমি তো তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি ও তোমার সেবাতে প্রাণ মন সকলি সমর্পণ

করিয়াছি। তবে কেন আমি সুখী হই না?

স্বা। তুমি যে আমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ভালবাস ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। নিঃস্বার্থ ও প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা স্মরণ হইলেই আমার চক্ষু হইতে অনবরত প্রেমাশ্রুবর্ষণ হয় এবং আমি ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। যথার্থই তুমি স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় বন্ধু আমি আর কোথায় পাইব? কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি আমাকে ভালবাস ইহা হৃদয়ের ভালবাসা—আত্মার প্রণয় নহে।

স্ত্রী। আমি তো জানিতাম প্রণয় একই প্রকার। আত্মার প্রণয় আবার কি রূপ?

স্বা। ইহার মূল ধর্ম্মেতে ও ঈশ্বর প্রীতিতে। যদি আমরা ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বর প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে ভালবাসি, তাহা হইলে আমাদের প্রেম স্বর্গীয় হইবে। স্বামী স্ত্রীর প্রণয় নিঃস্বার্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা পার্থিব। ইহা এক প্রকার মায়া ও মমতা মাত্র। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ হইলে ইহা আরও মধুর ও পবিত্র হয়। দেখ আমাদের বর্ত্তমান প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোভ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি নীচ ভাব অনেক আছে। আমরা কত সময় পরস্পরেব প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হই, কতবার ভালবাসার অনুরোধে আমরা বিষয়ী হইয়া ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। ইহা কি তুমি স্বীকার কর না?

স্ত্রী। হাঁ ঠিক বলিয়াছ। প্রণয়ের দ্বারা মন পবিত্র না হইয়া অনেক সময় অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইয়াছে। তোমাকে ভালবাসিতে গিয়া আমি কৈ ঈশ্বরকে তাদৃশ প্রেম দিতে পারি না।

স্বা। আমিও ঐ কথা বলিতেছি। যথার্থ স্বর্গীয় প্রেম আমাদিগের মধ্যে থাকিলে তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মনুরাগ ও ঈশ্বর প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং মন দিন দিন নির্ম্মল হয়। পরস্পরকে যতই পবিত্র ভাবে ভালবাসিবে, ততই ঈশ্বরকে ভালবাসিবে এবং ঈশ্বরের প্রতি যত অনুরাগ বাড়িবে, ততই পরস্পরের প্রণয়ে আমরা সুখী হইব। এইরূপ স্বর্গীয় প্রেমযোগ আমাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত। এই যোগই প্রকৃত বিবাহ, বিবাহের অন্য কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। ভাবিয়া দেখ আমরা কোথায় ছিলাম, পরস্পরকে জানিতাম না, ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে একত্র করিলেন এবং উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। তিনিই প্রণয়ের সঞ্চার করিলেন এবং তিনিই এত দিন হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ করিয়া সংসার ব্রত পালনে উভয়কে পরস্পরের সহায় করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় যে এই হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগে পরিণত হয়। যাঁহার কৃপায় আমরা এক হৃদয় হইলাম, তাঁহার প্রসাদে এক আত্মা হইতে হইবে। সংসারে যেমন সম্মিলিত হইয়াছি, উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যে সেইরূপে মিলিত হইতে হইবে। অন্যান্য সংসারীরা যেমন বিবাহ করে, আমাদের সেরূপ বিবাহ অনেক দিন হইয়াছে, এখন দেবভাবে বিবাহ করিতে হইবে।

স্ত্রী। অবশ্য, দয়াময় আমাদিগকে এইজন্য একত্র করিয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে আরও ভালবাসিব এবং মিলিত হইয়া তাঁহার সেবা করিব, এজন্য নহে যে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার নিকটে অপরাধী হইব। মায়ার জন্য অথবা পাপের জন্য বিবাহ নহে, স্বর্গীয় প্রণয় ও স্বর্গীয় সুখের জন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে সেইরূপ প্রণয় ও সুখ কবে হইবে বল? তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া ইচ্ছা হইতেছে, এখনি পিতার কাছে এইরূপ উচ্চ দেব-প্রণয়ের জন্য প্রার্থনা করি। অসার সাংসারিক ভালবাসার তৃপ্তি নই। তোমাকে প্রাণ মন সকল দিয়াছি, এখন দুই জনে যথার্থ প্রেমে মিলিত হইয়া পিতার

পদসেবা ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া চিরদিন স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করি এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

স্বা। ইহা হইতে আর অধিক সুখ পৃথিবীতে কি আছে? তোমাতে আমাতে দয়াময়ের পদতলে সর্ব্বদা বাস করিলে হৃদয়ে যে কত আনন্দ হইবে, তাহা বলিতে পরি না। আহা! এই স্বর্গীয় দৃশ্য ভাবিলেও চক্ষে জল আইসে। প্রিয়তম মোহিনি! এমন দিন কবে হবে? আহা! কি সুখের দিন!

হে দয়াময়! বিনীত হৃদয়ে আমরা দুইজনে তোমার পদতলে প্রণত হইয়া কাতর অন্তরে এই মিনতি করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে পবিত্র প্রণয় যোগে বদ্ধ কর, যেন তোমার দাস দাসী হইয়া এক হৃদয়ে চিরদিন তোমার সেবা করি ও তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হই।

কার্ত্তিক ১২৮০

# আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা

"কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদতে জন্ম গেল।'

বঙ্গীয় পুরাতন গাথা

আমরা নারী জাতির যে অবস্থা ভাবিয়া দেখি, তাহাতেই আমাদিগের উদ্ধৃত গাথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়। তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়। শৈশবে তাহারা জনক জননীর বিশেষ ভাবনার কারণ, যৌবনে স্বামীর নিরতিশয় সতর্কতার বস্তু এবং বার্দ্ধক্যে সন্তানগণের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করে। এই জন্যই তাহারা সময়ে সময়ে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে—"কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদ্‌তে জন্ম গেল।" কন্যা সন্তান জন্মিলে পিতার যেরূপ ভাবনার বিষয়, এরূপ কাহারও নয়। শৈশবে কি প্রকারে তিনি তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিবেন এই ভাবনায় দিনযামিনী কাতর হয়েন, এবং এইখানেই কি তাহার ভাবনার শেষ? কন্যা বিবাহিতা হইলেও তাঁহার অশেষ ভাবনা, পাছে বিধবা হন, পাছে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্যা হয়েন, পাছে শ্বশুরালয়ে যন্ত্রণা পান এই প্রকার ভাবনায় তিনি অণুদিন আক্রান্ত থাকেন। এই জন্যই কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, কন্যা সন্তানের যত দিন না মৃত্যু হয় ততদিন জনক জননীর শান্তি লাভ নাই। শৈশবাবস্থায় যতদিন পিতৃভবনে লালন পালন হইতে থাকে, ততদিন সামান্য অনাদর ভিন্ন তাহাদিগের অন্যবিধ দুঃখের অধিক কারণ থাকে না। কিন্তু পরিণয় অবধিই তাহাদিগের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। বধূ অবস্থায় তাহাদিগের যত প্রকার যন্ত্রণার কারণ ঘটিয়া থাকে, আমরা তাহার

সমুদায় উল্লেখ করিতে না পারি, কতিপয় প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিলেই অবধারিত হইবে যে এ অবস্থায় তাহাদিগের কত সুখ! আমরা একে একে কতিপয় কারণ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। অধিকাংশ বধূর প্রধান যন্ত্রণার কারণ শ্বশ্রূ নিগ্রহ। শ্বশ্রূগণ সন্তানের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই আশা করিয়া থাকেন, বধূগণ গৃহে আসিলেই তিনি সংসারের কার্য্যভার হইতে অবসৃত হইবেন। বিবাহ কালে তিনি পুত্রকে একপ্রকার প্রতিশ্রুত করান, যে নববধূকে তিনি জননীর দাসী স্বরূপ আনিতে যাইতেছেন। কিন্তু জননী জানেন না, একজন বালিকাকে তিনি বধূ করিয়া আনিতেছেন। যে বয়সে নববধূ সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, যে বয়সে পুত্র সন্তানগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, শ্বশ্রূগণ সেই বয়সে বালিকাকে সর্ব্বগুণান্বিতা দাসী রূপে দেখিতে চান। তিনি চান নববধূর কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়, এবং আপনাকে কোন কার্য্য দেখিতে বা করিতে না হয়, এরূপ আশা যে কখন ফলবতী হইতে পারে না, নির্বুদ্ধি শ্বশ্রূ তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি অজ্ঞান বালিকাকে কতই তিরস্কার করেন, কতই গঞ্জনা দেন, এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার করিতেও উদ্যত হন। অল্পবয়স্কা. নিঃসহায়া বালিকা কেবল ক্রন্দন সার করেন। বধূর মন একমাত্র পরিতোষের কারণ তিনি সমস্ত দিন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় নির্যাতিতা হইয়া আশা করিয়া থাকেন, কতক্ষণে স্বামী গৃহে আসিবেন। স্বামী গৃহে আসিলে তাহার সমুদায় দুঃখ খুলিয়া বলিতে থাকেন। স্বামী কিছু কাল ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রমে পত্নীর সমদুঃখী হইয়া পড়েন। পত্নী পক্ষ হইয়া তিনি জননীকে বুঝাইয়া নম্রভবে দুই একটী কথা বলিলে আর রক্ষা থাকে না। শ্বশ্রূ ক্রমশঃ ঈর্যান্বিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার প্রভুত্বভাব এখন ঈর্ষায় প্রজ্বলিত ও অসহ্য হইয়া উঠিল। নববধূ বয়োবৃদ্ধি সহকারে তার তুষ্ণিম্ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নববধূর মুখ ফুটিল; মুখ ফুটিল, না সর্ব্বনাশ হইল। গৃহধাম কেবল বচসা ও কলহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর কার সাধ্য সেখানে তিষ্ঠিতে পারে? এই শ্বশ্রূনিগ্রহ বোধহয় আবহমান কাল প্রচলিত আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই স্বাভাবিক শ্বশ্রূ নিগ্রহ নিবারণের কোন সদুপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল কলহ নিবারণের কথঞ্চিৎ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, কি শ্বশ্রূগণ নিজে আপনাদিগের সুবিধার জন্য সেই বিধান প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে সুকঠিন। এই বিধির অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগের নববধূগণ বহুকাল স্বামিগৃহে গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ করেন না, বাক্যালাপ করিলে নিন্দার ভাজন হয়েন। আমাদিগের অনুমান হয় কেবল কথঞ্চিৎ কলহ নিবারণের জন্য এই রীতি অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইয়া আছে। এই রীতির প্রতি পোষক যুক্তি নিতান্ত অসার নহে।

২। কোথাও শ্বশ্রূর অবর্ত্তমানে ননদিনী তাহার স্থানীয়া হয়েন। কোথায়ও বা শ্বশ্রূ ও ননদিনী অথবা জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা একত্রে সমবেত হইয়া নববধূ অথবা কনিষ্ঠা বধূর নিগ্রহের কারণ হয়েন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে অনেক স্থলে স্ত্রী জাতি তাঁহাদিগের স্বজাতিরই যন্ত্রণাব কারণ। স্ত্রীজাতি জ্ঞানবতী হইলে যখন বিবেচনা করিতে সমর্থা হইবে, তখন এই যন্ত্রণার কারণ ক্রমশঃ লাঘব হইবার সম্ভাবনা। অপরে ইহার কিছু প্রতিবিধান করিতে পারে না।

৩। স্বামীর প্রভূত শক্তি ও স্বাধীনতা এবং স্ত্রী জাতির নিতান্ত অধীনতা অনেক স্থলে স্ত্রী নিগ্রহের কারণ হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, স্বামী মনে করেন যে পত্নী

তাহার দাসী স্বরূপ। তিনি যেরূপ করিবেন, পত্নীকে তাহাই সহ্য করিতে হইবে। স্বামী নিতান্ত নির্যাতনা দিতেছেন, পত্নী মেষের ন্যায় সহ্য করিয়া আছেন। কি করিবেন, কুলবধূ, নিরুপায়, স্বামীর প্রহার পর্য্যন্ত তাহার সহিয়া থাকিতে হইবে। যে স্বামী সংসার ধামে তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনার কারণ, সেই স্বামী অবিবেচক, মূর্খ, কোপন স্বভাব ও যথেচ্ছচারী হইলে পত্নীর যে কত দূর যন্ত্রণার বিষয় হয়, তাহা অনুমান করিতেও আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই প্রকার স্বামী পত্নীর প্রভু, এই প্রকার স্বামীকে যাহাকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা ও সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহার ন্যায় চির দুঃখিনী কি আর জগতে আছে, কিন্তু ইহাতেও পত্নীর সন্তোষ হয়। যেহেতু তিনি জানেন, যে এ অবস্থা বৈধব্যের ন্যায় ক্লেশকর নহে।

৪। যে নারীর উপরিউক্ত ত্রিবিধ কোন যন্ত্রণারই কারণ নাই, তিনিও সুখিনী হইতে পারেন না। মনে কর কোনও পত্নী স্বামী সুখে অত্যন্ত সুখী এবং তাহার শ্বশ্রূ অথবা ননদিনী নিগ্রহ কিছুই নাই। তিনিও সর্ব্বদা সশঙ্কিত পাছে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে, পাছে তাহাকে বিধবা হইতে হয়। বৈধব্যের চিন্তা স্ত্রী জাতির মনে নিয়তই উদিত রহিয়াছে। নারী সেই চিন্তায় বিহ্বলা হইয়া দিন যামিনী শুশ্রূষায় নিয়োজিতা আছেন। জাগ্রদবস্থায় তাহার এই চিন্তা, স্বপনেও তাহার এই ভাবনা, নির্ধন হইলে তিনি এই ভাবনায় অধীরা হয়েন, ধনবতী হইলে আশঙ্কা হয়, পাছে সে ধন বৈধব্যাবস্থায় আত্মীয় স্বজন অথবা অপরে লুণ্ঠন করিয়া লয়। নারীর পরাধীন ও অসহায় অবস্থা তাহার মনে অনুক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে।

বধূ অবস্থায় নারীগণকে যে কয়েকটী প্রধান যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এ স্থলে তাহার নির্দ্দেশ করা গেল। তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণার কারণ এই সাধারণ এবং সামান্য প্রস্তাবে উল্লিখিত হইতে পারে না। সেই সকল অসুখের কারণ বিস্তর এবং ব্যক্তিগত অবস্থা ভেদ জন্যে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নারীগণের ভাগ্য এই পরাধীন এবং অবস্থাধীন, যে তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা ও পার্থিব জীবন অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে কয়েকটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা সধবা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। সধবা অবস্থায় বরং তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী বলিতে হইবে। কিন্তু যখন তাহাদিগের বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগের যাতনা স্মরণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় ফাটিয়া যায়। এই অবস্থাপন্ন নারীগণ মনে করেন যে, জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহাদিগের মরণ শ্রেয়স্কর। এই জন্য স্বামীর সহমৃতা হইয়া তাহারা দুঃখ কষ্টের হাত হইতে এক কালে নিষ্কৃতি পাইতেন। এখানকার হিন্দু গৃহের বিধবাগণ বিশেষতঃ তরুণী বিধবারা জীবন্ত দগ্ধ হইতে থাকে এবং তাহারাই দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফেলিয়া নিয়ত নির্জ্জনে মনে যে এই শোক সঙ্গীত করিবে আশ্চর্য্য কি?
"কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদতে জন্ম গেল।"

শ্রাবণ ১২৮১

# গার্হস্থ্য দর্পণ
## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"অবস্থানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কার্য্যং সমাচরেৎ ॥"

যথোচিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, এখন না হয় কিছু পরে, আজ না হয় কাল, এ কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে, এইরূপ করিলে কার্য্য যথোচিত কালে অথবা কখনই সম্পাদিত হয় না। যে সময়ে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা তৎকালেই করিবে। যথোচিত কালে কার্য্য সম্পাদিত না হইলে ফল নাই। কার্য্য মাত্রেরই এইরূপ নিয়ম; কিন্তু সাংসারিক কার্য্য বিষয়ে সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এত প্রকার সাংসারিক কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে তিনি কখন কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব প্রথমতঃ আপন২ কার্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যের সময় স্থির করিবেন, পরে নিয়মিত সময়ানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

যত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য, বলিয়া গণ্য করা যায়, সে সমস্তই যে গৃহিণীকে আদ্যোপান্ত স্বহস্তে করিতে হইবে ইহা ঠিক নহে। যাহাদিগের দাসদাসী যথেষ্ট থাকে তাহাদিগের স্বহস্তে কিছুমাত্র না করিয়া শুদ্ধ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেই চলে। কিন্তু দাস দাসী যথেষ্ট না থাকিলে অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদনা করিতে হয়, এবং অন্যের কোন সাহায্য না পাইলে, স্বয়ংই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। অতএব অবস্থা এবং সময় উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে।

কত প্রকার কার্য্য গৃহিণীর কর্ত্তব্য, কোন্২ কার্য্য প্রত্যহ, কোন্২ কার্য্য নিয়মিত কালান্তরে এবং কোন১ কার্য্য আবশ্যক মতে করিতে হয়, সে সমুদায় গণনা করিয়া দেখিলে গৃহিণী দাসদাসীর সাহায্য ব্যতিরেকে কি করিবেন ইহা স্থির করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিবেন যে দাস দাসী না থাকিলেও যে সংসারে অধিক লোক সেই সংসারেই অধিক কর্ম্ম, অতএব অধিক লোক থাকিলে তাহাদিগের দ্বারাই অধিক কার্য্যও সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সেই সকল লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ অশক্ত হইলে আপনাকেই কার্য্য ভার অধিক বহন করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রাণালীবদ্ধরূপে কার্য্য করিলে কোন কার্য্যই ভয়াবহ বোধ হয় না, বরং অভ্যাস দ্বারা কার্য্য সকল কালক্রমে অনায়াস সাধ্য হইয়া যায়।

সাংসারিক কার্য্য অধিক হইলেও তাহাতে অধিক কষ্ট নাই, কেন না আপন ইচ্ছাধীন কার্য্য সম্পাদন করিতে পাইলে কষ্ট বোধ না হইয়া বরং স্বভাবতঃ উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আপনি স্নানাহার করিতে যেমন কষ্ট বোধ হয় না, সাংসারিক কার্য্য করিতেও তদ্রূপ, এবং সন্তানাদির প্রতি যত্ন করা মাতার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ ও আনন্দকর। মনুষ্যের স্বাভাবিক এই কার্য্য প্রবৃত্তির অনুগামিনী হইয়াই গৃহিণীর গৃহকার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছে করেন, তবে কেবল কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সময়ের নিয়ম না রাখিতে পারিলে সাংসারিক কার্য্য সমুদায় যথোচিত রূপে সম্পাদিত হয় না। কিন্তু যে সকল গৃহিণী উক্ত শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যকে কদাচ কষ্টকর বোধ করেন না, তাহাদের পক্ষে তাহা অনায়াস সাধ্য। বস্তুতঃ সাংসারিক কার্য্য করিতে ২

তাহাতে শুদ্ধ অভ্যাস হইলেই তাহা সহজ বোধ হয় এমন নহে; যেমন আপন শরীর অপরিষ্কার থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় এবং তাহা করিতে কষ্ট বোধ না হইয়া তাহাতে স্বভাবতঃ উৎসাহ হয় এবং পরিশ্রমকে পরিশ্রমই জ্ঞান হয় না, উত্তম গৃহিণীর পক্ষে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যও সেইরূপ বোধ হয়।

বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাংসারিক কার্য্য নানাবিধ হওয়াতেই কষ্টকর হয় না, কেন না, এক বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বিষয়ান্তরে পরিশ্রম করিতে হইলে শ্রমের লাঘব বোধ হয়। সুতরাং সাংসারিক কার্য্যের যত পরিশ্রম কল্পনা করা যায় বাস্তবিক তত হয় না। আর একটী কথা এই যে কোন ব্যক্তি অর্থের জন্য অপর লোকের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাতে কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু আপন কার্য্যে কাহার না যত্ন হইয়া থাকে? ফলতঃ যথেষ্ট দাসদাসী থাকিলেও গৃহিণী অনেক কার্য্য স্বয়ং না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন।

দাসদাসী থাকিলেও তাহাদিগের উপর কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে কেহ কার্য্য সমাধা করুক গৃহিণী তাহার কর্ত্রীস্বরূপা। যেমন রাজা স্বয়ং কার্য্য না করিয়াও মন্ত্রীদিগের কার্য্যের দোষগুণ ভাগী হয়েন, তদ্রূপ গৃহিণী তাবৎ সাংসারিক কার্য্যের গুণদোষ ভাগী, অতএব দাস দাসীর সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাসদাসীরা প্রথমতঃ তাহাদিগের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে সক্ষম হয় না, অতএব তাহাদিগকে যথাকালে যথোচিত কার্য্যে নিয়োগ করাও সেই কার্য্য যথাবিহিত রূপে সম্পাদন করিতে আদেশ করা গৃহিণীর অতীব কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাহারা তাহাদিগের কার্য্যে ফল ভোগী নহে, তাহার বেতনভোগী মাত্র, এই বিবেচনায় তাহারা কর্ম্মে যথেষ্ট যত্নশীল থাকে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর যে পরিমাণে দৃষ্টি রাখিবে সেই পরিমাণেই কার্য্য পাইবে, তাহা না করিতে পারিলে কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

গৃহিণী শুদ্ধ আপনি সময়ের নিয়ম করিয়া লইলেই যথেষ্ট হইল না, দাসদাসী ও অপর সকলের কার্য্যের নিয়ম ও সময় স্থির করিতে হয়, তাহা না হইলে কার্য্য সমাধা হয় না। এক জন একবার আসিয়া খাবার চাহিল, একজন আসিয়া কাপড় চাহিল, এইরূপে কার্য্যের শেষ হয় না। কার্য্যের অনেক লোক থাকিলে কিন্তু শৃঙ্খলা না থাকিলেও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য যে সময়োচিত নহে, তাহা লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকিলে এবং সময়োচিত কার্য্যে কেহ মনোযোগী না হইলে কার্য্যের ফল কি? অতএব দাসদাসীর কার্য্যের ও সময়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ তাহা হইলেও যথেষ্ট হয় না। সন্তানাদির সংসারের অপরাপর সকল লোকের আহারাদি কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত থাকা উচিত, তাহা না থাকিলে অনিয়ম হেতু গৃহিণীর সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ গৃহিণীর সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে তৎপর থাকা উচিত। অনেকের এমনি কদর্য্য অভ্যাস যে তাঁহারা নিজের ইচ্ছায় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া কার্য্যের প্রয়োজন বশতঃ তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, এরূপ কার্য্য করিলে লোককে কার্য্যের দাস বলা যায়, কার্য্য কর্ত্তা বলা যায় না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তিনি সময় বুঝিয়া ও সকলের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য স্বয়ং সমাধা করিবেন অথবা লোক দ্বারা সমাধা করাইয়া লইবেন। সামান্যতঃ গৃহিণীর প্রাত্যহিক কার্য্য পশ্চাল্লিখিতরূপে লিখিত হইতেছে।

গৃহিণী অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিবেন, তাহা হইলে দাসদাসী ও সন্তানাদি সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা নিয়মিত স্থানে রাখিয়া যথোচিতরূপে বাটীর সমস্ত স্থান পরিষ্কার করা প্রথম কর্ত্তব্য। পরে বাহ্য শৌচ ক্রিয়া সমাপন করিলে শিশুদিগেরও বাহ্য শৌচ স্নানাদির তত্ত্বাবধান করা উচিত, পরে আহ্নিক পূজাদি সমাপনান্তর আহারের আয়োজনাদি করিতে হয়। কিন্তু তৎকাল মধ্যেই শ্বশুরাদি কোন গুরু লোক থাকিলে তাঁহাদিগেরও আবশ্যক মত প্রাতঃক্রিয়াদি কার্য্যের উপকরণ প্রদান করিতে এবং শিশুসন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগেরও অগ্রে আহার দিতে হয়। গৃহস্বামীর কার্য্যানুসারে এবং বালকদিগের বিদ্যালয় গমনোচিত সময়ানুসারে প্রায় আহারের সময় স্থির রাখিতে হয়। কিন্তু তদ্রূপ কারণ না থাকিলেও আহারের সময় স্থির রাখা কর্ত্তব্য; অতএব তৎকাল লক্ষ্য করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময়টীতে গৃহিণীরা অতিশয় ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং কোন২ স্থানে প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃই আহারাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং প্রাতঃকালোচিত অনেক কার্য্য মধ্যাহ্ন কালে করিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেন। লোকাভাবে ও কার্য্যবাহুল্য সত্ত্বে অগত্যা তাহা করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিঞ্চিত পূর্ব্বে উঠিলে যদি সমস্ত কার্য্য যথোচিত কালে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সকলের আহারাদি সমাপনান্তে গৃহিণী সুস্থির হইয়া অসম্পাদিত কর্ত্তব্য সমস্ত সম্পাদন করিবেন। স্নানাগার, রন্ধনশালা, আহারগৃহ ও ভোজন পাত্রাদি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া যথোচিত স্থানে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া ভাণ্ডার গৃহ, সজ্জাগৃহ ইত্যাদি স্থান ও তত্রত্য বস্তুসকল যথোচিতরূপে পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু যাহাই করুন, শিশু সন্তান অথবা অশক্ত বৃদ্ধ গুরু লোক থাকিলে তাহাদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া নিয়মিত সময়ে এ সকল প্রাত্যহিক কার্য্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিয়া অবকাশ প্রাপ্ত হইলে গৃহিণী সকলের পরিধেয় বস্ত্রাদি যথা স্থানে আছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সূচীকার্য্য বা কোন প্রকার সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকিলে তাহা করিবেন, অথবা স্বয়ং-অধ্যয়ন করিবেন কিম্বা শিক্ষা দিবার পাত্র বা পাত্রী থাকিলে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ক্রমশঃ বালকদিগের বিদ্যালয় হইতে অথবা গৃহস্বামীর কার্য্য স্থান হইতে প্রত্যাগমন কাল উপস্থিত হইলে, তাহাদিগের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আয়োজন করিবেন এবং শয্যাদি প্রস্তুত ও আলোর আয়োজন করিয়া পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিবেন। আহারাদি সমাপনান্তে যেরূপ পরিষ্কার করণাদি কার্য্য আবশ্যক তাহা অনেক স্থলে রাত্রিতে সম্পাদিত না হইয়া প্রাতে সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাধ্য সত্ত্বে রাত্রিতেই কার্য্য শেষ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে নীতি গর্ভ গল্প দ্বারা শিশু দিগের মনোরঞ্জন করিয়া অথবা অধ্যয়নাদি করিয়া যথাকালে নিদ্রাগত হইবেন।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮২

# মাতার প্রতি কয়েকটী উপদেশ

১. প্রথমতঃ আপনাকে পরে আপনার সন্তানকে ঈশ্বরে উৎসর্গ কর। ইহা করিলে ঈশ্বরের নিজস্ব ধন তাঁহাকে দেওয়া হয়। ইহা না করিলে ঈশ্বরের বস্তু অপহরণ করা হয়।

২. ধন অপেক্ষা ধর্ম্মকে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। মনুষ্যের নিকট যে সম্ভ্রম পাও, তদপেক্ষা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত সম্ভ্রমকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তোমার আপনার জন্য এবং তোমার সন্তানের জন্যই ইহা প্রয়োজনীয়।

৩. তোমার সন্তানকে ক্রমশঃ উন্নত করা তোমার জীবনের প্রধান কার্য্য জানিও। নিজে বালকত্ব অবলম্বন করিও না।

৪. বিবেচনা না করিয়া সন্তানকে কোন আদেশ করিও না, কিন্তু যে আদেশটী করিবে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হয়।

৫. সন্তানকে একটী কীটের প্রতিও নিষ্ঠুর আচরণ করিতে দিও না।

৬. সন্তানের ন্যায়সঙ্গত সুখ ও দুঃখে আপনিও সুখ ও দুঃখ প্রদর্শন করিতে অভ্যাস কর।

৭. তোমার সন্তানকে কি জন্য তাড়না করা উচিত ইহা না জানিয়া তাহাকে তাড়না করিতে যাইও না। প্রথমে তাহার যাহা বলিবার আছে সম্পূর্ণ রূপে শুন পরে তাড়না কর।

৮. তোমার সন্তান যেন কখন খিদ্যমান বা অসন্তুষ্ট চিত্ত হইতে অভ্যস্ত হয় না।

৯. প্রথম হইতেই সরলতা, সাধুতা, উদারতা, মনস্বিতা, স্বদেশ হিতৈষিতা এবং ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা দেও।

১০. ঈশ্বরের প্রতি ভয় প্রকৃত জ্ঞানের আরম্ভ।

১১. অলস অকর্ম্মণ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কখন সন্তানের মর্ম্ম পীড়া দিও না, আবার তাহার মনে আত্মগরিমা জন্মাইতেও দিও না।

১২. প্রতিদিন একান্তচিত্তে সন্তানের সহিত একসঙ্গে বসিয়া সন্তানের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর।

১৩. আত্মোন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দান কর।

১৪. সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিও না, অথবা তাহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিও না।

১৫. অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে সন্তানকে তীব্ররূপে ভর্ৎসনা করিও না।

১৬. জীবন বাষ্পের ন্যায় এবং তুমি ও তোমার সন্তান যে কোন্ দিন ইহলোক হইতে পরলোকে আহূত হইবে জান না, ইহা স্মরণ রাখিও।

ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮২

# শিশু বিনয়ন

## জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন

জ্ঞা। সরলা। তোমার ৩/৪টী ছেলে পিলে হয়েছে, তাদের শেখবার কি উপায় করচো?

স। তারা এখন বালক, কি শিখবে? আর বড় ছেলেটীকে স্কুলে আজি কালি পাঠাব।

জ্ঞা। ছেলে আবার কি শিখবে। ছেলের চোক কাণ ফুটতে না ফুটতে সে শিখতে

আরম্ভ করে। কেবল বাহিরের পদার্থ সকল দেখে তা নয়, কিন্তু মানুষের আচার ব্যবহার দেখিয়া ভাল মন্দ শিখিয়া থাকে। ছেলেকে ভাল না শিখাইলে সে মন্দ শিখিবেই শিখিবে। আর স্কুলে যে শেখা, সে পুর অঙ্কে শেখা নয়। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা পাঠশালায় শেখান যায় না, ঘরে শেখাতে হয়।

স। ঘরে কে শেখাইবে? তাদের বাপ ত সমস্ত দিনই বাহিরে বাহিরে থাকেন, কখন যদি ঘরে আসেন আপনার কাজেই ব্যস্ত।

জ্ঞা। দেখ সরলা, তুমি পরের উপর দোষ্টা চাপাও কেন? ছেলেদিগকে শিক্ষা দিবার প্রধান ভার মার উপর। মা যেরূপে শেখাতে পারেন এরূপ আর কেহ পারে না।

স। মার ত বিদ্যা জান, মা কি শেখাবে?

জ্ঞা। কেবল বই পড়া বিদ্যাই যে বিদ্যা তা নয়, সন্তানদিগকে যাতে ভাল করিয়া তুলিতে পারা যায় সেইটী জানাই মার পক্ষে প্রধান বিদ্যা। মা যেমন ছেলের শরীরটীর সুস্থতা ও পোষণের জন্য সর্ব্বত্র যত্নশীল থাকিবেন, সেইরূপ ছেলের শরীরের ভিতর যে আত্মাটী আছে তার উন্নতির জন্যও চেষ্টা করিবেন। মার স্নেহের এমত ক্ষমতা আছে যে তাহাতে তিনি ডাক্তার না হইয়াও সন্তানের শরীর রক্ষার উপায় বাহির করিয়া লন, সেইরূপ বড় পণ্ডিত না হইয়াও সন্তানের মনের উন্নতির উপায়ও বাহির করিতে পারেন।

স। সে উপায় কিরূপ?

জ্ঞা। ছেলের, মনের গতি মন্দ দিক হইতে ফিরাইয়া ভাল দিকে লওয়ানই প্রধান কাজ। তা উপদেশে পার, গল্প শুনাইয়া পার, ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পার, অথবা আর যে কোনো উপায়ে পার ক্ষতি নাই। কচি চারাকে যেদিকে নোয়াইবে, সহজে নত হইবে এবং চিরকালই সেদিকে নত হইয়া থাকিবে, সন্তানের মন সেইরূপ ভাল দিকে নত করা চাই, সন্তানের চরিত্র চিরদিনের জন্য ভাল হইবে।

স। মার দ্বারা কি এত বড় কাজ হয়?

জ্ঞা। এ পৃথিবীতে যাঁরা বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁদের অনেকেই বাল্যকালে মাতার শিক্ষাগুণে বড় হইয়াছেন, ওয়াসিংটন যিনি আমেরিকাকে স্বাধীন করিয়াছেন, মাতার নিকট তিনি ভাল হইতে শিক্ষা করেন। সার উইলিয়াম জোন্স মাতার নিকট জ্ঞান লাভে প্রথম উৎসাহ পান, আর মাতার গুণে কত কুসন্তানও ভাল হইয়াছে। সেন্ট অগাষ্টাইন নামে এক খৃষ্টান পাদরী প্রথম বয়সে বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াও ভালপথে আনিতে পারেন নাই। ধার্ম্মিকা রমণী নিরুপায় হইয়া সন্তানের মঙ্গল জন্য একান্ত কাতরতা সহকারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। মাতার এই চেষ্টার ফল প্রথমে যদিও ফলে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে আশ্চর্য্যরূপে ফলিল। দুরাচার অগাষ্টাইন পুণ্যাত্মা বলিয়া গণনীয় হইলেন এবং তিনি পরে বলিতেন তাঁহার মাতার কথা ভাবিয়া তিনি পাপ পথ ছাড়িয়া পুণ্য পথ অবলম্বন করেন। মাতার গুণে সন্তান ভাল হয় ইহার আরও কত কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

স। আপনার ছেলে ভাল হয় কোন্ মা না চায়? কিন্তু সব ছেলে বাগ মানে না।

জ্ঞা। ছেলের রীত চরিত্র ভাল হয়, এটী অবশ্য অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে যে নয় অনেকে এরূপ অনুভব করেন না, ছেলে এখন দুই চারিটী মিথ্যা কথা বলিতে শিখিলে পরে যে জালিয়াত জুয়াচোর হইবে, এখন মারামারি করিতে শিখিলে পরে যে মানুষ খুন করিবে, এখন কথার অবাধ্য হইতে শিখিলে পরে যে ধর্ম্ম

কর্ম্ম অগ্রাহ্য করিবে এবং এখন মন্দ বালকের সঙ্গে বেড়াইলে পরে যে বদমায়েসের দলে মিশিবে ইহা সকলে মনে করেন না। এই জন্য ছেলের মন্দ ব্যবহার দেখিয়াও তত গ্রাহ্য করেন না।

স। আমাকে তেমন মা পাও নাই, ছেলে মন্দ কাজ করে আমার কাছে পার পাবার যো নাই!

জ্ঞা। ছেলের মন্দ কাজ দেখিলে তুমি কি কর?

স। কি আর করিব? আচ্ছা করিয়া প্রহার করি;

জ্ঞা। এতে কি ছেলেরা সে দোষ আর করে না?

স। তেমন ছেলে পাও নাই, যা বারণ করবে তাই করে বসে আছে! তাই বলি বাগে আনা যায় না।

জ্ঞা। ছেলেকে ভাল করা একটু বিবেচনার কাজ। ছেলে মন্দ কাজ করিলে অগ্রাহ্য করা যেমন দোষ, কেবল প্রহার করাও তেমনি খারাব, অনেক ছেলে এতে মার ঘেঁচড়া হইয়া যায়, তারপর আর প্রহারে কিছু হয় না। অনেকে, যে প্রহার করে, তাকেই ভয় করে, তার সমুখে কোন মন্দ কাজ করে না, কিন্তু তার চখের আড় হইলে এক গুণ দুষ্টামি শতগুণ বাড়াইয়া থাকে। প্রহারের আর এক মহৎ দোষ এই এতে ছেলেরা দোষও করে, মিথ্যা কথাও কয়, এতে স্বভাব বড় বিকৃত হইয়া যায়।

স। এর মানে ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

জ্ঞা। কেন পারবে না? দেখ ছেলেরা মন্দ কাজ করিলে তাদের সরল স্বভাববশতঃ স্বীকার করে। এটী ভাল; ইহা হইলে তাদের দোষ শুধরাইবার পথ থাকে। কিন্তু অনেক মা ছেলে নিজমুখে মন্দ কর্ম্ম করেছে বলিলে আর রক্ষা রাখেন না, ইহাতে সন্তান দোষ করিয়া তাহা ভয়ে ঢাকে, ঢাকিবার জন্য বানাইয়া নানা কথা বলে, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে চায়, সত্য কথা বলিতে ছেলের সাহস থাকে না, কুকর্ম্মের সহিত মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা অভ্যাস করে।

স। ঠিক বলেছ। আমার মেজো ছেলেটার এই অভ্যাস হয়েছে, আগে মন্দ কাজ করলে মান্‌তো, এখন কত রকম করে সে ঢাকে, কি আর বলবো? তার বুদ্ধি দেখে অবাক হই।

জ্ঞা। মার দোষেই ছেলে অনেক সময় খারাব হয়, ছেলের কোমল মন বড় সাবধানে গঠন করা চাই। একটু অবিবেচনার কুফল সন্তান ও মাতা উভয়কে ভোগ করিতে হয়, ছেলেকে ভাল করিব মার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাল করিবার সদুপায়গুলি অবলম্বন করা চাই।

চৈত্র ১২৮৬

# আদর্শ গৃহিণী*

## বামাগণের রচনা

গৃহিণী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, বিশেষতঃ আদর্শ গৃহিণী কাহাকে বলে? প্রকৃতপক্ষে তদুপযুক্তা গৃহিণী আমাদিগের চক্ষে পড়িয়াছেন কি না, জানি না। তবে গৃহিণী শব্দ ব্যবহারে সরল অনুভূতিতে আমরা এই মাত্র পাই যে, উত্তমরূপে গৃহ পালন অর্থাৎ গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা যিনি রাখেন, তিনিই আদর্শ গৃহিণী নামের উপযুক্তা।

গৃহিণী এ শব্দটি প্রয়োগ সময়েই এই ভাবটীর উদয় হয় যে, গৃহিণী বিশিষ্ট গৃহ এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশিতে আবরিত ও পরিশোভিত। বস্তুতঃ যে গৃহে গৃহিণী নাই, সেই গৃহ আর শ্মশানে আমরা কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই না। গৃহ আর গৃহিণী এতদুভয় সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন লক্ষ্মীরূপা গৃহিণীকে গৃহদেবী এবং গৃহটীকে দেবালয় বলিয়া আমাদিগের অনুভূত হয়।

ফলতঃ যখন আমরা আমাদিগের কাল্পনিক গৃহিণীকে কল্পনার তুলি লইয়া আঁকিতে বসি, তখন বাস্তবিক তাঁহার সেই সূক্ষ্ম দর্শিতায় ও কার্য্যদক্ষতায় আমরা একান্ত মোহিত হইয়া যাই। প্রকৃত গৃহিণী যিনি, যাঁহাকে আমরা আমরা আদর্শ গৃহিণী নামে অভিহিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সেই মেধাবিনী শক্তিশালী আদর্শ গৃহিণীর কার্য্যনিপুণতা সম্বন্ধে আমরা অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

গৃহিণী আমাদিগের চক্ষে অনেক প্রকারের পড়িয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা দুই জাতীয় গৃহিণীর প্রকৃতি মাত্র উল্লেখ করিব:—

একজাতীয় গৃহিণী, যাহাকে গৃহিণী নামে অভিষিক্ত করিতে আমাদের লজ্জা ও কষ্ট হয় এবং যাহার বিষয় আলোচনা করিলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায় ও শরীর কণ্টকিত হয়। গৃহিণী হইতে তাঁহার আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশে পৃথক! গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, গৃহের শ্রী নাই, সুশৃঙ্খলা নাই, কোন প্রকার সুব্যবস্থা নাই; গৃহ সামগ্রী বাজার হইতে আসিতেছে, হাঁড়িতে চড়িতেছে, ব্যবহারে নিঃশেষিত হইল, আবার বাজারে দৌড়িল। এইরূপ, কেহ স্নান করিতে যাবেন, কিন্তু তৈল পাইতেছেন না; কেহ আহারে বসিয়া মাখা খাবেন, লবণ পাইতেছেন না; কেহ দুগ্ধে হাত দিয়া বসিয়া আছেন, দুগ্ধের মিষ্ট গিলিতেছে না; এই প্রকার চারিদিক দিয়া হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, গৃহিণীর সঙ্গে এসব কাজকর্ম্মের কোন খোঁজ খবর নাই। তাঁহার নিকট কেহ কোন বিষয়ের অভাব, অনাটন সম্বন্ধে জানাইতে গেল, তিনি অবলীলাক্রমে খোলা জবাব দিলেন, "আমি জানি কি? বাবুর কাছ থেকে চেয়ে পয়সা লইয়া যাও, যা হয় আন, খাও, আমাকে ত্যক্ত করিতে আসিও না।" বাড়ীতে কে মরিতে চলিল, কে বাঁচিয়া রইল, কে খাইল, কে অনাহারে রহিল, বা ঘরের এক দিক দিয়া আগুনই লাগিয়া গেল, গৃহিণীর সে বিষয়ে চৈতন্য নাই! আর পাঁচ জনেও খাচ্চে, তিনিও চারটী খাচ্চেন, গৃহের সঙ্গে তাঁহার এই পর্যন্ত সম্বন্ধ। বস্তুতঃ গৃহে আর গৃহিণীতে এরূপ সম্বন্ধ শূন্য ভাব, এ বিষয় আলোচনায় আমাদেরও ধৈর্য্য থাকিবে না এবং

* ববানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগত সহধর্ম্মিনীর স্মবণার্থ বঙ্গমহিলা সমাজের হস্তে যে রচনা পুরস্কারের ভাবার্পণ করেন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই প্রস্তাবের রচয়িত্রী সেই পুরস্কারেব যোগ্যা হইয়াছেন।

শ্রোতৃবর্গেরও এ সংবাদ তত তৃপ্তিজনক হইবার নয়, অতএব আমাদের বর্ত্তমান গৃহিণীকে এখানেই বিদায় দি।

আর এক জাতীয় গৃহিণী, যাঁহাকে আমরা প্রীতি পুষ্প লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ও প্রকৃত গৃহিণী নামে অভিহিত করিয়াছি।

গৃহিণী যিনি, তিনি জানেন, গৃহ সাজাইতে কি কি উপকরণ আবশ্যক;—তিনি জানেন, গৃহ এবং গৃহিণী এতদুভয় মধ্যে পবিত্র ধর্ম্মের আভা না থাকিলে, গৃহাপেক্ষা শ্মশানও মানব বাসের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি শ্মশানপানে তাকাইতে ইচ্ছা করেন, তথাপি ইত্যাকার গৃহপানে তাকাইতে তাঁহার রুচি জন্মে না। গৃহিণীর প্রকৃতির মূলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে তাহার পরিণাম ফল শেষে এই দাঁড়ায়, যেমন তৈল-শূন্য প্রদীপ জ্বালাইয়া উহা স্থায়ী করিতে প্রয়াস পাওয়া। তৈল শূন্য সলিতা যে ভাবে যতটুকু সময় জ্বলিয়া নির্ব্বাপিত হয়, ধর্ম্মহীনা গৃহিণীর পক্ষেও পরিণামে তদবস্থা।

প্রকৃত গৃহিণী যিনি তিনি জানেন, গৃহিণীর প্রকৃতির মূলে ধর্ম্মবৃত্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, দয়া, সূক্ষ্মদর্শিতা, ও সর্ব্ব বিষয়ে অনুভব শক্তি থাকিলে গৃহ কতদূর শোভার আস্পদ ও সুখের স্থান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। সংসার সম্বন্ধে গৃহিণী স্থিরা, ধীরা, অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে গৃহ মধ্যে এমন স্থান নাই যাহা তাঁহার দৃষ্টির অগম্য; এমন বিষয় নাই যাহা তাঁহার চিন্তার অগম্য পথ; এমন বস্তু নাই, যাহার অভাব সভাব সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত নন এবং এমন ব্যক্তি নাই যাহার ঘুম, দুঃখ, অভাব, অনভাব, সুস্থতা অসুস্থতা শান্তি অশান্তি সম্বন্ধে তিনি অবগত নহেন। তিনি সমুদয় বিষয় অবগত থাকিয়া, স্থান বিশেষে— সুখ বর্ধন, দুঃখ দূরীকরণ, অভাব মোচন, ও শান্তি প্রদান বিষয়ে একান্ত যত্নশীলা রহেন। গৃহিণীর সূক্ষ্ম দর্শিতায়, কার্য্যদক্ষতায় ও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি থাকায় গৃহ গৃহীর পক্ষে কতদূর সুখের ও শোভার বস্তু হয়, তাহা আমরা কতক পরিমাণেও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গৃহিণীর রুচি একান্ত পবিত্র, সুতরাং দুর্গন্ধময় স্থান, দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু গৃহে পুষিয়া রাখা, এবং গৃহের যে অংশে তিনি অবস্থান করেন, কেবল সেই অংশের পরিচ্ছন্নতাতেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাংই তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া কাহাকেও নাক ঘুরাইয়া ছুটিয়া পালাইতে হয় না, বরং গৃহ মধ্যে প্রবেশান্তে, তাঁহার কার্য্য নিপুণতা দেখিয়া, লোকের দুদণ্ড বেড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা যায় এবং ইত্যাকার কার্য্য পরিপাট্য ও সুশৃঙ্খলতা যে দেখে সে ক্ষণকালের জন্য বিমোহিত হইয়াই রহে। সুগৃহিণী, অতি সামান্য জিনিসটুকুও এত আদরে পরিপাটী রূপে এমন স্থানে স্থাপিত করেন, এবং গৃহসজ্জা ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও শয্যা প্রভৃতি এতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল করিয়া রাখেন, আগন্তুক ব্যক্তি মাত্র তদ্বিষয়ের সমালোচনা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

গৃহিণীর গৃহ হইতে এমন কোন বস্তু অনাদরে তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক ফেলা যাইতে পারে না, যদ্বারা অপরে সেই ত্যাজ্য বস্তুর কার্য্যোপযোগিতার পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার গৃহ হইতে অতি সামান্য নেকড়া বা পুরাণ কাগজটুকু পর্য্যন্ত ফেলা যায় না। যে ক্ষুদ্র নেকড়া অপরাপর গৃহ হইতে সচরাচর অনাদরে অতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত ফেলা যায়, তদপেক্ষা সামান্য নেকড়াটুকু পর্য্যন্ত তিনি অতি যত্নের সহিত সুবিধানুসারে ধোপাবাড়ী দিয়া, বা নিজে ক্ষার দিয়া ধোলাই করিয়া, উপরে নীচে দুইখানি নূতন কাপড় দিয়া ভিতরে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেকড়া গুলিন পাতিয়া ব্যবহারোপযুক্ত লেপ তোষকের

মত সেলাই করিয়া লয়েন। পুরাণ কাগজ, যাহার মধ্যে বিশেষ আবশ্যক বিষয় রহিয়াছে, তাহা অতি যত্নের সহিত একের পর আর ক্রমান্বয়ে ফাইল করিয়া রাখেন, আর আর অবশিষ্ট অনাবশ্যক বাজে কাগজগুলিও যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া খরিদ্দার আসিলে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করেন, কিন্তু ফেলিয়া দেন না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি পর্য্যন্ত তাহার আদর ও সতর্কতা দৃষ্ট হয়। গৃহিণীর প্রকৃতি মূলে এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা থাকায়, অনেক অনাটন বা অতিরিক্ত ব্যয়ের সময়েও তাঁহাকে নিতান্ত কাতর অবস্থায় পড়িতে হয় না।

গৃহিণী যিনি, তিনি জানেন তাঁহার গৃহে কি আছে কি নাই, কার্য্যকালে তাঁহার কি কি বস্তুর অভাব, অনাটন থাকিবার সম্ভাবনা—চাউল, ডাইল, তৈল লবণ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী মধ্যে কোন কোন জিনিস, একত্রে কতটা কি পরিণামে আনাইয়া রাখিলে কতদিন চালান যায় এবং সেই একত্রে আনায় লাভ আছে কি লোকসান পড়ে। "হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ" উননে হাঁড়ি চাপাইয়া বাজারে তৈল, লবণ, মসলা প্রভৃতির জন্য পাঠান গৃহিণীর পক্ষে অতি অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক কথা। তাঁহার গৃহে যখন যাহার প্রয়োজন, তখনই তাহা প্রস্তুত, যাহার যে কাজ সেই তাহা নিঃশব্দে নীরবে সম্পন্ন করিতেছে, একের কাজ অপরে জানিতেছে না।

কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা, সকরুণ হৃদয়ে পরিজন বর্গের প্রতি সমভাব, সর্ব্ব বিষয়ে হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রদর্শন, পরিজনবর্গের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির বিপদে আপনাকে বিপদাপন্ন ভাবা এবং দুঃখী তাপী জনের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেই অবস্থায় তাঁহার প্রতি সমদুঃখতা প্রকাশ ও সহানুভূতি প্রদান করা গৃহিণীর বিবেচনায় ইহাই ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কার্য্য।

গৃহিণীর এ প্রকার ধর্ম্মমূলক নীতি প্রকৃতির প্রতি ক্ষুদ্র শিশু ও অপরাপর পরিজনবর্গের প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রহিয়াছে, সুতরাং ভুলক্রমেও তাঁহার কার্য্য নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ সতর্ক রহেন। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শয্যা পার্শ্বেই উপবেশন পূর্ব্বক, পরম রক্ষক অনন্ত আশ্রয়দাতা পরমেশ্বরকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ ও তাঁহার নাম গান করিয়া পতি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে জাগরিত করেন। এইরূপে তিনি ঈশ্বর আরাধনা সমাপনান্তে, পতি, পুত্র, কন্যাগণের স্বাস্থ্যানুসন্ধান করতঃ শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে অপরাপর গৃহস্থিত পরিজনবর্গের সুস্থতা অসুস্থতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহা বলা বাহুল্য যে, দৈনিক কার্য্য মধ্যে রান্না আর খাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ নয়, যেমন অনেকানেক গৃহিণীতে দৃষ্ট হয়। রন্ধন পরিবেশনাদি যতটা তিনি নিজে চালাইতে পারেন আপন হস্তেই রাখেন, তবে আনুষঙ্গিক সহায়তা যতটা নিতে হয়, অপর হইতে লইয়া থাকেন। গৃহিণী দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে আহারাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ছয় সাত ঘণ্টার জন্য রন্ধন গৃহের নিকট বিদায় লইয়া অন্যান্য কাজ দেখিতে লাগিলেন। কোন্ জামাটাতে বুতাম নাই, কোন্ কাপড়খানি ছেঁড়া, রিপু করিলে পুনরায় কিছুদিন পরা যায়, কোন্ বালিশটিতে ওয়াড় নাই, কোন্ বিছানায় চাদর খানি ময়লা হইয়াছে বদলান আবশ্যক, এবং কোন্ মশারী খানিতে দু একটী ছিদ্র হইয়াছে দুটি ফোড় দিয়া রাখিলেই থাকে ইত্যাদি, এবং কোন্ জিনিসটীতে মরিচে ধরিয়াছে, কোন্ জিনিসপত্র গুলিতে ময়লা পড়িয়া আছে ও কোন্ জিনিসপত্র গুলি বহুদিন যাবৎ নাড়াচাড়া পড়ে না, পুনরায় পড়িয়া পড়িয়া রাখা

আবশ্যক এইসব বিষয়ে তিনি যত্নপর হয়েন। এবং রুচি ও তৃষ্ণা থাকাতে, গৃহকার্য্যে এতদূর ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি লেখা পড়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই, ইহারই মধ্যে তিনি সময় করিয়া সন্তান সন্ততিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কখন আপনার পড়া শুনায় আপনি ব্যস্ত থাকেন, এবং কখন সন্তান সন্ততিদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তাহারা কে কতটুকু শিখিল।

এইরূপে যখন গৃহিণী আপন কার্য্য ক্ষেত্রে আপনি পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ করেন, ক্ষুদ্র শিশুগুলি তখন জননীর কার্য্যনিষ্ঠার প্রতি এক দৃষ্টিতে স্থির নয়নে তাকাইয়া থাকে এবং তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এবং লক্ষ্মীরূপা জননীর সুদৃষ্টান্তকে আদর্শ রাখিয়া শিশু সন্তান যখন আপনার কোমল চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হয়, ও সেই শান্তশীলা জননীর নিরাপদজনক ক্রোড়ে থাকিয়া, আপনার সরল ও কোমল প্রকৃতিতে আপনি একটু একটু করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন সেই একটীমাত্র আদর্শ জীবনে কতটা জীবন গঠিত হয়, এবং সেই একটী মাত্র আদর্শ পরিবার ধর্ম্ম ও নীতির আশ্রয় লইয়া ও তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজের নিকট কতদূর আদরের ও অনুসরণের বস্তু হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

ফাল্গুন ১২৮৭ শ্রী পার্ব্বতী বসু।

## সময়*

### বামাগণের রচনা

সময় অমূল্য ধন, ইহা প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কি প্রকারে যে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা কয় ব্যক্তি চিন্তা করেন? সময়-জীবনের অংশমাত্র। যেমন প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, সেইরূপ আমাদের এই জীবনও কতিপয় দিবসের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন পদার্থের যেরূপ একটী মাত্র পরমাণুরও স্খলন হইলে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ হ্রাস হয়, সেইরূপ অতি অল্পতম সময়ও অতীত হইয়া গেলে আমাদের এই প্রিয়তম জীবনেরই কিয়দংশ ক্ষয় হয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে এমন বহুমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করা ও নিজ জীবনকে ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা উভয়ই তুল্য। আমরা সর্ব্বদাই প্রায় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকি যে "আমার সময় নাই" কিন্তু সময় যে কেন নাই তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা সময়ের ব্যবহার জানি না বলিয়াই যে আমাদের নিকট সময় এত অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহা ভ্রমেও ভাবি না। সত্য কথা বলিতে কি আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাস্তবিক কয়ঘণ্টা কার্য্যে নিযুক্ত থাকি? যে বুদ্ধিমান সময়ের সদ্ব্যবহার জানেন, তাঁহার নিকট অল্প সময়ও দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত কার্য্য করেন, অন্যলোকে তাহার চতুর্গুণ সময়েও তত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

* বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

যদিও দেশীয় জলবায়ু এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা আমাদিগকে শ্রমকাতর করিবার যথেষ্ট কারণ বটে, কিন্তু শিক্ষার দোষ যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে হেতু শৈশব হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা না করিলে মনুষ্য কখনই ভবিষ্যতে শ্রমক্ষম ও কার্য্যকুশল হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক জননীর কর্ত্তব্য তাঁহার সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেন এবং নিজেও সেইমত কার্য্য করেন। নতুবা তিনি যদি স্বয়ং শ্রমকাতরা ও অনর্থক সময় যাপনে অনুরাগিনী থাকিয়া পুত্র কন্যাকে কেবল মুখে পরিশ্রমী হইতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই বাক্য ছিন্নবৃক্ষ মূলে জলসেচনের ন্যায় কোন কার্য্যেরই হয় না। সেই পুত্রকন্যা আপন মাতার উপদেশ অপেক্ষা তাঁহার আচরণই যে অবিলম্বে শিক্ষা করে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, যেহেতু উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই সর্ব্বস্থানে অধিক কার্য্যকারী।

মাতা যেরূপ প্রকৃতির হয়েন, তাঁহার সন্তানও যে তদনুরূপ হয় ইহা কে না স্বীকার করিবেন? মণিকার ন্যায় ধার্ম্মিকা মাতা না পাইলে আগষ্টিন কি কখন তাদৃশ দেবজীবন লাভ করিতে সক্ষম হইতেন? স্বদেশ হিতৈষিণী কবনিলিয়ার পুত্র না হইলে গ্র্যাফাই নামক ভ্রাতৃদ্বয় জন্মভূমি রক্ষা হেতু কি জীবন দানে সাহস পাইতেন? কখনই না।

অতএব জননীর গুণেই যে সন্তানগণ সৎ হয়, এবং তাঁহার চরিত্রই যে তাহাদের একমাত্র আদর্শ ইহা বলা কেবল বাহুল্য। কারণ মানব প্রকৃতি কিছু মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে সময়ের সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা এই সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রকৃত অর্থ এই যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে সময়কে নিয়োগ করা। যাহা কিছু আমাদের বিবেক-সম্মত, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা যে আহার করি, নিদ্রা যাই, সন্তান পালন করি, গৃহকার্য্য দেখি বা অন্যান্য কার্য্য করি, নিশ্চয়ই এই সকল কার্য্য পরোপকার, উপকারীর প্রত্যুপকার, গুরুজনের সেবা প্রভৃতি সৎকার্যের ন্যায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এ নিমিত্ত বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সকল কার্য্যে উপযুক্ত সময় নিয়োগ করিলে কখনই সময়ের অপব্যবহার করা হয় না। তবে যদি কোন ব্যক্তি ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু সে আলস্যের বশীভূত হইয়া আরও দুই ঘণ্টা অধিক নিদ্রা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ অতিরিক্ত দুইঘণ্টা তাহার অপব্যয় করা হয়, সেইরূপ যে কোন সময় আমরা ঈশ্বরাভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপন করি সেই সময়টিই আমাদের বৃথা নষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মধ্যে মধ্যে আত্ম-চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ আমি কতদিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি, কি লইয়াই বা পরলোকে গমন করিব এবং আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি? এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করা। কারণ এইরূপে আত্ম-চিন্তা করিলে মানবজীবন যে ক্ষণস্থায়ী ও ঈশ্বরলাভই যে তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইতে পারিবে এবং তাহা হইলে এই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই যে আপনা হইতে অভিলাষ জন্মিবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, কার্য্য সকল শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিবার জন্য সময়ের বিভাগ করা। কোন্ সময়ে

কোন্ কার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির থাকিলে সকল কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় এবং সময়েরও অপব্যয় হয় না। এই পৃথিবীতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় কার্য্যের কোন না কোন প্রকার নিয়ম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যে হেতু নিয়মপূর্ব্বক না চলিলে এই ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনে কর্ত্তব্য সকল পালন করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। ইংলন্ডের অধিপতি রাজা আলফ্রেড্ যাঁহার নাম এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসীগণের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি নিয়মপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া নিজের ও নিজ রাজ্যের কি পর্য্যন্ত না কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

উক্ত মহাত্মা দিন ও রাত্রিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যয়ন, অপরাংশ রাজকার্য্য ও স্বদেশোন্নতি এবং অবশিষ্টাংশ আহার নিদ্রা ও ব্যায়ামে অতিবাহিত করিতেন। আমার বিবেচনায় গৃহিণীগণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে চলিতে পারিলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইতে পারেন।

নিদ্রা ৭ ঘণ্টা, স্নান আহার প্রভৃতি ৩ ঘণ্টা, গৃহকার্য্য সন্তান পালন ও তাহাদের শিক্ষাদান ৭ ঘণ্টা, ঈশ্বরচিন্তা জ্ঞানচর্চ্চা ও অন্যান্য সৎকার্য্য ৭ ঘণ্টা।

চতুর্থতঃ, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে গেলে অবকাশকালে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এই সময়ই পাপপুণ্য উভয় পথের মধ্যস্থল। মনুষ্য এইসময়ে যেরূপ চরিত্রশোধন ও আত্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হইতে পারেন, সেইরূপ এইকালেই তাঁহার কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ লোকই অবকাশকালের প্রকৃত ব্যবহার জানেন না। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যত অবসর তাঁহার ততই আলস্য ও বিলাসাসক্তি। ইহা কে না জানেন যে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নিষ্কর্ম্মা ধনাঢ্যের অপেক্ষা শ্রমজীবী দরিদ্র কৃষক অনেকাংশে সচ্চরিত্র?

এই অবকাশকাল কিরূপে যাপন করিলে পাপপথ হইতে রক্ষা পাইয়া, পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহা সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনুষ্য যে সময়ে এই কোলাহল-পূর্ণ সংসার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে যদি তিনি অনন্যমনে পরম পিতা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন যে কত মধুর ও পবিত্র হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অহো! এরূপ ব্যক্তির হৃদয় পার্থিব সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যে কি এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে তাহা দেবতাদিগের বাঞ্ছনীয়!

অবসর কালে যতক্ষণ মনের একাগ্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, ততক্ষণ ঐরূপ ঈশ্বর সাধনে উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট সময় সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত সদালাপ করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন। যেমন চুম্বকের ঘর্ষণে সামান্য লৌহখণ্ডও উহার অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সদালাপে অতি জঘন্য চরিত্রও পবিত্রতা লাভ করে।

সাধুসঙ্গের ন্যায় সদ্ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠেও বিশেষ উপকার দর্শে। উত্তম গ্রন্থ নীরবে মনুষ্যকে হিতশিক্ষা প্রদান করে এবং সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার বলে লোকের বিবেক শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং কুপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়। অবকাশ কালে এইরূপ ঈশ্বর সাধন, সদালাপ এবং সৎগ্রন্থ পাঠের ন্যায়

পরহিতানুষ্ঠান, পবিত্রভাব-পূর্ণ সংগীত গান, প্রেমার্দ্রচিত্তে প্রকৃতির শোভাদর্শন, চিত্র বা শিল্প চর্চ্চা প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য সৎ ও সুখী হইতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কার্ত্তিক ১২৮৮ শ্রী রমাসুন্দরী ঘোষ

## স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ সম্বন্ধে কথোপকথন

### নির্ম্মলা ও প্রমদা

নির্ম্মলা। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি যদি প্রস্ফুটিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে।

প্রমদা। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণ কি?

নি। লজ্জা, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি।

প্র। বিবিরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, পুরুষের সঙ্গে হঠ্ হঠ্ করিয়া বেড়ায় সুতরাং লজ্জা নাই। তবে কি বিবিরা শিক্ষিত হইতে পারে না?

নি। মাথায় ঘোমটা না থাকিলেই যে লজ্জা থাকে না তাহা নহে। লজ্জা ঘোমটায় নহে, লজ্জা মনে।

প্র। মনে লজ্জা তুমি জানিবে কিরূপে?

নি। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে লজ্জা প্রকাশ করিতে দেখা যায় না? ঘোমটা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহারা কাপড়ও পরে না, তথাপি তাহারা মস্তক অবনত করিয়া, অথবা চক্ষু মুদিয়া লজ্জা প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্র। সাহেব আয় বিবি একসঙ্গেই থাকে তাদের আবার লজ্জা কি?

নি। পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ স্ত্রীপুরুষে একত্র অবস্থিতি করিতেন। তাবলে কি তাঁদের লজ্জা ছিল না?

প্র। সাহেব বিবির মতন আর থাকতে হয় না। এমন স্বেচ্ছা বিহার আর কোন কালে ছিল না। এদের লজ্জা কোথায়?

নি। সাহেব বিবির মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন, তাঁদের দেখিলে দেবতা বলে বোধ হয়। লজ্জা থাকিলে এমন ভাল লোক হইতে পারে না।

প্র। লজ্জা না থাকিলে লোক ভাল হয়, তার প্রমাণ কি?

নি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানুষকে ভাল রাখিবার জন্য, লজ্জা, ভয়, বিবেক প্রভৃতি সদ্ভাবগুলি মনের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। যতদিন লজ্জা থাকে, লোকে লজ্জাভয়ে পাপ করে না। লজ্জা নষ্ট হইলে পাপ করা সহজ হয়, যাদের লজ্জা নাই, লোকভয় নাই তাহাদের দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিমে যে সকল বাঙ্গালী লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে, বোধ হয় যে, তাঁহারা কোনকালে ভদ্র সমাজে অবস্থিতি করেন নাই। পৃথিবীতে

অধিকাংশ লোক লোকভয়ে ভাল থাকে, বিবেকে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা অবগত হইয়া ভাল থাকে, এমন লোক অতি বিরল। এজন্য বলি লজ্জা ভয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্র। কিরূপে লজ্জা রক্ষা করিবে?

নি। পাপভয়ে সঙ্কোচের নামই লজ্জা। পাছে মলিনতা জন্মে এই ভাব মনে থাকিলেই লজ্জা উপস্থিত হয়। পরপুরুষের মুখ দেখিলেই যে স্ত্রীলোকের লজ্জা যায়, তাহা নহে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করেন, অথবা সর্ব্বদা পাপাচরণে কলঙ্কিত হন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে সতীস্ত্রীর লজ্জা উপস্থিত হইবে। আমাদের দেশে উল্টা ব্যবহার। ভদ্র মহিলাগণ শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য পরিচিত ভদ্র লোক দেখিয়া ঘোমটা দিয়া লজ্জা প্রকাশ করেন। অথচ অপরিচিত পুরুষ অথবা নীচপ্রকৃতি ভৃত্যবর্গের নিকট কিছুমাত্র লজ্জা প্রকাশ করেন না। ইহা প্রকৃত লজ্জা নহে।

প্র। এরূপ লজ্জা করিলে স্ত্রী স্বাধীনতা হইতে পারে না।

নি। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত লজ্জার বিরোধ উপস্থিত হয় না। ঈশ্বরের অধীন হওয়া অথবা কর্ত্তব্য ভাবের অধীন হওয়া স্বাধীনতা, পাপভয়ে সঙ্কোচের নাম লজ্জা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, কর্ত্তব্য বুঝিয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া, কার্য্য করাই প্রকৃত স্বাধীনতা, গাড়ী ঘোড়া চড়াও স্বাধীনতা নহে, কেবল পুরুষের মধ্যে মিলামিশি করাও স্ত্রীস্বাধীনতা নহে, অথচ কর্ত্তব্যবোধে ঐ সকল কার্য্য করা যাইতে পারে।

প্র। এরূপ ভাবে কজন স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? তোমার কেবল স্বাধীনতা না দিবার ফিকির।

নি। যাহাই বল আমি যাহা ভাল বুঝি বলিলাম ফিকির ফাকীর কিছু বুঝি না।

প্র। লজ্জা থাকিলেও কি লোকভয়ের প্রয়োজন?

নি। লজ্জা থাকিলে লোকভয় থাকিবে না তাহা নহে। জনসমাজের শাসনের নামই লোকভয়। দুষ্কর্ম্মে যে লোকভয় তাহাই আদরণীয়; তদ্দ্বারা অনেকে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে, কিন্তু সৎকার্যে লোকভয় করা অনুচিত, ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার লোকভয়ের প্রয়োজন হয় না। তিনি কেবল ঈশ্বরকেই ভয় করিয়া বলেন, তাঁহার চরণ পাপপথে যাইতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়। লজ্জা, বিনয় ও সুশীলতা তাহার আভরণ হইয়া থাকে।

মাঘ ১২৮৮

## সংসার*

### বামাগণের রচনা

আমি কখনও কোন সভায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি নাই; অদ্য এই প্রথম চেষ্টা। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এই অসম্পুর্ণ প্রবন্ধ পাঠে কাহারও বিশেষ কিছু উপকার কিম্বা শ্রুতি-সুখ হইবে না। তবে যে আজ এই গুরুতর বিষয় লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম, ইহা কেবল এই সভার অনুমতিক্রমেই বলিতে হইবে। একে মনে ভাল ভাব নাই, তাহার

* বঙ্গমহিলা সমাজের ১৪ই ফাল্গুনের আলোচনাসভায় শ্রীযুক্তা গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

উপর আবার ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও নাই, তাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আপনারা বিরক্ত না হইয়া আমাকে স্নেহ গুণে ও সরল মনে ক্ষমা করিবেন।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে মানুষ প্রথমে সামাজিকতা শিক্ষা করে; আমরা সেই সামাজিক মনুষ্য এবং সংসারী। যদি সংসারী হইলাম, তবে সংসার সম্বন্ধে আমাদের কি কি জানা আবশ্যক এবং সংসার কি প্রকারে সুন্দর করা যায় এতৎবিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভগ্নীগণ! আসুন আজ সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

সংসার অনিত্য, অসার ও শোক দুঃখে পূর্ণ; যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই মায়া, এই মতটী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; এই মতের দ্বারা আমাদের দেশের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। একেত পরাধীনতা, তাহার উপর এই মত। আর কি মনুষ্যের উদ্যম উৎসাহ এবং কার্য্যকারিতার শক্তি থাকিতে পারে? এইজন্য আমাদের দেশের এত দুরবস্থা! ধর্ম্ম করিতে গেলে সংসার ছাড়িতে হয় এবং সংসার করিতে হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, এই দেশের প্রচলিত মত। এখন আমরা এই সকল মতকে ভ্রম বলিয়া মনে করি, বর্তমান সময়ে আমরা এই বিশ্বাস করি যে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়াই আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং সৎকর্ম্মশীলা হইব।

সংসারে দয়া, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা এবং পবিত্রতা শিক্ষা করিতে হইবে। যতই এই সকল বিষয় আলোচনা করিব এবং জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিব, ততই ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিব। এইভাবে সংসারকে দেখিলে আমরা কত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিব! যে সংসারে রাগ নাই, প্রফুল্লতা আছে, হিংসা নাই সৎভাব আছে, মিথ্যাচরণ নাই সত্যনিষ্ঠা আছে, সেই সংসারই প্রকৃত সংসার; যে সংসারে সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান ধর্ম্ম এবং মান সম্ভ্রম বর্ত্তমান, সেই সংসারই সুন্দর; পুণ্য পবিত্রতা সেই সংসারে বিরাজ করে। যত দিন না আমরা নিজের সংসারকে এইরূপ সুন্দর করিতে পারিব, তত দিন আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব না। সংসারী হইয়াও সকল সময় সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। যদি নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া জীবনের প্রত্যেক ঘটনা স্মরণ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা কত সময় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া সংসার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া থাকি। আমরা চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্য-ভাবশূন্য হইয়া কি অনেক সময় সংসার কার্য্য করিয়া থাকি না? "নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তা করিবে" এই উপদেশটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন পালনীয়, সংসার সম্বন্ধেও তেমনি। জীবনে যদি সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই, তাহা হইলে আমাদের কতকগুলি সৎগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সৎগুণগুলি কি, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা সকল সময় বুঝিতে পারি না। দয়া, ভক্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, এবং বিনয় প্রভৃতি কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, এইগুলি আমরা আমাদের জীবনের মূলে গ্রথিত করিয়া লইতে পারিলে সংসার পথে চলিবার সময় কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে পারে না, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তখন তাহাতেই সুফল লাভ করিতে পারিব।

তবে আসুন আর বিলম্ব না করিয়া আমরা সংসার মধ্যে যে সকল সৎগুণ চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা দ্বারা জীবন গঠন করিয়া সংসারকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করি। দেখিব ইহা কেমন সুখের স্থান, পবিত্র স্থান ও শান্তির স্থান! দুঃখী হই সংসারেই সুখ অন্বেষণ করিব, শান্তিবিহীন হই সংসারেই পুণ্যকামনা করিব এবং অহঙ্কারী হই সংসারে বিনয়ী হইব, এই সকল স্বর্গীয় জিনিসগুলি যত্ন করিয়া জীবনে লাভ করিতে পারিলে আমাদের প্রত্যেক সংসার সুন্দর করিতে পারিব এবং সুখানুভব করিতে পারিব।

সংসার সুন্দর করিতে হইলে একদিকে যেমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন, তেমনি অন্য দিকে কতকগুলি কু-অভ্যাস দূর করা আবশ্যক। আমরা পরিশ্রমে বিমুখ অথবা আলস্যপ্রিয় হইলে এবং দিবসে নিদ্রা যাইতে অভ্যাস করিলে সংসারকে সুন্দর এবং জীবনকে ভাল করিতে পারিব না। যাহাতে পতি পুত্র কন্যা এবং পরিজনের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং সংসারের সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে মহিলা সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহার সংসার কখনই সুন্দর হইতে পারে না। সংসার সুন্দর করা অনেক পরিমাণে আমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যে সংসারে দাস দাসীর উপর সকল কার্য্যের ভার; গৃহিণী অলস ও সুখপ্রিয় হইয়া সময় অতিবাহিত করেন, সেই সংসারে চতুর্দ্দিকেই বিশৃঙ্খল ভাব দেখা যায়। সেই সংসারই সুন্দর যে সংসারে জিনিস পত্র সুব্যবস্থায় রক্ষিত হয়, যেখানে গৃহিণীর দৃষ্টি সকল সময় সংসারের সকল স্থানে থাকে, যেখানে সন্তানদিগের লালন পালনের ও শিক্ষার ভার গৃহিণী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। স্বামীর প্রতি, সন্তানদিগের প্রতি, গুরুজনদিগের প্রতি এবং দাসদাসীর ও অভ্যাগত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যে গৃহিণী নিয়ত রত থাকেন, তাঁহার সংসার সুন্দর হয়। আমরা সেই সংসার ও পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব উত্তমরূপে রাখা আবশ্যক। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে সংসারে কোন প্রকার অঘটন উপস্থিত হয় না। সকলেরই ভাল খাইব, ভাল পরিব মনে হইতে পারে, কিন্তু আয়ের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যজ্ঞান চালনা করিয়া যদি সুব্যবস্থা মতে ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে ভাল খাইলাম না, ভাল পরিলাম না বলিয়া মনে কষ্ট পাইতে হয় না। এইরূপ অনেক পরিবার অন্যায় ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, এমন কি আজ গত হইলে কাল কি খাইবেন এমন সংস্থান নাই, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয় । বর্ত্তমান সময় আমাদের উপর এই সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কি বলিতে পারি যে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা? এইরূপ বলিতে পারিলে বড় সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে অবিবেচনার দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। আমি এই বিষয় অধিক বলিতে চাই না; আমার এই মাত্র নিবেদন যেন এতৎ বিষয়ের উপর আমাদের সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বকালের গৃহিণীদের এ বিষয়ে বিশেষ বহুদর্শিতা ছিল, এখনকার গৃহিণীদের এই বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য ভাব দৃষ্ট হয়। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা সন্তানদিগের অল্প অসুখেই চিকিৎসকের প্রার্থী হন, আর যাহাদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁহারা সেইরূপ অসুখকে উপেক্ষা করেন, এই দুয়ের ফলই মন্দ। এক দিকে অর্থ নষ্ট

অপর দিকে রোগ বৃদ্ধি। তাই প্রত্যেক সংসারে চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

এই প্রকারে সংসারে সমস্ত কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করিয়া লইতে পারিলে আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব। আমরা যেন উদ্দেশ্যবিহীন ও কর্ত্তব্যশূন্য হইয়া সংসার পথে ভ্রমণ না করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ফাল্গুন ১২৮৮

## নারী-জীবনের উদ্দেশ্য

### বামাগণের রচনা

(বঙ্গমহিলা সমাজের পারিতোষিক রচনা)

লক্ষ্যহীন জীবন কর্মহীন তরীর ন্যায় দুর্গতির কারণ। সুতরাং যাঁহার যেরূপ আশা ও কার্য্যনিপুণতা সেরূপ আপনাপন জীবনের এক একটী উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি সৃজনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশ কাল ভেদে নানাপ্রকার মত ভেদ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ বলিবেন, অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ হইয়া পারিবারিক কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য নাই; কাহার কাহার মতে জগতে যাহাতে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার হয়, তজ্জন্য জীবন অর্পণ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি তাঁহাকে সংসারের অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয় তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই উভয় মতই আতিশয্য দোষে দূষিত। নারী কেবল আপন পারিবারিক কতিপয় সামান্য কার্য্য করিয়া অমূল্য জীবন কাটাইবেন, আত্মপরিবার ভিন্ন জগতের অন্য লোকের সুখ দুঃখের সংবাদ রাখিবেন না, ইহা যেমন একান্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মত, অপর দিকে নারী আত্মপরিবারের সুখের দিকে ও সমাজের ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনে বিব্রত হইবেন, ইহাও সেইরূপ অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক মত। সত্য ধর্ম্মের বহুল প্রচার, কুসংস্কার পূর্ণ সমাজের সংস্কার সাধন ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু সংসারে আসিয়া যে কোন শুভকার্য্য সম্পাদনার্থে যে চিরকুমার হইতে হইবে ইহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ বাক্য নহে। সংক্ষেপে নারী জীবনের উদ্দেশ্য ইহা বলা যায় যে ঈশ্বরের বিধি অবগত হইয়া কার্য্য, বাক্য বা চিন্তায় তাঁহাকে অতিক্রম না করিয়া জীবনের গুরুতর কর্তব্য পালন, হৃদয় মন ও আত্মার সম্যক উন্নতি সাধন ও তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত যে সমুদয় কমণীয় গুণাবলীর অধিকারিণী যাহাতে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া পৃথিবীতে দেবলোকের শোভা বিস্তার করে, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন প্রকাশ নারী জীবনের উদ্দেশ্য। সে সমুদয় কার্য্য করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহাদ্বারা তাঁহার জীবন দিন দিন দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়, ও

তাহা তাঁহার সর্ব্বথা পরিহার্য্য, যাহা তাঁহাকে দেবতার স্বর্গীয় সিংহাসন ভ্রষ্ট করে।

এখন দেখা যাউক কি কি উপায়ে বঙ্গনারীগণ হৃদয় মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নীতিগর্ভ বা উপদেশপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিলে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। কেবল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেই হয় না, যাহাতে উহার অন্তর্গত নীতিগুলি মনে রাখা যায় ও কার্য্যকালে উপকারে আসে, তদ্বিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ করিতে হয়। সর্ব্বদা সাধু আলাপ, সাধু সহবাস ও সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ করিলে তাহা হৃদয়ের উন্নতি সাধনের প্রধান সহায় হইতে পারে। গৃহ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্যে সময় ক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট সময় আত্মোন্নতি সাধনে অর্পণ করিবেন। ঈশ্বরকে লাভ করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য; ঈশ্বরের আদেশ পালন জন্যই তাঁহার সংসারে আগমন; তিনি যে কর্ত্তব্য কার্য্য করুন না কেন, তাহা সম্পাদন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া করিবেন; বিনাড়ম্বরে নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মের উচ্চব্রত পালনে একান্ত তৎপর হইবেন। স্বীয় জীবনে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সংসারাসক্ত লোকের মন সেই পরম দেবতার দিকে আকৃষ্ট করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও ইহাই তাঁহার জীবনের গৌরব।

নারীজাতির সৃজনের লক্ষ্য অতি উচ্চ। ঈশ্বর নারী জাতি এইজন্য সৃজন করিলেন, যে স্ত্রীর কোমল প্রকৃতির প্রভাবে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে কোথাও এই উচ্চ লক্ষ্য প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পুরুষদিগকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং আপনারা স্বার্থপর হইয়া পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে অনেক যুবকের পৃথিবীর কল্যাণ-সাধন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকে, কিন্তু বিবাহের অল্প কালের মধ্যেই সে উৎসাহ কোথায় লুক্কায়িত হয়। স্ত্রীর সংকীর্ণ মত কি ইহার কারণ নয়? এত বড় আত্মা, যাহা সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ভাল বাসিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ হয়। অমরাত্মা বিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কে কলঙ্কিত হয়। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের হৃদয় একান্ত স্বার্থপরতার আধার; অশিক্ষা, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি ইহার কারণ। স্ত্রীলোকের আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার নিয়ম নাই। সেই ক্ষুদ্র গৃহ ব্যতীত পৃথিবীতে যে আর কোন স্থান আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। সুতরাং সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থ আত্মীয়গণের প্রতি তাহাদের সমুদয় অনুরাগ পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, দয়া, দেশানুরাগ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হৃদয়বৃত্তিগুলি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর আপন কোমল হস্তে নারীহৃদয়ে যে সকল মধুর ও উচ্চভাবের বীজ বপণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত ও অনুকূল অবস্থার অভাবে ও স্ফূর্তিবিহনে সে সকল শুষ্ক হইয়া যায়। নারী কেবল আপনাপন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিয়া নিশ্চন্ত, হইলে, তাহার কলঙ্ক হইবে, অতএব তাঁহার সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। আপনার দোষে যেন নারী উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মে কেবল আপনাকে উন্নত করিলে হইবে না, যাহাতে অন্যে সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মরত্নের অধিকারী হয়, তজ্জন্য একান্ত চেষ্টা করিবেন। তাঁহার পরহিতৈষণা কেবল আত্মপরিবারে আবদ্ধ থাকিবে না, প্রত্যুত উহা পরহিতৈষণায় পরিণত হইয়া জগতে প্রচারিত হইবে। নারীর সংসারই প্রধান কার্য্যক্ষেত্র বটে, কিন্তু একমাত্র নহে, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। পাপী তাপীর দুঃখ নারীর কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয় ভিন্ন কে আর উপলব্ধি

করিবে? নারী ব্যতীত কে আর তাহাদের তাপিত মস্তক স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে? পতিত আত্মার উদ্ধার নারী ব্যতীত আর কে করিবে? একজন পরহিতৈষিণী নারী একজন পুরুষ অপেক্ষা অধিক সমাজের উপকার করিতে পারেন। ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে অনেক স্ত্রীলোক সমাজের কোন বিশেষ বিশেষ কল্যাণ সাধন উদ্দেশে চির কৌমার্য্য অবলম্বন করেন। কৌমার্য্য আর কিছুই নয়, পবিত্র-জীবন লইয়া পবিত্র-হৃদয়ে পবিত্র-মহৎ কার্য্যে জীবন অর্পণ করা; নিঃস্বার্থ পরোপকারের ন্যায় উচ্চতর ব্রত আর কোথায়? আমাদের দেশে ইংলন্ডের ন্যায় উক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, তবে বঙ্গবালবিধবা দ্বারা উক্ত অভাব মোচন হইতে পারে। যাঁহাদেব নিকট সংসারের সমুদায় সুখভোগ চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধন করাই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের ন্যায় এ পবিত্র ব্রত সাধনের উপযুক্ত আর কে? বিধবারা ধর্ম্ম-সাধন উদ্দেশে নানাপ্রকার দুর্ব্বিষহ কষ্ট স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার ন্যায় পুণ্যকর ব্রত আর কি? এ ব্রত সাধন করিলে হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে। কেহই বলিতে পারেন না ঈশ্বরের গৃহে আমার কোন কার্য্যই নাই। অল্পবুদ্ধি, দরিদ্র প্রতিজনেরই কার্য্য আছে, জীবনের দায়িত্ব আছে। অকিঞ্চিৎকর বেশভূষা বা স্বীয় পরিবারের ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য নারীর জন্ম হয় নাই; কেবল আপন সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহার জীবন নয়, পৃথিবীর মঙ্গলসাধন জন্য অন্যার্থে জীবন উৎসর্গ উদ্দেশে তাঁহার জীবন। নারী স্বীয় শরীর ও মন হইতে যাহা কিছু সেবার উপহার দিবেন, তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবী উন্নত হইবে। ঈশ্বর নারীহৃদয়ে যে শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, বল ও অন্যান্য গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই জন্য, যে নারী ঈশ্বরের অনুগত দাসী হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহা বিতরণ করিবেন, ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা, বল, উৎসাহ জগতের কল্যাণে উৎসর্গিত হইবে। আর স্বার্থপর হইয়া আপন সুখোন্নতির জন্য অনবরত চেষ্টা করা কর্তব্য নয়। যে জীবন জগতের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে সে অমূল্যজীবন অবহেলায় বা সামান্য কার্য্যে বৃথা অতিবাহিত না হইয়া জগতের কল্যাণার্থে উৎসর্গিত হউক, তাহা হইলে জগতে অল্প দিন মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, নারী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা, তাহা গৌরবের সহিত সুসম্পাদিত হইবে; ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ ও তাঁহার পবিত্র নাম ধন্য হইবে।

ভাদ্র ১২৮৯ — শ্রী লাবণ্যপ্রভা বসু।

## গৃহিণী

**বামাগণের রচনা**

যে গৃহের গৃহিণীরা বাবুয়ানা করেন, অথবা আলস্য বশতঃ সংসারের কাজে মনোযোগ দেন না সেই গৃহ যে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ সেই গৃহ রোগ শোকের আলয় হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন গৃহস্বামীকেও অনেক সময় অপব্যয় স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীর উদাসীনতা বশতঃ অনেক সময়

অনেক আপদ বিপদ আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত করে। তিনি কোন কাজই মনোযোগের সহিত দেখেন না, কাজেই তাহা দাস দাসীর হস্তে দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এমন কি নিজের সন্তানের লালনপালন পর্য্যন্ত দাস দাসীকে ভার দেন। সুতরাং শিশুদিগকে সদা সর্ব্বদাই অসুখ বিসুখে অস্থির করে। শিশুদের যাহা আহার করাইলে অসুখ হইবে, তাহারা তাহাই আহার করায়। এক এক গৃহিণী আলস্যবশতঃ দুধ পর্য্যন্ত দাস দাসীকে খাওয়াইবার ভার দেন। তাহারা হয়ত দুগ্ধ উত্তপ্ত না করিয়াই পান করায়, অথবা নিজে কিছু ভাগ চুরি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জল মিশ্রিত করিয়া পান করায়। ইহাতে যে শিশুদের কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। অনেক গৃহিণী শিশুদিগকে দাস দাসীর হস্তে দিয়া বহুক্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, সেই সময় দাস দাসীরা রাখিতে অক্ষম হইয়া যাহা খাওয়াইলে শিশুদের পীড়া জন্মিবে, তাহাই খাওয়াইয়া কোন মতে প্রবোধ দিয়া রাখে, কিন্তু পরে শিশুদের এমনি অসুখ হয় যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে। দাসদাসীরা প্রায়ই চোর, কখনও কখনও হয়ত নিজে দুধটুকু ও অন্যান্য ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়া বলে সে খাওয়াইয়াছে। গৃহিণী তাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী শিশুকে দাসদাসীর হস্তে দিয়া নিজে (দিনের বেলা) দুই তিন ঘণ্টার জন্য নিদ্রাভিভূত হন, সেই সময় দাসদাসীরা শিশুকে রাখিতে অক্ষম হইয়া কখনও বা প্রহার করে, কখনও বা অখাদ্য দ্রব্য খাওয়াইয়া ভুলাইয়া রাখে, অথবা যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যায়।

অনেকে বলিবেন যে শিশুদিগকে দাসদাসীর হস্তে না দিলে কি প্রকারে চলে? তার উত্তর এই, অবশ্য না দিলে চলে না, কিন্তু নিজের দৃষ্টিও তাদের প্রতি বিশেষরূপে রাখা উচিত। তাহা না হইলেই অনভিজ্ঞ দাসদাসীর ব্যবহারে শিশুদের পীড়া উৎপন্ন হইয়া পিতামাতাকে বিপদগ্রস্ত করিবে।

আবার কোন কোন গৃহিণী আলস্য বশতঃ রন্ধন কার্য্যের ধার দিয়াও যান না, সমস্ত দ্রব্যাদি দাসদাসীর হস্তে দিয়া রাখেন, তারা যা করে গৃহিণী তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। নিজহস্তে ব্যবহার করিলে যে দ্রব্যে এক মাস যাইত, সে দ্রব্য এক সপ্তাহেই শেষ হইয়া যায়। তবু সকলের তৃপ্তির সহিত আহারাদি হয় না। গৃহস্বামী আহারাদির এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া দাসদাসীকে ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া থাকেন, কিন্তু পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকে।

এখন ভগ্নীগণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি এই দোষ কাহার? এই দোষ কি আমাদের নয়? দাসদাসীকেই বা ভর্ৎসনা ও প্রহার করিলে কি হইবে? তারা ছোটলোক, তারা কিরূপে আমাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের পছন্দসই কাজ কর্ম্ম পরিপাটী রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে?

যে গৃহিণী নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম হন অর্থ্যাৎ রন্ধানাদি করিলে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারও একান্ত উচিত রন্ধনাদির সময় পাচক পাচিকার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এক এক গৃহিণীর এতদূর আলস্য যে মাসের মধ্যে হয়ত একবারও রন্ধনশালায় যান না। তাঁহার কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট দাসদাসী থাকিলেও তাঁহার রন্ধনশালায় যাওয়া কর্ত্তব্য, এবং ঠিক সময়ে রন্ধনাদি হইবে কিনা তাহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। কোন কোন গৃহিণীর দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই, শুদ্ধ পরিপাটীরূপে রন্ধনাদি করিয়া তৃপ্তির সহিত আহারাদি করান, তাহারই অভাব। যদি গৃহ-স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া কখনও কোন ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলেন, তাহা হইলেও তিনি আলস্যের

বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজহস্তে করার পরিবর্ত্তে দাস দাসীকে করিতে আদেশ দিয়া নির্ভাবনা হইয়া আহ্লাদ আমোদে নিযুক্ত থাকেন। এদিকে যখন আহারের সময় হইল, তখন গৃহ-স্বামী আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু কিছুর সঙ্গেই দেখা শুনা নাই, কোন তরকারি হয়ত অর্দ্ধেক প্রস্তুত হইয়াছে; কোনটা বা এখনি চড়ান হইবে। আর তিনি গৃহিণীকে যাহা প্রস্তুত করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গৃহিণীর আজ্ঞানুসারে দাস দাসীরা প্রস্তুত করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখে দিবার যো নাই। গৃহ-স্বামী আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সব ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ভগ্নীগণ একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! আমরা আমাদের স্বামীর নিকট কত অপরাধিণী! যে স্বামী আমাদের বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য এবং নানা রকম সুখ সচ্ছন্দতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহার আহারাদির জন্য যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হই। আমাদের এই পাপের শাস্তি অবশ্য একদিন ভুগিতে হইবে। আপনারা হয়ত বলিবেন যে আমাদের সংসারের কার্জ ভিন্ন অন্যান্য আরো সৎকাজ আছে, যাহাতে আমরা সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। তাহা সত্য বটে, কিন্তু যে গৃহিণী সংসারের কার্য্য করিয়া অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে সেই সকল সৎকার্য্য করা না করা উভয়ই সমান। যদি গৃহিণীর নামে অপবাদ হইল, তবে কোন্ বাহিরের খ্যাত নামে সংসারের বিশৃঙ্খলতা দূর হইবে?

আশ্বিন ১২৮৯ শ্রী—।

# গৃহশ্রী সম্পাদন

(কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত)

গৃহের শ্রী সম্পাদন করিতে হইলে সুরুচি ও শ্রমপরায়ণতা এই দুইটি গুণের অত্যন্ত প্রয়োজন। আলস্য পরায়ণা গৃহিণীর গৃহকার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না, সুতরাং তদ্দ্বারা আর গৃহের সুশৃঙ্খলতা কিরূপে সাধিত হইবে? পরিষ্কার স্বভাব গৃহের শ্রী সম্পাদনের প্রধান উপকরণ, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য অভাবে ধন-কুবেরের গৃহ প্রেতনিবাসবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে আর দরিদ্রের পর্ণকুটিরও সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা গুণে মুনি-তপোবন তুল্য রমণীয় হইতে পারে।

মহাভারতে এ বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ব্বাসা মুনি একদা মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে সেই দেব-বাঞ্ছিত ইন্দ্রপ্রস্থও পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা অভাবে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, পরে তিনি কুরুরাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কাম্যকবনে ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যুধিষ্ঠির একটি সামান্য কুটীরে ভার্য্যা সহ বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সুপরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন হওয়াতে ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। মুনি তদ্দৃষ্টে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "হে রাজন্! তুমি কুটীরে বাস করিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছ, তোমার কুটীরের তুলনায় দুর্য্যোধনের ইন্দ্রপ্রস্থ

নিতান্ত হীন।" বাস্তবিক পরিষ্কার কুটীর যে বিশৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্ন অট্টালিকা হইতে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের প্রাচীনা গৃহিণীগণের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির প্রতি যেরূপ ঘৃণা আছে, দুঃখের বিষয় গৃহ পরিষ্কার করণ বিষয়ে তদ্রূপ যত্ন নাই। তাঁহারা "উচ্ছিষ্ট উচ্ছিষ্ট" করিয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত, কিন্তু গৃহের পারিপাট্য সাধনে কতটুকু চেষ্টা করেন? শিক্ষিত মহিলাগণ এখন বিলাতি বিবিদের ভাল মন্দ অনেক দোষগুণ অনুকরণ করিতে সতত ব্যাকুলা, গৃহপারিপাট্য ও সুপরিচ্ছন্নতা তাহারা বিবিদিগের নিকট যেন যত্নের সহিত শিক্ষা করেন।

ইংরাজ মহিলাদিগের পারিপাট্যপ্রিয়তা এতদূর প্রবল যে একটী বিবি একদিন আমার কতকগুলি শিল্পকার্য্য বাক্স হইতে বাহির করিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার অনেক স্থানে অতি অল্পকাল মধ্যে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি শিল্পগুলি পূর্ব্ববৎ বাক্সে সজ্জিত করিয়া না রাখিয়া গেলেন না; আমি জানিতাম তাঁহার সময়ের অত্যন্ত অল্পতা, তজ্জন্য পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে আপনি অমনি রাখিয়া যাউন, আমি ঠিক করিতেছি, কিন্তু আমার কথায় তিনি বিরত হইলেন না, শিল্পগুলি সাজাইয়া তৎপরে টেবিলের বইগুলি পর্য্যন্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিদায় লইলেন।

ইংরাজ রমণীগণ গৃহপারিপাট্যে অত্যন্ত সুপটু। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাই ইহার মূল। ইংরাজ মাত্রেই আপন বাসভবন পরিষ্কার এবং সুপরিপাটী করিয়া রাখে।

আমাদের জাতির এই গুণটীর সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যগণের এরূপ ছিল না, কেননা মুনিঋষিদের সামান্য তপোবন হইতে রাজাদিগের প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকলই পূর্ব্বকালে সুপরিপাটী ও সুপরিচ্ছন্ন ছিল।

দেশের স্বাধীনতা ও সভ্যতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের সুরুচিও অন্তর্হিত হয় সন্দেহ নাই, কেননা শোভানুভাবকতাশক্তি যদি আর্য্যদের না থাকিত, তবে কালিদাস মেঘদূতে অলকাপুরীর ও রূপ বর্ণনা কখনই করিতে পারিতেন না। পুরাণাদিতে এক একটী তপোবনের সুন্দর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কাহার অট্টালিকা ছাড়িয়া কুটীরে বাসের বাসনা না হয়? গৃহসামগ্রী উত্তম উত্তম না হইলে যে গৃহ সুপরিপাটী এবং পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না এমন নয়; আমাদের দেশ যেরূপ নির্ধন, তাহাতে কিছু মাত্র অর্থ সঞ্চয় না করিয়া কেবল মূল্যবান বিলাতি জিনিষে গৃহপূর্ণ করা অতিশয় অন্যায়। দেশীয় এবং স্বহস্ত প্রস্তুত নানা প্রকার অল্পমূল্য শিল্পদ্বারা ঘর সাজাইবার সঙ্কল্প করা ভাল, তাহাতে দুইটী উপকার আছে, (১) দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন এবং (২) দেশের টাকা দেশে রাখা। বিলাত হইতে চাকচিক্যশালী জিনিষ আনিয়া বিদেশীরা দেশের টাকা প্রচুর পরিমাণে লইয়া যায়, দেশের শিল্পিগণ অর্থাভাবে কষ্ট পায়, এ বড় দুঃখের বিষয়। দেশের শিল্পের আদর করিয়া যাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, ধনিগণের তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করা উচিত। প্রাচীণ গৃহীণীগণ নানাপ্রকার পুঁতির ঝাড় এবং মাটির সাজ ও সোলার ফুল ইত্যাদি সাধারণ শিল্প স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া গৃহ সাজাইতেন, সেই সমস্ত এক্ষণকার মহিলাগণের রুচিসঙ্গত হইবে না, কিন্তু ভাল ভাল শিল্প প্রস্তুত করিয়া গৃহ-সজ্জিত করিয়া তাঁহারা সুখী হইতে পারেন। উত্তম উত্তম ছবি এবং ভাল ভাল সূচি কার্য্য দ্বারা গৃহশ্রী সম্পন্ন হইতে পারে।

গৃহিণী শ্রমশীলা, পরিচ্ছন্ন ও পারিপাট্যপ্রিয়া হইলে গৃহকার্য্যের ব্যবহৃত সামান্য জিনিষ দ্বারাও গৃহ সুন্দর করিতে পারেন। জিনিষ পত্রগুলি যদি সুশৃঙ্খলরূপে না রাখিয়া

সকল ঘরে ছড়াইয়া রাখা যায়, তবে ভারি বিশ্রী দেখায় এবং জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়, কার্য্যেরও অনেক অসুবিধা ঘটে।

অনেক গৃহিনীর গৃহে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। ছেলে স্নান করিয়া আসিয়া মাতার নিকট পরিধেয় বস্ত্র চাহিল, মা একবার এঘর ওঘর ঘুরিলেন, পরে গৃহকোণে স্তূপাকার বস্ত্র রাশি ওলট পালট করিয়া ছয় দণ্ডে একখানি বস্ত্র বাহির করিলেন। কর্ত্তা বাহির হইতে ঘরে আসিয়া মুখ ধৌত করিয়া গামছাখানি চাহিলেন, গিন্নি তন্ন২ করিয়া খুঁজিয়া বহুক্ষণের পর ছোট ছেলেদের শয়নের কাঁথার ভিতর হইতে ভিজা গামছাখানি বাহির করিলেন। এই প্রকার নানা বিশৃঙ্খলতা ও অপরিচ্ছন্নতা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যাহার যেরূপ জোটে সেইরূপ আল্‌নাতে হউক অথবা দড়ি টাঙ্গাইয়া হউক বস্ত্রগুলি এক একখানি করিয়া সাজাইয়া রাখিলে আর এমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, দেখিতেও বেশ দেখায়, এক প্রকার গৃহ সামগ্রীতেই কোন গৃহিণীর গৃহ যেন হাসিতেছে বোধ হয়, আর অন্যের গৃহ যেন মলিন মুখে কাঁদিতেছে দৃষ্ট হয়।

পরিচ্ছন্না রমণী পাকান্তে পাকপাত্রগুলি উত্তররূপে ধৌত করিয়া, সুন্দররূপে সাজাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন, পাকশালা ধৌত বা লেপন করিয়া রাখেন, দেখিলে নয়নের প্রীতি হয়। অপরিষ্কৃতা আলস্য পরায়ণা কোনমতে পাকটা নামাইয়া অধৌত হাঁড়ি এখানে ওখানে পাড়িয়া কালী ঝুলিতে পাকশালা ভরিয়া অপরিষ্কার অন্নরাশি গ্রাস করিতে বসেন, এইরূপ স্ত্রীলোকের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু কণ্টকিত হয়।

বাসভবনের প্রাঙ্গণে যে স্থান থাকে, তাহা পতিত ফেলিয়া রাখিলে ধূলি কর্দ্দম হইয়া নানা প্রকারে অপরিষ্কার হয়, কিন্তু দুর্ব্বার চট বসাইয়া দিলে দেখিতে শ্যামল শ্রী এবং ধূলিকর্দ্দম নিবারিত হয়। প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বে দাড়িম্ব আতা পেয়ারা সপেটা প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ফলের গাছ রোপণ করিলে প্রাঙ্গণ ছায়াযুক্ত হয় এবং ছেলেরা নূতন২ ফল খাইয়া আনন্দিত হইতে পারে। নিজ বাড়ীতে উৎপন্ন করিতে পারিলে ফল ও তরকারী ইত্যাদি যেরূপ উত্তম ও টাটকা পাওয়া যায়, বাজারের জিনিষ কখনই সকল সময় তেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রাঙ্গণের প্রশস্ততা বিবেচনায় নানাপ্রকার শাক ও সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। এই প্রকার ফল ফুলে সুশোভিত বাটীতে বাস করিলে মনে এক প্রকার অতুল আনন্দ অনুভূত হয় এবং মন পবিত্র ও প্রসন্ন হয়।

বিলাতি মূল্যবান জিনিস দ্বারা ঘর ভরিলেই যে গৃহশ্রী সাধিত হয় না, আমাদের দেশের অনেক ধনীর গৃহই তাহার সাক্ষী স্বরূপ। জিনিসগুলি ধূলিপূর্ণ এবং যে জিনিস যেখানে রাখা হইয়াছে, তাহার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—আর তাহা নাড়া হইবে না, তাহার নীচে আজন্মের ধূলি সঞ্চিত থাকিবে।

গৃহশ্রী এবং গৃহ পরিষ্কার সম্বন্ধে উপকার পাইতে হইলে যে সকল মহিলা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে সুশীলার উপাখ্যান, মেজবউ এবং সুরুচির কুটীর পাঠ করা এবং তদনুরূপ আচরণ করা উচিত। ইংরাজিতে গৃহ সাজান বিষয়ে অনেক সুন্দর উপদেশ আছে, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা তৎসমুদায় পাঠ করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে দালান কোটা ও উত্তম উত্তম মূল্যবান গৃহসামগ্রী এবং বহু দাস দাসী না থাকিলে আর গৃহের শ্রী হইতে পারে না; কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভ্রম। দরিদ্রের যৎসামান্য নিকেতনও ধনীর বাসভবন হইতে সুন্দর দেখিয়া অনেক সময় নয়ন

মন প্রীত হয়। একদিন এক ধনীর ভবনে গমন করিয়াছিলাম, সে বহুদিনের কথা, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই ছবিটী মনে অঙ্কিত আছে। বৃহৎ অট্টালিকা, কোন স্থানে অঙ্গারের স্তূপ, কোথায় গৃহ-নিক্ষিপ্ত আবর্জনা রাশি পচিয়া পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে, বড়২ ঘরগুলি মাকড়সার জালে সমাচ্ছাদিত, মূল্যবান সুন্দর ছবি বিশিষ্ট আয়নাগুলি মাকড়সার জালে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে, খাট পালঙ্ক চেয়ার সোফা সকলি চূণের দাগ, পানের পিচ, ধূলি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ, দেয়ালগুলি তেলের দাগ ও পানের দাগে ভরা; এখানে কলাগুলি মাটীতে পড়িয়া পচিতেছে, ওখানে চিনির পাত্রগুলি পিপীলিকার আধার হইয়া পড়িয়াছে; দাসদাসীগুলি এ জিনিষ চুরি করিয়া খাইতেছে, ও জিনিষ চুরি করিয়া বিক্রয় করিতেছে, এ সংবাদ ঘণ্টায় পাঁচবার পহুঁছিল। গৃহিণীর কোন দিগেই দৃষ্টি নাই, তিনি বসিয়া ছাগলের ন্যায় অনবরত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন, কর্ত্তা অপরিমিত মদ্য পানে অবশ হইয়া পড়িয়া আছেন। দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ জমিদারী লুটিয়া খাইতেছে। এদিগে একটাকার যায়গায় ৫ টাকা খরচ হইতেছে, ৫ টাকার যায়গায় ১০ টাকা লেখা হইতেছে, কিন্তু কোন জিনিষই ভাল হইতেছে না। দাসদাসী অনেক, কিন্তু কাজ কে করায়? যে যাহার ইচ্ছামতে বসিয়া আছে।

পচা নর্দ্দমার গন্ধে আমার নাসিকা জ্বলিতে লাগিল, আমি একটু ভাল বায়ু পাইবার আশায় ছাদে গিয়া উঠিলাম, প্রাণ অনেক জুড়াইল, এদিগ ওদিগ বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ধনীর ভবন সন্নিহিত একটী সামান্য গৃহস্থের বাড়ী আমার নয়নে পতিত হইল, আমার চক্ষু সেদিগে এমন আকৃষ্ট হইল যে আমি সেই ক্ষুদ্রবাড়িখানির পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিলাম। সবে বাড়ীখানিতে ৩ খানি একতলা কোটা ও একটী বারান্দা। প্রাঙ্গণটী অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ইষ্টকে বান্ধান, পাইখানা সব পাকা এবং ধৌত, সে সিন্দুরের মত রাঙ্গা প্রাঙ্গণে একটী পেয়ারাগাছ এমনি সুপরিষ্কৃত যে তাহাতে একটী মরা ডাল বা পত্র নাই, সুন্দর সতেজ গাছটী ফলের ভারে একেবারে হেলিয়া পড়িয়াছে, আলবালের মধ্যে একটী সিমলতা দড়িতে বান্ধিয়া সেই পেয়ারা গাছটীর সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সিমগুলি থলো থলো হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বাড়ীখানি যেন শান্তিপূর্ণ বোধ হইল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম একটী লোক দেখিলাম না, কি একটী কথা শুনিলাম না। কৌতূহলী হইয়া সেই ধনীর গৃহিণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বড় সঠিক খবর রাখেন না, কেন না শহর যায়গা—প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বড় পরিচয় নাই। যাহা হউক আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, জানিতে পারিলাম যে বাড়ীখানিতে কেবল দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক (মাতা কন্যা) বাস করে, আর পশ্চাৎ দিয়া ধনীর বাড়ী হইতে সেই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে যাইবার একটী ছোট দ্বার আছে। আমি আনন্দমনে এই নরকালয়বৎ ধনীর ভবন পরিত্যাগ করিয়া একটী আত্মীয়ের সহিত ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীখানিতে বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম মাতা কন্যা দুই জন নীরবে যে যাহার কাজ করিতেছে, আমাকে দেখিয়া তাহারা যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল। অনেক মিষ্টালাপের পর আমাকে এক ডালা পেয়ারা উপহার দিয়া বিদায় করিল। আমি দেখিলাম যে সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানির সকলই সুশৃঙ্খল, আমার নিতান্ত বাসনা হইল যে উক্ত ধনীর গৃহিণীকে একবার সেই বাড়িখানিতে লইয়া গিয়া কিছু উপদেশ দেই, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, সুতরাং আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এক সময়ে এরূপ একটী কদর্য্যধনীর ভবন ও সুপরিচ্ছন্ন সুপরিপাটী গৃহস্থ-নিকেতন আমার চক্ষুতে পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্যই আমি তাহা আজও ভুলিতে

পারি নাই। সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানিতে গমন করিয়া আমার দুর্গন্ধপূরিত নাসিকা এবং বিশৃঙ্খলতা-দর্শন-পীড়িত চক্ষু শীতল হইয়াছিল এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকেরও কতদূর শিষ্টাচার এবং সৌজন্য থাকিতে পারে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

আজ পাঠিকা ভগিনীগণের নিকট বিদায় হইলাম, বারান্তরে এবিষয়ে আরও কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

আশ্বিন ১২৯০

# নারী জীবনের উদ্দেশ্য

## বামাগণের রচনা

সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল পদার্থ ও প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের কোন না কোন কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান, তিনি মানবজাতিকে যেরূপ মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, তদনুরূপ গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণও করিয়াছেন, অতএব প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা উচিত। মনুষ্যেরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে একত্রে বাস করে এবং ইহার সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কি তাহাই এস্থলে বক্তব্য।

সংসার যাত্রা যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা স্ত্রীজাতির প্রধান কার্য্য। এ কার্য্য বড় গুরুতর। যখন এতাদৃশ গুরু কার্য্যের ভার নারীদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক রূপে পরিমার্জ্জিত না হইলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতি দুরূহ। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কোনক্রমে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় না, অতএব শিক্ষাই আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। এক্ষণকার অনেক রমণী কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান জ্যোতিঃ এ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয় ক্ষেত্রে বিকীর্ণ হয় নাই, সে বিষয়ে আজিও সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। অল্পশিক্ষা নানা অনিষ্টের মূল; কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় আমরা ইহা এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিদিত নহি। বাহ্যিক অকিঞ্চিৎকর বেশ ভূষায় সজ্জিত হওয়া অপেক্ষা জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত হওয়াই সকলের প্রার্থনীয় ও একান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যাশিক্ষাই ঐ রত্ন লভিবার সোপান স্বরূপ। অতএব যদ্দ্বারা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সকল সাধিত হয়, তল্লাভার্থ যত্নবতী হওয়া উচিত। পরে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন পিতা মাতা, যাঁহাদিগের হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহারা অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের তুল্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জগতে আর কে আছে? কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করা ও সকল সময়ে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপা জননী যিনি দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করিয়াছেন ও আহার নিদ্রা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক দিবানিশি সুখ নিরীক্ষণ করিয়া লালন পালন করেন,

যাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহরসে আপ্লুত না হইলে আমরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতাম, তিনি আমাদের দুঃখের সময় দুঃখ, বিপদে বিপদ ভোগ করেন, রোগ হইলে পীড়িতবৎ হইয়া থাকেন—এমনকি তৎকালে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বীয় অপত্যকে সুস্থ করিতে ইচ্ছুক হয়েন এবং নিজ শরীর—নিঃসৃত স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া শরীর পোষণ করেন। এরূপ মঙ্গলময়ী স্নেহদাত্রী জননীর কি প্রকারে সন্তোষ সাধন ও সুখবর্ধন করিতে পারি, সর্ব্বতোভাবে তদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ্য পিতা মহাশয় স্বীয় সন্তান সন্ততিকে সুশীল, সদাশয় ও সচ্চরিত্র করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা পান, কিসে আমরা কুশলে থাকিব এবং কি প্রকারে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে অবিরত ঐ কামনা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টিত হয়েন। সন্তানের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করাই পিতা মাতার আন্তরিক বাসনা। তাঁহাদের তুল্য হিতকারী ভূমণ্ডলে আর নাই। আমরা অন্যের দ্বারা যে সকল সুখ সম্ভোগ করি, তাহাও তাঁহাদের প্রসাদাৎ জ্ঞান করা উচিত, কারণ পিতা মাতা ঈদৃশ কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া আমাদিগকে সুস্থ জীবন প্রদান না করিলে কি প্রকারে সুখ ভোগের অধিকারী হইতাম? তাহাদিগের ঋণ অপরিশোধ্য, আমরা কখনও উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। তথাপি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের হিত চিন্তা ও অকৃত্রিম ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করা উচিত। তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে যদি কোন প্রকার কষ্ট বোধ হয় তাহাও অক্ষুব্ধ-চিত্তে সহ্য করা কর্ত্তব্য। যথাসাধ্য পিতা মাতার সন্তোষ বিধান করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রফুল্ল হয় এবং বিশ্বপিতার নিয়মও প্রতিপালিত হয়।

(ক্রমশঃ)

পৌষ ১২৯০

## নারীজীবনের উদ্দেশ্য

**বামাগণের রচনা**

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর পরম পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার সহিত চিরজীবনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যিনি যাবজ্জীবনের নেতাস্বরূপ, সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে এক মাত্র সহায়, যাঁহার অবর্ত্তমানে শত শত পরিজন সত্ত্বেও অনাথা মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়, সেই শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীর শুভানুষ্ঠান ও মঙ্গলচিন্তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সাংসারিক বন্ধনের নিমিত্ত এই বিশুদ্ধ বিবাহ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে নিয়ম ভঙ্গ করিলে চিরদিন ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। কত দম্পতী সুখময় উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও অহরহঃ বিষম যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে, ইহার কারণ অবধারিত করিতে হইলে প্রস্তাবের বহির্ভূত হইয়া উঠে, অতএব উহা অভিপ্রেত নহে। বিরুদ্ধপ্রকৃতি দম্পতীগণ যে এই বিষময় বিষম যাতনা ভোগ করেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সেই হেতু অমৃতময় সম্বন্ধ হইতে গরল উৎপাদিত হইয়া তাঁহাদিগের পবিত্র প্রেমলতা বিশুষ্ক করে।

যথাযোগ্য মিলন অত্যল্প স্থলে দৃষ্ট হয়। কত ধৰ্ম্ম পরায়ণা সাধ্বী সুরাপায়ী বেশ্যাসক্ত মূর্খ নরাধম স্বামীর অত্যাচারে দিবানিশি অশ্রু বিগলিত নেত্রে কাল যাপন করিতেছেন, কোথায় বা কোমলস্বভাব সাধু ধাৰ্ম্মিক পুরুষ অসতী ভাৰ্য্যা লইয়া জ্বালাতন এবং কত শত বিদ্বান জ্ঞানশীল স্বামী কোপন স্বভাবা কলহপ্রিয়া বিলাসিনী স্ত্রী লইয়া আন্তরিক গভীর যাতনা ভোগ করিতেছেন। সংসারের বিচিত্র গতি!! কিন্তু যাঁহাদিগের চিরজীবন একত্রে বাস করিতে হইবে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বিপরীতমতাবলম্বী হইলে আজীবন দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে, সংসারের শ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় সুখ দুঃখ যাঁহার প্রতি নির্ভর করে, সেই স্বামীর সহিত তাঁহার মিলন না হইলে সংসার দুঃখের সাগর স্বরূপ জ্ঞান হইবে। সে স্থলে কি কৰ্ত্তব্য? সকল বিষয়ে সন্তোষ শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। 'যেমন অবস্থা হউক না কেন' উহাতে সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস করিলে ঈশ্বরও প্রসন্ন হয়েন। সন্তোষ বাহ্যিক অবস্থার প্রতি নির্ভর করে না। করুণাময় পরমেশ্বর এমন কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে আমরা আবশ্যকমত উহা অবলম্বন করিয়া সুখিনী হইতে পারি। অতএব অবস্থা যত নিকৃষ্ট হউক না কেন সৰ্ব্বতোভাবে সন্তোষী হওয়া কৰ্ত্তব্য, তাহা হইলে সুখ, শান্তি ও ধৰ্ম্ম লাভ হওয়া দুঃসাধ্য নহে।

স্বামী কুরূপ, নির্গুণ, দরিদ্র যে প্রকার হউন না কেন, স্ত্রীলোকের পূজনীয়; চিরকাল তাঁহার শুভাকাঙ্খিণী হইয়া আন্তরিক প্রীতিপূৰ্ব্বক সেবা করতঃ কালাতিপাত করাই প্রধান ধৰ্ম্ম ও একান্ত প্রার্থনীয়। পতি-সেবাই গৃহ ধৰ্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কল্যাণ সম্পাদনার্থে সতত চেষ্টিত থাকিবে। সতত ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইয়া প্রিয়াচরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করা আবশ্যক। যে দম্পতী একতাবলম্বী হইয়া বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করেন, তাঁহারাই জগতে সুখী। তাঁহারা অতি কষ্টে পতিত হইলেও নিৰ্ম্মল প্রেমজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হয়েন না। আর্য্য মহিলাগণ তাহার উপমা স্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। জনক নন্দিনী সীতা ভয়াবহ বিজন অরণ্য মাঝেও রামচন্দ্র সহবাসে অতুল সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু রঘুপতি বিরহে দশাননের অপরিসীম ঐশ্বর্য্য তাঁহার পক্ষে বিষবৎ জ্ঞান হইয়াছিল। এবংবিধ অনেকানেক কামিনী পাতিব্রত্য ধৰ্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চরিতাখ্যান এ পৰ্য্যন্ত ভারতীয় কবিগণের কণ্ঠাগ্রে রহিয়াছে। যে স্ত্রী নিজ কৰ্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি সাংসারিক সুখভোগে সম্পূর্ণরূপে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

মাঘ ১২৯০

## নারী জীবনের উদ্দেশ্য

**বামাগণের রচনা**

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংসার প্রতিপালন মাতার একটি গুরুতর কাৰ্য্য এবং উক্ত কাৰ্য্যটি অতি কঠিন। অধুনা যেরূপ অপরিণত বয়সে সন্তান উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ লালন পালনের নানাপ্রকার ত্রুটি

জন্মে। উহাই যে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার কারণ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রায় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে মাতা কেবল দশ মাস কষ্টে সৃষ্টে গর্ভধারণ করেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রেই তাহাদিগের প্রতিপালনের ভার দাসীদিগের প্রতি অর্পিত হয়। কোমল প্রকৃতি শিশু জ্ঞানোদয় অবধি ইতর লোকদিগের নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহার শিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা করা উচিত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর যখন আমাদিগের উপর ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন উহা আমাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য। সন্তানগণের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান যদ্রূপ মাতার উপযোগী, শিক্ষাদান তদনুরূপ আবশ্যক। জননীর শিক্ষা ব্যতীত সন্তানগণ অনায়াসে শিক্ষিত হইতে পারে না। প্রায় জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণ প্রথম শিক্ষা মাতার নিকটেই পাইয়াছেন, জননীরই সুশিক্ষা ফলে পরে নানা সদ্‌গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

প্রত্যেক মাতার স্বীয় সন্তানগণকে বাল্যকাল হইতে সুশীল সচ্চরিত্র ও বিনীত হইতে অভ্যাস করান উচিত। শিশুদিগের সরল স্বভাব সর্ব্বদা অনুকরণে আসক্ত, যাহা দেখে তাহাই শিখে, এজন্য তাহাদিগকে সৎ—সংসর্গে রাখা উচিত, এবং কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। সর্ব্বদা তাহাদিগকে সুনিয়মে ও সুশাসনে রাখিয়া ভাবী মঙ্গলের জন্য শিক্ষা প্রদান করতঃ মাতৃপদের সফলতা সাধন প্রয়োজনীয়।

সন্তানপালন ও পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিলেই যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন হইল, তাহা নহে, আমাদের প্রাণপ্রতিম সোদর ও সোদরা, যাহারা একজননীর গর্ভে উৎপন্ন, এক পিতা মাতার স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হওয়া পরম প্রীতিকর। শ্রদ্ধাস্পদ, শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে ও তাহাদিগের যথা বিধানে আনুকূল্য সাধনে তৎপর হইতে হয়। অনাথ পোষ্যবর্গ, যাহারা সর্ব্বক্ষণ সকল বিষয়েরই প্রত্যাশা করিয়া থাকে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের অভাব মোচনার্থ চেষ্টিত হওয়া উচিত।

সমুদয় রাজ্যের ভার যেরূপ রাজার উপর ন্যস্ত থাকে, তদনুরূপ গৃহিণীর উপর সংসারের ভার অর্পিত, গৃহিণীই সংসাররূপ রাজ্যের অধীশ্বরী, এজন্য সংসারস্থ সমুদয় পরিবারবর্গের দুঃখ দূর করিয়া সুখ বর্ধন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য। পুরুষের অর্থোপার্জ্জন, সামাজিক হিতসাধন ও অন্যান্য শুল্কের কার্য্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধান করা ততোধিক আবশ্যক; দাসদাসীগণের প্রতি সমুদয় কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটে, কোন বিষয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। এতদ্ব্যতীত পরিশ্রম সকল সুখের মূল। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু শ্রমলভ্য। শ্রম বিনা স্বাস্থ্যের হানি হওয়া সম্ভব। নিরন্তর অকর্ম্মণ্য হইয়া অলসের ন্যায় কালযাপন করা অতীব কষ্টপ্রদ। কর্ত্রীপদাভিষিক্ত হইয়া ভৃত্যগণের প্রতি সদা সদয় ব্যবহার ও উপযুক্ত সময়ে...[১] পুরস্কার প্রদান করা উচিত।...[২] ভৃত্য অন্যায় আচরণ করিলে তিরস্কার করা ও ভবিষ্যতের নিমিত্ত সতর্ক করিয়া তৎকৃত অন্যায় উহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এতৎ সমুদয় কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য শুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। স্ত্রীকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কেবল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ ক্ষান্ত থাকা কোন ক্রমে বিধেয় নহে,

১, ২ অস্পষ্ট, পড়া যায়নি।

পুরুষের ভাবের সমভাবী হইয়া যাবতীয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ পৃথিবীর শান্তি কুশল বিস্তার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা যেমন নিজের সুখাভিলাষ ও আপদ বিপদে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করি, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছা। অতএব যথাসাধ্য ক্ষুধাতুরকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল ও পীড়িতকে ঔষধী প্রদান এবং বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করা উচিত। পরোপকার মহাব্রত। ইহা পালন করিলে পরম সুখ হয়। যেহেতু উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিলে যে ব্যক্তি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পায় ও স্বীয় সৎকার্য্যের নিমিত্ত মনে কেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হয়। কত শত ইংরাজ মহিলা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আহা তাঁহাদের পুণ্যময় জীবন কেমন সুন্দর। সেইসকল অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহাদের অবর্ত্তমানে জাজ্বল্যমান থাকিবে। উক্ত মহিলাগণের বেশভূষার অনুকরণ না করিয়া গুণনিচয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তিণী হওয়া শ্রেয়ঃ। সকল স্ত্রী-পুরুষকে স্বীয় ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করা উচিত এবং তদুপযুক্ত আচরণ করা ও তাহাদের সম্পদে সম্পদ, বিপদে আপদ অনুভব করা...[১] এবং পরস্পরের প্রতি অনুকুল হইয়া কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।...[২] পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া বিশ্বপতিরচিত জগৎসংসারের সুখলাভ করা যায়, কিন্তু আমাদের জীবনে একটি অধিকতর প্রিয় বস্তু আছে। সাংসারিক কোন বস্তুই তত্তুল্য নহে, উহা জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর ও সার। সেই অমূল্য রত্ন ধর্ম্ম। উহা বর্জ্জন করিলে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি দরিদ্র, যুবতী, বৃদ্ধা, ইতর, ভদ্র সকল প্রকারেরই স্ত্রী জাতির ইহা রক্ষণীয়।` আমাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ রাখা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম, দূষিত বারি সংসর্গে বাস কিম্বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করা অতি গর্হিত। মানবজাতির স্বভাব এই প্রকার অনুচিকীর্ষাযুক্ত যে, যে বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করা যায়, তাহাতেই অন্তরকরণ আসক্ত হয়। বিশেষতঃ অবলাজাতির মন কোমল, অনায়াসে আকর্ষিত হওয়া সম্ভব, এজন্য উহা হইতে অন্তরে থাকাই ভাল। আপন আপন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করাই নারীজীবনের মহৎকার্য্য। যে কুলকলঙ্কিনী উক্ত রত্ন হইতে বঞ্চিতা, তাহার কলুষিত জীবন দুঃসহনীয়। সে পুণ্যজনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিতা ও পাপজনিত আন্তরীক অনুতাপে তাপিতা হইয়া ঘোরতর পাতকের প্রতিফল, অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়। অতএব আমাদের জীবনের অত্যুত্তম শ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যদ্দারা আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যে সম্যকরূপে পালন করিতে পারি তন্নিমিত্ত দয়ার সাগর জগৎপতির নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি; তিনি আমাদের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছাদিত মানসাকাশে, জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করুন। আমরা যেন "আর্য্যনারী" আখ্যার উপযুক্ত হইয়া আপনজীবন সফল করিতে পারি এবং পরে যেন সকলে ভারত রমণীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে প্রয়াসী হয়।

ফাল্গুন ১২৯০

শ্রীমতি নিস্তারিণী দেবী,
কানপুর।

১, ২ অস্পষ্ট, পড়া যায়নি।

# পারিবারিক সুখ

## বামাগণের রচনা

পারিবারিক সুখ প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই অতিশয় বাঞ্ছনীয়। সুখের পরিবার দেখিলে কাহার না হৃদয়ে সুখ হয়। কাহার না চক্ষু জুড়ায়? পরিবারে সুখ থাকে, সকলেই এইটী ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু অনেকেই পরিবারকে সুখের করিবার জন্য তত চেষ্টা করেন না। বাস্তবিকই অনেকে আবার হয়ত জানেন না কি উপায়ে পরিবারটীকে সুখের স্থান ও আকর্ষণের বস্তু করা যাইতে পারে। সেই জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াও সফল-মনোরথ হইতে পারেন না। বাস্তবিকই যাহার পরিবারে কোন প্রকার আকর্ষণের বস্তু নাই, ভালবাসা নাই, তাহার মত অভাগা ও অসুখী আর কে আছে? পরিবারে যাহার সুখ নাই, তাহার আবার সুখ কোথায়? তাহার জীবনই দুঃখময়; যাহার পরিবার সুখী, সেই যথার্থ সুখী। সুখের পরিবারে যে বাস করে, তাহার মত সুখী এজন্মেতে আর কে আছে? যে পিতামাতা ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও আদরে বর্দ্ধিত, তাহার ন্যায়, সুখী আর কে আছে? যাহার প্রাণ ভালবাসা দিয়া ভালাবাসা পাইয়া সুখী হইতে না পায়, তাহার মত আর হতভাগ্য কে আছে? যে পরিবারে বাস্তবিক "ভালবাসা দিয়ে জুড়ায়, হৃদয়, একপ্রাণ স্রোত অন্য প্রাণে বয়" এরূপ না হয়, সে পরিবার কখনই সুখের পরিবার নয়। প্রেমের সঙ্গে সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেম যেখানে, সুখও সেখানে। পরিবারকে সুখের স্থান করিতে হইলে—প্রাণ জুড়াইবার স্থান করিতে হইলে, প্রেম আবশ্যক। পরিবারকে সুখের করিতে হইলে যেমন প্রেম চাই, আর তিনটী বস্তু থাকাও আবশ্যক—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ। যেখানে এই চারিটী নাই, সে পরিবারে সুখ নাই। সে পরিবারে এমন কিছু থাকে না যাহা দ্বারা মানব সেই পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। যে পরিবারে এই চারিটী বস্তুর অভাব, সেখানে এক মুহূর্ত্ত এক দিনের ন্যায় বোধ হয়। মানব সেখানে দিনেকের তরে বাস করিতে পারে না। সেস্থান তাহার নিকট কারাগারের ন্যায় বোধ হয়। যেখানে মানবকে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, সেখানে যদি সুখ না থাকে, সেখানে যদি মন না বসে, সেখানে যদি থাকিতে ইচ্ছা না করে, তবে অভাগা মানব কোথায় গিয়ে সুখী হইবে, কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াইবে? সেই যথার্থ গৃহ, যাহার জন্য মানব বলিতে পারে আমার প্রাণ জুড়াইবার জায়গা এই, আমার এ ঘর পর্ণকুটীর হইলেও এই আমার রাজপ্রাসাদ—কোটী মুদ্রাতেও ইহার বিনিময় করিতে পারি না। আমার আর কোন প্রকার সম্পদের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিকই পারিবারিক সুখ মানবের পক্ষে প্রাণের আকর্ষণের বস্তু। যে পরিবারে প্রেম, স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে, সেই পরিবারেই প্রাণ সহজে আকৃষ্ট হয়। এই যে পরিবার, ইহার প্রধান পিতা মাতা, সুতরাং পারিবারিক সুখ সম্বন্ধে পিতা মাতা দায়ী। পারিবারিক সুখের উপায় পিতা মাতার হস্তে।

"The primal duty of every father and mother is to make home attractive to the boys and girls."

প্রত্যেক পিতা মাতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে গৃহকে বালক বালিকাদিগের নিকট আকর্ষণের বস্তু করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের এমন দুরবস্থা, এমনি ভ্রম, এমনি কুসংস্কার যে এমন পরিবার একটী দেখা যায় কি না সন্দেহ, যেখানে প্রেম, স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নির্দ্দোষ আমোদ আছে।—কোন কোন পরিবারে হয়ত প্রেম আছে—স্বাধীনতা

নাই, শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই। এরূপ স্থানে প্রেমও বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যেখানে মানুষ স্বাধীনতা পায় না, যেখানে মানুষের মন খেলিতে পায় না, মানব কি কখন সে স্থানে আকৃষ্ট হইতে পারে? যেখানে যত ভয়, ভালবাসা সে স্থান হইতে ততদূরে। যেখানে একটী উচ্চ কথা কহিতে ভয় হয়, একটু উচ্চ করিয়া হাসিতে ভয় হয়, একটু খেলিতে ভয় হয়, সেখানে কি কখন মানবের থাকিতে ইচ্ছা হয়, না সেখানে মানব কখনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে? যেখানে স্বাধীনতা নাই, সুশিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তাহা মানবের পক্ষে যথার্থই কারাগার। ইহা সত্য হইলে হিন্দু পরিবার কখনই সম্পূর্ণ সুখের পরিবার নয়। হিন্দু পিতা মাতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ততটুকু দেন না। তাঁহাদের পরিবারে যতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, ততটুকু শিক্ষা হয় না। যখন হিন্দু পরিবারে স্বাধীনতা নাই, শিক্ষা নাই, নির্দ্দোষ আমোদ নাই, তখন কখনই হিন্দু পরিবারকে সুখের পরিবার বলিতে পারি না। আমাদের সমাজের পিতা মাতা অনেক সময় পুত্রকে এমন স্বাধীনতা দেন, যাহা কখনই পিতা মাতা হইয়া দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় এমন কি একটী সামান্য স্বাধীনতা যাহা দেওয়া উচিত, তাহা দিতে প্রস্তুত নন। পিতা পুত্রকে একটী সৎকার্য্য করিতে স্বাধীনতা দিতে পারেন না, অথচ একটু হাসিলে তাহাকে শাসন করিবেন। একটু ছুটাছুটী করিলে একটী গান করিলে তাহাকে অভদ্র বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সন্তান হাসিতে পাইবে না, খেলিতে পাইবে না, গাইতে পাইবে না, এগুলি যদি সে করে তবে তার বাঁচা ভার। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, স্বার্থপরতার কার্য্য করিলে ক্ষতি নাই, এ সকল অসঙ্কোচে করিতে পারে। আমাদের সমাজে যে ছেলেটী চুপটী করিয়া বসিয়া থাকে, কথাটী কয় না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে চুক চুক করে, মাথা নাড়ে, হাসিতে হইলে মুখ টিপে টিপে হাসে, কখনও খেলা করে না, কেবল জড় পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকে, সে বড় ভাল, সে যদি মিথ্যা কথা কয়, সেটা দোষের মধ্যেই নয়। সে যদি আর আর সব দোষ করে, সে দোষের মধ্যেই নয়, কেন না সে যে শান্ত। মিথ্যা কথার চেয়ে হাসিটাই বেশী দোষ!! আশ্চর্য!! আমাদের পরিবারে সুশিক্ষা আদৌ নাই। ইহা বলিতেও দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের জননীরা সন্তানদিগকে কিরূপে সৎশিক্ষা দিতে হয়, তাহা মোটেই জানেন না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এমন সব কুশিক্ষা দেন, যাহা দ্বারা তাহাদের অশেষ অনিষ্ট, তাহার যত কুফল অভাগারা সারা জীবন ভোগ করে। পরিবারে সুশিক্ষা না থাকা অতি দুঃখের বিষয়। যে পরিবারে সুশিক্ষা নাই, তাহা কখনও সুখী পরিবার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পারিবারিক সুশিক্ষা অতিশয় মূল্যবান পদার্থ। যে বালক বালিকা শৈশব কালে জনক জননীর নিকটে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা যথার্থই অতিশয় সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী, তাহাদের পক্ষে সৎ হওয়া স্বাভাবিক, তজ্জন্য কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না। পারিবারিক কুশিক্ষার জন্য আমাদের দেশে আজকাল সৎ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। "সহজে কি ভাল হওয়া যায়?" এ কথা সবারই মুখে। সত্য সত্যই আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বাস্তবিকই এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই ইহা স্পষ্ট জানা যাইবে যে পারিবারিক কুশিক্ষাই ইহার মূল। সৃষ্টিকর্ত্তা কিছু শিশুকে অসৎ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। শিশুর ন্যায় পবিত্র বোধ হয় আর কেহই নাই। কিন্তু সেই শিশু যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততই মন্দ হইতে থাকে।--সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহাদের মন্দ হওয়া ভাল হওয়া, যাঁহারা তাহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন তাঁহাদের

হস্তে। সৎ হইলে তাঁহাদের শিক্ষার বাহাদুরি, অসৎ হইলে তাঁহাদের শিক্ষার দোষ। কিন্তু অনেক মাতা সন্তান যদি অসৎ হয়, তবে রাগিয়া কখন কখন তাহাকে বলেন "হায়রে যদি আঁতুড়ঘরে নুন খাওয়াইয়া মারিতাম, তাহা হইলে এমন কষ্ট পেতে হইত না।" কিন্তু হায়! হায়! তিনি বোঝেন না যে তাঁহার শিক্ষা দিবার দোষেই তাঁহাকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইতেছে। আবার অনেক মাতা বলেন, "আমার কপালের দোষ।" আবার কেহ কেহ বিশ্বস্রষ্টাকে গালি দেন। বলেন, "ভগবান! দিলে যদি এমন হতভাগা করে দিলে কেন।" কিন্তু বাস্তবিক কার দোষ, কপালের দোষ, কি ভগবানের দোষ, না নিজেরই দোষ? আমরা বলি জননীর নিজেরই দোষ। আপনার কুশিক্ষার ফল আপনিই ভোগ করেন। কপাল ত কোন দোষ করে নাই, বিধাতার ত কোন দোষ নাই—যত দোষ সব তাঁর নিজের। অতএব পরিবারকে সুখের করিতে হইলে পিতা মাতার দৃষ্টি সর্বদাই সন্তানের শিক্ষার উপর থাকা উচিত। পরিবারে স্বাধীনতা, নির্দ্দোষ আমোদ না থাকাতে সন্তানের অতিশয় অনিষ্ট হয়। তাহারা যতক্ষণ গৃহে বাস করে, ততক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে, বাড়িতে থাকিলে ইচ্ছা হইলে কিছু করিবার জো নাই। গৃহে আমোদ নাই। তার পক্ষে তার গৃহ তার গৃহ স্বরূপ নয়, সে তার কারাগার। সে তার মন খুলিয়া মনের কথা বলিবার উপায় পায় না। পিতাকে যমের ন্যায় বোধ করে। তাঁর কাছে মনের কথা বলা দূরে থাক কথা কহিতে ভয় করে, হাসিতে ভয় করে খেলিতে ভয় করে। এ সব করিতে ভয় করে বটে, কিন্তু গোপনে কোন প্রকার মন্দ কার্য্য করিতে ভয় করে না। মাতাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। জননীকে যত দূর শ্রদ্ধা করা উচিত, ভক্তি করা উচিত, তত দূর করে না। করিবেই বা কিরূপে? জননী এমন ব্যবহার করেন, যাহা দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। আমাদের পরিবারের ভ্রাতা ভগিনীতে দশ যোজন দূর। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে না। পরিবারে এইসব স্বাধীনতা না পাইয়া তাহারা বাহিরে মন খুলিবার লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের আকর্ষণের বস্তু বাহিরে।

পরিবারের মধ্যে সুখ নাই। হায়! হায়! এরূপ অবস্থায় পড়িলেই মানব অসৎ হইয়া যায়। পিতা মাতার পক্ষে ইহাও অত্যন্ত লজ্জার কথা যে তাঁহারা জনক জননী হইয়া সন্তানের মনের ভাব জানেন না। সন্তানকে চেনেন না। পরিবারে ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। পিতা মাতা যদি সন্তানের যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী হন, তবে তাঁহারা পরিবারকে সুখের স্থান করুন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা বাটীতে আসিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিবে। গৃহ তাহাদের জুড়াইবার স্থান হইবে। গৃহ তাহাদের নিকট আকর্ষণের বস্তু হইবে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই প্রধান কাজটী না ভুলিয়া যান। তাঁহারা পরিবারকে সুখের করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহারা জানিবেন সন্তানকে ভাল করিতে হইলে পরিবারকে সুখের স্থান করা উচিত এবং সন্তানকে ভাল করিতে পারিলে গৃহধর্ম্ম সার্থক।

ভাদ্র ১২৯১

# শুভ বিবাহোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ*
(উদ্ধৃত)

শ্রীমতি তরলে! গত প্রায় ষোড়বর্ষ কাল তোমাকে লালন পালন করিয়া অদ্য মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সৎপাত্রেরই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে তোমার নবীন জীবনে একটী মহা পরিবর্তন উপস্থিত হইল। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য তুমি তোমার নিজের গৃহে চলিলে। তুমি একেবারে শিক্ষালাভ না করিয়াছ, এমন নহে। যতুটুকু বিদ্যালাভ করিয়াছ, তাহাতেই ভরসা করি তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, অদ্য যে জীবন-সোপানে তুমি পদার্পণ করিলে, তাহাতে কতকগুলি নূতন কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর পতিত হইল। এতদিন তোমার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রকৃতির উপর তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পর্য্যবসিত ছিল, এখন সে কর্ত্তব্যের ভূমি আরও বিস্তৃত হইল। সকলের পরে তোমার কর্ত্তব্য পরমেশ্বরের প্রতি! যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জান, প্রাণান্তেও সে পথে পদার্পণ করিবে না। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে। তৎপরেই যদি সুখী হইতে চাও, তোমার কর্ত্তব্য তোমার স্বামীর প্রতি। সুখে দুঃখে, আহ্লাদে বিষাদে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, প্রতি মুহূর্তে তোমার হৃদয় যেন তোমার স্বামীর অনুবর্ত্তী ও অনুকূল হয়। তোমার পতিকে অতিক্রম করিয়া তোমার চিত্ত যেন ক্ষণকালের জন্যও অন্য দিকে ধাবিত না হয়। সকলে যাহাকে সামান্য অর্থে তোমার স্বামী বলিয়া দেখিবে, তুমি দেখিবে যে তিনি প্রকৃত অর্থে তোমার স্বামী—তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর। এতদিন তুমি হয় ত লক্ষ্যহীন ও শূন্যদৃষ্টি হইয়া এক প্রকার নির্ভাবনায় কালযাপন করিতেছিলে; এখন আর সে নিশ্চিন্ত ভাব থাকিবে না। এখন তুমি এক গৃহের গৃহিণী হইলে। গৃহিণী হওয়া কি, মা তুমি কি তা জান? দেখিয়াছ, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত গৃহিণীর কি চিন্তা, কি ব্যস্ততা, কি পরিশ্রম, কি কষ্ট! কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, তাহা কষ্ট নহে, তাহা পরম সুখ। নিজের পরিশ্রমে ও যত্নে যদি দশজন প্রতিপালিত হইতে পারে, এই অস্থায়ী মনুষ্য জীবনে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? গৃহিণী শব্দটী বড় গম্ভীরার্থক। তুমি যদি প্রকৃত গৃহিণী হইতে পার, তাহা হইলে তোমায় গর্ভধারিণীর ও আমার যথেষ্ট সার্থকতা লাভ হইবে। কিন্তু বৎসে! গৃহিণী হওয়া বড় কঠিন কথা! তাহাতে ধর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই, ধৈর্য্য চাই, ত্যাগস্বীকার চাই, বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, ভালবাসা চাই, প্রেম চাই, চরিত্রের পূর্ণতা চাই, গাম্ভীর্য চাই,—কী যে না চাই তাহা আমি জানি না—পৃথিবীতে যত গুণ আছে সকলই চাই। কেবল যে গৃহটী সজ্জিত করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিলেই গৃহিণী হয়, তাহা নয়; কেবল যে স্বামী পুত্রাদি পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিলেই উত্তম গৃহিণী হইল তাহা নয়; ডাকিবা মাত্র দাসদাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, আদেশ অনুসারে অল্প সময়ে আদেশ প্রতিপালিত হইল, এই হইলেই যে ভাল গৃহিণী হইল তাহাও নয়। গৃহিণী যিনি তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উদার হওয়া বিধেয়। তাঁহার সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যে হিমাচল সম অটল হওয়া আবশ্যক। শারীরিক পরিশ্রম

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের অ্যাটর্নি বাবু ভুবনমোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরলার শুভবিবাহ ঢাকানিবাসী ডাক্তার প্যারী লাল গুপ্তের সহিত সমারোহে ও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা এই উপদেশ দেন।

করিতে তাঁহার অক্লান্তি হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, পরের ভাবনা যিনি না ভাবিতে পারেন, তিনি কখনই সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। আত্ম-শ্লাঘা আত্মম্ভরিতা যাহার আছে, যিনি মনে করেন, আমার সুখ হইলেই হইল, পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে আমার চাওয়া আবশ্যক করে না, তিনি কখনও সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। যিনি কেবল আপনার ও স্বামীর কিম্বা নিজ সন্তানের সুখ অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান; যিনি দাস দাসীগণকে সন্তানের মত না দেখেন; যিনি তাঁহার গৃহের অন্য লোকদিগকে, এমন কি, আপনার শ্বশুর শাশুড়ীকে ও দেবর এবং দেবর সন্তানদিগকে এবং স্বামীর ভগিনীদিগকে পর বলিয়া ভাবেন, তাঁহাকে আমি কখনই গৃহিণী বলিতে পারি না। যিনি স্বামী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার শ্রান্তি দূর না করিয়া জল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না, যিনি স্বামীর আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে না পারেন; যিনি মিতব্যয়িতা দ্বারা স্বামীর আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে না পারেন; যিনি বাহ্যিক আড়ম্বরের ইচ্ছাকে, নিজে ভাল পরিবার ভাল খাইবার ও ভাল থাকিবার ইচ্ছাকে পরাজয় করিতে না পারিয়া সেই বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ক্রমে ক্রমে ঋণে নিমগ্ন করেন; যিনি আবশ্যক হইলে কুটীরে থাকিয়াও সুখী না হইতে পারেন, যিনি আবশ্যক হইলে বনে বনে স্বামীর অনুসরণ করিতে না পারেন; যিনি দাস দাসী প্রভৃতি অনুগত জনকে সন্তানবৎ দেখিতে না পারেন, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি উপযুক্ত সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না। এ এসকল বড় গুরুতর কার্য্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে এমন কি গুণ আছে যাহা আবশ্যক না হয়? তাই বলিতেছিলাম, তরলে! বালিকে! গৃহিণী হওয়া বড় সহজ কথা নয়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তুমি সুগৃহিণী হইতে পারিবে কি? অন্ততঃ সে চেষ্টা করিবে কি? তাহা না হইলে যে কিছুই হইল না। ব্রাহ্মিকা হইয়া যদি তুমি কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে এতদিন কি ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে? শিশুকাল হইতে তোমার প্রতিপালনের যত্ন ও পরিশ্রম সেইদিন সফল বোধ করিব, যে দিন দেখিব ও শুনিব আমার তরলা যথার্থই স্বামীর গৃহের ভূষণ হইয়াছে; যে দিন দেখিব ও শুনিব যে তরলা তাহার স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করে না, যে দিন জানিব যে সে যথার্থই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছে, স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হইয়াছে, স্বামীর শ্রান্ত হৃদয় অশ্রান্ত করিয়াছে, স্বামীর সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া চলে, স্বামী না খাইলে খায় না, স্বামী না শুইলে শয়ন করে না, স্বামীর নায্য কোনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন কার্য্য করে না; অধিকন্তু যখন শুনিব স্বামীর ত্রুটি হইলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কি বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা কুভার্য্যার লক্ষণপ্রাপ্ত না হইয়া যথার্থ পতিব্রতার ন্যায় পতির প্রতি সাদর ব্যবহার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে,—যে দিন আমি এই সকল শুভবার্ত্তা শুনিব ও সুচিত্র দর্শন করিব, সেই দিন আমার চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তি হইবে। আমার মন সেই দিন আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, যে দিন শুনিব আমার তরলা তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করে, এবং তাঁহাদিগের অন্য পুত্র ও কন্যাগণকে ভাই ভগিনীর মত ভালবাসে ও স্নেহ করে। আমার কন্যালাভ সেইদিন সার্থক হইবে, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার স্বামীর পরিবারের অন্য সকলের সহিত সৎ ব্যবহার কর এবং দাস দাসীদিগকে সন্তানবৎ ভালবাস ও তাহারা তোমাকে ভয় না করিয়া তোমাকে মাতৃবৎ মান্য ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং তোমার অসময়ে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে

সময় আমার প্রাণ শীতল হইবে, যখন আমি শুনিব যে আমার তরলা তাহার প্রতিবেশীদিগের প্রিয়পাত্রী হইয়াছে এবং যাহার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সেই তাহাকে ভাল বলে। সেই দিন বিশেষ আহ্লাদিত হইব, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার সাধ্যমত তোমার স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হও নাই।

ঈশ্বর না করুন, যদি তোমার স্বামীর অবস্থা পরিবর্তন হয় এবং যে অবস্থায় তুমি এখন থাকিবে তাহা হইতে মন্দ অবস্থায় থাকিতে হয়, সেই সময় যদি তুমি তোমার স্বামীর পথের কণ্টক না হইয়া তাঁহার সহগামিনী হইতে পার ও সেই অবস্থায় তোমার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহার ক্লেশের অর্দ্ধেক ভার লঘু করিয়া তাঁহার জীবন সুখী করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি যথার্থ তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছ এবং তোমার শিক্ষিত ধর্ম্মকে জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ। মিতব্যয়িতা দ্বারা যদি স্বামীর অর্থ বৃদ্ধি করিতে পার, সৌজন্য ও বিনয় দ্বারা যদি স্বামীর সম্মান রক্ষা করিতে পার, সকল সৎকার্য্যে স্বামীর সহকারিণী হইয়া যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার। তবে জানিব, অদ্যকার এই প্রতিজ্ঞা তুমি কখন বিস্মৃত হও নাই এবং তাহা হইলেই তোমার পিতৃমাতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে। যদি কখনও শুনিতে পাই যে, তোমার আচারে ও ব্যবহারে, বাক্যে কি কার্য্যে তোমার স্বামী ও স্বামীর পরিবারেরা ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা হইলে লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে এবং ভরসা করি চিরকাল স্মরণ রাখিবে। ইতিহাসে, নাটকে, রামায়ণে, মহাভারতে, কাব্যে, নভেলে কত কত সতী সাধ্বী রমণীর কথা পড়িয়াছ, তাহা কাল্পনিক মনে করিবে না; তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরম পিতা তোমার এই মহৎ সংকল্প সাধনে তোমার সহায় হউন।

আশ্বিন ১২৯১

# হিন্দু রমণীর পারিবারিক জীবন

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ" ॥

(মহাভারত)

যদি কেহ এদেশের সম্ভ্রান্তা হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবনের একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, নিজের জীবনকে ভুলিয়া—আপনার স্বার্থকে ভুলিয়া—গার্হস্থ্য সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দিয়া—পরের সেবা, পরের শুশ্রূষা এবং পরের মঙ্গল সাধন করাই, পবিত্রা হিন্দুরমণীর পবিত্র জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য এবং একমাত্র পরম সাধনা। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে, ভারতে কেন সমগ্র জগতে, স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। গ্রীশ, রোম, মিসর, ভারত প্রভৃতি সভ্য জনপদসমূহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ,

জানিতে পারিবে, স্ত্রী-জাতি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সম্মান, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্রী স্বরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাকর্ত্তা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে রমণীর আদর নাই সে গৃহে সাধুরা যেন ভ্রমেও পদবিক্ষেপ না করেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যে গৃহের অধিকর্ত্তা রমণীকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সম্মাননা করিতে স্বীকৃত নহেন, সে গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া কিম্বা সে গৃহে ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা দেবতাদিগের অনভিপ্রেত, বিপ্র ও ক্ষত্রিয়েরা এই উপদেশটি যেন সতত স্মরণ করিয়া রাখেন।" ফলতঃ, জগতের "আদ্যাশক্তি স্বরূপা এবং সন্তপ্ত সংসার ক্ষেত্রের সন্তোষ ও শান্তির উৎসস্বরূপা স্ত্রীজাতির গুণাবলী পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসেই নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। ভারতের ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—লক্ষ্মী, জ্ঞানভাণ্ডারের অধিনেত্রী—সরস্বতী; সন্তানাদির সুখ স্বচ্ছন্দতার কর্ত্রী—ষষ্ঠী; হিন্দু পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্রতের অধিশ্বরী—সাবিত্রী; প্রাতঃশয্যার উপাসনার প্রধানা পাত্রী—অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চকন্যা, শাক্ত ও ভক্তের উপাসনার দেবী—শ্যামা, এবং বঙ্গের, ভারতের পূজার অধিকর্ত্রী—আশ্বিনের অম্বিকা। এখন বল দেখি, হিন্দু পরিবার রমণী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, রমণীর অসম্মাননা করিয়া, এক মুহূর্ত্তও কি তিষ্ঠিতে পারে? গৃহপ্রাঙ্গনস্থ আগন্তুক অতিথির সৎকার, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন রক্ষার ভার, গৃহধর্ম্মের ও গৃহের যাবদীয় কর্ম্মের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন এবং পরিবারভুক্ত সমগ্র জনগণের শান্তি সংরক্ষণ করিতে, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিতে হয়, অপরের মঙ্গল সাধনই হিন্দু রমণীর পবিত্র জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

বিধবা হিন্দু রমণীর জীবন আরও সম্পূর্ণ, আরও পবিত্র এবং আরও মধুর। আমরা এক জন চৈতন্য, এক জন ম্যাট্‌শিনি, একজন মাত্র প্রতাপসিংহ অথবা একজন হাওয়ার্ডের স্বার্থত্যাগ এবং পরোপকারের কথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়ি, কিন্তু হিন্দু পরিবারের প্রতিগৃহে পবিত্রচেতা বিধবাকুলের মধ্যে কত সহস্র সহস্র নারী-চৈতন্য বা নারী-হাওয়ার্ড বাস করিতেছেন, এবং ইতিহাস বা সংবাদপত্রের দুন্দুভিনাদকে তুচ্ছ করিয়া, গোপনে গোপনে প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? একটি বালবিধবা রমণী, অষ্টাদশ বা যোড়শ বর্ষ বয়সে প্রবৃত্তিমার্গকে অবরুদ্ধ করিয়া, জগতের সমগ্র সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সামান্য অশন—সামান্য বসন—সামান্য শয্যায় জীবন রক্ষা করিয়া, পবিত্র মনে দিবানিশি হরিগুণ গান, অতিথি সৎকার, মাতা পিতার সেবা, বালক বালিকার শুশ্রূষা, পীড়িতের অশান্তি অপনোদন, পরলোকগত পতির চরণবন্দনা, গ্রামস্থ নরনারীবৃন্দের দুঃখমোচন এবং স্বগৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সতত বিব্রতা থাকে, একথা স্মরণ করিলেও হিন্দুরমণীর পবিত্রতায় চিত্ত অবশ হইয়া যায় এবং মনে হয়, যদি কখন এই জগতে পুরাণ জাতি কর্ত্তৃক প্রকৃতরূপে নারীপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হয় তাহা হইলে সেই পূজা হিন্দু পরিবারের বিধবা রমণীই সর্ব্ব প্রথমে পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যাহাই হউক, হিন্দু বিধবার জীবন বড়ই প্রশংসনীয়। এই জন্যই আমেরিকার খ্যাতনামা পাদ্রী জেরেমি টেলর সাহেব তাঁহার "নারী পূজা" (Worship of Womanhood) নাম্নী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দুস্থানের 'সতী' নাম্নী আর্য্য-বিধবা রমণীর চরিত্র অভ্রান্তরূপে অনুকরণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য"।

কিন্তু আজিকালি, এই উনবিংশ শতাব্দীর দিব্য জ্ঞানালোকে, শিক্ষিতাখ্যাধারী এক সম্প্রদায় ভদ্র যুবা সংস্কারবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে আর প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মত এই যে, প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যে উপাদানে গড়িয়াছেন, পুরুষকে সে উপাদানে গড়েন নাই, পুরুষের অধিকার অবলার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। এই যুক্তিবলে তাঁহারা পুরুষের পদতলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহেন এবং স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রমণী সমাজকে কুসংস্কার এবং অশিক্ষার অন্ধতিমিরে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন। স্ত্রীলোক যে পুরুষের ক্রীত দাসী এবং পুরুষের স্বার্থের জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

অগ্রহায়ণ ১২৯২

# রমণীর কর্ত্তব্য

## প্রথম প্রস্তাব

### পীড়িতের শুশ্রূষা

অতি অল্প দিবস পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সকলেই নানা প্রকার পীড়ার কিছু কিছু ঔষধ জানিতেন, এখনও মফস্বলের এবং সহরের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগকে বালক বালিকাগণের সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে দেখা যায়; এটী তাঁহাদের সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটী শিক্ষণীয় কার্য্য ছিল। বাটীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে প্রথমে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গৃহিণীরা তাঁহাদের শিক্ষিত ঔষধ দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেন এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। তাহারা এই সকল বিষয়ে কিছুই শিক্ষা লাভ করিতেছে না এবং সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি দেখা যায় না। বাটীর কর্ত্রী সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে পারিলে যে তাহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্যের কত সুবিধা হয়, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ সকল পীড়াতেই ইংরাজি চিকিৎসার সাহায্য লইয়া বিদেশীয় ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা দেশীয় ঔষধ সেবনে আমাদের শরীরের অনেক উপকার হইতে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পীড়ার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ মন্দ হইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকেরাও সকল সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া ও ইংরাজি ঔষধ ক্রয় করিয়া সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অক্ষম। দরিদ্র লোকেদের ত কথাই নাই। এরূপ স্থলে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটির বালিকা ও বয়স্থা সকলেরই কিছু কিছু ঔষধ জানা কর্ত্তব্য। ইহাতে আরও একটী উপকার দর্শে। মনে করুন হঠাৎ বাটীর কোন লোকের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল, চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যদি সেই বাটীর গৃহিণী ঔষধ জানেন, তাহা হইলে তিনি কিছু ঔষধ দিয়া পীড়া আরোগ্য করিতে না পারুন আপাততঃ তাহা স্থগিত রাখিতে বা তাহার

বেদনা কথঞ্চিত পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন। এখনও অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক পীড়িত লোকের নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। অনেক স্ত্রীলোকের নাড়ীজ্ঞানশক্তি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসক অপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা যখন রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধাদির গুণাগুণ তাঁহাদের জ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ রোগীর নাড়ীর অবস্থা ও রোগের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা তিনি জানিতে পারিলে সেই রূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

আমাদের দেশে পীড়িত লোকদিগের শুশ্রূষার ভার সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হয়; জননী, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়াগণই পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুশ্রূষা কার্য্যে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা অনেক সময়ে রোগীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার যাতনার কারণ হইয়া উঠেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে এইমাত্র জানা যায় যে তাঁহারা কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয় তাহা জানেন না; শুশ্রূষাকারিণীর যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের সকলের থাকে না।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকদের যে যে গুণ থাকিলে তাঁহারা রীতিমত রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের বিবেচনা প্রফুল্লতা, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আত্মসংযমন গুণ থাকা আবশ্যক।

**বিবেচনা**—ইহা দ্বারা শুশ্রূষাকারিণী বুঝিবেন যে কখন রোগীর সহিত কথা কহিবেন, কখন কথা কহিবেন না, কি কি বিষয়ে রোগী বিরক্ত হয় ও তাহার মনে কষ্ট হয় ইহা তিনি জানিবেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে রোগী দেখিতে ইচ্ছা করে এবং সাক্ষাৎকারীগণকে কখন রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে, শুশ্রূষাকারিণীর এসমস্তই জ্ঞাত থাকা আবশ্যক এবং যখন সাক্ষাৎকারীগণকে বিদায় করিবেন তখন এরূপ বিদায় করিবেন যে রোগী যেন জানিতে না পারে যে তাহার পীড়ার কারণে তাহাদিগকে শীঘ্র বিদায় করা হইল।

**প্রফুল্লতা**—ইহা শুশ্রূষাকারিণীর একটী প্রধান গুণ; ইহা দ্বারা তাঁহার (শুশ্রূকারিণীর) স্বর মিষ্ট হইবে। তাঁহার পদক্ষেপ দ্রুত অথচ ধীর এবং আনন্দব্যঞ্জক হইবে, তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন গৃহ আলোকময় হইল; তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য থাকিবে, এবং পীড়িতের যাতনা এবং কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হওয়া আবশ্যক।

**ধৈর্য্য**—রোগীর নিকট সকল সময়ে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতে হইবে; ধীর এবং অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিতে হইবে এবং তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য, অকারণ অনুযোগ, অন্যায় প্রতিবাদ এবং যাতনা ও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির (সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে) তীব্র বাক্য অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, তাহার যাতনা উপশমের জন্য আন্তরিক যত্নের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

**প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**—রোগীর রোগের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ভীত না হইয়া তাহার

প্রতিকার চেষ্টা করিতে হইবে, আবশ্যকমত প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ক্ষতস্থান হঠাৎ বাঁধিতে হইবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবশ্যক মত উপস্থিত করিতে হইবে; আবশ্যকমত রোগীর হস্তপদাদি ধৃত করিতে হইবে; চিকিৎসককে সাহায্য করিতে হইবে এবং মুখে সর্ব্বদা সাহস বিরাজ করিবে; যেন রোগী ভয় না পাইয়া সাহস এবং সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়।

**আত্মসংযমন**—সকল প্রকার মনের ভাব গোপন করিতে হইবে। যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আশাপূর্ণ বাক্যে কথা কহিতে হইবে, চক্ষের জল (ক্রন্দন) বন্ধ করিতে হইবে এবং যখন রোগী নিরাশহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিবে "আমি কি বাঁচিব না?" তখন স্থিরভাবে উত্তর দিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন যে আত্মসংযমন দ্বারা মনের ভাব গোপন করিয়া মুমূর্ষু রোগীকে জীবনের আশা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যখন আমরা দেখিতেছি যে তাহার জীবনাশা নাই তখন কিরূপে তাহাকে বলিব যে সে বাঁচিবে? এ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন। ঈশ্বর ভিন্ন মানুষের মৃত্যুর বিষয় কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে বড় বড় চিকিৎসক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাড়ী দেখিয়া এবং বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। কিন্তু সেই মহা চিকিৎসকের অদৃশ্য ক্ষমতায় দেখা গেল যে রোগীর অচলিষ্ণু নাড়ী চলিষ্ণু হইল, দুর্ব্বল শরীরে বলাধান হইল, রোগী রোগমুক্ত হইল। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিও মৃত্যুভয়ে ভীত হন, মৃত্যু নিকট জানিলে স্তম্ভিত হন এবং জীবনের আশায় তাঁহারও মন অনেক শান্ত হয়। কিন্তু রোগীর মনে যদি মৃত্যু ভয় প্রবেশ করে, তাহার মনে যে কত কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না এবং হয়ত তাহা দ্বারা তাহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিষয়ে মনুষ্য কিছুই বলিতে পারে না এবং ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, তখন সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া রোগীকে যাতনা দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারিণী ইহাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য যে রোগীকে যথাসাধ্য সাহস প্রদান করেন। রোগীকে আমাদের অনুমান জ্ঞান না করাইয়া সস্মিতবদনে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে "আমরা সকলেই পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন; তাঁহার ইচ্ছায় তোমার অপেক্ষা সুস্থ এবং বলবান ব্যক্তিও তোমার অগ্রে মরিতে পারে। আবার তোমার অপেক্ষা সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"।

(ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণ ১২৯৩

# রমণীর কর্ত্তব্য
## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রোগীর গৃহের জানালা খোলা থাকিবে। অনেক পীড়া আরোগ্য পক্ষে পরিষ্কার বায়ু আবশ্যক।

শুশ্রূষাকারিণী রমণী প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন জন্য বাহিরে যাইবেন। যে বিশুদ্ধ বায়ু শুশ্রূষাকারিণী বাহির হইতে গৃহে আনিবেন, তাহা তাঁহার এবং রোগীর উভয়ের পক্ষে উপকারী। তাহার দ্বারা তাঁহার শরীর ও মন প্রফুল্ল হওয়ায় তিনি আরও উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন। যদি শুশ্রূষাকারিণীর সময় অতি অল্প হয়, তাহা হইলেও তিনি অন্ততঃ কিয়ৎক্ষনের জন্য নিকটস্থ কোনও উদ্যানে কিম্বা একটু এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া আসিবেন যেন নির্ম্মল বায়ু সেবনের বিষয়ে কখনও তাঁহার ভুল না হয়। যদি বায়ু জলীয় হয়, তাহা হইলে তিনি বেড়াইবার কাপড় না ছাড়িয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না।

রোগীর গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নানা রূপ উপায় দ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ করা যায়। তন্মধ্যে দুইটী বিষয় নিম্নে লিখিত হইল:—

১। গৃহে কিঞ্চিৎ ধুনার ধূম দিলে হয়।

২। কয়লার আগুনে আস্ত কাফি (যাহার কাথ সাহেবরা খাইয়া থাকেন) পোড়াইলে হয়। এই উভয় প্রকরণেই বায়ু সুগন্ধ ও বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাদের গন্ধ রোগীর তৃপ্তিকর এবং ইহাতে ব্যয় অতি অল্প।

অস্থিরতা রোগীর একটী যাতনাদায়ক অবস্থা; এই অবস্থাপন্ন রোগীর পাত্রে এবং কেশে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে, ধীরে ধীরে সুস্বরে ভাল পুস্তক পাঠ করিলে অথবা মিষ্টস্বরে উত্তম সঙ্গীত করিলে তাহার যাতনার অনেক উপশম হয়।

রোগীর গৃহের ভিতরে অথবা বাহিরে গুন্ গুন্ স্বরে অথবা ফুস্ ফুস্ করিরা চুপি চুপি কথা কহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, কারণ তাহাতে রোগী মনে করিতে পারে যে তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা হইতেছে। তদ্ব্যতীত ফুস্ ফুস্ শব্দে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয় । সুতরাং যাহা করিবে সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট স্বরে কহিবে।

রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয়; এজন্য যাহাতে নিদ্রার সময় কেহ রোগীর গৃহে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। একখানি পুরু কাগজে "নিদ্রিত" এই কথাটী লিখিয়া রোগী যখন নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে তাহার গৃহ দ্বারে লম্বমান করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে আর কেহ কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই শুশ্রূষাকারিণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

সকল স্ত্রীলোকেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষার বিষয়ে শিক্ষা লাভা করেন। যে স্ত্রীলোক শুশ্রূষা কার্য্যে বিশেষরূপ পারদর্শিনী, যদি তাঁহার সুন্দর শুশ্রূষায় একটী মাত্রও মানব জীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাঁহার সেই পরিশ্রমের যে কি পুরস্কার তাহা মনুষ্য বলিতে পারে না। শুশ্রূষাকারিণীর সাহায্য না পাইলে চিকিৎসকের ক্ষমতা ব্যর্থ হইয়া যায়।

যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আমরা তাহাকে শুশ্রূষা করিতে নিবৃত্ত হইব না। ঈ বর নিকট হইতে যে আত্মা পৃথিবীতে আসিয়া মানব হৃদয়ে প্রবেশ

করিয়াছে, কে বলিতে পারে যে সেই আত্মা কখন মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবে। চিকিৎসকেরা জীবনের বিষয়ে নিরাশ হইবার পরও শুশ্রূষাকারিণীর আন্তরিক যত্নে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। শুশ্রূষাকারিণীর ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে!!! এই সকল কারণে আমরা প্রথমে বলিয়াছি যে সকল স্ত্রীলোকেরই নাড়ী পরীক্ষার ক্ষমতা এবং ঔষধের গুণাগুণ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনে কর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল, চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না, যদি শুশ্রূষাকারিণী নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং ঔষধের গুণাগুণ জানা থাকিলে সে সময়েও কতকটা সাহায্য হইতে পারে। সেইজন্য আমরা ইচ্ছা করি যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকে ঔষধের গুণাগুণ ও নাড়ী পরীক্ষার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হউক।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর জীবনের আশা না থাকিলেও উপযুক্ত শুশ্রূষা দ্বারা তাহার যথাসম্ভব আরাম বিধান ও যন্ত্রণার প্রশমন করা যায়। জীবনের চরম সময়ে এরূপ কার্য্যের যে কত মূল্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রোগীর শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করা অত্যন্ত দায়িত্বের কার্য্য। একটী মনুষ্যের জীবনের ভার একটী শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে আত্মীয় দ্বারাই রোগীর শুশ্রূষা হইয়া থাকে। আত্মীয়হীন রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত, অথবা প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ে গমন পূর্ব্বক নিরাশ্রয় যন্ত্রণা-কাতর রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আমাদের দেশের রমণীগণকে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে ইউরোপীয় রমণীগণকে উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে। প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ে, সমরাঙ্গণে, মারীভয়গ্রস্ত গ্রামে শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়-শূন্য নিরাশ্রয় রোগীদিগকে জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, রোগীর প্রলাপ বাক্যের মধ্যে কত দুর্ব্বাক্য, অস্থিরতা বশতঃ কত দুর্ব্ব্যবহার অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন; ভগবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা পবিত্র কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করিতেছেন। স্বদেশীয় ভগিনীগণ! কবে তোমাদিগকে সেরূপ নিরাশ্রয় রোগীদিগের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুমিষ্ট বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে রোগের যাতনায় অস্থির রোগীকে সেবা করিতে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব?

(ক্রমশঃ; দ্র. ফাল্গুন ১২৯৩)

পৌষ ১২৯৩

# মা

যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত, সেইরূপ অনন্ত ভাষা-সাগর মন্থন করিয়া 'মা' শব্দ। কবির কল্পনায় এতদপেক্ষা মিষ্টতর চিত্র আঁর নাই, মানব হৃদয়ে এতদপেক্ষা শান্তির স্থান নাই। 'মা' জননী, গর্ভধারিণী, প্রসূতি, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 'মা' 'মা' 'মা', তোমায় ডাকি—এক বার ডাকি, দুই বার ডাকি, দশ বার ডাকি, ডাকিয়া ডাকিয়া কণ্ঠ রোধ

হয়, কিন্তু মন তৃপ্ত হয় না; ইচ্ছা হয় আবার ডাকি, তোমায় যতই ডাকি, হৃদয়তন্ত্রী ততই তানে তানে নৃত্য করিতে থাকে, শরীর আনন্দে স্ফীত হইতে থাকে, মন শান্তি রসে পূর্ণ হয়। যখন দুরন্ত অপরিহার্য্য সংসারে, চিরপরিবর্ত্তনশীল কঠিন নিয়তি চক্রের আবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া পৃথিবী শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হয়, চরণযুগল অবসন্ন হইয়া পড়ে, হৃদয় দুঃখ সাগরে ডুবিয়া যায়, জীবন ভয়াবহ বোধ হয়, দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া বন্ধু বান্ধব প্রস্থান করে, তখন অবসন্ন হইয়া জিহ্বাগ্রে সেই সুধাপূর্ণ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র, যন্ত্রণার লাঘব হয়, মনে হয়, ওঃ আমার একজন আপনার আছে যে কোনও সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না। বিপদ হউক, সম্পদ হউক, সুখ হউক, দুঃখ হউক, কীর্ত্তি হউক, অকীর্ত্তি হউক, সে জন কখনও পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না, সে বিপদে তাহার বক্ষে স্থান দিবেই, সে যে প্রমোদে হর্ষ, বিপদে শান্তি। আহা যে মূর্ত্তি দেখিলে সংসারের দুর্ব্বিষহ উত্তাল তরঙ্গমালাকে দেখিয়া ভয় হয় না, মন প্রাণ আনন্দে মাতিয়া যায়; এমন মূর্ত্তি আর কি আছে? 'মা' এমন মধুর নাম আর সংসারে নাই। আমার ইচ্ছা হয় জগৎ ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া ঐ নামের সুধাসাগরে ডুবিয়া থাকি।

ওগো মা, মাগো, তুমি সুন্দর; অতি সুন্দর, সুন্দর হইতে সুন্দর,সুন্দরতম। তুমি মধুর, তুমি অত্যন্ত মধুরা; তুমিই শান্তি, সংসারে তুমিই সত্য, তুমিই সার, তোমার কথা কি লিখিব, কি বলিব—কি বলিয়া তোমার অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিব?

যখন তোমাকে একমনে ডাকি, তখন আর আমাতে আমার অস্তিত্ব থাকে না। যখন ভাবি এ দেহ কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া গঠিত হইল, আমাকে এ বিশ্ব সংসারের নানা প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু ভোগ করিবার উপযুক্ত কে করিল? কে আমার সুখের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য, আমার পুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়াছেন, তখন আর আমি কেহ ইহা বলিয়া অহঙ্কার থাকে না, মা তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই সব, আমিও তুমি, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি, সংসারে তোমার উপমা নাই, বক্তার তোমায় ব্যাখা করিবার সাধ্য নাই, তোমার মহিমা গান করিতে মানবীয় ভাষা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

মানব গন্তব্য পথে যাইতে যাইতে স্খলিতপদ হয়, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, হতচেতন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে, বিপদ তাহার সহস্র প্রকার ভীষণ আকার দেখাইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে। তখন মানব অবলম্বন বিহনে উঠিতে পারে না। তাহার পতন দেখিয়া বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করে, কেহ কেহ বা কৌতূহলচ্ছলে করতালিই দিতে আরম্ভ করে, কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, কেহ বা সুযোগ পাইয়া তাহার সৎ নাম ধন মান প্রভৃতি যা পায়, লুণ্ঠনে রত হয়। ভ্রাতা ভগ্নী মনে করে এ অপদার্থ ভ্রাতার দ্বারা আর উপকারের সম্ভাবনা কি? জীবনের অর্দ্ধ অঙ্গ পত্নীও মুখ ফিরাইয়া বসেন, এমন কি পরমারাধ্য পিতাও পুত্রের পতন দেখিয়া দেশময় তাহার নিন্দাবাদ শুনিয়া পুত্রকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহার উপর বীতরাগ হন, কিন্তু মাতা ও মাতার স্নেহ সর্ব্ব সময়ে একরূপ গভীর, অচঞ্চল ও অক্ষয়, মাতার সে বিপদের কথায়, প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রের অমঙ্গল সংবাদে স্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনি তখন মনে করেন আহা পুত্র আমার স্খলিতপদ হইয়াছে, ভগ্ন মনোরথ হইয়া না জানি সে এখন কি প্রকার দারুণ যন্ত্রণাই বা ভোগ করিতেছে! কত ক্লেশ, কত পরিশ্রম, কত আয়াস স্বীকার করিয়া এতদিন

অগ্রসর হইয়া এক্ষণে হঠাৎ বাছার সমুদায় শ্রম পণ্ড হইল, তাহার মনে আজ কত না কষ্টের ঢেউ উঠিতেছে! সন্তানের শরীর যে মাতার শোণিতে গঠিত, সুতরাং পুত্রের কষ্ট মা না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? সন্তানের বিপদের কথা শুনিয়া মাতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, তিনি কোন মতে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না। তখন তিনি যে স্থানে যে প্রকার অবস্থায় থাকুন, দৌড়িয়া পুত্রের নিকটে যাইবেন। সমুদায় বাধা বিপত্তিও অতিক্রম করিবেন, অপত্যস্নেহে ডুবিয়া কায়মনে পুত্রের বিপদভঞ্জনের উপায় চেষ্টা করিবেন। তখনকার তাঁহার সে গতির সম্মুখে পর্ব্বতও নিজবক্ষঃ বিদারণ করিয়া পথ না দিয়া থাকিতে পারে না। পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, পতন-জনিত দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করিতেছে; তখন কি আর মাতা স্থির থাকিতে পারেন? মাতা সেই বিপন্ন পুত্রের 'মা' 'মা' ধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহার মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিয়া তিনি তখন আর কিছু চাহেন না আর কিছুর প্রার্থনা রাখেন না, কেবল মাত্র তখন তাঁহার প্রাণের পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানস করেন। তখন তাঁহার নিকট সংসারের সমুদয় একদিকে আর পুত্রের উদ্ধার অন্য দিকে। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, শরীরের শোণিত পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, তখন তিনি আর কি চাহিবেন?

মা! তুমি মূর্ত্তিমতী ভালবাসা, তুমি মূর্ত্তিমতী শান্তি। আমার মা, আমার জননী, আমি যে দিন তোমার জরায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই দিন হইতে প্রাণপণে শত সাবধানে তোমার অকৃতি সন্তানকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছ। কিন্তু আমি অধম, আমি অকৃতি, আমি বোধশূন্য পাগল, আমি তোমার অযোগ্য পুত্র, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না। সংসারে আসিয়া কত লোককে হাসাইলাম, কত লোককে কাঁদাইলাম, কত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইলাম, কিন্তু কৈ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম কৈ? মা! তোমায় ডাকি, তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকি, ডাকিলে তাপিত হৃদয় শীতল হয়। তোমায় দেখি, হৃদয় ভরিয়া দেখি, তোমায় দেখিয়া আশা মিটে না। তোমাকে দেখি, দেখিয়া শিক্ষা করি, তুমি শিক্ষার স্থল, তুমি শান্তি স্থল, তুমি বিশ্রামের স্থল, তুমি জীবনবালুকারণ্যে মরুদ্বীপ, তোমাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত রহিয়াছে, তোমাতে যাহা নাই, সংসারে তাহা অপ্রাপ্য। সংসারে তোমার অকৃত্রিম প্রেম ছাড়া আর কি আছে মা! পর্ব্বতে, কাননে, প্রান্তরে, গ্রামে, নগরে, রাজপ্রাসাদে, পর্ণকুটীরে, সাহিত্যে, ব্যাকরণে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভূগোলে, খুঁজিয়াছি মা, কিন্তু তোমার ও শান্তিদায়িনী মূর্ত্তির তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই মা। কোথাও এ প্রকার সুধার ভাণ্ডার আর দেখি নাই মা, সংসারে তোমার ন্যায় আপনার আর কেহ দেখিলাম না মা। দেখিলাম, সংসার অসার, সার মাত্র মাতৃস্নেহ। দেখিলাম সংসার অকূল সমুদ্র, মাতৃস্নেহ ইহার ভেলা। এ স্নেহের, এ ভালবাসার বিন্দু মাত্র হ্রাস হইলে মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, খসিয়া পড়িবে, পৃথিবী অতল সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যাইবে, সৃষ্টি নাশ হইবে, মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে, আর কি হইবে তাহা কল্পনাতীত।

সংসারে যে জন এ অমৃত রসাঞ্জনে বিমুখ, এ শান্তিমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে অপারগ, তাহার পাপ চক্ষু, সে স্বর্গীয় বিচিত্র দৃশ্য দেখিবার অনুপযুক্ত, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যে জন দুরদৃষ্টক্রমে বাল্যকালেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হইয়াছে, সে সংসারে অত্যন্ত অসুখী। মাতার স্নেহে বঞ্চিত, মাতার দয়ায় বিমুখ, যে মাতাকে শান্তিময়ী মূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে সক্ষম হয় নাই, সে পৃথিবী মায়া কাননে, যাহা কিছু দেখিবার আছে তাহা দেখে

নাই, যাহা কিছু শুনিবার আছে তাহা শুনে নাই, যাহা কিছু ভোগ করিবার আছে, তাহা ভোগ করে নাই। সে একবার দুইবার শতবার দুরদৃষ্ট লোক. আমি তাহার জন্য দুঃখিত, জগৎ তাহার দুঃখে সমদুঃখী হউক।

মাতার স্নেহ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ, ইহা স্বর্গের পারিজাত, সংসারে ইহার উপমা নাই। ইহা প্রেমের জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মনুষ্য এই প্রেম লইয়া অসাধ্য সাধিতে পারে। মায়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও যা, ঈশ্বরের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও তাই, অতএব এ স্নেহে যে বঞ্চিত, সে দুর্ভাগ্য নহে ত কি? মানব ! শান্তি চাও, শিক্ষা চাও, ভক্তি চাও, প্রেম চাও, মায়ের নিকট যাও, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়, আপনাকে ভুলিয়া সে প্রেমে ডুবিয়া যাও—জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, হৃদয় মুধময় হইবে, সংসারে যাহা চাও মিলিবে, অনন্ত অমৃতধামের শত দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইবে।

মাঘ ১২৯৩

## রমণীর কর্ত্তব্য

### দ্বিতীয় প্রস্তাব

### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

**বাস ভবন**—আমাদের দেশে আজ কাল পীড়ার অত্যন্ত আতিশয্য হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের বাসগৃহ সচরাচর যেরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আমরা আমাদের বাসগৃহকে যেরূপ অবস্থায় রাখি, তাহা পীড়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ।

আবার বাসগৃহে সুন্দর প্রণালীক্রমে দ্রব্যাদি রাখিলে সাংসারিক কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। যে দ্রব্যটী যেখানে থাকা আবশ্যক, যদি সেটী সেখানে না থাকিয়া অন্য কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত অসুবিধা । আবার একটী দ্রব্য প্রাতঃকালে একস্থানে রহিয়াছে মধ্যাহ্নে অন্য স্থানে, আবার অপরাহ্নে আর এক স্থানে, ইহাতে যে কত অসুবিধা ও সাংসারিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় বলা যায় না। অর্থাৎ প্রাতঃকালে দেখিলাম যে গামছাখানি গাড়ুর উপর রহিয়াছে, মধ্যাহ্নে দেখা গেল যে দরজার উপর উঠিয়াছে, অপরাহ্নে দেখা গেল তাহা রন্ধনশালায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত, রাত্রিকালে আহারের পর গামছা পাওয়া গেল না, অগত্যা কাপড়ে হাত মুছিতে হইল, শয়ন করিবার সময় দেখা গেল যে গামছা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিছানার কিয়দংশ ময়লা হইয়া ও ভিজিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভিজা বিছানায় শয়ন করিতে হইল। কি কারণে এই রূপ হয়? ইহার কারণ এই যে গৃহিণী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা নহেন। গামছা খানির যদি একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত এবং যদি গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে গৃহিণীর আদেশ থাকিত যে "কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবার পর তাহা আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবে" তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। আবার ইহাও দেখা যায় যে সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে

গৃহস্বামিনী শয্যাগৃহে কতকগুলি অপরিষ্কার দ্রব্যাদি রাখিয়া গৃহটীকে শোভাবিহীন ও অপরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যেমন শয্যাগৃহের এক কোণে কতকগুলি ছেঁড়া পুস্তক অথবা এক চেঙ্গারি চাউল ইত্যাদি। গৃহটীকে যেমন পরিষ্কার রাখিতে হইবে, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং গৃহস্বামিনী গৃহ কার্য্য করিবার সময় যেমন গৃহের সুশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করিবেন। গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের দিকে দৃষ্টি করিলে যেন "আহা" বলিতে ইচ্ছা হয়, যেন চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

**শয্যাগৃহ**—বাটীর মধ্যে যে গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যাহাতে রৌদ্র লাগে ও বায়ুর সমাগম ভাল রূপ আছে, এরূপ গৃহ শয়নার্থ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। শয়নগৃহে যত অল্প দ্রব্য থাকে, ততই ভাল, সেই গৃহে শয়নার্থ (অবস্থানুসারে) খাট অথবা তক্তপোষ এবং কাপড় রাখিবার জন্য একটী আল্‌না আলমারী অথবা দেরাজও থাকিতে পারে। আবশ্যক হইলে আরও দুই একটী দ্রব্য রাখা যায়, তথা লিখিবার জন্য টেবিল এবং বসিবার জন্য চেয়ার। গৃহের আয়তন অনুসারে দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে, গৃহ পরিষ্কার করা এবং শয্যাগৃহে বায়ু সমাগম যে বিশেষ আবশ্যক, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। শয়নগৃহে যদি ছবি রাখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষ ও প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল রাখা উচিত। আজি কালি ঐ রূপ ছবি অনেক পাওয়া যায়। এরূপ প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে অনেক সময়ে মহৎ ও পবিত্র ভাব আসিয়া থাকে।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই শয্যাগৃহের সমস্ত জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারা শয্যাগৃহের সমস্ত দূষিত বায়ু দূর হইয়া যায় এবং গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে। অন্ততঃ দুইবার (প্রাতে ও অপরাহ্নে) শয়ন গৃহ ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কার করিবে। ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিবার সময় খাটের নিম্ন পর্য্যন্ত যেন ঝাঁট দেওয়া হয়; কেননা অনেক বাটিতে অনেক স্ত্রীলোককে গৃহের মেজের অনাবৃত অংশটুকু কেবল ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতে দেখা গিয়া থাকে। তাহা হইলে খাটের নীচে ধূলা ঝুল জমিয়া ঘর অপরিষ্কার হয়, গৃহে দুর্গন্ধ হয় এবং সেই কারণে পীড়াও হইতে পারে। গৃহসজ্জাগুলি একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা প্রতিদিন মুছিয়া ফেলিবে এবং প্রতিবর্ষে এক একবার ভাল রূপ পরিষ্কার করিবে অর্থাৎ সাজিমাটীর জল দিয়া ধৌত করিলেই হইতে পারে। ইহা দ্বারা যদি বার্ণিস উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কিছু নূতন বার্ণিস কিনিয়া আনিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিলেই হইবে। প্রতি মাসে একবার করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ ঝুল ঝাড়িয়া গৃহ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঝুল ঝাড়িবার পূর্ব্বে শয্যা ও গৃহের দ্রব্যাদি সকল কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে, তাহা না হইলে ময়লা ও ঝুল পড়িয়া সেগুলি অপরিষ্কার হইতে পারে। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে শয়নকক্ষে ধুনার ধুম দেওয়া উচিত। তাহা দ্বারা গৃহের দুর্গন্ধ দূর হয়, দূষিত বায়ু নষ্ট হয় এবং গৃহে মশার আতিশয্য থাকিলে তাহাও কমিয়া যায়। আর গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উপকার হয়।

শীতকালে ঠিক সন্ধ্যার সময় শয়ন গৃহের বাতায়নগুলি বন্ধ করিয়া দিবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু যেমন আবশ্যক, আবার শীতকালের হিম তেমনি পরিত্যাজ্য। যে গৃহের পরিসর অল্প সে গৃহে অধিক সংখ্যক লোকের শয়ন করা অনুচিত, কারণ তাহাতে গৃহস্থিত বায়ু শীঘ্র দূষিত হইয়া যায়। গৃহ নির্ম্মাণ কালে শয়নগৃহের বাতায়ন গুলি বিশেষ প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত শয়ন গৃহে আবশ্যকমত পুস্তকাদিও থাকিতে পারে।

বিছানার চাদর, বালিস ও লেপ প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া উচিত। বিছানার চাদর এক দিবস অন্তর জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে, কারণ নিদ্রার সময় শরীর হইতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নিগর্ত হইয়া বিছানার চাদরের সহিত সংলগ্ন হয়, মধ্যে মধ্যে চাদর ধৌত করিলে সেই সকল দূষিত পদার্থ দূর হইয়া যায়।

শয্যাগৃহের মধ্যে পান সাজিবার উপকরণ যেন না থাকে; কারণ সদা সর্ব্বদা এই রূপই দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরা পান সাজিয়া চুনের হাত নিকটস্থ দ্রব্যাদিতে মুছিয়া থাকেন। সুতরাং শয্যাগৃহে পান সাজিবার উপকরণ রাখিলে অতি অল্প দিবসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গৃহের চেয়ার টেবিল দেরাজ খাটের পায়া ইত্যাদি সকল বস্তুতেই চুনের দাগ লাগিয়াছে। এজন্য পান প্রস্তুতের উপকরণগুলি স্বতন্ত্র গৃহে রাখা কর্ত্তব্য অথবা পান সাজিবার উপকরণের মধ্যে একখানি পরিষ্কার কাপড়ের খণ্ড থাকা আবশ্যক। পান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হাত মুছিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।

ভাণ্ডার গৃহ।—ভাণ্ডার গৃহকে আমাদের দেশের লোকে চলিত কথায় ভাঁড়ার ঘর বলিয়া থাকেন।

প্রত্যেক গৃহস্থের বাটিতে একটি স্বতন্ত্র ভাঁড়ার গৃহ থাকা আবশ্যক। ভাঁড়ার গৃহ শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ভাঁড়ার গৃহ আর্দ্র হইলে গৃহস্থিত তণ্ডুলাদি নষ্ট হইয়া যায়, অধিক দিন থাকে না। তবে যদি নিতান্ত পক্ষে শুষ্ক গৃহের অভাব হয়, তাহা হইলে কাজে কাজেই যেরূপ গৃহ পাওয়া যায়, সেই রূপই নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

ভাঁড়ার গৃহে যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহার তালিকা ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইতেছে। তবে গৃহস্বামিনীর একটী বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, ভাঁড়ার গৃহের সকল দ্রব্যই যেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকে অর্থাৎ এক এক প্রকারের দ্রব্যাদি এক এক স্থানে থাকিবে, যথা কাটারি, কুড়ালি, খন্তা, শাবল, ফোঁড় কোদাল ইত্যাদি লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য সকল একস্থানে থাকিবে, আবার রন্ধনার্থ হাতা, বেড়ী, খন্তী, চাটু, কড়া. ইত্যাদি রন্ধন কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি এক স্থানে থাকিবে; ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত গৃহস্বামিনীর গৃহস্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি এইবিষয়ে বিশেষ আদেশ থাকিবে যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থিত কোন দ্রব্য যে গৃহ হইতে এবং যে স্থান হইতে লইবে, কার্য্য শেষ হইলে ঠিক সেই স্থানে সেই দ্রব্য রাখিবে। তাহা না হইলে আবশ্যক মত দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে না। এরূপ সুশৃঙ্খলা না থাকিলে যে কাজ এক ঘণ্টায় হয়, তাহা করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং আবশ্যকমত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত কষ্ট, ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে।

সৌন্দর্য্য ও সুবিধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহকর্ত্রী ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবেন। চাউল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য একট একটী স্বতন্ত্র পাত্রে থাকিবে। পাত্রগুলিকে সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইবে। যদি হাঁড়ীর মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য রাখা হয়, তবে হাঁড়ীগুলিকে বিড়ার উপর বসাইয়া রাখিতে হইবে। অনেকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে সিন্দুক অথবা আলমারীর ভিতর দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকেন। ইহা অতি উত্তম, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, সকল লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। মাটীর পাত্র, কাঠের পাত্র বা টিনের পাত্র যাহা অল্প দামে পাওয়া যায় তাহা আবশ্যকমতে সংগ্রহ করা আবশ্যক। ভাঁড়ার গৃহের একদিকে চাউল, ডাল, ময়দা, লবণ, বড়ী প্রভৃতি থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন

ভিন্ন হাঁড়ী বা পাত্র থাকিবে, প্রত্যেক হাঁড়ী বা পাত্রের গায়ে প্রত্যেক দ্রব্যের নাম লেখা থাকিবে। তাহা হইলে একজন অপরিচিত লোক গিয়াও তাহা খুঁজিয়া বাহির করতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

মাঘ ১২৯৩

## রমণীর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাঁড়ার গৃহের একটী কোণে আলু থাকিবে। যৎকালে আলুর মূল্য সুলভ হয়, সেই সময়ে সস্তাদামে আলু কিনিয়া রাখিতে হইবে। ভাঁড়ার গৃহের একটী কোণে পাতলা করিয়া বালি বিছাইয়া তাহার উপর আলু রাখিতে হইবে। ঐ বালি পাছে গৃহের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, এজন্য তাহার দুইদিকে (কোণে রাখিলে অপর অপর দিকে দেওয়াল থাকিবে) ইটের সারি দিয়া বালির সীমানা ঠিক করিয়া দিবে। ঐ বালির উপর পরিষ্কাররূপে আলু বিছাইয়া রাখিবে। প্রথমে বড় বড় আলু খরচ করিবে কারণ বড় আলু শীঘ্র পচিয়া যায়। অনেক বাটীতে এরূপ দেখা যায় যে কোন দ্রব্য সুলভ মূল্য পাইলেই অধিক ক্রয় করা হয় এবং একেবারে অধিক ক্রয় করিলে অধিক খরচ হয়। এ বিষয়ে গৃহিণীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দ্রব্যাদি একেবারে ক্রয় করিলে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যদি অধিক খরচ হয় তাহা হইলে একেবারে কেনার কোন ফল দেখা যায় না। ইহার উপায় এই যে প্রত্যেক গৃহিণী ভাঁড়ার গৃহে একটা তৌল দাঁড়ী ও একপ্রস্থ বাটখারা রাখিবেন এবং দ্রব্যাদি নিজের সম্মুখে অথবা যাঁহার হস্তে ভাঁড়ার গৃহের ভার থাকিবে তাঁহার সম্মুখে ওজন করিয়া রন্ধনার্থে দিবেন। তাহা হইলে অধিক খরচের ভয় থাকিবে না। ভাঁড়ার গৃহের নর্দ্দমা আদি রাত্রিকালে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে নতুবা ইন্দুরাদি দ্বারা দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়া সম্ভব। সেই ঘরে যেন কোনরূপ আবর্জ্জনা না থাকে, পরিষ্কার ঝরঝরে থাকিবে, তাহা হইলে ইন্দুর থাকিতে পারিবে না অথবা থাকিবার সুবিধাও পাইবে না।

কলিকাতার বাজারে ছোট ছোট টিনের কৌটা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মসলা রাখিবার বেশ সুবিধা। ওই সকল কৌটাতে ঢাকনি দিবার আবশ্যকতা নাই। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলি পেরেক পুতিতে হইবে। প্রত্যেক টিনের কৌটার পায়ের উপর একটী করিয়া ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া ঐ পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং ঐ কৌটার ভিতর মসলা থাকিবে। কৌটাগুলির আকৃতি মসলার পরিমাণ অনুসারে হইবে অর্থাৎ যে কৌটায় লঙ্কা হলুদ থাকিবে তাহা বড় হইবে। যাহাতে জিরে মরিচ থাকিবে তাহা তদপেক্ষা ছোট হইবে আবার যাহাতে পাঁচ ফোড়ন (সম্বরা) থাকিবে, তাহা আরও ক্ষুদ্র হইবে, যেখানে যে কৌটা থাকিবে, তাহার উপরে দেওয়ালের গায়ে মসলার নাম লেখা থাকিবে ইহা দ্বারা সকলেই জানিতে পারিবেন যে কোন্ কৌটায় কোন্ মসলা আছে। মসলার কৌটাগুলি ঐ রূপে সাজাইয়া রাখিলে বেশ সুন্দর দেখায়, প্রস্তাব লেখক স্বয়ং ঐটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ভাঁড়ার গৃহের এক পার্শ্বে একটি চাঙ্গারিতে

নিত্য-ব্যবহার্য তরকারী আদি থাকিবে। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তরকারীগুলি ভাঁড়ারের মধ্যে না রাখিয়া অনাবৃত স্থানে শিশিরে রাখা উচিত, তাহা হইলে তরকারী সকল শুষ্ক না হইয়া সরস থাকে। তৈল ও ঘৃত রাখিবার জন্য একপ্রকার পাত্র ব্যবহার করিলে ভাল হয়; ঐ পাত্র চিনা মাটীতে প্রস্তুত। কলিকাতার পুরাতন জিনিস বিক্রেতাদিগের দোকানে সদাসর্ব্বদা ঐ পাত্র পাওয়া যায়। ঐ পাত্রে করিয়া মোরব্বা প্রভৃতি আমদানি হয়, পরে ঐ মোরব্বাদি বিক্রয় হইয়া গেলে দোকানদারেরা পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতাদিগকে ঐ পাত্র বিক্রয় করে। ঐ পাত্র চিনামাটিতে প্রস্তুত। উহা ঢাকনি সহিত পাওয়া যায়, উহার এক একটীর মূল্য আনা [তিন আনা] করিয়া, ঘৃত তৈল রাখিবার পক্ষে উহা অত্যন্ত উপকারী। ঘৃতের পাত্র হইতে ঘৃত হাত দ্বারা না তুলিয়া পলা দ্বারা তুলিলে ঘৃত অধিক নষ্ট হয় না। কিন্তু লোহার পলা ব্যবহার করিলে ঘৃতের বর্ণ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং ঘৃতের জন্য টিনের পলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লবণ যাহাতে রাখা যায়, তাহাই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এ জন্য এমন পাত্রে লবণ রাখিবে না যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। লবণ রাখিবার জন্য কাষ্ঠের পাত্রই বিশেষ উপযোগী। ভাঁড়ার গৃহে অন্ততঃ দুইটী সিকা থাকিবে। ঐ সিকার একটীতে ঘৃত ও একটীতে রন্ধনের তৈল থাকিবে। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে দুইটী কাষ্ঠ পুতিয়া তাহার উপর একখানি তক্তা দিয়া দ্রব্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিলে স্থানের সঙ্কুলান হয়। যাঁহারা জ্বালানি কার্য্যের জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা টিনের পাত্রে অথবা বোতলে ঐ তৈল রাখিবেন, এবং ঐ টিনের পাত্র অথবা বোতল একখানি তক্তার উপর রাখিবেন কারণ বোতলের গা দিয়ে যে তৈল ঝরিয়া পড়িবে তাহা ঘরের মেজেতে না পড়িয়া ঐ তক্তার উপর পড়িবে এবং সময়ে সময়ে ঐ তক্তা পরিষ্কার করিলেই হইবে। প্রদীপে তৈল দিবার জন্য একটী টিনের পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ টিনের পাত্রে একটী লম্বা গাডুর মত নল থাকিবে। ঐ নলের অগ্রভাগ খুব সরু হইবে, ঐ সরু নল দিয়া প্রদীপ ইত্যাদিতে তৈল ঢালিলে তৈল পড়িয়া নানাস্থানে লাগিবার অথবা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গাত্রে মাখিবার জন্য অনেকে নারিকেল তৈল ব্যবহার করেন। ঐ নারিকেল তৈল অনেকে বোতলের মধ্যে রাখেন। বোতলে নারিকেল তৈল রাখিলে একটী বিশেষ অসুবিধা হয়—শীতকালে প্রাতঃস্নান করিবার সময় তৈল পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তৈল না গলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে বোতল হইয়ে বাহির করা যায় না। সুতরাং ঘৃত রাখিবার জন্য যেমন পাত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐরূপ পাত্রে নারিকেল তৈল রাখিলে সুবিধা হইবে। এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে—আজ কাল কলিকাতার অনেক দোকানে সুবাসিত নারিকেল তৈল পাওয়া যায়। দোকানে ঐ তৈল যেরূপ মূল্যে পাওয়া যায় গৃহে প্রস্তুত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে এবং বাজারের তৈল অপেক্ষাও কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় না। এক সের নারিকেল তৈলে [দুআনা] ইস্তাম্বুলিকাহী নামক একপ্রকার তৈল মিশাইয়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়। উহা কলিকাতার আতরওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। যদি ঐ তৈলকে লাল করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ তৈলে দুই পয়সার রতনজুৎ ফেলিয়া দিলেই হইবে। রতনজুৎ একপ্রকার গাছের শিকড় কলিকাতার মাতাঘসাওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

**(ক্রমশঃ)**

**ফাল্গুন ১২৯৩**

# রমণীর কর্ত্তব্য
## (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

**রন্ধন গৃহ**—রন্ধন গৃহ সম্ভবতঃ ভাঁড়ার ঘরের সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। রন্ধন গৃহ ভাঁড়ার ঘরের যত নিকটে হয়, ততই সুবিধা। রন্ধন গৃহ নির্ম্মাণের সময় জল ও ধূম নির্গমের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। কারণ ধূম নির্গমের সুবিধা না থাকিলে পাচকের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং রন্ধনগৃহে জল অতি আবশ্যক, এ অবস্থায় জল নির্গমের প্রণালী রাখা উচিত। রন্ধনগৃহের যে দেওয়ালে জল নির্গমের নর্দ্দমা থাকিবে, সেই খানেই জলপাত্র রাখিবে, কেন না পাত্র হইতে জল লইবার সময় অবশ্যই কতক জল ভূমিতে পতিত হইবে, বার বার জল লওয়াতে অনেক জল ভূমিতে পড়িবে, সুতরাং নিকটে নর্দ্দমা থাকিলে সেই জল পড়িবামাত্র বাহির হইয়া যাইবে। রন্ধন গৃহের সীল বাহিরে পরিষ্কার আলোকময় স্থানে থাকিবে। সেখানেও জল যাইবার জন্য উপযুক্ত প্রণালী থাকিবে। জল বাহির হইবার প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ যে বাটীতে জল নির্গমের উপযুক্ত পন্থা নাই, সে বাড়ী সর্ব্বদাই সেঁতসেঁতে ও ভিজা থাকাতে গৃহস্থিত বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানি হয়। মধ্যে মধ্যে রন্ধন গৃহের ঝুল ঝাড়িতে হইবে, নতুবা গৃহের ছাদে অধিক ঝুল হইলে তাহা পড়িয়া খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইতে পারে।

রন্ধনের পূর্ব্বে রন্ধনাদির সমস্ত দ্রব্য যে পরিমাণ আবশ্যক, সেই পরিমাণ মত ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির করিয়া রন্ধন গৃহে রাখিতে হইবে। যেন পাচিকার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে না হয়।

অনেক গৃহস্থের বাটীতে এরূপ দেখা গিয়াছে যে পাচিকাকে একেবারে সকল দ্রব্য দেওয়া হয় না, রন্ধন করিবার সময় আবশ্যক মত দেওয়া হয়। তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়—এমন কি রন্ধন কালে সময় মত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে পাকও খারাপ হইয়া যায়।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাঁহার হস্তে ভাঁড়ারের ভার থাকিবে, তিনি রন্ধন কার্য্যের জন্য প্রতি দিবস দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিবার সময় দেখিবেন, ভাঁড়ারের দ্রব্যাদি যে পরিমাণ রহিল, তাহাতে কত দিবস চলিবে। ৩ দিবসের পরিমিত দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে থাকিতে, তিনি পুনরায় দ্রব্যাদি আনাইবেন। ৩ দিবস পূর্ব্বে আনিতে বলিবার কারণ এই যে হয়ত কোন গুরুতর কারণে আনিতে এক দিবস বিলম্ব হইল অথবা দোকান হইতে দ্রব্যাদি আসাতে দেখা গেল যে সে সকল দ্রব্য তত ভাল নহে, সুতরাং ফিরাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে আর এক দিবস বিলম্ব হইল। সুতরাং ৩ দিবস আগে দ্রব্য আনাইবার যোগাড় করিলে কোন গোলযোগ হয় না—এমন কি আবশ্যক হইলে দোকান হইতে দুইবার বদলাইয়াও আনা যায়।

**পাঠগৃহ**—বালক বালিকার পাঠ অভ্যাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। কোন কোন বাটীতে দেখা গিয়াছে, বাহিরে একটী মাত্র বৈঠকখানা গৃহ আছে এবং সেই গৃহেতেই বালকেরা পাঠ অভ্যাস করে। ইহাতে বালকদিগের পাঠের যে কত অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মনে করুন প্রাতঃকালে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এক জন আগন্তুক আসিয়া বালকের পিতার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইল। মনে করুন বালক তখন নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত,—কিন্তু বালককে তখনই পাঠ ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে হইল। পিতা

বলিলেন বাবুকে তামাক দাও, যদি সঙ্গতিসম্পন্ন হয় তাহা হইলে বালক দাস অথবা দাসীকে তামাক সাজিতে বলিল, নতুবা ভদ্রলোকের মান রক্ষার্থে নিজেই তামাক সাজিল। আগন্তুকের অভ্যর্থনার ভার বালকের উপর পড়িল। বালক সাধ্যানুসারে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পুনরায় পাঠে বসিল। বালকের পিতা যথাসময়ে বাহিরে আসিয়া আগন্তুকের সহিত হয়ত বালকদিগের বসিবার আসনের এক পার্শ্বেই বসিলেন, আবশ্যক কথার পর নানা প্রকার কথা হইতে লাগিল। ক্রমে গল্প (যেরূপ অধিকাংশ স্থলে হইয়া থাকে) আরম্ভ হইল। হয়ত নানা প্রকার অদ্ভুত গল্প হইতে লাগিল। আর এদিকে অর্দ্ধহস্ত দূরে সন্তান পাঠ অভ্যাস করিতেছে। চঞ্চলস্বভাব বালক, সহজেই তাহার মন স্থির হয় না, সে কি আর পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে? গল্প শুনিতে লাগিল। পিতা যদি তেমন সাবধান হন, তাহা হইলে গল্প করিবার সময়ও বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং অন্যমনস্ক দেখিলেই তাহাকে বলেন, "তুমি এসব কি শুনিতেছ, নিজের পড়া কর না।" বালক কি তাহা শুনে, তাহার মন কি পড়ায় যায়? চক্ষু পুস্তকের দিকে, কর্ণ গল্পের দিকে। যথাসময়ে আগন্তুক উঠিয়া গেলেন, পিতাও চলিয়া গেলেন, বালকেরও পাঠ সাঙ্গ হইল। এইত গেল প্রাতঃকালের কথা। আবার রাত্রের কথা দেখুন; রাত্রে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এমন সময়ে পিতার কয়েকজন বন্ধু আসিলেন, কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই স্থির হইল তাস খেলিতে হইবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা সন্তানকে বাটীর ভিতর গিয়া পড়িতে আদেশ করিলেন। বালক পুস্তক বগলে করিয়া বাটীর ভিতর গেল, তথায় পড়িবার কোনও বন্দোবস্ত নাই; আলো ঠিক করিতে, বসিবার মাদুর বা অন্য কোন আসন সন্ধান করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। এই ত দেখুন ব্যবস্থা, ইহার দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে বাহিরের গৃহে যে স্থলে সদা সর্ব্বদা লোক জন আসে অথবা যথায় বসিলে বালকদিগের পাঠের ব্যাঘাতের একটু মাত্রও সম্ভাবনা থাকে, তথায় পাঠের বন্দোবস্ত করা অন্যায়। যখন পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ হইয়াছে, তখন যদি কোন কারণে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেরূপ মনোযোগ হঠাৎ হয় না; তাহাতে আবার বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত। বালক না হইলেও পাঠে ব্যাঘাত হইলে সকলেরই ভাল রূপ পাঠ অভ্যাস হয় না। সুতরাং পাঠের জন্য সদা সর্ব্বদা নির্জ্জন গৃহের বন্দোবস্ত থাকিবে। যাঁহাদের বাটীতে গৃহ অধিক নাই অথবা গৃহ প্রস্তুতের স্থানও নাই, তাঁহারা ছাদের উপর অল্প ব্যয়ে গোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। গ্রীষ্মকালের প্রাতে এই ঘর বেশ শীতল থাকে এবং রাত্রিকালেও গ্রীষ্ম বোধ হয় না, আর শীতকালের প্রাতঃকালে রৌদ্রের ভালরূপ সুবিধা হয়, কিন্তু শীতকালের রাত্রিতে হিমের সম্ভাবনা। কিন্তু ভালরূপ পর্দ্দা১ প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করিলে হিম হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ গৃহ অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং এই গৃহ বেশ নির্জ্জন থাকাতে পাঠ অভ্যাসের খুব সুবিধা হয়।

পাঠগৃহে বালকদিগকে বসিবার জন্য মাদুর, শতরঞ্জি, কম্বল, চেয়ার অথবা বেঞ্চ থাকিবে। যাঁহাদের চেয়ার অথবা বেঞ্চ না থাকিবে, তাঁহারা শীতকালে কম্বল বা শতরঞ্জি এবং গ্রীষ্মকালে মাদুর ব্যবহার করিবেন। পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক বালকের পুস্তকের সংখ্যানুসারে বড় বা ছোট একটি টিনের বাক্স থাকিবে। প্রত্যেকে স্ব স্ব বাক্সে নিজের ব্যবহার্য্য দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল রাখিবে। যে দিবস যে যে পুস্তক পড়িতে হইবে, পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে সেই সকল পুস্তক বাক্স হইতে বাহির করিয়া

লইয়া পড়িতে বসিবে। পড়া শেষ হইলে, সেইগুলি আবার গুছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিবে। বালকেরা তাহাদের নিজের পড়িবার পুস্তকাদি রাখিবার ভার তাহাদের নিজের হস্তেই রাখিবে। কোন একটী পরিবার মধ্যে আমি দেখিয়াছি যে পড়িবার সময় বালকেরা পুস্তক লইয়া পড়িত বসিল, আবশ্যক মত দোয়াত কলম শ্লেট পেন্সিল সকলই লইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল, পাঠ শেষ হইবামাত্র তাহারা উঠিয়া অন্য কার্যে গেল, পুস্তক, দোয়াত, কলম, শ্লেট, পেন্সিল সব পড়িয়া রহিল। কিন্তু যেমন বালকেরা পাঠগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, অমনি তাহাদের জননী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পুস্তকাদি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন, দোয়াত, কলম যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইবার সময় যথাস্থান হইতে পুস্তকাদি লইয়া চলিয়া গেল, বিদ্যালয় হইতে আসিয়া যেখানে ইচ্ছা পুস্তকাদি ফেলিয়া রাখিল, কিন্তু তাহাদের জননী সেই সকল যথাস্থানে রাখিলেন। সেই বাটীর বালকেরা মনে করে যে পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখা তাহাদের কার্য্য নহে, তাহাদের মাতার কার্য্য। এই বিষয় দেখিয়া দুঃখ সহকারে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কারণ সেই পরিবারের গৃহিণী অত্যন্ত পরিশ্রমী, সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তিনি সকল কার্য্য নিজে করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি মনে করেন যে নিজে করিলে কার্য্য যেমন সুন্দর হয়, অপরের দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এইটী ভাবিতে গিয়া তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ অনভিজ্ঞ করিয়া ফেলিতেছেন। পুত্রেরা নিজের কার্য্য নিজে করিতে পারে, এই শিক্ষা দিলে তাঁহারও কষ্টের লাঘব হয়, এবং পুত্রদিগেরও ভবিষ্যতের মঙ্গল হয়।

চৈত্র ১২৯৩

## বালকের ধনী হইবার বাসনা এবং বুদ্ধিমতী মাতার উপদেশ

একটী দশ বৎসরের বালক একদিন তাহার মাতার পার্শ্বে চিন্তান্বিত বদনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মাতা তাহার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবিতেছ?" বালক উত্তর করিল, "আমি কিসে ধনী হইব, তাহাই ভাবিতেছি।" "ধনী হইবার তোমার এত ইচ্ছা হইল কেন?" বালক উত্তর করিল, "সকলের মুখেই ধনীর কথা, ধনীর প্রশংসা শুনিতে পাই। সকলেই ধনীর কথা আগে জিজ্ঞাসা করে। সে দিন আমাদিগের বাটীতে দূরদেশ হইতে যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কে? আমাদের স্কুলে একটী বালক আছে। সে পাঠ অভ্যাস করে না, কেবল বেড়িয়া বেড়ায় বা বসিয়া থাকে। কখন কখন সে সহপাঠীদিগকে মন্দ কথা বলে। কিন্তু তাহাকে কেহই ভর্ৎসনা করেন না, শিক্ষক প্রহার করেন না, কারণ সে একজন ধনীর ছেলে।"

বালকটীর মাতা দেখিলেন যে তাঁহার সন্তানের মনে ধনের প্রতি এরূপ ঝোঁক হইয়াছে

যে সে যেন ধনের জন্য সকলই করিতে পারে। মাতা সুশিক্ষিত, তিনি বুঝিলেন যে যদি তাঁহার সন্তান ধনের প্রকৃত মর্ম না বুঝে, তাহা হইলে সে কালে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধনের সেবক হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার ভ্রম অপনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি ধনী হওয়া মানে কি?"

বালক। "তাহা ত আমি জানি না। কিসে আমি ধনী হইব, মা তুমি আমাকে তাহা বলিয়া দেও। ধনী হইলে সকলে আমাকে সম্মান করিবে। সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে।"

মাতা—ধনী হওয়ার অর্থ অনেক টাকা উপার্জ্জন করা। বেশী বয়স না হইলে টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে।"

বালক—"ধনী হইবার কি এমন কোন উপায় নাই। যাহা আমি এখন হইতে অবলম্বন করিতে পারি?"

মাতা উত্তর করিলেন;—'টাকা উপার্জ্জন করা একমাত্র ধন নহে, আর উহা প্রকৃত ধন নহে। টাকা আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে, জলে ভাসিয়া যাইতে পারে, চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষ ধন উপার্জ্জনে জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু উহা মৃত্যুর সময় সঙ্গে যায় না। মহা ধনী যে রাজা, মৃত্যুর পর তাহারও আত্মা অতি দরিদ্র যে পথ-ভিখারী তাহার আত্মার ন্যায় একই পথে যায়। আর প্রকার ধন আছে, তাহা বাক্সের মধ্যে থাকে না, তাহা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। যাহারা সে ধনে ধনী, সকল মানুষ তাহাদিগকে প্রশংসা করে না বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা জগৎপিতা ঈশ্বরের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।"

বালক—"এই যে ধনের কথা বলিলে তাহা কি মা আমি এখন হইতে উপার্জ্জন করিতে পারি, না তাহার জন্যও অপেক্ষা করিতে হইবে?"

মাতা পুলকিত হইয়া সস্নেহে তাঁহার প্রিয় সন্তানের মস্তকের উপর হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, এ ধন উপার্জ্জনের জন্য বিলম্ব করিতে হয় না। আজই এই ধনলাভে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন যে যাহারা তাহাকে বাল্যকাল হইতে অন্বেষণ করিবে, তাহারা তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।"

বালক—তবে মা ঈশ্বরের চক্ষে কি প্রকারে ধনী হইতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও।

মাতা সস্নেহে সন্তানের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"প্রতি দিন সকালে ও রাত্রে অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট সরলহৃদয়ে কাতরভাবে এই প্রার্থনা করিবে যে তিনি যেন তোমার প্রতি দয়া করেন, যেন তুমি ভাল হইতে পার এবং চিরজীবন সকলের ভাল করিতে পার। প্রত্যহ এই প্রার্থনা করিবে, এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে তোমাকে ভাল হইতেই হইবে এবং সকলের ভাল করিতেই হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া পবিত্র মনে সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সদালাপ ও সৎকার্য্য করিবে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে ধনী হইতে পারিবে—সেই জগৎ পালকের চক্ষে তুমি ধনবান বলিয়া বিবেচিত এবং পুরস্কৃত হইবে।"

এই উপদেশ বালকের মনে গ্রথিত হইয়া গেল এবং সে মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আশ্বিন ১২৯৫

# আদর্শ বঙ্গরমণী

## বঙ্গমহিলার পত্র*

প্রিয় হেম!

আজ ছয় মাস এখানে আসিয়াছি। পল্লীগ্রাম যে এত সুন্দর এত মনোহর, এত নবীনতর, ইহা আগে জানিতাম না। এ গ্রামের নাম মৃজাপুর, গ্রামখানি ক্ষুদ্র, আমার বোধ হয় ইহা প্রকৃতির ক্রীড়া কানন। শ্যামল বৃক্ষ লতায় তটিনীর মৃদুল স্রোতে বিশাল প্রান্তরে মনোরম শস্যক্ষেত্রে যে দিকেই দেখি, প্রকৃতিদেবী যেন সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতেছেন! সহরে শোভা দেখিয়া দেখিয়া দর্শনেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু গ্রামের শোভা যতই দেখ ততই নূতন; আজ ছয় মাসের মধ্যে আমার চক্ষের শ্রান্তি জন্মিল না।

এ শোভার কথা আর এক দিন বলিব, আজ একটী জীবন্ত শোভার চিত্র তোমাদিগকে দেখাইব বলিয়াই এ পত্র লিখিতেছি। এখানে আসিয়া আমরা গ্রামের "মাষ্টার বাবুর" বাটীতে বাসা লইয়াছি। মাষ্টার বাবুর বাটীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুটী ছোট ছোট পুত্র, এক জন চাকর এক জন "ঝি" এই কয়টী লোক মাত্র। মাষ্টার বাবুর পত্নী কমলা দেবী কিরূপ চরিত্রের লোক তাহাই লিখিতেছি। ভরসা করি তুমি ও অপর ভগিনীরা মন দিয়া শুনিবে।

**ধর্ম্মভাব**—মাষ্টার বাবুর স্ত্রীর ধর্ম্ম ভাব দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। শুনিলে বিস্মিত হইবে তিনি সকল প্রকার বিপদ, দুঃখ এই বলিয়া সহ্য করেন "ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা জীবের অবশ্য কল্যাণীয়। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" যখন একমনে ঈশ্বরের চরণ পূজা করেন, তখনকার ভক্তি ভাব, দীন ভাব ও পবিত্র ভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। বোধ হয় তিনি এ জ্বালাময়ী পৃথিবী হইতে কোন শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। বোধ হয় সেই অনন্ত মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, বোধ হয় তিনি এ মর জগতে দেবীরূপিণী হইয়া আছেন! প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় দেবের চরণ বন্দনা করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। বিশ্বদেবের "আজ্ঞা পালন" করাই তাঁহার প্রতি কার্য্যের উদ্দেশ্য। বোধ হয় বুঝিতেছ ইহা দ্বারা—তাঁহার প্রকৃতি কত দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

**সেবা পরায়ণতা**—আজিকার দিনে কমলা দেবীর মত সেবা পরায়ণা মহিলা অতি অল্পই দেখা যায়। পরের সেবা করিতে ইহার যে কত আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। প্রাচীনা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন, অনেক কন্যা মাতাকেও সেরূপ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, আত্মীয় স্বজনের সেবা সকলেরই প্রিয়, কিন্তু প্রতিবাসী, বৃদ্ধ, পীড়িত, অধিক কি পশুপক্ষীদিগের সেবা করিতেও কমলা দেবী সর্ব্বদা প্রস্তুত; এই সেবার জন্যে কতখানি দয়া সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা সকলের অনুভব করাও কঠিন!

**পতি অনুরাগ**—স্বামীর প্রতি ভালবাস্রা বঙ্গমহিলার স্বাভাবিক সংস্কার হইলেও কমলা

* পারিতোষিক রচনা উপলক্ষে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিতা পারিতোষিক যোগ্য না হইলেও লেখাটী পাঠিকাগণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বলিয়া পত্রিকাস্থ হইল। বা বো, স।

দেবীর পতি অনুরাগে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি স্বামীর প্রতি ভ্রমেও রুক্ষভাষিণী বা পরুষ-ব্যবহার কারিণী নহেন, ক্রোধ অভিমানাদিকে তিনি প্রেম দ্বারা জয় করেন; স্বামীর রোগে স্নেহময়ী, দোষে ক্ষমাময়ী, মনোবিকারে সান্ত্বনাময়ী এবং সর্ব্বদা প্রেমবতী রূপে রহিয়াছেন। আমরা মাষ্টার বাবুকে মনস্বী ও দেবোপম চরিত্রবান পুরুষ দেখিলাম, বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, কেবল সাধ্বী রমণীর গুণেই তিনি এতদ্বিধ উন্নত হইয়াছেন। স্পর্শমণি সহযোগে লৌহ স্বর্ণ হওয়ার কথা শুনিয়াছি, বোধ হয় সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণী এ জগতের স্পর্শমণি, ইহাদের সাহচর্য্যে মনুষ্য মাত্রে দেবতা হইতে পারে।

**শিশু পালন**—কমলা দেবীর পুত্র দুটীর বয়স দশ বার বছরের অধিক হইবে না; তাহারা মাতার যে কত দূর বাধ্য তাহা আর কি বলিব? এই অল্প বয়সে তাহাদের সত্যানুরাগ, মিথ্যায় ঘৃণা ও ঈশ্বরপরায়ণতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাহাদের এরূপ শিক্ষা হইতেছে যাহাতে তাহারা সময়ে দেশের উন্নতির জন্যে, পরোপকারের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। মনুষ্যজীবন যে নিজের জন্যে নহে ইহা তাহাদের দৃঢ় ধারণা। লেখাপড়াতে তাহাদের যেরূপ মনোযোগ, বোধ হয় এ বয়সে এরূপ অতি অল্পই দেখা যায়। পাঠ্য বিষয়ে তাহারা পিতার সাহায্য পায় বটে, কিন্তু চরিত্র শিক্ষা, জ্ঞান পিপাসা, অভিজ্ঞতা লাভ মাতার নিকটেই হইতেছে। কঠিন বিষয় সকল তিনি এত সরল ও এত সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে বালকদিগের সুকোমল মনে তাহা অঙ্কিত থাকিয়া যায়। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি মাতার সর্ব্বদাই দৃষ্টি। তিনি বলেন, "শারীরিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহা পাতক হয়। এবং শরীর রোগময় ও নিস্তেজ হইয়া মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে।" ইঁহার বালকেরা পুষ্টিকর আহার পানীয় গ্রহণ, নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং উৎকৃষ্ট ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বদা প্রায় সুস্থ থাকে। সন্তানকে অযথা আদর, অকারণ তাড়না এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন একয়টী বিষয় মাতার বিশেষ নিষেধ। তাহারা ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি, সত্যের প্রতি সম্মান এবং সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ আদিষ্ট হইয়াছে। প্রিয় বোন! আমি যত দূর বুঝি তাহাতে বোধ হয় এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই দুটী বালক, দেশের দুটী রত্ন বলিয়া গণনীয় হইবে এবং এই মাতার পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গ মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে।

**গৃহকার্য্য**—যাঁহারা এখনকার মেয়েদিগকে "আসল্য প্রিয়া" বা "গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী" প্রভৃতি বলেন, তাঁহাদিগকে কমলা দেবীর গৃহ কার্য্য দেখাইতে আমার বড় ইচ্ছা করে। এ গৃহিণী বয়সে অল্প হইয়াও "উত্তমা গৃহিণী" আখ্যা পাইবার যোগ্যা। আলস্য নাই, বিরক্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কমলা দেবী প্রায়ই গৃহের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন, আবার সে সকল কাজ এত সুন্দর এত পরিপাটি যে দেখিলে চক্ষুর পরিতৃপ্তি জন্মে। এ দিকে সহরের মত রাঁধুনী রাখা রীতি নাই, কমলা দেবী স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এ কার্য্যে হাত এমন পাকিয়া গিয়াছে যে শাকান্ন হইতে পলান্ন মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত অতি উপাদেয় রূপে প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক গৃহিণী এইরূপ শিখেন, তবে গৃহস্বামীর মিঠাইকর ও হালুইকরের খরচটা বাঁচিয়া যায়।

গৃহসজ্জা দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম, এত সামান্য বস্তু যে এত সুন্দর হয়, ইহা আগে কখনই জানিতাম না। ইঁহার নিকটে কিছুই উপেক্ষিত হইবার নাই, কোনও বস্তুর বিশৃঙ্খলা নাই। গোয়াল ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রসুই ঘর, শয়ন ঘর যাহাই কেন দেখ না সুশৃঙ্খল, সুপরিষ্কৃত ও সুন্দর। গৃহে এমন একটু স্থান দেখিলাম না যে এইখানে গৃহিণীর

অমনোযোগ, এমন একটী বস্তু দেখিলাম না যে ইহাতে গৃহিণীর উপেক্ষা, এমন এক ব্যক্তি দেখিলাম না যে ইহার মঙ্গলের জন্য গৃহিণী নিশ্চেষ্ট।

**দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার**—গৃহে এক জন দাস ও এক জন দাসী আছে আগেই বলিয়াছি। ইহারাও গৃহস্বামীনীর গুণে পরিশ্রমী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র হইয়াছে। ইহারা তাঁহার এমনি বাধ্য যে তাঁহার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তিনি ইহাদিগকে বিশ্রামের জন্য সময়, সুকার্য্যে পুরস্কার এবং ক্রটীতে উপদেশ দিতে কখনই ক্ষান্ত হন না; ইহাদের পীড়া হইলে স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করেন। ফলতঃ দাস দাসীরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে।

দাস দাসীরা তো মানুষ, নির্ব্বোধ পশুরাও বুঝি তাঁহাকে চিনিয়াছে। গরু বাছুরেরা "মা"কে দেখিলে যেন কত আনন্দ পায়! কুকুরের তো কথাই নাই, সে যেন ছেলেদের তৃতীয় ভাই। কমলা দেবীর প্রশস্ত হৃদয় সকলকেই ভালবাসিতে সক্ষম।

**সাধারণতঃ ১ম।** সংসারের আয় ব্যয়ের ভার কমলা দেবীর হস্তে। মাষ্টার বাবু নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন তিনি এ সকল কর্ম্মে "গৃহিণীর" মত পারদর্শী নহেন। কমলা দেবী মিতব্যয়ী, সিকি পয়সাটী তাঁহার নিকট হইতে অযথা খরচ হইবার যো নাই, তাই বলিয়া ইঁহাকে তুমি কৃপণ ভাবিও না—কানা খোঁড়া বৃদ্ধ অনাথ প্রভৃতি লোককে ইনি মুক্তহস্তে দান করেন; কিন্তু সে দান অতি গোপনে সাধিত হয়, আমাদের রাজা বাহাদুরের বা রাণী চৌধুরাণীর দানের মত সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় না, দেশের প্রধানতম ব্যক্তিদিগেরও কর্ণগোচর হয় না। মাতার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে কমলা দেবী দীন দুঃখীর উপকার করেন।

**২য়।** কমলা দেবীর শিল্প কার্য্য সকল দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। উলের সূচের জরীর পুঁতির সকল কাজই মনোহর; সামান্য কাঁথা সেলাই হইতে শালের কল্কা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়াছেন। গৃহের লেপ তোষক পিরাণ পেণ্টুলান আসন দুলিচা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ইঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত। দেখিয়া বুঝিলাম দরজীকে মাষ্টার বাবুর পয়সা দিতে হয় না।[1]

**৩য়।** প্রতিবাসিনীগণ কমলা দেবীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। কেহ উপদেশ লইতে, কেহ গৃহকার্য্য শিখিতে ও কেহ বা মনের কথা কহিতে সর্ব্বদাই কমলা দেবীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছে। কমলা দেবী সকলেরই বিশ্বাসভাজন। দুষ্টা স্ত্রীগণ তাঁহার সহিত বিবাদেচ্ছা করিয়া অপ্রতিভ হয়, কারণ সকলের ঈর্ষা, ক্রোধ, অবিমৃশ্যকারিতা তিনি বিনয় প্রেম ও ক্ষমা দ্বারা জয় করেন।

**৪র্থ।** সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়াও কমলা দেবী জ্ঞানোন্নতি সাধনের পরাঙ্মুখী নহেন। অবকাশ মত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ, বিদুষী মহিলাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বজাতীয় ভগিনীদিগের উন্নতি বিষয়ে আলাপ করিতে এবং সাময়িক পত্রাদিতে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ। এই গৃহাবরণে থাকিয়া এত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন, যে ইঁহার সহিত আলাপ করিলেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

**৫ম।** কমলা দেবী সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখী ও প্রিয়ভাষিণী। মুখখানি এমন গাম্ভীর্য্য—এমন পবিত্রতা—আর এমন লজ্জাশীলতা মাখা, এই তিনটী মিশিয়া এমন মধুরতা উৎপাদন

১ দেশীয় ভগিনীরা রন্ধন শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণ হইলে কেবল পয়সার সুসার, একথা বলা লেখিকার অভিপ্রেত নহে। এ বিষয়ে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

করিয়াছে যে সে মুখ দেখিলে আনন্দ ভালবাসা সম্ভ্রম আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

আর পত্র বাড়াইব না হেম! কমলা দেবীর চরিত্র ব্যবহার ও কথায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বোধ হয় এই দেবীই বঙ্গরমণীর আদর্শস্বরূপা। যে দিন বাঙালির ঘরে ঘরে এইরূপ দেবীগণ বিরাজিতা হইবেন, সেই দিন বঙ্গমাতার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইব। কাহারও প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয় না, একবার দুইবার তিনবার বহুবার চেষ্টা করিয়াও যদি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারি, তবে কেন চেষ্টা করিব না?

আজিকার মত বিদায় লইলাম ইতি।

কার্ত্তিক ১২৯৫

তোমার স্নেহের ভগ্নী

(দ্র. বৈশাখ ১২৯৬)

# নব্যাগৃহিণী*

## নব্যাগৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়

নব্যা গৃহিণীদিগের "মার্জ্জিত বুদ্ধি" "পরিষ্কৃত রুচি" এবং "শিক্ষিত" উপাধি সত্ত্বেও উত্তমা গৃহিণী বা আদর্শ গৃহিণী হইবার অনেক ত্রুটি দেখা যায়। যে কয়েকটী বিষয়ের অভাবে তাঁহাদের এ অসম্পূর্ণতা দূর হইতেছে না, আমরা তাহাই বিবৃত করিব।

সাধারণতঃ নব্যা গৃহিণীদের সহিষ্ণুতা, উদারতা, শ্রমপারগতা, ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা এই কয়টী উপকরণের অভাব রহিয়াছে। এই জন্যেই বঙ্গগৃহে উপযুক্ত সন্তোষ লাভ হইবার আশা নাই। আমরা এই কয়টী রোগের ও তৎপ্রতীকারক ঔষধের বিষয় লিখিতেছি, ইচ্ছা হইলে ও একটু যত্ন করিলে দেশীয় ভগিনীরা আপনারা আপনাদের চিকিৎসা করিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।১

**সহিষ্ণুতা**—আগেকার সেই "অশিক্ষিতা" "নিরক্ষরা" গৃহিণীরা সহিষ্ণুতার বলেই গৃহদেবীস্বরূপা ছিলেন। তখন হিন্দু জাতি দূরসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের সহিতও একান্নভূক্ত থাকিতে পারিতেন। এই জন্যেই হিন্দুনারী মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্টমনে উপবাস করিতেন। রোগ শোক অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি কোন কষ্টেই হিন্দু রমণী অধৈর্য্যতা প্রকাশ করেন নাই। এই সহিষ্ণুতার জন্যেই তো পৃথিবীর ধৈর্য্যের সহিক আর্য্য কবি রমণী-ধৈর্য্যের উপমা দিয়াছেন। আবার বলি, শুদ্ধ যে দৈহিক কষ্ট লইতে পুরাতন

* শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত। পারিতোষিক রচনা সকলের মধ্যে এ বিষয়ে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পারিতোষিকযোগ্য হইয়াছে। বা, বো, স।

১ নব্যা গৃহিণীদিগেব যে অভাবের কথা লেখা হইল, অবশ্য সকলের চরিত্রে এ অভাব লক্ষিত হইবে না। যাঁহাদের এ সকল অভাব, তাঁহারাও আমাব উপর বিরক্ত হইবেন না, কারণ বিদেশীয় প্লাবনে দেশের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে তাহা পুনঃ সংগ্রহ আর দেশীয় দূষিত বায়ুর পরিবর্তে বিদেশীয় স্বাস্থ্যকর বাতাস গ্রহণই আমাদের অভিপ্রেত। সমাজের পরিবর্ত্তন সময়ে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রঃ লেঃ।

গৃহিণীরা সহিষ্ণু, এমন যেন কেহ না ভাবেন। তাঁহারা বহু পরিবার মধ্যে বাস করিয়াও অনেক সময়ে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিজে গৃহ-স্বামিনী হইয়া কত সামান্য ব্যক্তির উপদ্রব সহিয়াছেন এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। আহা! এমন রত্ন বঙ্গবামার হাতছাড়া হইয়াছে, তাঁহাদের অমূল্য সম্পত্তি বিদেশে গিয়া পড়িয়াছে! আজ সহিষ্ণুতার আদর্শ খুঁজিতে হইলে দেশান্তর যাইতে হয়, ইহা কি সামান্য লজ্জা ও দুঃখের কথা?

**উদারতা**—দেশের শিক্ষিত উন্নত জ্ঞানাভিমানী অনেক পুরুষের স্বার্থপরতা প্রবল। তাঁহাদের নিকট হইতে (কিসে জানি না) এই বৃত্তি সংক্রামক রোগের মত রমণী হৃদয়ও আক্রমণ করিতেছে। নব্য মহিলার হৃদয়ে আর এতটুক স্থান নাই যে স্বামী পুত্র প্রভৃতি কয়টী লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও একটু স্নেহ কি সহানুভূতি দিতে পারেন। এই জন্যেই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—স্বামী পুত্র ব্যতীত গৃহিণীদিগের সবই পর হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, কেবল আত্মত্যাগ অভাবে কত গৃহ উৎসন্ন যাইতেছে, কত আত্মহত্যা ঘটনা হইতেছে, দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সঙ্কীর্ণতা রূপ ম্যালেরিয়া ত্বরায় দেশ হইতে অপনীত না হইলে দেশের যে কি পরিণাম হইবে তাহা বলিতে পারি না।

**নব্যাগৃহিণীদিগের তৃতীয় অভাব শ্রমপারগতা**—এখনকার লক্ষ্মীদের আগুনের কাছে গেলে মাথা ঘোরে, রৌদ্র লাগিলে গরম হয়, ভোরে উঠিলে সর্দ্দি লাগে এবং সকালে আহার না হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। সেকালে—সত্য দ্বাপরের কথা বলিতেছি না—ননীর দিদিমা, সুবেশের ঠাকুরমা প্রভৃতির সময়ে এত রোগ ছিল না; তাঁহারা ধনীর পরিবার হইলেও সংসারের কার্য্য নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। এখনও দেখিতে পাই শাশুড়ী বৌয়ে কত পার্থক্য! এখনও ৬০/৭০ বর্ষ বয়স্কা শাশুড়ী প্রাতঃস্নান করিয়া অনায়াসে ২০/২৫ জনের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন, অতিথি সেবার অনুরোধে তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্তও "বাসি মুখে জল" দেন নাই। আর বৌমাকে হয়ত দশ জনের ভাত রাঁধিতে গিয়া তিন বার মিছিরি ভিজা খাইতে হয়; শিশুর অনুরোধে ধাত্রী, গৃহকর্ম্মের অনুরোধে চাকরাণী তো আছেই, এবারে কিন্তু যেমন করিয়াই হউক একটা রাঁধুনি রাখিতেই হইবে, নয়ত ও রোগা বৌ দুই দিন পরেই মারা যাইবে!

এ দেশে যখন এত সৌখীনতার—এত অলসতার ছড়াছড়ি, যখন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীগণ পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া লজ্জা রাখিবার স্থান পান না, তখন এ দেশের লোক তো "নির্ধন" ও "নিরন্ন" হইবেই হইবে!

**ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা**—যখন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মনোবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, সেইখানে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—"যদি গোবিন্দলালের মাতা পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে এ মেঘ এক ফুৎকারে উড়াইতে পারিতেন।" আবার সুশীলার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে সুশীলা একদিন পোড়া দিয়াশেলাই হারান'তে বিমাতা বলিয়াছেন "সুশীলা, আজ তুমি বিস্তর অপচয় করিলে"। আমাদের স্থির বিশ্বাস পাকা গৃহিণীর কার্য্যই এইরূপ, ক্ষুদ্র ঘটনার ফলাফল গণনা, ক্ষুদ্র বস্তুর সদ্ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে তিনি বিরত হন না। আজি কালি নব্যা গৃহিণীরা ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করেন ইহা বড় দুঃখের বিষয়। গৃহিণী যতদিন ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিবেন, ততদিন তিনি গৃহকর্ম্মের নিশ্চয়ই সুবিধা করিতে পারিবেন না।

**গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা**—যেরূপ রাজ্যের অবলম্বন রাজা সেইরূপ গৃহের অবলম্বন

গৃহিণী। গৃহধর্ম্মা উত্তমরূপে সংরক্ষণ না হইলে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণীর প্রতি কার্য্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত না হইলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণী সুবিবেচনা পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলরূপে দৈনিক কার্য্য না করিলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন না হয়, সে গৃহে বিবাদ, অনুতাপ, রোগ, বিশ্বজ্বালা প্রভৃতি যে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকিবে—এরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ যে বনবাসী হওয়া সুখকর মনে করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা পালন না হইলে গৃহাশ্রম কেবলই কষ্টদায়ক মাত্র, এই মনে করিয়া প্রতি নব্যা গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

আমরা গৃহিণীদিগের অভাব বিবৃত করিলাম, এখন সেই অভাব মোচনের বিষয় লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

**১ম।** নব্যা গৃহিণীদিগের প্রথম অভাব সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা যাঁহার অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহার নিকট রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি সকল কষ্টই পরাভূত হয়। একদিনেই কেহ পৃথিবীর মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারেন না। অন্যান্য মানসিক গুণের মত সহিষ্ণুতাও অভ্যাস করিতে হয়। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে আত্মসংযমও আয়ত্ত হইবে, তাই বলিতেছি, ভগিনী! তুমি সহিষ্ণুতা গ্রহণ কর, এই ঐশিক অভেদ্য বর্ম্মে তোমার হৃদয় আচ্ছাদিত হউক, তাহা হইলে জগতের কোনও অস্ত্র তাহা ভেদ করিতে পারিবে না।

**২য়।** উদারতার কথা বলিতেছি, ভালবাসার সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতা নিজেই আসিবে। কেবল কয়টী "আপনার জনের" জন্যে তোমার জীবন নয়, প্রত্যেক নিকটস্থ ব্যক্তি হইতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর। হৃদয়কে যত বড় করিবে, ততই বাড়িবে। আপনার জনের দুঃখ দূর করিতে ত অনায়াসে প্রাণটা ছুড়িয়া ফেলিতে পার, পরের সুখের জন্য কেন হৃদয়টী উৎসর্গ কর না? তোমার চক্ষে অশ্রু দেখিলে অশ্রুর মূল্য মনে হয় না, কেন না অধিকাংশ সময়েই সে অশ্রু ক্রোধের অশ্রু, সে অশ্রু অভিমানের অশ্রু, সে অশ্রু হিংসার অশ্রু; যদি পরের দুঃখে অশ্রুধারা চক্ষে বহাইতে পার, তবেই তোমার অশ্রু মুক্তা হইতেও বহু মূল্য, তবেই "অশ্রুপরতা" তোমার স্বাভাবিক সম্পত্তি। তোমার স্নেহাস্পদ আত্মীয় কুপথগামী হইয়াছেন বলিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন, প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবে। মরিতে হয় ত বুঁদীর অধীশ্বরীর মত, ঝান্সীর দেবীর মত কাজ করিতে করিতে মরিবে; আর যদি রাগ করিতে হয়, তবে ঝি বা চাকরের প্রতি অথবা প্রতিবেশীর প্রতি কেন রাগ করিবে, মনের পাপগুলোর উপর রাগ কর, তাহাদের জন্য একটুকু স্থানও রাখিও না। হৃদয়ের সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতার অভাব দূর হইয়া বিমল জ্যোৎস্না ফুটিবে।

**৩য়।** শ্রমপারগতার এক আপত্তি শুনিতে পাই, "এক্ষণকার রমণীগণ বিদ্যাভ্যাস করেন বলিয়া বাল্যকালে শ্রমাভ্যাস করিতে পারেন না, সেই জন্যই পরিশ্রম করিতে অপটু।" এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত, খনা বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি (অসাধারণ বিদ্যাবতী) দেশীয় মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম করিতে নিপুণা ছিলেন। বিদেশীয় রমণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। সারলট ব্রন্টি, আরমিণী প্রভৃতি অধিকাংশ সময় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও "সুকবি, সুলেখিকা" আখ্যা পাইয়াছেন। এখন কথা এই যে, নব্য মহিলারা শ্রম করিতে লজ্জিতা না হন, এবং বালিকাদিগকে শ্রম অভ্যাস করাইতে যেন ত্রুটি না করেন। বিলাসিতা বিদেশীয় বস্তু, ইহার বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিয়া যে

দেশের সারবান জিনিসে অনাদর করে, সেই প্রকৃতরূপে "নির্ব্বোধ" উপাধির উপযুক্ত। ভরসা করি, দেশীয় গৃহিণীগণ এরূপ নির্ব্বোধতা দেখাইবেন না।

**৪র্থ।** সামান্য বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। বীজ হইতে যে মহা মহীরূহের উৎপত্তি, ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। একজনের ক্ষুদ্র অসন্তোষ (বর্দ্ধিত হইয়া) কালক্রমে গৃহ বিচ্ছেদের কারণ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র অগ্নিকণায় হয় ত একটী গ্রাম দগ্ধ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র সূচের অভাবে হয় ত একদিনের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে, এমন কত বলিব যে সকল গৃহিণী ক্ষুদ্র বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাঁহারা প্রতিদিনই নির্ব্বোধতার প্রতিফল পাইতেছেন; প্রতি ক্ষুদ্র বস্তু ও ক্ষুদ্র ঘটনায় গৃহিণী মনোযোগ করিলে এ দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে এবং গৃহস্থেরও সুবিধা হইতে পারে।

**৫ম।** গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা—গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে নিজের উপযুক্ত গুণগুলি গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বোধ, বিজ্ঞতাহীনা, মুখরা, পক্ষপাতিনী ও আত্মসংযম-বিমুখী রমণী কখনও গৃহিণী পদের উপযুক্তা নহেন। গৃহিণীকে বুদ্ধিমতী, শান্তস্বভাবা, পক্ষপাতহীনা ও আত্মসংযমে সক্ষমা হইতে হইবে। গৃহিণীকে অনেক সময়ে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা ও ক্ষমা বিতরণ করিতে হইবে। গৃহের অন্যান্য লোকের নিকট যাহাতে তিনি সম্ভ্রম পাইতে পারেন, এরূপ গাম্ভীর্য্য—এরূপ বিজ্ঞতা রক্ষা করিবেন। তিনি প্রত্যেক গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন। তিনি গৃহের সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। গৃহের অপর রমণী, (দাস দাসী থাকিলে তাহারাও) যাহাতে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ হয়, এরূপ সুশিক্ষা দিবেন। যাহাতে তাহারা আলস্য বা অবহেলা বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি না করে, গৃহিণীকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে অথচ কেহ তাঁহাকে যেন সন্দিগ্ধচিত্তা বলিয়া সন্দেহ না করে, তাহাতে সাবধান হইবেন। যাহাতে আয় হইতে ব্যয় অল্প হয়, গৃহস্থকে দরিদ্র বা ঋণী হইতে না হয়, গৃহিণী বিশেষ মতে তাহার চেষ্টা করিবেন। তাই বলিয়া গৃহিণীকে কৃপণা হইতে পরামর্শ দিতেছি না, মিতব্যয় করিলেই এরূপ সুবিধা হইবে।

গৃহিণীর লেখা পড়া, আবশ্যক ব্যবহার্য্য সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, শিশু পালন, গৃহচিকিৎসা, আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা কর্ত্তব্য। এই কয়টী বিষয় গৃহাশ্রমে বিশেষ আবশ্যক।

গৃহ যাহাতে ধর্ম্মালোকহীন শ্মশান না হয়, তদ্বিষয়ে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহের প্রতি জনের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি যত্নবতী হইবেন। সকলের পক্ষেই তিনি প্রিয়ভাষিণী, প্রফুল্লমুখী ও স্নেহময়ী দেবীরূপা হইবেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে গৃহের—গৃহাশ্রমের নেত্রী জানিয়া গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তাহা হইলেই বঙ্গ গৃহের নূতন অভাব সকল মোচন হইবেক।

অগ্রহায়ণ ১২৯৫

# প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও তাহার উন্নতির উপায়*

আমরা প্রাচীন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে প্রাচীনাগণের এবং নূতন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে নব্যাগণের নামোল্লেখ করিব। প্রাচীন গৃহকার্য্যের মধ্যে রান্না বড় আদরের কাজ ছিল। ইহাতে প্রাচীনাগণের বিন্দুমাত্র আলস্য বা ঔদাস্য ছিল না (এই প্রবন্ধ আমরা কেবল হিন্দু সমাজ লক্ষ্য করিয়া লিখিব। অবশ্য ইহাতে অতি প্রাচীন কালের কথা উল্লিখিত হইবে না।) ভোরে উঠিয়া পিঁড়ি, ঝাঁটা, ঘর ধৌত করা, বালক বালিকাদের প্রাতের খাদ্য তৈয়ারি করিয়া, তৎপরে তরকারী কুটিয়া স্নানান্তে রসুই করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজন করান প্রাচীনাদিগের স্বতঃসিদ্ধ কার্য্য ছিল। তদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে কোন কোন পল্লী গ্রামে চাউল কাঁড়া, জল তোলা কার্য্যও গৃহিণীকে করিতে হইত। প্রদীপ জলে ভিজান, তাহা পরিষ্কার করা, সলিতা প্রস্তুত, ঘর দরজা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা, গাভীকে ভাত খাওয়ান, বিছানা পাতা, সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতি ঘরে আলো দেওয়া এবং প্রতি ঘরে ধুনার ধোঁয়া দেওয়া, শাঁখ বাজান প্রভৃতি কার্য্যও গৃহিণীগণ করিতেন। এক কথায় তাঁহারা গৃহের সমস্ত কাজ স্বহস্তে করিতেন, তখন অধিক দাস দাসী আবশ্যক ছিল না। ধনী লোকের পক্ষে অন্যরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে অধিক দাস দাসীর প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক যতদূর দেখিয়াছি আর যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল কার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আলস্য বা বিরক্তি ছিল না। তাঁহারা অনেকে লেখাপড়া জানিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা গৃহ কার্য্যে অতি সুনিপুণা ছিলেন এবং শিশুপালনেও নিতান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন না। প্রাচীনাগণ অভাবের সংসারে নিজেরা সাধ্যমত অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এমনি কুসংস্কারের বশীভূতা ছিলেন, যে কর্ত্তব্য কাজকেও অবহেলা করিতেন। বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের সূতিকাগার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রাচীনাগণের কুসংস্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক গৃহকার্য্য-প্রণালীর কথা আর কি বলিব? নব্যাগৃহিণীগণ, গৃহকার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন না তা আর কিসের প্রণালী বলিব? অনেকেই এখন স্বামী বা অন্য আত্মীয়ের চাকরী স্থলে বাস করেন এবং দাস দাসী ও রসুয়ের দ্বারাই সমস্ত গৃহকার্য্য চলে। তবে অনেক নব্যাগৃহিণী টাকাকড়িগুলা নিজ হাতে করিয়া খরচ করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাহারও কি সদ্ব্যবহার করিতে জানেন? নিজের গহনা ও কাপড়ের জন্য অনেক সময় ভাবিতে হয়। আপনাদের সংসারে অন্যান্য অভাব থাকিলেও ইঁহারা অলঙ্কার ও অন্য বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করেন। আধুনিক নব্যা গৃহিণীগণের মধ্যে যাঁহারা দুরদৃষ্টক্রমে পল্লীগ্রামে থাকেন এবং সংসার কার্য্যসকল যাঁহাদের ঘাড়ে পড়ে, তাঁহারা নিতান্ত দুঃখের সহিত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কোনমতে কার্য্য সমাধা করেন। কিন্তু আধুনিক নব্যাগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহারা গৃহকার্য্য অকর্ত্তব্য বা মানহানিকর মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন কি যে তাঁহাদের স্বামী মোটা বেতন পাইলেও যে কার্য্য করেন সেই কার্য্যের নাম চাকরী। স্ত্রী যাঁহার অর্থে দাস দাসী খাটাইয়া

* যশোহর বিদ্যানন্দকাটীর শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত। পারিতোষিক রচনায় এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পুরস্কৃত হইয়াছে। বা, বো, স।

নিজে পুতলী সাজিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকেন, সেই আত্মীয়কে কত খাটিতে হয়—কত পরিশ্রম করিতে হয়!! তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, পরের খাটুনি খাটিয়া টাকা আনিবেন আর আমি বসিয়া থাকিয়া সেই টাকার শ্রাদ্ধ করিব এবং আপনার নিজের ঘরের কাজ নিজে করিতে অপমান বোধ করিব। ছি! এ বৃথাভিমান কেন? প্রধানতঃ পুরুষকেই দোষী করিতে ইচ্ছা করে, কারণ তাঁহাদের মধ্যেও এই বৃথা অভিমান দেখা যায়, অর্থাৎ নিজে মজুরী খাটিয়া খান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর চারিটা রসুয়ে পাঁচটা দাসী দশটা চাকর না থাকিলে মান থাকে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের সাহায্য করুন, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয়। কাহারও বেশি থাকিলে তিনি সঞ্চয় করুন, সাধ্যমত দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন। এ বৃথা টাকা উড়ান কেন? আবার বলি এ দোষ নব্যা গৃহিণীদের নহে, পুরুষদের মনঃসন্তোষের জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর ন্যায় হিন্দু ললনা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই পুরুষেরা যাহাতে সন্তোষে থাকেন, রমণীগণও তাহাই করিতে শিখেন। আমাদের পুরুষেরা এখন পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দু সদাচার ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা এখন ইংরেজ রাজের প্রজা, ইংরেজ একে রাজা, তাহাতে আবার বিদ্বান ও সভ্যজাতি বলিয়া অভিহিত। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বড় লোকের অনুসরণ করিতে ভাল বাসেন, তাই আজ বিলাসী ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া, ধর্ম্মভীরু স্বার্থত্যাগী হিন্দু শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের দিকে পদক্ষেপ করিতেছেন, কাজেই নব্যাগণ তদনুসারে বিলাসিনী ও গৃহকার্য্যে অপারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছেন এবং সন্তানকে "সঁপে দেন সুকুমার ধাত্রী মা'র করে।" অবশ্যই কোন বাটীতে বা পল্লীতে ইহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে। এখন গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি ও কি করিলে গৃহকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে?

প্রথমতঃ, গৃহিণীকে আয় ব্যয় হিসাব রাখিয়া সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যদি অভাবের সংসার হয় তবে নিজের চেষ্টা দ্বারা যতদূর অভাব মোচন হইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য, বাড়ীতে ঘৃত তৈয়ারী, ঘুঁটে তৈয়ারী করিলে এবং লেপ, কাঁথা, গদি, তোষক, কম্ফটর, টুপি, বোটক্লোক, দোলাই ও পাখা প্রভৃতি বাড়ীতে নিজে প্রস্তুত করিলে অভাবের সংসারে অনেক উপকারে আইসে। গৃহিণী দ্বারাই গৃহ কার্য্যের উন্নতি, সুতরাং গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা গৃহ কার্য্যের উন্নতির বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব। গৃহিণী অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারেন এরূপ অভ্যাস রাখা উচিত; গৃহিণী বলিয়া কেন, মনুষ্য মাত্রকেই পরিশ্রমশীল হওয়া উচিত। ভাঁড়ার ঘরের ভার গৃহিণী স্বহস্তে রাখিবেন, তাহাতে আবশ্যক জিনিষ আছে কিনা তাহা প্রত্যহ দেখিবেন, অল্প পরিমাণে থাকিলে পুনরানয়ন করিবেন, ভাঁড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করিবেন, যাহাতে জিনিষের পাত্রগুলি সুশৃঙ্খল থাকে ও পাত্রের মুখ ঢাকা থাকে, তাহা করিবেন। কারণ চাউল ডাইল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি যেখানে থাকে সেখানে ছুঁচা ইঁদুর তেলাপোকা পিপীলিকা প্রভৃতি থাকিবার সম্ভাবনা তজ্জন্য ভাঁড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করা ও পাত্রাদির মুখ ঢাকা আবশ্যক। গৃহের কে খাইল কে না খাইল কাহার কিসে খাওয়া ভাল হয় কাহার না হয়, সে সমস্ত গৃহিণীর দ্রষ্টব্য। বালক বালিকাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহিণী তথায় থাকিয়া তাহার দোষ ও অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া মিটাইয়া দিবেন। কিন্তু চটিবেন না। গৃহের পালিত পশু পক্ষীদিগের প্রতিও গৃহিণীর দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘর যদি বাটীর ভিতর হয়, তবে গৃহিণী প্রত্যহ গোয়াল ঘরের তত্ত্বাবধান করিবেন, তথায় চোনা সরিবার

ও বাতাস খেলিবার উত্তম পথ আছে কিনা—ঘরটা বেশ শুখনা খটখটে হইয়াছে কিনা—গোবরগুলা বাটী হইতে দূরে ফেলা হয় কি না প্রভাতে গরু বাহির হইলে ঘরখানা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিষ্কার করা ও ছাই কিম্বা শুষ্ক ধূলা ছড়াইয়া দেওয়া হয় কিনা—এবং শীতের সময় সাবধানে সাঁজাল দেওয়া হয় কিনা এবং গরু পেট ভরিয়া খায় কিনা গৃহিণী তাহারও তত্ত্বাবধান করিবেন। রন্ধন কার্য্য পারদর্শিনী হওয়া গৃহিণীর নিতান্ত দরকার। চাকর চাকরাণী থাকিলেও গৃহিণী স্বহস্তে গৃহের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে ক্রুটী করিবেন না। সেকালে সিকা বুনার বড় আদর দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সিকাও গৃহের আবশ্যক জিনিষ। রসুই ঘরে সিকা টাঙ্গাইয়া উপর্য্যুপরি হাঁড়ি সাজাইয়া তাহাতে রন্ধনের মশলা ও জল খাবার দ্রব্যাদি রাখিলে বেশ সুবিধা হয়। গৃহের বাসনগুলি ও শয্যাগুলি সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত রাখা উচিত। অনেকে শিশু সন্তানকে কাপড়ের তোষক পাতিয়া শয়ন করান, কিন্তু উহাতে ঐ তোষকে শিশুর প্রস্রাবজনিত এমন দুর্গন্ধ হয়, যে সে ঘরে তিষ্ঠান ভার হয়। চামড়ার গদিতে শোয়াইলে এরূপ হয় না, অভাবের পক্ষে ছোট ছোট কাঁথা ২/৩ খানা ভাঁজিয়া পাতিয়া দিলে ও প্রত্যহ জলে ধৌত করিলে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। এরূপ সুগৃহিণী প্রত্যেক বাড়িতে থাকিলে গৃহকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন আর আমরা অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনি হইতে চেষ্টা করি না, দ্রৌপদী সম্রাটপত্নী হইয়াও রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, "বসন না থাকে যদি ভূষণ বিফল।" বাস্তবিক গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া মেঘনাদ বধ, কাদম্বরী, স্কট, রামায়ণ অধ্যয়ন করা, আমাদের পক্ষে বসনহীন ভূষণের ন্যায়। তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমরা অধ্যয়ন বাদ্য শিক্ষা প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিন্দা করিতেছি। তবে গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া অন্য বিষয় খুব অধিক শিখিলেও আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

পৌষ ১২৯৫

## স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার*

প্রত্যেক নর-নারী লইয়াই মানব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। সামাজিক নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি অনেকগুলি সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তন্মধ্যে শিষ্টাচারকে এক প্রধান অঙ্গ বলা যায়। শিষ্টাচারের অভাবে সমাজবন্ধন ঘোর শিথিল হইয়া পড়ে।

সামাজিক শিষ্টাচারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে পারিবারিক শিষ্টাচার ও দ্বিতীয় ভাগকে লৌকিক শিষ্টাচার বলা যায়। ইহার ভাব অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

---

* ইহা শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত, পারিতোষিক রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

১ম। পারিবারিক শিষ্টাচার—দয়া দাক্ষিণ্যাদি অনেক উৎকৃষ্ট বৃত্তির প্রথম শিক্ষাস্থল গৃহ। আমরা বিশ্বাস করি শিষ্টাচারের প্রথম উৎপত্তিও পরিবার মধ্যে। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে পারে না, সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহ্যিক বা লৌকিক শিষ্টাচার উপযুক্তরূপে রক্ষিত হওয়া দুষ্কর, আর হইলেও তাহা নিষ্ফল বলিতে হইবে।

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সমুচিত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করাই শিষ্টাচার-সঙ্গত। রমণীগণের শ্বশুর ভাশুরও ঐরূপ ভক্তি ও সম্মান পাইবেন। গুরুজনদিগের নিকটে সকল প্রকার চাপল্য পরিহার্য্য। গুরুজনেরাও স্নেহ ক্ষমা ও সদুপদেশ দান করিতে ত্রুটী করিবেন না।

মাতা সন্তানকে (প্রাপ্তবয়স্ক) সম্মান করিবেন অর্থাৎ যাহাতে সন্তান অসম্মানিত হয় এরূপ কার্য্য বা বাক্য পরিত্যাগ করিবেন। সন্তানও যতই উন্নত, যতই যশস্বী হউন—মাতার চরণ সেবা করিয়া জীবন সফল করিবেন।

দেবর কনিষ্ঠ ভগ্নী-পতি প্রভৃতিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ-ভাজন। অতএব ভ্রাতৃবধূ বা শ্যালিকা ইত্যাদিগকে স্নেহ করিবেন এবং ইঁহারা তাঁহাদিগকে গুরুজনের প্রাপ্য সম্মানাদি দিবেন। কিন্তু অনেক স্থলে পরস্পরের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবরাদি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই প্রায় এরূপ হয়। কিন্তু আবার কত স্থানে এই রূপ সম্পর্কে অনুচিত হাসি তামাসা প্রচলিত। যদি পরস্পর পরস্পরের মান সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তবে এরূপ ব্যবহার কখনই হয় না। এই কৌতুক বা রহস্যে একটী বিশেষ অনিষ্ট এই হয় যে এইরূপ ঠাট্টা অভ্যাস করিয়া কত স্ত্রী ও পুরুষকে "পাকা ইয়ার" হইতে দেখা গিয়াছে। সেরূপ লোক ভদ্রলোকের চক্ষুশূল!

যিনি ভগ্নী-পতি প্রভৃতির সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুরুচি ও সদ্ভাবের উত্তেজক বাক্যালাপাদি করিবেন। ইহাতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হইবে এবং ইহা শিষ্টাচারেরও অনুমোদিত বটে। এই বিশুদ্ধ আমোদ কিসে পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অঙ্গীভূত নহে, এজন্য সময়ান্তরে আলোচ্য।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও শিষ্টাচার আবশ্যক। অনেকেই হয়ত এতক্ষণে বলিয়া উঠিয়াছেন "স্বামী স্ত্রী যখন একাত্মাস্বরূপ, তখন এতদুভয়ের মধ্যে আবার শিষ্টাচার কি?" এ বিষয়ের উত্তর ক্রমে যথাসাধ্য বলিতেছি। দম্পতি অপরের সাক্ষাতে পরস্পরের প্রতি রুক্ষ্ম ভাব বা কর্কশ ব্যবহার প্রকাশ করিবেন না। নির্জ্জন ব্যতীত কখনই প্রণয় প্রদর্শন বা রহস্যালাপ করিবেন না। অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন না। দাম্পত্য সম্বন্ধ শারীরিক বা সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জানিয়া উভয়ে উভয়ের কল্যাণানুষ্ঠান করিবেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের মলিনতা দেখিতে দিবেন না। অনেকের মন এরূপ অসংযত, যে হৃদয়ের যত লুকানো কালিমা লইয়া প্রণয়ীকে উপহার দেন এবং ইহাকেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করেন। কিন্তু ইহা হইতে যে কত সময় কত অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।[১] কত স্বামী স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া অন্যায় কাজে অভ্যস্তা করেন, কত স্ত্রী অম্লানমুখে স্বামীকে, দেবরটীকে পৃথক

১ সকলেই জানেন যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিয়াও অপরের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হয়, তাহাকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যে নির্লজ্জ নিজের অন্যায় কাজের বিষয় অম্লানমুখে আত্মীয় স্বজনেব নিকট প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকে ন্যায় পথে আনাই কঠিন হইয়া উঠে।

করিবার উপায় বলিতে থাকেন, ইহাদিগের মধ্য স্থলে যদি শিষ্টাচারের আবরণটী রক্ষা পায়, তাহা হইলে কখনই এরূপ দুর্ঘটনা হইতে পারে না!—বোধ হয় "স্বামী স্ত্রীর শিষ্টাচার কেন আবশ্যক" তাহা একরূপ বুঝান হইল।

অনেক নব্যাগৃহিণী ভৃত্যাদির সাক্ষাতে গাত্রমার্জ্জন ও তাহাদিগের প্রতি বড় কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। ইহা শিষ্টাচারের বহির্ভূত। ভৃত্য বেতনভোগী ও সেবক হইলেও তাহার প্রতি অশিষ্টাচরণ প্রকাশ করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

পারিবারিক শিষ্টাচার একরূপ শেষ করিয়া লৌকিক শিষ্টাচার বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

**২য়।** লৌকিক শিষ্টাচার—সামাজিক শিষ্টাচার যখন পরিবারগণের বাহিরে আইসে, তখন তাহা লৌকিক শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার অল্প সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতিই ব্যবহার্য্য। পুরুষ রমণী পরস্পরে পরস্পরকে সম্মান করিবেন। তরুণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের অধিক মিশামিশি হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহা শিষ্টাচারেরও অননুমোদিত। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ নির্জ্জন বাস, একাসনে উপবেশন, রহস্যালাপ অঙ্গাদি স্পর্শ প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে স্ত্রী পুরুষ অধিক মিশামিশি তো করিবেন না, তাহার পরে বিনা প্রয়োজনে কোনও রমণীর যে সে পুরুষের সম্মুখীনা হওয়া ও বিনা প্রয়োজনে কোন পুরুষের পরস্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করা অকর্ত্তব্য। তবে জ্ঞানলাভ, পীড়িতের শুশ্রূষা, দুরবস্থাপন্নাকে দয়া প্রভৃতি আবশ্যকস্থল উপস্থিত হইলে অবশ্য আপত্তি অগ্রাহ্য।

রমণী (যে কারণেই হউক) যখন পর পুরুষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন, তখন এমন একটী পবিত্রতা মুখে বিকশিত হইবে, যেন তাঁহাকে দেখিলে সম্ভ্রম উপস্থিত হইতে থাকে। পুরুষ যখন অপর স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন, তখন তাঁহার মন যেন এরূপ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে, যে তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ না হইয়া দেবতার ন্যায় বিরল বলিয়া মনে হইতে থাকে।

যখন নিঃসম্পর্কীয় কোন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ আলাপের আবশ্যক হয়, তখন মাতা পুত্র ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি সম্বোধন হইয়া থাকে, ইহা শিষ্টাচারের অনুমোদিত। একজনের সহিত নিতান্ত "পর" ভাবে আলাপাদি করা অপেক্ষা ঐ রূপ একটী পবিত্র বিশ্বাস্য সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া—উভয়ের মধ্যে যতই আত্মীয়তার ভাব আসুক না কেন, যতই চরিত্র বিষয়ে দৃঢ় শাসন থাকুক না কেন—শিষ্টাচারের সীমা যেন অতিক্রান্ত না হয়; সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সামাজিক শিষ্টাচার সম্বন্ধে রমণীর কয়েকটী কর্ত্তব্যের বিষয় লিখিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। রমণী নির্লজ্জ প্ররিচ্ছদ পরিধান করিয়া বা কোন প্রকার অসংযতাবস্থায় পুরুষের সম্মুখীন হইবেন না।

২। পুরুষের সহিত প্রগলভতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। পুরুষের আমোদ প্রমোদ স্থলে গমন করিবেন না।

৪। পুরুষের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর সম্ভব হলে সমবয়স্কাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ, দূষিত ভাবোত্তেজক সঙ্গীত বা কবিতা আবৃত্তি করিবেন না।

৫। কোন পুরুষের সাধুতার বিষয়ে সন্দিহান হইলে তাহার সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাগ

করিবেন। (কিন্তু তাহার আত্মীয় হইলে তাহাকে সৎপথে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইবেন)।

৬। কোন উৎসবে, অপরিচিত স্থলে, রাজ পথ বা বন পথে, রেলওয়ে কি ষ্টীমার প্রভৃতি আরোহণে আত্মীয় পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত কখন যাইবেন না।

৭। রমণী আত্মীয় পুরুষদিগের সহিতও সর্ব্বদা মিলিত থাকিবেন না; "অধিক মিশামিশিতে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।"

৮। যে রমণী সর্ব্বদা পুরুষের নিকটে থাকেন তাঁহার অপর কোনও ক্ষতি না হইলে, প্রকৃতি-দত্ত লজ্জা, যাহাকে পুরুষের প্রতি সম্ভ্রম বলা যায় সেই বৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়।

এই সামাজিক শিষ্টাচার "কুৎসিত দেশাচার" নয়। ইহা হইতে নর-নারীর নৈতিক বৃত্তি সকল পরিস্ফুট ও সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষণ হয়। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে পুরুষ সর্ব্বদাই রমণীর মনে সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। যাহাতে স্ত্রী চরিত্র উপযুক্ত রূপে বিকশিত হয়, তাহার চেষ্টা পাইবেন। আশা করি এইরূপ শিষ্টাচার সকলের অভ্যাস হইয়া গেলে এক সময় এমন দিন আসিবে যে পুরুষেরা রমণীদিগকে পবিত্রতার ছবি ও রমণীগণ পুরুষদিগকে দুর্ব্বলের সহায় বলিয়া মনে করিবেন। প্রত্যেকের সেইরূপ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

মাঘ ১২৯৫

# আদর্শ বঙ্গরমণী*

পুরুষ ও প্রকৃতি, এই উভয়ের মিলনে সৃষ্টি, এইরূপ কথিত আছে। এই "হরগৌরী" মিলনের উপরে সমাজেরও অস্তিত্ব নির্ভর করে। রমণী সমাজে শক্তিরূপিণী; সমাজ জীবন এই শক্তির দ্বারাই রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, রমণীর শরীর মন ও জীবনের উপর সমাজের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, সুতরাং স্ত্রীজাতির আদর্শ যত উন্নত হয়, ততই মঙ্গল।

জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যতই হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই না কেন, আমাদের কল্পনা প্রায়ই উচ্চতর রাজ্যে ভ্রমণ করে, আমরা প্রত্যেক বিষয়েরই আদর্শ গঠিত করিয়া রাখি, সে আদর্শ লাভ করা জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না; আকাশের সীমান্ত রেখার ন্যায় যতই তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাহা দূরে পলায়ন করে।

সকল জাতির আদর্শ সকল বিষয়ে সমান নহে। কাব্যে, সাহিত্যে এবং সামাজিক জীবনে প্রত্যেক জাতির আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। যে জাতি নারীর আদর্শ যত উঁচুরূপে ভাবিতে পারিয়াছে, সে জাতি তত উন্নত,—সে জাতির জীবনে তত পবিত্রতা এবং অধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে। সভ্যজাতি সমূহের সাহিত্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে এই

* বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক লিখিত এবং পারিতোষিক রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। নারীচরিত্রের উৎকর্ষ চিত্রণেই কবির কবিত্ব; যিনি ইহার স্বর্গীয় আদর্শ কল্পনার শিল্প তুলিকায় সর্ব্বোত্তমরূপে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কবিশ্রেষ্ঠ। যে দেশে রমণীর সদ্‌গুণসমূহ পূজা এবং আদর পাইয়াছে, যে জাতি নারীকে উপযুক্ত সম্মান দিতে শিখিয়াছে, সেই দেশ এবং সেই জাতি ধন্য!

পুরুষ জ্ঞান, রমণী ভক্তি; জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়েরই মিলন না হইলে মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না। রমণী প্রেমরূপিণী হইয়া সমাজরক্ষা ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা দিবার জন্যই রমণী সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, রমণীর যে আদর্শ, তাহাতে এই প্রেমের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রমণীর স্বাভাবিক আদর্শ কত কত জনসমাজে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি অতি ঘৃণিত, অপমানিত এবং পদ-দলিত। ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্যে যে উচ্চ উচ্চ আদর্শের অভাব, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সে আদর্শভাব তত সম্মানিত হয় নাই। এখানে রমণী গৃহধর্ম্মের অত্যাবশ্যক বস্তু, গৃহিণী না থাকিলে গৃহ "গৃহ" নামের উপযুক্ত নয়, এই রমণীর যাহা কিছু আদর। এ সমাজে স্ত্রীজাতি দাসী ও বিলাস ভোগের সহচরী মাত্র। পুরুষের উপকার, তৃপ্তি সাধন এবং গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই যেন রমণীর জন্ম হয়, এদেশে নারী সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে, কৈশোরে পিতা বা অভিভাবক আত্মীয়ের, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকাই এ দেশে নারীর প্রকৃতি। বিলাস-সামগ্রী ও সুখের উপকরণ হইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এবং উপযুক্ত রূপে সন্তান পালন করিতে সক্ষম হইলেই বঙ্গরমণী আপনার জীবন সার্থক মনে করেন, সুখ ও সাংসারিক সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই তিনি ধন্য হন, তাঁহার জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য কোথায়?

রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক—সকল প্রকার অধীনতার মধ্যে যুগ যুগান্তর থাকিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন অবসন্ন ও নিস্তেজ, কুলাচার, দেশাচার প্রথা, শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ, রাজবিধি এই সকল ক্ষমতা বাঙ্গালীর চরিত্র গঠিত করিতেছে। স্বাধীন চিন্তা নাই বলিলেই হয়, শত সুবিধা সত্ত্বেও পুরুষ নির্জ্জীব,—রমণীর ত কথাই নাই, অধীনতার উপর অধীনতা। বঙ্গদেশের নারী জীবন যেন কলের পুতুলের মত; আত্মদৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তা যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বঙ্গ কবিগণের মধ্যে আদর্শ নারী চরিত্র প্রায় কেহই চিত্রিত করিতে পারেন নাই, বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের ত কথাই নাই; তাঁহারা রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং ভোগ বিলাসের ছবি অঙ্কনেই একাগ্র। প্রেম তাঁহাদের নিকট যেন শারীরিক একটী ভাব ছিল, বলিয়াই বোধ হয়। উচ্চ, পবিত্র কল্পনা, অতৃপ্ত অনন্তের বাসনা, নারীর প্রেম ও স্বার্থত্যাগের উপাসনা,—এ সমস্ত ভাব এখন বোধহয় মূলেই প্রস্ফুটিত হয় নাই, আজকাল সুসভ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে বঙ্গীয় কাব্য কাননে অনেক উচ্চদরের ফুল ফুটিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট হইতে আমাদের প্রাচীন সময়ের নারীপূজা ফিরিয়া পাইতেছি। তাঁহাদের আদর্শ হইতেই আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত করিয়া লইতেছি।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা মানবের প্রকৃতিগত। সৌন্দর্য্যের জয় সর্ব্বত্র। সুন্দরের উপাসনার জন্য মানুষের প্রাণ ব্যগ্র, সে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত সৌন্দর্য্যের জন্য ছুটিয়ে বেড়ায়। রমণী সেই সৌন্দর্য্যের বাহ্যিক প্রতিমূর্ত্তি। রমণীর রূপ, গুণ, প্রেম, পবিত্রতা ও

স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে মানুষ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের আদর্শ অনেকটা স্ত্রীজাতিতে পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্য প্রেমের জনয়িতা, প্রেম বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক, সৌন্দর্য্যে প্রীতিই প্রেম, নারীর আদর্শ প্রতিমা প্রেম এবং পবিত্রতা-অলঙ্কারে ভূষিত।

জনসমাজে যত সম্বন্ধ আছে, রমণী সে সকলের প্রাণ। নারীর প্রেম পাত্র বিশেষে বিভিন্ন আকার ও নাম ধারণ করিয়া থাকে। মাতার অনুপম স্নেহ, ভার্য্যার বিশুদ্ধ প্রেম, ভগিনীর নাম অকৃত্রিম আদর,—এ তিনের অপেক্ষা পৃথিবীতে মধুরতর আর কি আছে? রমণী সংসারের বন্ধনরজ্জু।

সকল অবস্থাতে রমণী গৃহে এবং সমাজে আনন্দ ও স্নেহ বিকীর্ণ করেন, বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন অত্যন্ত দৃঢ়, সমাজ ও পরিবার ছাড়িয়া বাঙ্গালীর আর অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। সংসারে সুখী হইতে হইবে, এই সংকল্পই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র; সুতরাং পারিবারিক সুখ লাভের সকল প্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন।

বঙ্গরমণী শৈশবে জনক জননীর স্নেহ যত্ন এবং সহোদরের আদরের মধ্যে প্রতিপালিত হন, তাঁহার সুস্থ ও সবল দেহ, সরল স্নিগ্ধ লাবণ্য, অর্দ্ধোন্মোচিত স্নেহকলিকা সকলের হৃদয় মন স্নিগ্ধ করিবে, ক্রীড়ার মধ্যেও তাঁহার কমনীয়তা, স্থৈর্য্য এবং শান্তভাবের পরিচয় থাকিবে, যাহাতে ভবিষ্যতে গৃহকর্ম্মের ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, এইরূপ খেলাই বঙ্গবালিকার বেশী প্রিয়। সেই সামান্য খেলার ভিতর দিয়াও মাতা সন্ততিকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

কৈশোরে বঙ্গবালা গৃহকর্ম্মে জননীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। পিতা ও মাতার আজ্ঞাবহ হইয়া, সকলের নিকট বিনীত হইয়া বালিকা সকলের নিকট স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইবেন, শশিকলা যেমন দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দ উৎপাদন করে, আদর্শ বালিকাও তেমনি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকের আনন্দের কারণ হইয়া উঠিবেন; তাহার সদ্‌গুণ জ্যোৎস্না অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। তাঁহার প্রফুল্লতা, ফুলের নীরব হাসির ন্যায় অলক্ষিতভাবে চারিদিকের শোকতাপ বিদূরিত করিবে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বঙ্গবালা জ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করিবেন। এদেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোক এমন আছেন, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন। বালিকাগণও বালকদিগের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, বুদ্ধি ও মেধা স্ত্রী বা পুরুষভেদে ভিন্ন হয় না, ব্যক্তি বিশেষ যে বিশেষরূপে বুদ্ধিমান ও মেধাবান হয়, তাহা নিয়ত চর্চ্চার গুণে, যে বংশে বুদ্ধির অধিক চর্চ্চা হইয়াছে, সে বংশের সন্তান বুদ্ধিমান হইয়া থাকে, আমাদের দেশে নারীজাতির বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা প্রায়ই হয় নাই; আজীবন পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের চিন্তা করিবার শক্তি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, এখন বঙ্গনারীর কোমল হৃদয় ব্যতীত আর কিছুই শ্লাঘার বিষয় নাই। মানবের যত প্রকার ক্ষমতা আছে, সকলগুলিরই উৎকর্ষ সাধন এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে তবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়, নারীপ্রকৃতি যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন চিন্তার অভাবে নারীজীবন যে বদ্ধ জলাশয়ের মতো নিশ্চল এবং বিবিধ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, জ্ঞানের আলোক সেখানে থাকে না, সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কলহ ও অশান্তি পূর্ণভাবে রাজত্ব করিতে পায়। যিনি বঙ্গরমণীকুলের আদর্শস্বরূপা হইবেন, তিনি আপনার

প্রবৃত্তি এবং শক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবেন, হৃদয়মনের যত সাধুবৃত্তি আছে, সকলেরই চর্চা করিবেন। বুদ্ধিকে পুরুষ প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া মনে করিবেন না। যতদূর সম্ভব সুশিক্ষিতা হইয়া তিনি গৃহ পরিবারে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস বামাগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তৃত হইলে এ সমাজের অধিকাংশ কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অত্যাচার অন্তর্হিত হইবে, আদর্শ বঙ্গরমণী জ্ঞানকে মস্তিষ্কে ধারণ করিয়া হৃদয়ে নারীজনোচিত করুণা ও প্রেম বহন করিবেন, শরীরের স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তিসমূহের উপযুক্ত চর্চ্চা, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন, সকলই তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার উপর লোকের তত আস্থা এবং আগ্রহ নাই। বহুশতাব্দী ধরিয়া স্ত্রীজাতির উপরে অপরাজিতভাবে প্রভুত্ব করিতে পাইয়া পুরুষজাতি এখন সে প্রভুত্বের সুখ এবং সুবিধা হারাইতে বড়ই অনিচ্ছুক। সুতরাং দেশ-প্রচলিত অন্যায় অধিকারকে তাঁহারা স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রমণী প্রকৃতিবশতঃই পুরুষের শক্তির উপরে নির্ভর করেন, এবং এরূপ অধীন না হইলে সমাজ চলে না, স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে ইহা এক প্রবল যুক্তি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির স্রোতে আমেরিকা এবং ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে এ অস্বাভাবিক যুক্তি ভাসিয়া গিয়াছে, সে সকল জাতির মধ্যে রমণী আপনার স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ লোকস্থিতি ভঙ্গ হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়, স্বাধীনতা না থাকিলে শিক্ষালাভ কিরূপে হইবে? জগতের বিবিধ পদার্থ এবং দৃশ্যসমূহ না দেখিয়া বেড়াইলে মন প্রশস্ত হইবে কিরূপে? শরীরের বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে না, শুধু পুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নহে।

আদর্শ রমণী অন্তঃপুরের কারাগারে চিরবদ্ধ থাকিবেন না। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্ববর্তী দেওয়ালগুলিতেই তাঁহার বিচরণ শেষ হইবে না। তিনি মুক্তশৃঙ্খল বিহঙ্গিনীর ন্যায় সংসারে ও সমাজে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞান ও প্রেম বিস্তার করিবেন। যখন বিদ্যাশিক্ষায় একান্তভাবে নিযুক্ত থাকিয়া বুদ্ধি মার্জিত হইবে, তখন তাঁহার আত্মজীবনের মূল্য এবং উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে, আত্মীয় স্বজনের সদুপদেশে এবং আত্মচিন্তার সাহায্যে তখন তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হইবে। তিনি পরজীবনে সেই লক্ষ্যসাধনে নিরত থাকিবেন। সেই মূলভাবই জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীর জীবনে একটা বিশেষ সাধু লক্ষ্য নাই। অবস্থা ভেদে চিন্তার গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু আদর্শ রমণী আপনার জীবনের লক্ষ্য এবং মহত্ত্ব স্থির করিয়া লইবেন, এবং তদনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এক এবং মহান, উদ্যম অক্লান্ত এবং অধ্যবসায় অটল থাকিবে।

বাল্যবিবাহ সমাজের বিষম অনিষ্টের বহ। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উপরে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। ইহাতে নারীগণের শরীর, মন উভয়ই হীনাবস্থা ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। অকাল বার্দ্ধক্য, অবসাদ, শিক্ষার শেষ, প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট বাল্যবিবাহের পদচিহ্ন নিয়ত অনুসরণ করে। ইহাতে নৈতিক অবনতিও বড় অল্প হয় না। অপ্রাপ্তবয়সে যৌবনোদয় ইহারই অন্যতম ফল। অকালে সন্তানের প্রসূতি হইয়া সন্তান পালন করিতে বাধ্য হওয়া, তাহাও বাল্যবিবাহের গুণে! আবার অপরদিকে স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে

বাল্যবিবাহ একেবারেই রহিত করিয়া দিতে হয়। দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সামান্য স্থূল স্থূল পাঠ শিক্ষা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই শিক্ষা হয় না। জ্ঞান এত সহজে করতলস্থ হয় না। সরস্বতী এত অল্প তপস্যায়, বালিকার ক্রীড়ায় প্রসন্ন হয় না। জ্ঞানার্জ্জনে গাঢ় মনোনিবেশ এবং দীর্ঘ অধ্যবসায় না থাকিলে কিছুই হয় না। "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী", কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন যে যদি জ্ঞানের প্রস্রবণে বারি পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিতে চাও, তাহা হইলে খুব বেশী করিয়া পান কর; নতুবা সে পবিত্র জল স্পর্শ করিও না। এই বঙ্গসমাজে প্রায় সকল স্থলে, স্ত্রীশিক্ষা "সখের" জিনিষ মাত্র; কর্ত্তব্য বলিয়া আজও পিতা মাতার বিশ্বাস হয় নাই। আদর্শ রমণী শিক্ষাকে জীবনের চিরন্তন কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিবেন, সুতরাং কৈশোর কাল অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই বিদ্যাশিক্ষা হইতে তিনি বিরত হইবেন না, জ্ঞান-ব্রত কখনও এত শীঘ্র উদ্‌যাপন হয় না।

পুষ্পবৃক্ষ বসন্তকালে নব পল্লব ও ফুলফলে শোভিত হইলে যেরূপ আনন্দজনক হয়, যৌবনে রমণীও তেমনই আনন্দরূপিণী। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে মনের বৃত্তিগুলি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মধুরতা ও কোমলতা রমণীর ভূষণ। বিনয়, লজ্জা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া এগুলি নারীচরিত্রেরই সমধিক শোভা পায়, আদর্শ বঙ্গবালা এই সমস্ত সদ্‌গুণ কুসুমে বিভূষিত হইবেন, তাঁহার অন্য অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই। স্বভাব-সুন্দর চরিত্র সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সাধুশীলা রমণী পার্থিব ধন এবং বিলাস সম্পদ অপেক্ষা চরিত্রকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ ১২৯৬

## আদর্শ বঙ্গরমণী
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আদর্শ বঙ্গললনা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা আপন বুদ্ধি মার্জিত করিবেন। সেই পরিষ্কার বুদ্ধির আলোকে জীবনের সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট মীমাংসিত হইবে। তিনি না বুঝিয়া দেশাচার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন না। তাঁহার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হইবে, ততদিন ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের ছবি তাঁহার মানসপটে চিত্রিত হইবে না, প্রকৃতির নিয়মক্রমে যখন তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণতার দিকে সম্যক অগ্রসর হইবে, তখন বিবাহের চিন্তা সহজ ভাবেই উপস্থিত হইবে। যতদিন না আপনা আপনি এ চিন্তা উদয় হয়, ততদিন বিবাহের আবশ্যকতা নাই বুঝিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য যথাসময়ে হইতেই হইবে। বিবাহ,—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন—প্রকৃতিগত অখণ্ডনীয় নিয়ম। শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ, মানসিক বৃত্তির উন্মেষ, হৃদয়ের চর্চ্চা স্বাভাবিক ক্রম অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; অকাল বিকাশ বিনাশের পূর্ব্ব পন্থী। নানাপ্রকার উপায়ে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উপযুক্ত সময়ের অগ্রে করান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কুসংসর্গে, কুচিন্তায় এবং অসদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনের যে বিকার

উপস্থিত হয়, তাহা শরীরের উপরেও কার্য্য করিয়া থাকে। বঙ্গীয় পরিবার এইরূপ অকাল বিকাশের এক একটী যন্ত্র স্বরূপ, বালক বালিকাগণকে যেরূপ শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে রাখা হয়, তাহাতে উপযুক্ত বয়সের বহু পূর্ব্বেই তাহাদের যৌবন উন্মেষিত হয় এবং বিবাহের চিন্তা মনে প্রবেশ করে। আদর্শ রমণী এই সমস্ত শক্তির কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবেন। তিনি স্বভাব শিশু হইয়া স্বভাবের নিয়মেই পরিচালিত হইবেন।

বিবাহের প্রাণ ধর্ম্ম,—শারীরিক সম্বন্ধ শুধু উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু সংসারের লোক চিরকালই উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। বিবাহের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহাতে বিকৃতির লক্ষণই বেশী। শরীরের মিলন নহে, প্রাণে প্রাণে মিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। আদর্শ রমণী শারীরিক বিবাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক হইবে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার পথপ্রদর্শক হইবে। বাহিরের কোন গণনা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিবে না। হৃদয় যদি আর এক জনের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, অনন্ত মিলনের জন্য প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছুটিতে থাকে, কণ্টকময় জীবন পথে যদি সহচর লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলেই রমণী বিবাহ করিতে অধিকারিণী, হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত না হইলে বিবাহের অধিকার জন্মে না, অগ্রে প্রণয়, তাহার পরে পরিণয়,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আদর্শ রমণী লজ্জাশীলা হইলেও স্বাধীন ভাবে সমাজে বিচরণ করিতে থাকিবেন, ধর্ম্মই তাঁহার বর্ম্ম ও আবরণ; তিনি আপনাকে আপনিই সুরক্ষিত করেন, জনসমাজে বিচবণ করিতে করিতে তাঁহার সামাজিক বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি হইবে। যাঁহার প্রতি তাঁহার মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই তিনি জীবনের সহচর করিতে অধিকারিণী। পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন বটে; কিন্তু কেবল তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করা অত্যন্ত হীনতা, যদি অবস্থা নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে নারী বরং যাবজ্জীবন কুমারী থাকিবেন, কিন্তু আপনার হৃদয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আত্মঘাতিনী হইবেন না।

জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে মানব প্রকৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই মণিকাঞ্চন যোগে রমণী দেবীরূপে বিরাজ করেন। প্রেমের দ্বারা তিনি সংসারকে বশ করেন। তিনি সংসারের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া পড়েন, পুরুষের বাহুবল নারীর প্রেমের বলের নিকট আনন্দে পরাজয় স্বীকার করে। রমণী যখন গৃহিণী হন, তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজ্ঞী।

হৃদয়ের অনুরূপ প্রফুল্লা রমণী এই সংসারের গরল সমুদ্রের সুধাবিন্দু। সাধুশীলার চরিত্রের সৌরভ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোককে আমোদিত করে। তাঁহার প্রভাব সকলেরই হৃদয়ে অনুভূত হয়।

আদর্শ রমণী যদি কুমারী থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের নামে পরসেবাব্রতে জীবনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। তাঁহাব পবিত্র জীবন পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনেই অতীত হইবে। সংসারের মঙ্গল সাধনই তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে, তিনি ব্রহ্মচারিণী ভাবে জীবন যাপন করিবেন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া হৃদয় মনের বৃত্তিগুলি স্ববশে আনয়ন করিবেন, সংযম দ্বারা স্বভাবকে নির্ম্মল রাখিবেন।

বিবাহিতা হইলে আদর্শ বঙ্গললনা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহভোগিনী হইবেন। হৃদয়ে হৃদয়ে যখন বিনিময় হয়, তখন জীবনে লক্ষ্যেরও বিনিময় হয়। এক উদ্দেশ্য না হইলে বন্ধন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয় না। ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিত

হইবেন। ধর্ম্মকেই সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। আমাদের শাস্ত্রে সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থ আশ্রমেরই অধিক সাধুবাদ আছে, সংসারে থাকিয়া যেটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক, ধর্ম্মাচরণে স্ত্রী স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেন। শাস্ত্রের উপদেশ, গৃহস্থকে সস্ত্রীক ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, স্বামী যে কর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন, ভার্য্যা তাহার সহকারিণী হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন, যত প্রকার সাধু কার্য্য আছে, তাহাতে উভয়ে মিলিয়া খাটিলে অতুল আনন্দ হয়। এদেশে স্বামীর জীবন ব্রতের সহিত স্ত্রীর কোনো সহানুভূতি নাই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভ্রমণ করেন, যতটুকু স্বার্থ, ততটুকুতেই মিলন। স্ত্রী এ সমাজে শূন্য,—তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়, পুরুষের দ্বারাই তিনি সকল বিষয়ে চালিত হন, স্রোতের উপরে ভাসমান তৃণের ন্যায় তিনি পুরুষের ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যান। আদর্শ বঙ্গবালা স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াও আপনার স্বাধীন ইচ্ছা হারাইবেন না, স্বামী যে একেবারে ভ্রম, অন্যায় ও পাপের অতীত; স্ত্রীর যে স্বামীকে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, ইহা অন্ধতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রেমে উন্মত্ত হইলেও প্রেমাস্পদের ত্রুটী সংশোধন করা অতীব কর্ত্তব্য; প্রেমের সহিত মঙ্গল ইচ্ছা না থাকিলে সে প্রেম স্বার্থ প্রণোদিত বলিতে হইবে। আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক অংশ একেবারে নিৰ্জ্জীব; এই অর্দ্ধাংশ সচেতন বৃদ্ধি করে। স্বামীর প্রেমে, আদরে, শুশ্রূষায় সতী আপনাকে ঢালিয়া দিবেন। তিনি স্বামীর স্বাস্থ্যের সুখ, রোগের অমৃত হইবেন। যখন প্রিয়তমের মর্মস্থানে যাতনা হইবে, তখন সতী স্ত্রীই তাঁহাকে সান্ত্বনা-সলিলে অভিষিক্ত করিবেন; অবসন্ন হৃদয়ে তিনিই নূতন তেজ ও উৎসাহ অনুপ্রবিষ্ট করিবেন। স্বামীর নিরাশায় তিনিই আশালতা হইয়া থাকিবেন। ঝটিকা বিক্ষিপ্ত ফুলদল যেমন নবীন তপন-কিরণে পুনঃপ্রফুল্ল হইয়া উঠে, সতীর প্রেমজ্যোতির সংস্পর্শে মানবের ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়ও তেমনই নবীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শ বঙ্গনারী স্বামীর "প্রিয়চারিণী, হিতকারিণী, সদাচারা, জিতেন্দ্রিয়া এবং ব্রহ্মপরায়ণা" হইবেন, তিনি এইরূপ হইয়া একটী আদর্শ সুখী পরিবার স্থাপন করিবেন। পরিবার সমষ্টি লইয়াই সমাজ; সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে। বঙ্গরমণী আদর্শ গৃহিণী হইয়া পরিবার গঠন ও শাসন করিবেন, নতুবা তাঁহার জীবন বিশেষ কাজে আসিল না। তাঁহার উপর গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বঙ্গসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথাই প্রচলিত, এই প্রথা অনুসারে চলিতে হইলে বঙ্গরমণীকে অনেক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হয়, কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যশীলা হইয়াই তিনি শান্ত থাকিতে পারেন না; আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার অনেক কর্ত্তব্য আছে; লোক-লৌকিকতার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। আদর্শ রমণী আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেমের বলেই সংসারে চলিতে থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি স্রোতস্বিনী নদীর মত সংসার-ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাকে ফলশালী করিবে।

আত্মীয় পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মশীল হইয়া উঠিলে দেশের বহুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে। রমণী যখন এ দেশে পুরুষের বাহুর বল, হৃদয়ের প্রেম, শরীরের শোণিত হইবেন, তখন কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইবে,—তখন এ জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে। তখনই এ জাতির চরিত্রে পুরুষকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এক হৃদয় স্বেচ্ছায় অন্য হৃদয়ে মিলিত হইলে ধর্ম্মে, অর্থে বা ভোগে পরস্পর

পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে না, সংসারের সকল প্রকার অবস্থায়, শরীর মনের সর্ব্বাবস্থায় স্বামী স্ত্রী একই প্রকার ভাবের অধীন হইবেন। পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইবেন। দাম্পত্য প্রণয় সংসার মরুভূমে শান্তি প্রস্রবণ। ইহাতে বিষকেও অমৃত করিয়া লয়। প্রণয়ের প্রভাবে তরুলতাও স্বর্ণ সিংহাসন হয়। স্ত্রী স্বামীতে অন্তরের আনন্দ ভোগ করিবেন, স্বামীও স্ত্রীকে আনন্দ ও প্রেমরূপিণী বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন, স্বামীর প্রেমে স্ত্রী আপনাকে সম্মানিত মনে করিবেন, স্ত্রী স্বামীর জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্যই যেন জীবিত থাকিবেন, দুই হৃদয়ে এক এবং এক হৃদয়ে দুই হইবে। এই সম্বন্ধই সকল সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। এই মধুর সম্বন্ধই সংসারের মূল গ্রন্থি।

সতীর পবিত্র প্রেম মর্ত্তের পারিজাত, মানবের যত প্রকার সুখ আছে তাহার মধ্যে পতিব্রতা ভার্য্যালাভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নানা সদ্‌গুণ ভূষিতা রত্নসমা আদর্শ নারী আপনার চরিত্রপ্রভা বিস্তার করিয়া সংসারকে সুখময় করিবেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্যায় আত্মীয় স্বজনের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবে; তাঁহার মধুর প্রশান্ত হাসি দুঃখান্ধকারের মধ্যেও সুদিনের শুভ্রালোক উৎপন্ন করিবে। তাঁহার সন্নিধানে যে আসিবে, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইবে। সতীর ধৈর্য্য বিপদের সহায়, তাঁহার প্রফুল্লতা সম্পদের সুখ শতগুণ বৃদ্ধি করে পরিবারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও উন্নতির দিকে তাঁহার একান্ত লক্ষ্য থাকিবে। তিনি পরিবারের প্রত্যেকের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিবেন, প্রত্যেকের সুখসাধন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র হইবে। সংসারে প্রতিকূল ঘটনারাজির মধ্যে অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে রত হইবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম্ম। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া অহরহঃ অপরের কল্যাণকামনা করিলে সহিষ্ণুতা উপার্জন করা যায়। রমণী এমন দৃষ্টান্ত দেখাইবেন যাহাতে তাঁহার সম্পর্কিত সকলেই প্রেমে মিলিত হয়।

আমাদের দেশে রমণীর হৃদয় অন্ধ ভাবুকতায় পূর্ণ। পরের দুঃখে অশ্রুজল পড়ে বটে, কিন্তু কার্য্যশীল জীবন পরিচালিত করা তাঁহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। তাঁহাদের বিবেচনা শক্তির কিছু অভাব দেখা যায়। এই বুদ্ধির অভাব নিবন্ধন নানা প্রকার কল্পিত ভয় ও দুঃখে তাঁহারা অভিভূত হইয়া থাকেন। আদর্শ রমণী বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করিয়া এবং হৃদয়কে পরদুঃখকাতরতায় পরিপূর্ণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান লইয়া তিনি সংসারের অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বিপদের সময় অশ্রুমাত্রকে সম্বল করিয়া অসহায় হওয়া তাঁহার সাজে না; তিনি ঘোর দুর্দ্দিনেও প্রকৃতিস্থ এবং প্রশান্ত থাকিয়া যথাকর্ত্তব্য সাধন করিবেন, একদিকে ভাবস্রোত, আর এক দিকে কঠিন কর্ম্ম-ভূমি, তিনি কখনও স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন না, নির্ভরশীলা হইয়া তিনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য সেই মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন করিবেন।

বঙ্গ সমাজে নারীর হৃদয় প্রশস্ত ও উদার নহে। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন নানা প্রকার সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতা রমণী হৃদয়ে রাজত্ব করে। স্বার্থপরতা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি গরলময় ভাব অধিকাংশ স্থলে অত্যন্ত প্রবল. এই সকল বিষে কত সংসার যে চিরটা কাল জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত স্থলে সঙ্কীর্ণ প্রকৃতি নারী বিচ্ছেদের কারণ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন, ক্ষুদ্র কথা, নীচ বিষয় লইয়া যাহারা মত্ত, আহার, বেশবিন্যাস, গল্প, শয়ন ভিন্ন যাহাদের কার্য্য আর কিছুই নাই,—তাহারা যে সংসারে শান্তি বিনাশ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?—আদর্শ

বঙ্গবালা উদার প্রেমের সাধনা করিবেন। তাঁহার সহানুভূতি সকলের সুখ দুঃখেই আলিঙ্গন করিবে। তিনি বঙ্গীয় পরিবারকে শান্তির আশ্রম করিয়া তুলিবেন, নিজে প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকেও প্রীতিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। তাঁহার আদর্শে শত শত ললনা আপনাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক বুদ্ধি, প্রচুর কৌশল, প্রভূত ধৈর্য্য এবং গভীর সহৃদয়তার প্রয়োজন, গৃহধর্ম্ম বড় উপেক্ষার জিনিস নয়। গৃহিণী সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। বিলাসিতাকে তিনি বিষবৎ পরিহার করিবেন। মিতব্যয়কেই তিনি নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, পরিশ্রমে তাঁহার অতুল আনন্দ হইবে। পরিবারস্থ আত্মীয় এবং প্রতিবেশীগণের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহা প্রাণপণে সাধন করিতে চেষ্টা না করিলে কখনও তাহা হইবে না।

গৃহিণীর চরিত্রে আর একটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেটী সেবাশীলতা, সেবার ভাব রমণী প্রকৃতিতে নিহিত, বিশেষতঃ বঙ্গসমাজে পরের সেবার জন্যই নারীর জন্ম, প্রভাত হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিয়া যিনি প্রফুল্ল থাকিতে পারেন, তাঁহার জীবনই ধন্য, এ দেশে সাংসারিক সকল কার্য্য পরিবারস্থ রমণীরা করিয়া থাকেন, এমন কি, আমাদের মহিলাগণ অভ্যাস ও প্রথার ফলে পরের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কার্য্যেও এই সেবার ভাব দেখা যায়। যিনি আদর্শ স্থানীয়া হইবেন, তাঁহার সেবার মূলে প্রেমপূর্ণ হৃদয় থাকিবে, শুধু হস্তের কর্ম্মের কিছু পুণ্য নাই—হৃদয়ের সাধুতাই পুণ্যের নিদান, আত্মোৎসর্গ না করিলে সহস্র সেবা শুশ্রূষার কোন মূল্য থাকে না,—তাহাতে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয় না।

অতিথি-সৎকার আমাদের দেশের লোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, অতিথির পূজা দেবতার ন্যায়, দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের জাতিগত গুণ, আমাদের দেশে নানা স্থানে অতিথি পরিচর্য্যার নিমিত্ত কত আশ্রম, কত অতিথিশালা, কত সরাই, কত তীর্থ রহিয়াছে, দেশের ধনীলোক মাত্রেই যে কারণেই হউক, অতিথির জন্য বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকেন, আজকাল এ বিষয়ে একটু বিপরীত ভাব আসিতেছে বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতকে যে আদর করে না, তাহার সর্ব্বত্রই অপযশঃ হইয়া থাকে, আমাদের মহিলাগণ এ বিষয়ে কুল ক্রমাগত শিক্ষা ও সংস্কারের অধীন। আদর্শ রমণী অতিথি সেবাতে হৃদয়ের প্রীতি ঢালিয়া দিবেন। নিজে অভুক্ত থাকিয়া ক্ষুধার্ত্তকে অগ্রে আহার্য্য প্রদান করিবেন। দয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ বৃত্তি; আদর্শ নারী দয়ার অবতার হইবেন, দুঃখী, দরিদ্র, শোকসন্তপ্ত মানবের অশ্রুজল নিবারণ করাই তাঁহার কর্ম্ম হইবে।

সন্তানের লালন পালন সংসারের সকল কর্ত্তব্য হইতে গুরুতর। ইহাতে ক্রুটী হইলে যতদূর অনিষ্ট হয়, এত আর কিছুতেই হয় না, অজ্ঞানতা নিবন্ধন এই বিষয়ে যত ক্রুটী হয়, তাহা কে সংখ্যা করে? সংসারের কত অনিষ্ট ফল আমরা নিজেদের অজ্ঞতা দোষে অলক্ষিতে উৎপন্ন করিতেছি; পৃথিবীর দুঃখভার আমরাই হয়তো ইচ্ছা করিয়া বাড়াইতেছি! ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেই অনেক সময়ে বৃহৎ পদার্থ উদ্ভূত হয়, ক্ষুদ্র শিশুর শরীর ও মনের উপযুক্ত সংগঠনের উপরে ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন নির্ভর করে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ফলাফল অনুসারে সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ। নারী এই অর্থে সমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী, মানবজাতির উৎপত্তি, স্থিতি এবং বৃদ্ধি মাতার করুণা সাপেক্ষ, জননীর স্নেহ মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপ,—এই বিশ্বপালিনী শক্তি অপসারিত করিলে জনসমাজ

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই দায়িত্ব মস্তকে করিয়া যখন রমণী দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহার প্রকৃত শোভা, মাতার কর্ত্তব্য অপেক্ষা নিঃস্বার্থ, উচ্চতর, পবিত্রতর কর্ত্তব্য আর জগতে কি আছে?

আদর্শ বঙ্গরমণী আদর্শ মাতা হইবেন। শিশু পালন সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যয়নলব্ধ যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কার্যক্ষেত্রে পড়িয়া বয়স্কা আত্মীয়াগণের অভিজ্ঞতার ফল গ্রহণ করাও যুক্তিসিদ্ধ, সন্তানের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। সন্তান সন্ততির শিক্ষা ও চরিত্রের জন্য জননীই দায়ী, নিজের জীবন পবিত্র ও উন্নত না হইলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্ত্ব কল্পনা পথে আনাই দুরাশা।

মহাবীর নেপোলিয়ন একদিন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত কথাবার্তায় বুঝিয়াছিলেন যে ফরাসী দেশে তখন উত্তম "জননী"র অভাব ছিল। আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে সেই উপযুক্ত মাতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। বাঙ্গালী জাতি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীকুলকে পদ-দলিত, কারারুদ্ধ এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিন দিন গভীর 'অবসাদ-হিমে' ডুবিয়া যাইতেছে। যতদিন না দেশের মহিলাগণ আদর্শ জননীর সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, যতদিন না জননীর স্তন্যদুগ্ধের সহিত বালক বালিকা বীরত্ব, তেজ ও সাধুতার বীজ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে,—ততদিন এ জাতির মঙ্গল নাই, স্ত্রীজাতি জাগিয়া উন্নতির পথে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী না হইলে এ দেশ আর জাগিবে না।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

## বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম*

সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রয়োজনীয় কার্য্য সমুদায় সুচারু ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করাকেই গৃহধর্ম্ম বলা যায়। গৃহধর্ম্ম উপযুক্ত রূপে পালন করা রমণী জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রে "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" গৃহিণীরাই গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং "স্ত্রীয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো হস্তি কশ্চন", রমণীর সহিত ধন ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রভেদ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে ও লৌকিক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস এই যে, দেশীয় ভগিণীরা অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, যতই যশস্বিনী হউন না কেন, গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারা সমুচিত অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হয় না এবং তাঁহাদের গৃহেও বিশুদ্ধ সুখ শান্তি বিরাজ করে না।

যে রমণী গৃহধর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাকে গৃহিণী বলা হইয়া থাকে। গৃহিণী

* ১৯২০ সালের ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক রচনা শ্রীমতী মানকুমারী বসু লিখিত।

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেন ধর্ম্মাচরণের জন্য, পারিবারিক জীবনে সুখ আনয়ন জন্য এবং সাধারণের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য। এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারাই উত্তমা গৃহিণীর কার্য্য। যেমন অনুপযুক্ত রাজার হস্তে রাজ্য সমর্পিত হইলে সে রাজ্য রক্ষা না পাইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনভিজ্ঞা রমণীর প্রতি গৃহধর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া দূরে থাকুক, দারুণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। এই কারণে অনেক বাঙ্গালি গৃহস্থ উৎসন্ন গিয়াছেন, অনেক সন্তান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেশেরও প্রধান অভাব মোচন হইতেছে না।

গৃহধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রমণীর আত্মগঠন করা আবশ্যক। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন পীড়িতা, আলস্যপরায়ণা, নির্ব্বোধ, নিরক্ষরা, অসংযতেন্দ্রিয়া বা নীচাশয়া রমণীগণের দ্বারা গৃহ কর্ম্ম কখনই উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না; বরং তাহাদের অবস্থান প্রযুক্ত গৃহ বিষময় হইয়া উঠে। অতএব রমণী শরীর মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থে প্রাণপণ যত্ন করিবেন; কিরূপে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী স্থূল নিয়ম লিখিত হইল।

শরীর—শারীরিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহাপাপে লিপ্ত হই, এবং পীড়াক্রান্ত হইয়া শরীর এরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় যে জীবনকেও দুর্ব্বহ মনে হইতে থাকে। অতএব শরীরকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। স্নান, আহার, পান, নিদ্রা, পরিশ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদিত হইলে শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করা হয়। এই সকল নিয়মাবলী অনেক সুবিজ্ঞ মহোদয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, 'স্বাস্থ্যরক্ষা', 'শরীর পালন' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া তন্নিয়মে চলিলেই হইতে পারে; ইহা অধিক আয়াস-সাধ্য নহে।

মন—বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া রমণী মানসিক, উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। পরিণামদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আশু-ভাবগ্রাহিতা শক্তি গৃহিণীর বিশেষ আবশ্যক। কোন কথায় কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইতে পারে, ইহার আলোচনাকে পরিণামদর্শিতা, কোনও অতর্কিত রূপে বিপদাক্রান্ত হইয়া মুক্তির উপায় সহসা উদ্ভাবনাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অপরের হৃদয়স্থ ভাব (আকারেঙ্গিতে) শীঘ্র বুঝিতে পারাকেই আশু-ভাবগ্রাহিতা বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় ও ক্রম অভ্যাস বলে রমণী ইহা নিজের আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও কার্য্যোপযোগিনী করিবেন। অনেক লোক এরূপ যে গৃহধর্ম্মে রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতেই পারেন না। তাহাদিগের বুঝা উচিত, আবশ্যক পত্রাদি লিখন পঠন, আয় ব্যয়াদির সুন্দর মত হিসাব রাখা, শিশুদিগকে প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করান প্রভৃতি কার্য্যে গৃহিণীরা অক্ষম হইলে কতদূর অসুবিধা ঘটিতে পারে। অপর বিষয় অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম।

চরিত্র—হীনচরিত্রা রমণী গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কেমনে? অতএব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রমণী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। প্রথমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এপথ সুগম করিয়া লইবেন, তাহা হইলে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গৃহধর্ম্মের আবশ্যক সদ্‌গুণগুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং শ্রমকুশলা, সত্যপরায়ণা, মিতাচারিণী, অপক্ষপাতিনী ও সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবেন।

এইরূপে তাঁহার শরীর মন ও আত্মার কর্ত্তব্য পালিত হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবেক।

বঙ্গরমণী এইরূপে আত্মগঠন করিয়া সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। গৃহ ধর্ম্ম যে তাঁহার গুরুতর কার্য্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। যিনি যত শান্তস্বভাবা, তিনি তত সুন্দররূপে এই ভার বহন করিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে গৃহধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ধর্ম্মাচরণই গৃহ ধর্ম্মের প্রথম সোপান। রমণী আপনার সহিত সমস্ত গৃহ ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত করিবেন। ঈশ্বরকে সমস্ত দান করিলে অবশ্য ন্যায়পরায়ণা হইতে হইবে। সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্যের তীব্র কশাঘাত তাঁহাকে কখনওই ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হইতে দিবে না।

আমার প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কার্য্যের ফলাফল এক জন উপরে বসিয়া দেখিতেছেন ইহা মনে করিয়া যদি সংসারে পদক্ষেপ করি, তাহা হইলে পাপ যে মূর্ত্তি ধরিয়াই আসুক না কেন, আমি তাহাকে ধরা দিতে চাহিব না।

ঈশ্বরের পূজার জন্য গৃহে নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখা আবশ্যক। সেই শান্তিময় মঙ্গলময়ের চরণ ধ্যান করিয়া রোগে শান্তি, শোকে ধৈর্য্য ও বিপদে অভয় পাইতে পারিবেন। যে গৃহে সেই দয়াময়ের মধুর নামোচ্চারিত না হয়, সে গৃহ তো শ্মশান, সেখানে বাস করিয়া মানুষে কখনই প্রকৃত সুখ শান্তি পাইতে পারে না।

আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পরিতেছি না, গৃহধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক রমণী গৃহধর্ম্মের অনুরোধে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন। সামান্য সংসারের মায়ায় পড়িয়া এ ঘটনা সংঘটিত হয়, অথচ এরূপ ব্যবহারে গৃহধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহিণী ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেন, সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন এবং আর্য্যমহিলা মৈত্রেয়ীর সহিত "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাৎ" "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া কি করিব?" বলিতে পারেন, তিনিই রমণীরত্ন, তাঁহারই হস্তে গৃহধর্ম্ম উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইতে পারে।

পারিবারিক জীবন সুখময় করাকেই গৃহধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান বলা যাইতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ সঞ্চারিত হয় কিসে? কর্ত্তব্যপালন দ্বারা। পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে হিন্দুনীতি সকলের অগ্রগণ্য হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুসেবা, সৌভ্রাত্র, ভগ্নীভাব, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি হইতে পশুপক্ষীর প্রতি সদ্ব্যবহারের বিধান পর্য্যন্ত দেখা যায়। যখন হিন্দুগণ হিন্দু নীতি অনুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, তখন অপর সহস্র অসুবিধাসত্ত্বেও কি সুখের সময় ছিল।

হিন্দু নিয়মানুসারে পিতা মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী বঙ্গরমণীর গুরুজন। গুরুজনের আদেশ পালন করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। গুরুজনের নিকট সর্ব্ব প্রকার চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন। গুরুজন কোন অন্যায় আদেশ করিলে বিনীতভাবে তাহার ফলাফল বুঝাইয়া দিবেন, প্রাণান্তেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি রাখা উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় ক্লেশানুভব দূরে থাকুক, মনে বিমল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। মহাভারতে নারীধর্ম্মে কথিত হইয়াছে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা পিতৃমাতৃ পরনিত্যংযা নারী সা তপোধন।"

যে গুণবতী নারী নিত্য শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন এবং সদা পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত তপস্বিনী ভার্য্যা। এইরূপ ভক্তিমতী রমণী গৃহের অলঙ্কার।

স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থে উক্ত হইয়াছে:—"আতা আর্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা দশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" [য.] অর্থাৎ "যিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, বিচ্ছেদে মলিনা ও মৃত্যুতে ম্রিয়মানা, তিনিই পতিব্রতা রমণী।" আমাদের বিশ্বাস যেখানে স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা আছে, সেখানে ইহা স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে স্ত্রী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। স্বামী কোনওরূপ অনিয়মে রোগাক্রান্ত না হন, অমিত ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত না হন ও কুসংসর্গে পড়িয়া পাপাচারে লিপ্ত না হন, তৎপক্ষে রমণী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দেশের কোন সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যিনি পরিবার মধ্যে প্রকৃত সুখ উপভোগ করেন, পৃথিবীর পাপপূর্ণ ঘটনা সকল তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না।" ফলতঃ স্বামী যেরূপ লোকই হউন না কেন, তাঁহার যদি একটুকুও হৃদয় থাকে, তবে সাধ্বী স্ত্রীর বিমল প্রেম ও সদ্ব্যবহার অবশ্য তাঁহাকে মনুষ্য করিয়া তুলিবে। মহাভারতে একস্থলে লিখিত আছে "তথা রোগভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্ গতস্য চ। নাপ্তি ভার্য্যা সমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥ " "মনুষ্য রোগে অভিভূত ও সর্ব্বদা নানা কষ্টে পীড়িত হয়, তাহার যাতনা শান্তির বিষয়ে ভার্য্যা ভিন্ন মহৌষধ আর নাই।" এবং নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমা গতি। নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়োধর্ম্মসংগ্রহে।" অর্থাৎ "এ জগতে ভার্য্যার ন্যায় বন্ধু পুরুষের আর নাই এবং ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায় পুরুষের আর নাই।" ইহা দ্বারা স্বামীর শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির জন্য স্ত্রী কত দূর দায়ী, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

রমণী কৌশলক্রমে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের সীমা বৃদ্ধি করিবেন। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে অপ্রশস্ত মন যে পাপের আলয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহাতে স্বামীর কুপ্রবৃত্তি সকল দূর হইয়া ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, রমণী তদুপায় অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যবহারে কেবল স্বামীর নয়, মলিনচেতা আত্মীয় বন্ধুমাত্রেরই নীচাশয়তা দূর করিতে পারিবেন।

মাতৃপ্রকৃতি রমণীর অখণ্ডনীয়, ঐশিক নিয়ম। শিশুপালন মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য। সন্তানের দৈহিক বিকাশ মাতার হস্তে, সেইরূপ তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রথম গঠনের ভারও মাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মাতার অনভিজ্ঞতায় অনেক সন্তান রোগগ্রস্ত, নির্ব্বোধ ও হীন চরিত্র হইয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবেন? অতএব রমণী শিশু-পালন ভারগ্রহণ করিয়া শিশুর ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন।

সন্তানের প্রতি অনুকূলা ও স্নেহময়ী হইয়া মাতা ন্যায়পরতার দ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিবেন। শিশুকে বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অভ্যাস করাইবেন। এ কয়টী গুণ অভ্যস্ত হইলে শিশু সময়ে "মনুষ্য" নামের উপযুক্ত হইতে পারিবে। শিশুর জ্ঞানেচ্ছা বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট করা ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিকশিত করা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমতী মাতা সন্তানকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবেন। যাহাতে শিশুর পাপে ঘৃণা, অন্যায়ে ও দুষ্কর্মে ভয় হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিবেন। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকর, অতএব মাতার হৃদয়ে জীবের প্রতি প্রেম,

সত্যের প্রতি সম্মাননা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিতে পাইলে সন্তানও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। বলা বাহুল্য শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মাতাকে বিশেষ অভিজ্ঞা হইতে হইবে। যে মাতা সু-পালনের দ্বারা সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, তিনি যে কেবল গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন করিলেন এমত নহে, তাঁহা কর্ত্তৃক জগতের এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিতে হইবে। ইহা হইতে গৌরবের বিষয় তার কি আছে?

"বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা নাই" বলিয়া অনেকে দুঃখ করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা একেবারে নাই একথা কখনই সত্য নহে। যদিও ওয়ালিংটন, ওয়সিংটন বা সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার ন্যায় বঙ্গীয় মাতাগণ সুপ্রসিদ্ধ নহেন, তথাপি আমরা শুনিতে পাই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মৃত্যুকালে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলেন, "মা, তোমার গুণগুলি পাইয়া আমি মানুষ হইয়াছিলাম, তোমার মত মা যেন সকলেই পায়।" কে বলিতে পারে দেশে এরূপ প্রমাণ আর নাই? যাহা হউক যেদিন এইরূপ মাতা সকল ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা হইবেন, সেই দিন দেশের আর এক শ্রী হইবে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী দেবর প্রভৃতি পালনের ভারও কত রমণীকে গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান যাহারই হউক না কেন, পালন করিতে হইলে তাহাকে নিজ শিশুর ন্যায় ভাবিতে হইবে।

অর্থের সঙ্গতি থাকিলে দাস দাসী রাখিতে সকলেই ইচ্ছা করেন। সে কালে দাসদাসীরা পরিবারের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তাহাদের সহিত প্রভু পরিবার একটী সম্পর্কে পাতাইতেন, কাজেও প্রায় সম্পর্কানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। এখন ঐ সকল "ছোটলোকের" সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে অনেকেই লজ্জিত হন, সেই সঙ্গে নূতন রকম শাসন প্রণালীও প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি দুঃখের বিষয় এই যে অনেক দাস দাসীর মুখে শুনিতে পাই "বাবু তো মন্দ নয়, তা মা ঠাকুরানীর জন্য থাকিতে পারি না" ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত তখনকার দিনে ভৃত্য প্রভুর মঙ্গলের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিত, আর আজি প্রভুর চক্ষু এড়াইতে পারিলেই যেন তাহারা রক্ষা পায়। তখন ভক্তি ছিল, এখন ভয় হইয়াছে, তাই এ দুর্দ্দশা। যদি এখনও বঙ্গমহিলা দাস দাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখান, তাহাদিগকে কঠোরতার পরিবর্ত্তে কোমলতা দিয়া শাসন করেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারাও উপযুক্ত প্রতিদান দিতে ইচ্ছুক হয়। দাস দাসীকে খাটাইতে হইলে তাহাদের সকল কার্য্যে দৃষ্টি রাখিতে হয়, নয়ত মনের মত কাজ পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে গাভীকে মাতার ন্যায় পালন করিতে বলা হইয়াছে। আমরাও সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি কেবল গাভী কেন যে সকল পশু আমাদের উপকারে আইসে তাহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

ফাল্গুন ১২৯৬

# সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী

গ্রন্থকার ও কবিগণ চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে সদাই বিচরণ করিতে ভালবাসেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় চিন্তাশীল ও কল্পনা প্রিয়, তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহাদিগের সঙ্গ ভাল বাসিয়া থাকেন, সুতরাং গ্রন্থকার ও কবিগণ ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিণীও হইবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই ন্যায় অধ্যয়ন, চিন্তা ও কল্পনা শক্তির পরিচালনায় অনুরাগিনী হইবেন এবং তাহাতেই আনন্দ ও সুখ অনুভব করিবেন। সকল দেশেই আজও বিদ্যার চর্চা ও বুদ্ধির অনুশীলন স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে অধিকতররূপে প্রচলিত থাকাতে গ্রন্থকার ও কবিগণের মধ্যে তাঁহাদের মনোমত পরিণয় অল্প হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইংলন্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উহা এককালে বিরল নহে। স্বামীকে সন্তুষ্ট ও সুখী করিবার জন্য অনেকানেক পতিব্রতা মহিলা স্বামীর যাহা প্রিয় তাহাই নিজের প্রিয় করিয়া লইতে সাহসী হইয়াছেন—স্বামীকে কল্পনা দেবীর সেবায় অথবা নানা কঠোর ও উচ্চ বিষয়ের চিন্তায় নিরত থাকিতে দেখিয়া তাঁহারও তদনুরূপ হইয়াছেন, এরূপ পতিভক্তির পরিচয় অতীব প্রশংসনীয়, আমরা নিম্নে ইহার কতকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। জন স্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। মিলের সহিত পরিণয় হইবার পর হইতেই তিনি তাঁহার সহিত অধ্যয়নে ও চিন্তায় প্রবৃত্তা হয়েন, ক্রমে তিনি এরূপ গভীর চিন্তাশীলতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন যে মিল আশ্চর্য্য হইয়া যান এবং বিবাহের পর তিনি যে কিছু গ্রন্থাদি লিখেন তাহা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমবেত চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল বলিয়া স্বীকার করেন। মিল তাঁহার কোন গ্রন্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করেন, সেই উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থাদিতে যে সকল অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা তাঁহার স্ত্রীরই চিন্তার ফল, এবং তাঁহার স্ত্রীর মনে যে সকল মহৎ চিন্তা নিহিত আছে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র যদি তিনি জগৎকে জানাইতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি জগতের বিশেষ উপকার করিতে পারিতেন। মিলের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়া—একত্র চিন্তা করিয়া চিন্তাশীলতার যে রূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল গ্রন্থকারের স্ত্রীর অর্জ্জনীয়। ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ডিজরেলি যিনি পরিশেষে লর্ড বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর অধ্যয়ন ও চিন্তার সহকারিণী ছিলেন। বিকন্সফিল্ড কেবল রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ইংলন্ডের বর্ত্তমান কালের একজন প্রধান উপন্যাসকার, তাঁহার সিবীল (Sibyl) নামে একখানি উপন্যাস আছে, সেই উপন্যাসখানি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন, তাঁহার উৎসর্গ পত্রে লিখিত আছে,—"যাঁহার মহৎ আত্মা ও কোমল স্বভাব আমাকে সর্ব্বদা দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে, যিনি স্বীয় মধুর বচনে এই গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্বদাই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, যাঁহার সুরুচি ও সদ্বিবেচনা শক্তি এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছে, যিনি তীব্র সমালোচক এবং যিনি আদর্শ সহধর্ম্মিণী, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।" বিকন্সফিল্ড মিলের ন্যায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে গ্রন্থ রচনায় যে বিশেষ সাহায্য পাইতেন, তাহা এই উৎসর্গ পত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। ক্লপষ্টক নামক জর্ম্মন দেশীয় মহাকবির সহধর্ম্মিণী চিন্তা ও রচনা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহকারিণী ছিলেন, তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন; —আমার স্ত্রী প্রায়

সৰ্ব্বক্ষণই আমার নিকট থাকেন, আমি যখনই যাহা লিখি, তাহা তাঁহার নিকট পাঠ করি, তিনি অতি আনন্দের সহিত তৎসম্বন্ধে আপনার মত আমার নিকট ব্যক্ত করেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার জনসনের স্ত্রীও তাঁহার স্বামীর রচনা কার্য্যে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিতেন। লবর নামক ইংরাজ উপন্যাসকার বলিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী রচনাকার্য্যে বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। পাদ্রি এস, ফি, হলের সহধৰ্ম্মিণী নিজে এক জন গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উইলিয়ম ও মেরি হাউইট উভয়ে গ্রন্থ রচনা করিতেন, কবি ব্রাউনিংয়ের সহধৰ্ম্মিণী একজন উঁচু দরের কবি, তাঁহারা রচনা কার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সাহায্য করিতেন, স্ত্রী যে স্বামীর কেবল সহধৰ্ম্মিণী নহেন, স্বামীর অবলম্বিত অতি কঠিন কার্য্যেও সহায়তা করিয়া তাঁহার সহকৰ্ম্মিণী হইতে পারেন, তাহা এই সকল এবং অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

চৈত্র ১২৯৬

## মাতার প্রতি উপদেশ

কয়েক বৎসর হইল আমেরিকায় একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শতাধিক ধৰ্ম্মপরায়ণ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। ইহারা কি কি উপায়ে সচ্চরিত্র মাৰ্জ্জিত-হৃদয় হন, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অধিকাংশ ব্যক্তি উত্তর করেন যে, শুধু এক মাতৃশিক্ষার গুণেই। মাতার প্রদত্ত শিক্ষার এমত ক্ষমতা কেন? প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তানের ভাবী জীবন গঠন বিষয়ক শক্তি মাতৃহস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃস্নেহ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অমিয়ময় স্তন্যপান করাইয়া ও নানা প্রকার আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া লালন পালন করিয়া তাহার শারীরিক মঙ্গল বিধান করেন। এই প্রকার যত্ন হইতে মনে এক কমনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। মানবচরিত্র গঠনবিষয়ে ভালবাসার আকর্ষণীশক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূত হয়। তাহারই দ্বারা মানব স্বভাব সুশাসিত ও পরিচালিত হয়। নারীর কোমল হৃদয় ভালবাসার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব নারী ভিন্ন কাহার ভালবাসা অধিকতর কাৰ্য্যকরী হইবে? ভালবাসাই ইহাকে ধৈর্য্যশীলা, সরলা ও ক্ষমতাশালিনী করে। তাঁহার বাক্য মৃদু, তাঁহার হাস্য সুমধুর; তাঁহার ভ্রূকুটি অপেক্ষাকৃত কম ভীতি ও বিরক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার বদন-জ্যোতিতে ক্ষুদ্র শিশু-প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য মনড্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন। শিশুর চরিত্র কোমল মৃৎপিণ্ডবৎ ইহাতে যাহা পড়িবে তাহার অনুরূপ ছবি থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা বাহুল্য তাহার মনোবৃত্তি স্ফুরণ বিষয়ে জনয়িত্রীই মুখ্য উপায়। শুধু শরীরের কল্যাণ বিধান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, হওয়াও উচিত নহে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। সন্তানের মন ও অন্তর তাঁহার হস্তে সমর্পিত। অস্মদ্দেশীয় মাতৃগণ—এ বিষয় আদৌ

মনোযোগপূর্ব্বক দেখেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সন্তানের দৈহিক কুশল কামনা করিলে ও দৈহিক কুশল বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা বিষম ভ্রম। এই বিষম ভ্রমের বিষময় ফল মাতাকে ও সন্তানকে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হয়। মাতৃশিক্ষার বলে শিশু প্রথমে কথা কহিতে শিখে, ভাবভঙ্গি শিখে, উত্তরকালবর্ত্তী যাহা কিছু শিক্ষা তৎসমস্তের ইহাই ভিত্তি। মাতৃশিক্ষা ভাল হইলে সন্তান সুশিক্ষা পাইবে, মাতৃ-শিক্ষা মন্দ হইলে, সন্তান কু-শিক্ষা পাইবে। অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, শৈশব শিক্ষা যেরূপ হউক না কেন, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরকালবর্ত্তী শিক্ষাই বিশেষ কার্য্যকরী। এই কথার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃশিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ। পরে যেরূপ শিক্ষা হউক না কেন, খারাপ ভিত্তির উপর উত্তম অট্টালিকা যেরূপ স্থায়ী হয় না, সেইরূপ কুসংস্কার-সঙ্কুল মন্দ মতে শিক্ষার উপর সুশিক্ষা স্থাপন করিলে তাহাও মন্দ হইয়া উঠে। মাতাই সন্তানগণের সমক্ষে আদর্শ। তিনিই ন্যায়ের সুন্দর প্রতিমা তাঁহার কথায়, কার্য্যে ও স্বভাবে তিনি যাহা পরিচয় দেন, সেগুলি তাহারা সতত সূক্ষ্মরূপে দর্শন করে। তিনি অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কথায় ও কার্য্যে যাহা শিক্ষা দেন, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, মাতাকে সর্ব্বদা আপন দায়িত্ব ও শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণ-চেতা থাকিতে হইবে। সমাজের আশা ভরসা, পরিবারের অগ্রণী, ও অনন্তের শিক্ষার্থী জ্ঞানে তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। মাতৃগণ! মাতৃ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অগ্রে একাগ্রতা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষা করুন। আশা করি আপনারা কখনও বিস্মৃত হইবেন না যে, আপনাদিগের চতুঃপার্শ্বে যাহারা ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে অমর আত্মা আছে।

বিচক্ষণা জননী অতি সাবধানে বিচরণ করেন। সন্তানদিগের চরিত্র বুঝিয়া তিনি যেন তাহাগিদের প্রতি ব্যবহার করেন। সংসারে যত সন্তান তত প্রকার পৃথক স্বভাব। যে উগ্রস্বভাব ও সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাকে দমন করিতে হইবে, যে ভীরুস্বভাব লোকের সহিত বড় মিশিতে চাহে না, তাহাকে সাহস দান ও প্রোৎসাহিত করিতে হইবে। এইরূপে এক একটি স্বভাব ও চরিত্র অভ্যাস করিয়া চলিতে হইবে। যিনি এই সকল বুঝেন না, তিনি কুত্রাপি সুমাতা নহেন, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ ১২৯৭

## মাতার প্রতি উপদেশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে নারী আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণা তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ও নানা প্রকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ কবিরার জন্য বেশি আয়াস পাইতে হইবে না; একটী সামান্য দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হইবে। ডিম্বস্থ শাবককে গরমে রাখিবার জন্য পক্ষী কত প্রয়াস পায়,

কত কষ্ট সহ্য করে, কত দিন অনশনে অতিপাত করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। পক্ষিণী স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া যাহা করে, জননী ধর্ম্ম ও বিবেকের আদেশানুবর্ত্তিণী হইয়া তাহা করেন। সন্তান পালনের নিমিত্ত তিনি সামাজিক জীবন এমন কি পুণ্যকার্য্য জনিত পরমানন্দ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সন্তানের উপর যে আধিপত্য দিয়াছেন, তাহা হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত-পদ না হন, তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ এক অলৌকিকী ঈপ্সা বলবতী থাকে। সন্তানেরা তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকে, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সন্তান ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমোদ প্রমোদ ভোগবিলাসে বহির্গত হওয়া তাঁহার পক্ষে গর্হিতকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ যেন বিবেচনা না করেন যে, জননীরা কিছু কালের নিমিত্ত নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ভোগেও অনধিকারিণী। মাতা সন্তানদিগকে এক কালে ভুলিয়া ও সাংসারিক কর্ত্তব্যে বীতরাগ হইয়া আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব বিলাসিনী হইতে পারেন না। ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

সন্তানকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু কিরূপে? দৈনিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কথোপকথনচ্ছলে মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবার জন্য সন্তানের শিক্ষার প্রতি চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। সেইরূপ আবার বর্ণপরিচয়ের কালের পূর্ব্ব হইতেই মাতার সতর্ক দৃষ্টি, পিতার সন্তান কর্ত্তৃক সম্পাদিত সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও অসৎ কর্ম্মের অসাধুবাদ, ভগিনীর অকৃত্রিম ভালবাসা, ভাইয়ের সহিষ্ণুতা প্রভৃতির দ্বারা অধ্যাপনা আবশ্যক। অনেক মাতা আপনার ক্ষমতার উপর তত বিশ্বাস না করাতে শিক্ষা কার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। সন্তানের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে নারী মাত্রে বিশেষতঃ গর্ভধারিণী মাত্রে যাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক অধিক করিতে পারেন।

অন্যায় আদর ও প্রশ্রয় দান অত্যন্ত সাধারণ। ইহা দ্বারা পরম শত্রুর কাজ করা হয়। সুতরাং সুমাতা এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। দয়ালু হওয়াও উচিত। যে মাতার হৃদয় কঠিন—যাঁহার স্নেহ নাই, তিনি স্বজাতির কলঙ্গ, স্বজনের কলঙ্ক, ভালবাসাই তাঁহার ক্ষমতা; ভালবাসাই তাঁহার অমোঘ অস্ত্র; ভালবাসাই তাঁহার কবচ; ভালবাসাই তাঁহার মন্ত্র। ভালবাসা ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। সন্তানদিগকে এই ভালবাসা দ্বারা সুশাসনে রাখিতে হইবে। পিতা মাতা অবশ্যই সম্মানিত হইবেন। এই সুনিয়মটী পরিত্যাগ কর, সন্তানের সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। অনেকে সন্তান পালনের নিমিত্ত সেবক সেবিকার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। স্বীকার্য্য অনেক গৃহকর্ম্ম—শিশুদিগকে খাওয়ান ধোয়ান পরান প্রভৃতি কার্য্য দাসদাসীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহার আর্থিক বল আছে তাঁহার পক্ষে এ সুবিধা আছে। কিন্তু এ স্থলে আমরা ইহাও অবশ্য বলিব যে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা যত দূর সম্ভব সন্তানকে আপনার কাছ ছাড়া কখনও করিবেন না।

জননীর আর একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। মুষ্টিযোগ প্রভৃতি টোটকা টাটকি জানা উচিত। সন্তানাদির সামান্য পীড়া হইলে মাতা স্বয়ং চিকিৎসা করিবেন। কথায় কথায় একটু হাঁচি ও হোঁচটে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইলে গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরও কষ্ট হয় কিনা তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা যাহা প্রকটিত হইল, তৎ সমস্ত অবধান করিয়া প্রসূতিগণ চলিলে, অন্ততঃ চলিতে চেষ্টা পাইলে সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

## শিশুশিক্ষা

এই সকল ব্যতীত শিশুশিক্ষা বিষয়ে অন্য ত্রুটীও পরিলক্ষিত নয়, শিশু কোন দূষণীয় কার্য্য করিলে তাহার মা হয়ত যৎপরোনাস্তি উত্তম মধ্যম দিয়া নিজের ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করেন। কথা না শুনিলে মার ভ্রূকুটী বা চপেটাঘাত শিশুর অন্তরাত্মাকে জড়সড় করিয়া দেয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিতামাতার উপর শিশুর প্রেম বা শ্রদ্ধা হ্রাস পায় এবং প্রেম, শ্রদ্ধা হ্রাস পাইলে তাঁহাদের উপদেশেও আর তত ফলোদয় হয় না। অন্যদিকে বরং তাহারা যথেষ্ট কুশিক্ষা লাভ করে। ভৃত্যের প্রতি ব্যবহারের বিষয়েও জনক জননী সাবধান হইবেন। বাবুরা হয়তো "শ্যালকের অপভাষা" ইত্যাদি নীতিগর্ভ বাক্যদ্বারা ক্রোধ পরবশ হইয়া ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, বাড়িতে সর্ব্বদাই পরনিন্দা ও হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার কথা হইতেছে, শিশু তবে কিরূপে নীতিশিক্ষা করিবে? বালক বালিকা শৈশব হইতে চতুর্দ্দিকে মিথ্যা ও অপবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিলে জীবনে ঘোর দুরাচারী ভিন্ন আর কি হইবে? গৃহে দোল দুর্গোৎসব পূজার সময়, বিবাহাদি ঘটার সময় এবং হয়ত বার মাসই রীতিমত সুরাদেবীর পূজা হইতেছে এবং বেশ্যার নাচও থাকিবেই, তবে শিশু সন্তান কিরূপে নীতিমান ও সুরুচিসম্পন্ন হইবে? মা হয়ত "বাসরঘরে" ছড়া, গান, সুরুচিসম্পন্ন উপহাসাদি দ্বারা কন্যাদিগকে সদাচার শিক্ষা দিতেছেন—এদিকে লজ্জায় জড়সড় কিন্তু এমন কদর্য্য সঙ্গীত নাই যা ঘোমটার মধ্য হইতে বাহির হয় না, এরূপ মার ছেলে মেয়ে কি কখনও ভাল হইতে পারে? শিশুকে "কুকথা মুখে আনিও না" কেবল বলিলেই চলিবে না। অতএব প্রত্যেক জনকজননীর আপনার আচরণ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

ছেলেমেয়েকে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া কখনওই উচিত নহে। তাহারা চাকর চাকরাণীর নিকট থাকিলে তাহাদেরই চরিত্র অনুকরণ করে, বহুমূল্য হীরক কি ভৃত্যকে রাখিতে দেন? তবে প্রাণের প্রিয় বস্তু বালক বালিকাদিগকে অন্যের হস্তে দেন কিরূপে? চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর করার যে কি বিষময় ফল, তাহা ধনীদের পুত্রাদির বিষয় ভাবিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। আমি বলিতে পারি যে ভৃত্যের নিকট তাঁহারা যত কুশিক্ষা লাভ করেন, এমন আর কোথাও নহে, অতএব এ বিষয়েও শতবার সাবধান!!

জননীগণ! শিশুদের প্রতি কখনও উদাসীন হইবেন না, যাহারা আপনাদের হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু, তাহাদিগকে কিরূপে চিরদুঃখের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে দিবেন? যদি কাহাকেও সুস্থ হইতে হয়, তবে আপনাদিগকে সর্বাগ্রে সুস্থ হওয়া আবশ্যক, যদি কাহাকেও জ্ঞানী ও পবিত্রাচার হইতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগের হৃদয় ঘরকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। আপনাদের চরণে বসিয়া মানবজাতি প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান লাভ করিবে। আমাদের মধ্যে একটী গুরুতর অভাব আছে, আমাদের "good home" বা সুপরিবার প্রায় নাই বলিলেই হয়, ইয়োরোপীয় জাতির এই জিনিষ আছে বলিয়া তাহাদের এত উন্নতি, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাদের আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের সঙ্গ প্রিয়তম বোধ হয় বলিয়া ইয়ুরোপে পারিবারিক সুখ বড় অধিক। যদি জাতিকে পরিবার সমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তবে বুঝা যাইবে যে জাতীয় উন্নতির মূল কোথায়। নারীগণ যদি জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নত না হয়েন, তবে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহিবে কেন? পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাহিরের সঙ্গ চাহিবে, এবং

অজ্ঞানতাবশত কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দের দিকে যাইবে। এক দিন শ্রদ্ধেয় হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে 'তাঁহার জননীর সঙ্গ এমনই মধুর ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে তিনি বিদ্যালয় হইতে আসিলে সকল সময়ই মার সহিত কাটাইতেন, আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। মাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণে নিজ পরিবারকে বালক বালিকাদিগের আকর্ষণের বস্তু করাতে তাঁহার সন্তানেরা অন্য সঙ্গের জন্য লালায়িত নহে। বলা বাহুল্য যে তাঁহার ও তাঁহার জননীর এই সন্তান আকর্ষণী শক্তির যে কি মধুময় ফল ফলিয়াছে তাহা যিনি তাঁহার পরিবারের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই বেশ জানেন। বালক বালিকাদিগের মার উপর অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেম, অতএব মার শিক্ষাই অধিক ফলদায়িনী হইবার সম্ভাবনা। ইহা একরূপ অভ্রান্ত সত্য যে সুপরিবারে, সুমাতার নিকট থাকিলে যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কোথাও হয় না। জননীগণ! ভগ্নীগণ! আপনারা নিজ নিজ পরিবারকে এক একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে সচেষ্ট হউন, যেন যেখানে পরিবারস্থ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই আসিবার জন্য লালায়িত হন এবং আসিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারেন; এবং বাহিরের কোন লোক আসিলেও যেন আপনাদের জীবনের সৌরভে আকুল ও আকৃষ্ট হয়েন।

প্রেম, ক্ষমা ও ধৈর্য্যে মানব সমাজ পালিত ও রক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। রমণীগণ! আপনারা এই সকল গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি। আপনাদিগকে ভগবান আমাদের রক্ষণ পালন ও শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনারা নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিবেন না, উহার গুরুত্ব বিস্মৃত হইবেন না, চিরদিনই মানব সমাজের উন্নতি আপনাদেরই দ্বারা সাধিত হইয়া আসিতেছে। চিরদিনই মানব সমাজের ধর্ম্মের হোমাগ্নি আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, আজ মার্কিন রমণীগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যা, ভাই ভগ্নীদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছেন, তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন, সত্য ও পবিত্রতা এবং পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা মানব সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানুষের মুক্তি আপনাদের হস্তে, বাইবেল বলেন নারী হইতে পাপ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাই স্বর্গের দূতেরা আর পৃথিবীতে আইসে না, ইহা ঠিক কথা নহে। আমি বিশ্বাস করি নারীগণ দ্বারা জনসমাজ হইতে পাপ তাড়িত হইবে। স্বর্গের দূতগণ আপনাদের গুণে লজ্জিত হইয়া আর পৃথিবীতে মুখ দেখান না। নারীর সৃষ্টির পর তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভারতের রমণী, ভারত চিরদিন সতীনারী ও ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত, আজ কি ভারতী মাতা জগতে তাঁহার কন্যাদিগকে দেখাইতে লজ্জিত হইবেন? দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে বলিয়া নারীকুলের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবসূর্য্য আবার ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা উষাকালের সহিত পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে এবং ভারতাকাশের ঘন তমোরাশি ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। আমাদের জননীকূল যখন হাসিতেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ যখন তাঁহাদের ও ভগবানের হস্তে, তখন আর আমাদের ভয় ভাবনা কি? আমরা রক্ষা পাইবই পাইব।

শ্রাবণ ১২৯৭

# সুভার্য্যা

পারিবারিক সুখের প্রধান উপাদান পুরুষ ও স্ত্রীতে বিশ্বাস অর্থাৎ একে অপরকে বিশ্বাস করিবে, অণুমাত্র সন্দেহ দম্পতির অন্তর মধ্যে যেন স্থান না পায়। এই বিশ্বাস-রত্ন যে গৃহ-প্রকোষ্ঠে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত না হয়, সে গৃহে শান্তি নাই, সে গৃহে কমলার কৃপা নাই, সে গৃহে পদে পদে অমঙ্গল, সে গৃহে রণকালী সর্ব্বদা খড়্গহস্তে সংহার কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন। স্ত্রী সিজরের পত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত হইবেন। এই হইল সার কথা। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি একান্ত অলঙ্ঘ্য ভক্তি থাকিবে। তাঁহার চরিত্রে শুদ্ধতা দিবাকরের জ্যোতির ন্যায় বিশুদ্ধ থাকিবে। হলাহলেও শান্তি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দৌত্য কার্য্যে যে সংশয় নিয়োজিত হয়, তাহার প্রকোপে অব্যাহতি নাই। স্বামী গৃহকর্ম্ম পরিচলনার নিমিত্ত স্ত্রীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, (না থাকিলে বা চলিবে কেন?) এবং যাবতীয় পারিবারিক কার্য্য তাঁহার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। গৃহে এইরূপ সহায়তা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, দূরদেশে গমন করেন। কিম্বা দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে অবস্থিতি করেন। সুভার্য্যা এইরূপে ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন, যেন তাঁহার ভর্ত্তার সংসারে সকল দিকেই সুপ্রতুল-অসচ্ছল হইলেও সচ্ছল। এক তাঁহার গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীতে তাঁহার এত সুখ স্বচ্ছন্দের অবস্থা যে ধনীর ধনে তাঁহার কোনও প্রকার চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হয় না; কারণ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, এক অমূল্য স্ত্রী নিধিতে সকলই কুলান হইয়া থাকে। সেই দম্পতিই সুখী, যাহাদিগের অন্তঃকরণে এই পরম সন্তোষ বিরাজ করিতেছে। নিষ্ঠুর আচরণে অনেক স্বামী অনেক স্ত্রীকে অসুখী করেন। পক্ষান্তরে অনেক স্ত্রী অমিতব্যয়িতা দ্বারা অনেক স্বামীকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। ইহাতে কি স্বামীগণ পাপাচরণ করিতে বাধ্য হন না? গুণবতী ললনা সর্ব্বদা স্বামীর কল্যাণ কামনা করিবেন, যে কার্য্যে স্বামীর মঙ্গল হয়, তাহাতে উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইবেন এবং সাধ্যমত যাবজ্জীবন যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, তদ্বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন ও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; মিষ্ট কথায় তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন; অঞ্চল দিয়া ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিবেন; দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দিবেন না; ক্রোধভরে কটুবাক্য উচ্চারিত হইলে নম্র বাক্যে উত্তর করিবেন। এই রূপে পতিসেবা ও পতিভক্তি মাঝে মাঝে করিবেন না, দিবানিশি প্রতিক্ষণ করিবেন। স্বামীর পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও নিজের সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অনবরত দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী তাঁহার মান সম্ভ্রম সংবর্ধনের সহায়তা করেন। তিনি জনসমাজে সুপত্নীর পতি বলিয়া পরিচিত হন, ইহা ভার্য্যার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণের সন্নিধানে তাঁহার মর্য্যাদা পরিবর্দ্ধন অপেক্ষা স্ত্রীর আর অধিক প্রশংসার বিষয় কি হইতে পারে?

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের মহিলারা বিস্তর কর্ম্ম করিতেন ও জানিতেন। এখন যাঁহারা জানেন, অনেক স্থানে করিবার আবশ্যকতা দেখেন না, অনেক স্থানে রুচি মার্জ্জিত বল, বা বিকৃত বল, ভোগ বিলাসের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি থাকাতে তদ্রূপ গৃহস্থালি কাজগুলি সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কিছু লজ্জিতা ও অবমানিতা হন। এটী বড় আক্ষেপের বিষয়। এক সময় ছিল যখন কাটনা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিতে

সাহস করিতেন না। এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা মফঃস্বলে স্থানে স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি রন্ধন প্রণালী শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে পরেও থাকিবে, তবে কেন অস্মদেশী অবলাকুল এই গুরুতর কর্ত্তব্য শিক্ষার পক্ষে শিথিলতা প্রকাশ করেন? পাচক পাচিকা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের যে ইহা জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বোধ হয় কোনও রূপ মতদ্বৈধ থাকিবে না। বিজাতীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা স্বজাতীয়দিগের অনেক মঙ্গলময় আচার ব্যবহার ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিতে বীতরাগ হইতেছি। বিশেষতঃ অনুকরণ এই প্রধান গরলময় ধর্ম্ম যে, উহার অনুরাগে আপনা হইতে, অগ্রে মন্দটি অভ্যাস হয়। এই বিষয়টি মহাত্মা টড Students Manual নামক গ্রন্থে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি একান্ত অনুকরণ করাটাই এখনকার কালের ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি সুসভ্য বিজাতীয়দিগের গুণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে? তাহাদের মধ্যে পাকশিক্ষা করিবার কি প্রথা নাই? ভারত-ইংরাজ রমণী ভোগ বিলাসিনী। তাঁহার অবস্থা ভাল হইতেও পারে। ইঁহাকে দেখিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীগণ উদরের অন্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষিণী হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি অনুকরণ কর, তাহা হইলে ইংলন্ডীয় মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদিগকে অনুকরণ কর। বিবি জেন ওয়েলস কার্লাইল কি করিতেন? জর্ম্মণ মহিলাগণ কি করিয়া থাকেন? অলস কন্যাকালে অলস ভার্য্যা, অলস জননী ও অলস ধাত্রী হইবে। অলস গৃহকর্ত্রী দ্বারা গৃহকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। সংসারে করিবার অনেক আছে, অতএব গৃহকর্ত্রী যেন কাজ নাই বলিয়া বসিয়া না থাকেন। থাকিলে তিনি এক কুদৃষ্টান্ত পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। এই ব্যাধি যেরূপ সংক্রামক আর কিছুই সেরূপ নহে।

গৃহাদি সাজান গোছান নারীর বিচক্ষণতা ও নিপুণতার আর একটি নিদর্শন।

সুগৃহিণী সময়ের মূল্য জানিবেন, কোনও মতে ইহার অপব্যয় করিবেন না। নিদ্রা ক্ষণিক মৃত্যু মাত্র। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহার অধিক নিদ্রা যাইবেন না। অলস নিদ্রাপ্রিয় নারী সাক্ষাৎ অমঙ্গল! তিনি অপরকে কেমন করিয়া প্রাতরুত্থান করিতে শিখাইবেন, যখন তিনি নিজে বেলায় উঠেন? এই কারণেই মহাত্মা কবেট্ বলিয়াছেন যে কুমারী বিলম্বে গাত্রোত্থান করে, সে কি কখনও বৈবাহিক জীবনে ছেলের মা হইয়া প্রাতরুত্থান করিতে পারিবে? কখনওই না। প্রতি মুহূর্তের কাজ আছে, সেই কাজটি সেই মুহূর্তে নিষ্পন্ন করা বিধেয়। সন্তান, দাস দাসী ও স্বজনদিগের মধ্যে নীতি-বিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও অনুষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তিনি সাবধানে বিবেচনার সহিত কথা কহিবেন। কুৎসিত অশ্লীল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না। লজ্জাশীলতা তাঁহার একটী প্রধান লক্ষণ, ইহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ধর্ম্মই সংসারের কুটিল পথে একমাত্র নেতা। ধর্ম্মের অপেক্ষা আত্মার পদার্থ আর নাই। হিতৈষণা ইহার একটি অঙ্গমাত্র। দয়াবতী ধার্ম্মিকা নারী দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবেন। তাঁহার দয়া চিন্তা হইতে সম্ভূত হইয়া কথার দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইবে। তাঁহার হিতৈষণা উৎসসদৃশ, শুদ্ধ নিকটবর্তী জীবগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, অতি দূরদেশবর্ত্তী জীবগণেরও মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত হয়। তিনি উপকার এইরূপে করিবেন, যাহাতে স্বার্থের কোনও গন্ধ না থাকে।

সম্পদ বিদ্যুতের প্রভা, সৌন্দর্য্য জলবিম্ব, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণা নারী প্রশংসনীয়া। যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার কি উপমা আছে? তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করা কি দুর্বল মানবের সাধ্য? তিনি দেবতা। তিনি বর্ণনাতীত। তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকার জগৎ আলোকিত হইয়াছে, সূর্য্যচন্দ্রাদি প্রতিভাত হইতেছে, পাপ বিদগ্ধ হইতেছে; সংসার পুণ্যশ্রী লাভ করিতেছে, প্রাণিগণ ধরাধামে অবস্থিতি করিতেছে; অন্ধ দেখিতেছে, রোগী শান্তি লাভ করিতেছে তিনি অবলা কুলতিলক। তাঁহার পিতা ধন্য, মাতা ভাগ্যবতী, যে পরিবারে তাঁহার জন্ম তাহা তীর্থস্থান, যে স্থানে তিনি অবতীর্ণ তাহা পুণ্যক্ষেত্র।

ভাদ্র ১২৯৭

# বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য*

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে
ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥" (য.)

জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও হিন্দু জাতির এক সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। বিশেষত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ক্রিয়া স্ত্রী-জাতির পক্ষে অখণ্ডনীয়। বিবাহিতা হইলে স্ত্রীজাতির উপরে কতকগুলি কর্তব্যভার পতিত হয়। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে "বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" বিষয়ে যাহা উপলব্ধ হইল, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিব।

আমাদের বোধ হয় পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই বিবাহিতা রমণীর প্রথম কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 'পুরুষ যাবৎ বিবাহ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন, অতএব বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে রমণী নিজের হৃদয়, মন ও আত্মা স্বামীতে উৎসর্গ করিবেন। স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। যাহাতে স্বামীর শরীর মন ও আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। স্বামী দূরে বা নিকটে থাকুন, স্ত্রীর মন যেন সর্ব্বদাই স্বামীতে লিপ্ত থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বামী ভিন্ন

* শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত, যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত।

স্ত্রীলোকের আকাঙ্খিত ও হৃদয়াকর্ষক বস্তু যেন না থাকে। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী দেবী—পতিব্রতা-শীর্ষস্থানীয় গান্ধারী দেবী দর্শন শক্তি সত্ত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রমণী রত্ন সাবিত্রী, ঘোর নিশীথে স্বামি-শব বক্ষে করিয়া গহন বনে বাস করিয়াছিলেন, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, যাহাতে রমণী স্বামীকে অকৃত্রিম ভালবাসা দিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন। একজন আজন্ম অপরিচিত পুরুষকে ভালবাসা কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ঘটনা হিন্দু গৃহে সংঘটিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু হিন্দু রমণী জানিবেন হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মমূলক। ঈশ্বরের আদেশে স্ত্রী পুরুষের আত্মা মিলিত হওয়াই হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই ভার্য্যার নাম সহধর্ম্মিনী। তাই যাগ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম করিতে হইলে হিন্দুকে সস্ত্রীক হইতে হয়। অতএব ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলে রমণী স্বামীকে অবশ্যই ভালবাসিতে পারিবেন। প্রথমে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভালবাসিতে গিয়াই শেষে "আত্মহারা" হইতে পারিবেন।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কত পবিত্র ও কত উন্নত ইহা বুঝাইবার জন্য স্বামী হিন্দু শাস্ত্রে বারংবার 'দেবতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং স্বামিপূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল এ কথা বলিতেও আর্য্যাগণ কুণ্ঠিত হন নাই। শেষোক্ত কথাটী ব্যক্তি বিশেষের নিকট অত্যুক্তি বোধ হইলেও আমরা ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারি, স্বামী স্ত্রীর নিকট আদর্শ মনুষ্য। স্ত্রীর প্রীতি ও ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব থাকা উচিত। ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে ভক্তি দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

পাতিব্রত্য ভারত মহিলার চির আদরনীয় রত্ন। হিন্দুর কাছে পতিব্রতার এত গৌরব যে, হৃদয়ের পূর্ণ-উচ্ছ্বাসভরে হিন্দু সন্তান বলিয়াছেন:—

"পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যা
স্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি
ভুঞ্জতে ॥" (য.)

রমণীও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন। এ জগতে অনেক সময়ই মানুষের ভাগ্যে বিশুদ্ধ সুখ ঘটে না, বোধহয় জগতের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র যদি গান্ধারীর অনুরূপ স্বামী হইতেন, তবে হয়ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আখ্যান অন্যরূপ হইত। আমাদিগের একথা বলিবার কারণ এই যে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও সহৃদয় স্বামী সকল স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে সংঘটন হয় না। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে ভার্য্যা কি করিবেন? যাহাতে স্বামীর হৃদয়ের উন্নতি হয়, যাহাতে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ হয়; কার্য্য মঙ্গলজনক হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগিনি! যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে চাহ, যদি পতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হও, যদি পতিব্রতা-ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ে পূজিত হইয়া থাকে, তবে পতির নীরস হৃদয়ে কোমলতা সম্পাদন কর। যাহা অপরের নিকটে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা ভার্য্যার নিকটেই সুসাধ্য হইবে। যাহা গুরুজনের উপদেশে সাধিত হয় নাই, বন্ধুবান্ধবের তিরস্কারে সাধিত হয় নাই, সাধারণের

ধিক্কারে সাধিত হয় নাই, সেই গুরুতর কার্য্য, রমণী! তোমার হৃদয়পূর্ণ ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে সহজেই সাধিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত কম্‌টের কথা ভাবিয়া দেখ। একদিন তাঁহার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে মহান্ তর্ক উঠিয়া জগতের আদি কারণকে জড় বলাইয়াছিল। কিন্তু প্রেমময়ী ক্লোটিডার অপূর্ব্ব প্রেমবলে সে আসুরিক বিক্রম পরাস্ত হইল। ঈশ্বর অবিশ্বাসীর মনও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি প্রণয়িনীর অলৌকিক মহত্ত্বে মোহিত হইয়া তাঁহার ও সমগ্র রমণীর পূজার জন্য নব বিধান বাহির করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না! ক্লোটিডা! তোমার মহিমায় আমরাও মুগ্ধ হইয়া যাই; যে রমণী পতির শুষ্ক হৃদয় এমন কোমলতাময়—এমন মধুরতাময় করিতে পারেন, তিনি পূজা পাইবারই উপযুক্তা, তিনি দেবী, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের পুত্তলিকা! তাঁহার স্মৃতি কত মধুর, কত আনন্দপ্রদ!

যদি স্বামী ক্ষুদ্রচেতা হন, তাঁহার মন যদি সংকীর্ণ হয়, তবে যাহাতে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, রমণী তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন। সচরাচর দেখা যায় যে সকল মানব ক্ষুদ্রচেতা, তাহারাই অসৎপথে অধিকাংশ ধাবিত হয়—লিখিতে লজ্জা করে বঙ্গদেশে কত স্থানে স্ত্রীই স্বামীর মন আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা স্বামীর ভালবাসা সমস্তটা নিজের আয়ত্ত করিতে গিয়া, তাঁহার মনের অবস্থা এত খারাপ করিয়া তুলেন যে সে মন পাপের আগার হইয়া উঠে।[১] আমরা দেখিতে পাই এক একটা ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি অনেকদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে, বাতাস ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া (যত দূষিত বায়ু জমিয়া ও ঘোর অন্ধকারে) সে ঘর একরকম "যমালয়" হইয়া পড়ে। মানুষের মনও ধর্ম্মভাব, ভক্তি, স্নেহ, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি অভাবে শ্মশান বলিয়া প্রতীত হয়—নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতেছি যাহাতে স্বামীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয়, স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য যদি তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদিগের আদর্শ পতিব্রতা সীতাদেবী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও এই ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলেন "আর্য্যপুত্র প্রজারঞ্জনার্থেই আমাকে বনবাস দিয়াছেন, ধন্য তাঁহার আত্মসংযম।" এই কারণেই সীতাদেবী রমণী-কুল-রত্ন! এই কারণেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া।

স্ত্রীলোকের "আদর্শ দেবতা" স্বামীর চরিত্র কোন প্রকারে দূষিত হওয়া স্ত্রী মাত্রেরই দারুণ মর্ম্মপীড়াদায়ক। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীই এই দুর্দ্দশার মূল। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে হৈমবতী ও দেবেন্দ্র দত্তের প্রসঙ্গে ইহা দেখাইয়াছেন। আমরাও বুঝিতে পারি, যেরূপ মানুষ উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুভক্ষ্য আহার করে, সেইরূপ অনেক পতি নিজ গৃহে বিশুদ্ধ সুখ ও আমোদ না পাইয়াই নরকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহা কি স্ত্রীর সামান্য লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়!

যে কারণেই হউক স্বামীকে কোনও প্রকারে কণিকামাত্রও কলঙ্কস্পর্শ হইলে স্ত্রী আর নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। "একজনের প্রাণপণ চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না।" রমণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই স্বামীকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবেন। তিনি মনে রাখিবেন, স্বামী পাপীই

১ যাহাব এ বিষয়ে বুঝিতে আবশ্যক হয়, তাহাকে 'স্বর্ণলতা'ব শশিভূষণ ও প্রমদার উপাখ্যান' পড়িতে আমবা অনুরোধ কবি।

হউন আর অসাধু হউন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হউক, স্ত্রী তাঁহাকে জগতের অবলম্বন ধর্ম্ম জগতের সহায় বলিয়া মানিবেন। স্বামী কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর নিকট অবহেলনীয় বা অশ্রদ্ধেয় নহেন, (এই বিচারে স্ত্রী বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিবেন) অতএব স্বামীর চরিত্র সৎপথে ফিরাইতে রমণী যে প্রাণপণে যত্ন করিবেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অভিমান তিরস্কার প্রভৃতি রুক্ষভাব দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিতে না গিয়া বিনয়, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমলতা দ্বারা স্বামীকে নিজের আয়ত্ত করিবেন। আমরা বাল্যকালে সূর্য্য ও পবনের গল্পে পড়িয়াছিলাম, পবন তীব্র বেগে একজনের গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া হারিয়া আসিয়াছিলেন, আর সূর্য্য শান্তভাবে কার্য্য করিয়া অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্তটী সকলের পক্ষে সর্ব্ব সময়ে সুসঙ্গত না হউক, স্ত্রীর পক্ষে এই উপদেশটী অমূল্য। উগ্রতার পরিবর্তে মৃদুতা দিতে পারিলেই স্ত্রী পতির হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে যতই বিলম্ব হউক না কেন, স্ত্রী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সহিষ্ণুতাপরায়ণা হইয়া চেষ্টা পাইলে এক সময়ে অবশ্য সুফল পাইবেন। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" হইবেই হইবে; তবে মনে রাখিবেন "রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।"

অনেক স্ত্রীর মন এত দুর্ব্বল যে স্বামীর কোনও প্রকার দোষ দেখিলে কেবল অভিমান, কলহ করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সাধিত করেন, এরূপ রোমহর্ষণ কার্য্যে কি লাভ হয়, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। ইহাতে স্বামীর চরিত্র সংশোধিতও হয় না, সংসারে শান্তিও জন্মে না, কেবলমাত্র স্বার্থপরতাই চরিতার্থ করা হয়! স্বার্থপরতা স্ত্রীজাতির পক্ষে অস্বাভাবিক এ কথা বলা যাইতে পারে। রমণীজীবন পরের জন্য; মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, গৃহিণী, যে রমণীকেই দেখ না, তিনি পরের জন্য আসিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়, তিনি পরের জন্য খাটিতেছেন বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

অতএব পরার্থপরায়ণা রমণীর পক্ষে "স্বার্থপরতা" যে কলঙ্ক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। দূর আমেরিকাবাসিনীরা পরের—নিঃসম্পর্কীয়া পরের মঙ্গলের জন্য কত খাটিতেছেন, তাঁহারা পরের হীন চরিত্রের কত উন্নতি সাধন করিতেছেন, আর দেশীয় ভগিনীরা সেই নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের সহায়রূপ স্বামীর মঙ্গলার্থে কি আত্মবলি দিতে পারিবেন না? স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী, তখন স্বামী অধর্ম্মাচারী হইলে ঈশ্বরের নিকট তিনি অবশ্য দায়ী। তাই বলিতেছি কি কাজ করিয়াই মরিতে হইবে।

(ক্রমশঃ; দ্র.কার্ত্তিক ১২৯৭)

আশ্বিন ১২৯৭

# সহধর্ম্মিণী

স্ত্রীর জায়া ও পত্নী প্রভৃতি অনেকগুলি নাম আছে, তন্মধ্যে একটি নাম সহধর্ম্মিণী। এই নাম কেন হইল? তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী সার উপদেশ লব্ধ হয়। "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই পাঠক পাঠিকার মনে হঠাৎ যে অর্থের উপলব্ধি হয়, সে অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করি নাই—অর্থাৎ এই প্রবন্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতার কোন কথা বলা হইবে না এবং পুস্তক বা পত্রিকা পাঠের উপকারিতাও প্রদর্শিত হইবে না।

নামটী শাস্ত্রমূলক। শাস্ত্রকারগণ যে অভিপ্রায়ে ঐ নাম প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, সে অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। অল্প অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, চিত্তক্ষেত্র জ্বলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদগত হয় না। ধর্ম্মকার্য্য সকল পবিত্র প্রীতিবীজের শুভময় ফল। সুতরাং তদুদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ বিধি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। স্ত্রী স্বামীকৃত ধর্ম্ম কর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী হন। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—'শরীরার্দ্ধং স্মৃত্য জায়া পুণ্যাপুণ্য দানৈঃ সমা"। পুরুষ স্ত্রীর সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রীরা সহজে পুরুষকৃত ধর্মের ফলভাগিনী হয়, ইহা দেখিয়া ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। কেবল পুস্তক ও পত্রিকাপাঠে যথার্থ সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করা ও করান যায় না। কিরূপ শিক্ষায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী হওয়া যায়? এবং স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা উচিত? তাহা আমাদেরই শাস্ত্রকারগণের পুস্তক মধ্যে লিখিত আছে। দক্ষদুহিতা সতী ও গিরিরাজকন্যা উমা, ইঁহারা ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইতে অনিচ্ছুক হন নাই, একদিনের জন্যও কষ্টবোধ করেন নাই। দানব দুহিতা শচী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়তমা গৃহিণী হইয়া সপ্তস্বর্গের ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কেহই সে সময়ে পাতালে প্রবেশ করিয়াও নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দিষ্ট এই দুইটি আখ্যায়িকার মধ্যে যথেষ্ট সহধর্ম্মিণীত্ব শিক্ষার উপায় উপবিষ্ট আছে।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে ঐ দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও। স্ত্রী যাহাতে বুঝিতে পারে ও বিশ্বাস করে, "মা, বাপ, ভাই, ভগিনী ইহাদের সম্পদ, বিপদ, আমার সম্পদ, বিপদ নহে। স্বামীর সম্পদেই আমার সম্পদ, স্বামীর বিপদেই আমার বিপদ। বাপের বাড়ী বাড়ীই নহে; শ্বশুরবাড়ীই বাড়ী। তাহার চেষ্টা কর। ক্রমে দেখিবে, তোমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য অধিকার করিতে সমর্থা হইবে।

আর একটি শিক্ষা আছে, তাহাও শাস্ত্রমূলক এবং উহা তোমারই অধীন। শাস্ত্রতে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু করিবে, সমস্তই স্ত্রীর সহিত একযোগে করিবে। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবিয়া তাহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিও। সে বুঝুক বা না বুঝুক বলিতে ও গল্প করিতে অবহেলা করিও না। মনেও স্থান দিও না, যে, সে তোমার কথা বুঝিবে না। সে ত বালিকা, তাহাতে আবার লেখাপড়া জানে না, তাহার সহিত আর কি কথা বলিব, এরূপ ভাব যেন তোমার মনে কখনও স্থান না পায়। যখন যা মনে আসিবে, তখন তাহাই বলিবে। ক্রমে দেখিতে

পাইবে যে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত কথার উদ্দেশ্য বুঝিতেছে এবং সময়ে সময়ে তোমার শত শত পুস্তকপাঠের ফল স্বরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে লুক্কায়িত দুই একটি ভুল বাহির করিয়া দিতে সমর্থা হইয়াছে। এইরূপ সদ্ব্যবহাররূপ শিক্ষা অতি সাবধানে প্রদান করিতে হয়। অনৃতবাদী, ধূর্ত্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর স্বামী এ শিক্ষার গুরু হইবার অনুপযুক্ত।

মহাগুরু স্বামী উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েকটী শিক্ষা দিতে পারেন। সেগুলিও শাস্ত্রমূলক। তাহার একটী এই—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"।

শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিও। সমাদর ও যত্ন করিও। সময়ে সময়ে যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিও। অপরের সমক্ষে তাঁহার অত্যল্প ত্রুটীরও উল্লেখ করিও না। ত্রুটী দেখিলে মিষ্ট বাক্যে ত্রুটীর অবস্থা বুঝাইয়া দিও। পিত্রালয়ে যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কি( তথায় সম্মান পাওয়া সহজ নহে। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার সম্মানের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সকল একত্রিত হইলে অর্থাৎ যত্ন সমাদর সম্মান ও গৌরব এ সকল যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে তাহার বলে সেই নবাগত বালিকা তোমার সহধর্ম্মিণী পদ অধিকার করিতে চেষ্টিতা হইবেন। উল্লিখিত কয়েকটীর অনুষ্ঠান ব্যতীত নবাগত বধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার উৎকৃষ্ট উপায়ান্তর নাই। উল্লিখিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করিলে এবং উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত শিক্ষার মর্ম্ম তাঁহার হৃদ্বোধে আরোহিত করাইতে পারিলে, তখন সেই অনক্ষরা বালিকা তোমার প্রতি অনুরাগবতী হইবে, তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাহাও তখন বুঝিয়া লইবে এবং আপনার মনকে তোমার মনের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। যখন এতদূর অগ্রগামিনী হইবে, তখন আর সে তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল হইবে না, কাম্য কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবে না, বরং তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের সহায়া হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক্য সাধন করিবে।

(দ্র. পৌষ ১৩০৩)

কার্ত্তিক ১২৯৭

## বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামীর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বামীর স্বাস্থ্য সুনিয়মে রক্ষা হয়, অতিশ্রমে কি হীনশ্রমে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনিক কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি স্বাস্থ্যহীন না হন, স্ত্রী সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। এখনকার অনেক যুবক মানসিক শ্রমের অনুরোধে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অমনোযোগী, ইহারই ফলে রোগগ্রস্ত, অল্পায়ু প্রভৃতি হইয়া দারুণ দুর্ঘটনা ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন, তবে এরূপ হইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া উপস্থিত বিষয়টী শেষ করিতে পারি না। স্ত্রী স্বামীপ্রদত্ত সদুপদেশ সকল যথা নিয়মে পালন করিবেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বদা বাধ্যতা দেখাইবেন। যে কার্য্যে স্বামী প্রীত হন, সে কার্য্য সাধন করিবেন। স্বামীর হৃদয়, মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন। বিবাহ ক্রিয়া ধর্ম্মমূলক। অতএব স্বামীর জন্য ধর্ম্মার্থে স্ত্রী সকল কষ্টই অকাতরে সহিবেন। স্বামী স্ত্রীর প্রভু, শিক্ষক ও বন্ধু। স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি, সম্মান ও প্রীতি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। স্ত্রী, স্বামীর এরূপ আনন্দদায়িনী হইবেন যেন সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর হৃদয়ে সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে পারেন।

পরিবারগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনগণও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মানভাজন। তাঁহাদিগের আদেশ পালন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বিনীতভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সেকালে "বৌমা" ঘরে আসিলে শাশুড়ী আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেন না। "বৌমা" তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। কিসে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, কিসে তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন হইবে "বৌমা" দিবারাত্রই প্রায় সেই ভাবনা ভাবিতেন। আজিকালি বিলাসিতার ছড়াছড়ির দিনে "বৌমা"র অত ত্যাগস্বীকার হইয়া উঠে না। আজকাল "বৌ" ভাবেন, তাঁহার বয়সে অমন নরম হাত দিয়া মাটীর কাজ, আগুনের কাজ, যত ছোটলোকের কাজ, সে তো হইতেই পারে না। তার উপরে আজিকার দিনে মাথার সিঁথি কাটিয়া দুপাশের চুলে পেখম ধরাইয়া একটু সুগন্ধি গায়ে মাখিয়া যে বেড়াইতে না পারিল, যে বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিয়া তরুণ-বয়সে জলের ঘড়া কাঁখে তুলিল, তার জীবনই বিফল!

ওসব কাজ অশিক্ষিতা, অহৃদয়া, ভ্যানভেনে, পাকা চুলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীরই সাজে (!!) "বৌমা" কাজে কর্ম্মে আমার মত হউক, এই চাহেন শাশুড়ী; আর ময়ূর পাখীটীর মত সাজ করিয়া বেড়াইবে, এই চাহেন বৌমা! ইহার জন্যই এখনকার দিনে শাশুড়ী বৌয়ে এত অবনিবনা। ইহার জন্যেই পুত্রবধূ "সহুরে" মেয়ে হইলে শাশুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট! বধূ যদি ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে শ্রমশীলা ও সেবাপরায়ণা করিতে পারেন, তবে এ অশান্তি দুদিনেই ঘুচিয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বতন মহিলাগণের আদর্শ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা আমাদের মত দু'পাতা বই পড়িতে ও দু'কলম হাতে লিখিতে না পারিলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহাদের শ্রমশীলতা, প্রাণপণে শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভাশুর-পত্নী, জ্যেষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতিও গুরুজন, তাঁহাদের প্রতিও গুরুজনের ব্যবহার করা উচিত, দেবর, কনিষ্ঠা ননন্দা প্রভৃতি বয়ঃকনিষ্ঠ ও সম্পর্কে কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিবেন। যেভাবে নিজের কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীকে দেখিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইভাবে দেখিতে হইবে।

পারিবারিক বন্ধনের মূলমন্ত্র ভালবাসা। যিনি যে প্রকৃতির লোকই হউন একজন যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসে তবে তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়াই থাকিতে পারেন না। যদিও দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সে অতি অল্প। আমরা ব্যক্তি বিশেষের কথার উল্লেখ করিতেছি না। সাধারণতঃ ভালবাসা দিলেই পায়। তাই

বলিতেছি ভগিনি! তুমি তোমার গৃহের সকলকেই ভালবাসিতে শিখ, ধৈর্য্য ও নম্রতা তোমার কণ্ঠভূষণ হউক, তুমি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি সর্ব্বদা চক্ষু না রাখিয়া পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাও, দেখিবে তোমার সংসারে কখনই বিরক্তি আসিবে না।

রমণী প্রিয় বাক্যে ও বিনম্র ব্যবহারে গৃহের সকলকে বশীভূত করিবেন। উদ্ধতস্বভাবা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীলোক সংসারের চক্ষুশূল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি যদি অপ্রিয়বাদিনী ও উদ্ধতস্বভাবা হন তবে কখনই সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন না।

গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হওয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের তৃতীয় কর্ত্তব্য। গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। মানবের সকল সুখ ও আরামের স্থল গৃহ, সে স্থানটী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইবে, ক্ষুধার সময়ে আত্মীয়স্বজনকৃত সুস্বাদু আহার্য্য পাওয়া যাইবে, তৃষ্ণার সময়ে তাঁহাদিগের প্রদত্ত সুবাসিত সুনির্ম্মল পানীয় পাওয়া যাইবে, পরিশ্রান্ত হইলে শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে, রোগের সময়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা মিলিবে, ইত্যাদি সুখ ও আরাম সকলেরই প্রার্থনীয়। গৃহের স্ত্রীলোকেরা অলস বা গৃহকর্ম্মে অপটু হইলে সেখানে কখনই কেহ উপযুক্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, এবং সুখ ও আরামের আকর স্থান গৃহই কত বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইতে থাকে। ইহা প্রতি স্ত্রীলোক স্মরণ রাখিবেন।

গৃহকর্ম্মে সহরবাসিনী অপেক্ষা পল্লিগ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা অনেক শ্রেষ্ঠ। বাল্যকালে গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত না হওয়াই সহরবাসিনীদিগের গৃহকর্ম্মানভিজ্ঞতার মূল। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাঁহারাও যে অল্পদিনে গৃহকর্ম্মে সুদক্ষতা লাভ করিতে পারেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্যেক রমণী আলস্যবিরহিতা হইয়া যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া সকল প্রকার গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, কি করিয়া গৃহ সুনিয়মের অধীন রাখা যায়, কি করিয়া গৃহকর্ম্মে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়, কিরূপে কোন কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সাধিত হয়, এইগুলি অগ্রে শিক্ষা ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গৃহকর্ম্ম "আপদ বালাই" বোধ হইবে না। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ আছেন যে গৃহকর্ম্মের ন্যায় বিরক্তিজনক আর কিছুই দেখেন না। ইঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে হাসিকান্না দুইই আইসে। আমরা এক বঙ্গীয় ধনী পরিবারের কথা শুনিয়াছি, যে দিন তাঁহাদের পাচক পাচিকা অনুপস্থিত থাকে, সে দিন ঘরে উনান জ্বলে না, বাজারে জলখাবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সকল ক্রীত জিনিস যদি কোন রকম খারাপ হয়, তবে সকলে মিলিয়া খাঁটি উপবাস করিতে বাধ্য হন। এই পরিবারে চারি পাঁচটী স্ত্রীলোক আছেন, (সৌভাগ্যেই হউক আর দুর্ভাগ্যেই হউক), ইঁহারা গৃহকর্ম্মকে বাঘের ন্যায় ভয় করেন, তাই এমন দশা হইয়াছে। যদি অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঘরে এই রকম গৃহলক্ষ্মীগণ আবির্ভূত হন, তবে যে কি অবস্থা হয়, শুধু গৃহ নয় দেশের অবস্থাও কি হয়, আমাদের সকলেরই তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

সুকন্যা, সুভগ্নী, সুমাতা ও সুগৃহিণী হওয়াই নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান শিক্ষণীয়। সকল বিবাহিতা স্ত্রী সুভার্য্যা হইয়া সময় যাপন করিবেন এবং

ভবিষ্যতে যাহাতে সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন হইবেক।

প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমরা মহাভারতের দান ধর্ম্ম হইতে ভার্য্যাধর্ম্ম বিষয়ক একটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না:—

"অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিযাপ্য পতিনা সহ ॥" (য.)

অর্থাৎ, যে স্ত্রী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত, যিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন, এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া দেবারাধনা করেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

এই উপদেশ বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে অমূল্য। তিনি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া যথাসাধ্য ইহা প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দু গৃহে সাধারণতঃ বালিকাবিবাহই প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যগুলি যে কিরূপ গুরুতর ও বালিকাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া যে কিরূপ কঠিন তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রত্যেক অভিভাবিকার কর্ত্তব্য যে বালিকাদিগকে এই সকল বিষয় যথোচিত শিক্ষা দান করেন। তাহা হইলে তাহারা অবশ্য শিখিতে পারিবেক। এ দেশীয় বালিকাদিগের প্রকৃতি যেরূপ মৃদু ও কোমল, তাহাতে এরূপ আশা বোধ হয় "অসঙ্গত" নহে।

কার্ত্তিক ১২৯৭

## মাতৃ ও শাশুড়ীভক্তি

**বামারচনা**

গুরুজনের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে কোথায় কোথায় ইহার ন্যূনাধিক্য দেখা যায় বটে। যাহা আমাদে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক, আমরা যে তাহা সর্ব্বদাই করিতে পারি, এমত নহে। শিক্ষাদ্বারা আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলিকেই বিকশিত করা চাই এবং কোন্ অবস্থায় কাহার প্রতি আমাদের কি প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাও অনেকদূর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য স্থির করিয়া রাখা উচিত। এ বিষয়ে এই রূপ চিন্তা ও শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক সময়েই অনেক ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ মাতৃভক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

এজগতে মাতৃস্নেহের তুলনা কোথায়? মাতার স্নেহ যে জগতে অতুলনীয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিপদের সময় পীড়ার সময় আমরা একবার 'মা' নাম মুখে করিলেও কত আনন্দ লাভ করি, সন্তানের প্রতি মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন আর কেহই

করে না, কেহই পারে না, স্নেহ অনেকেই করেন বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমি যদি মূর্খ কিম্বা পাপী হই, তবে আমি সকলের অপ্রিয় হইব বটে, কিন্তু কখনও মাতার বিরাগভাজন হইব না, যাহাকে পাপী বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই হতভাগ্যের জন্য মাতা ভিন্ন কে আর নীরবে অশ্রুপাত করে? মাতাকে সন্তান সম্বন্ধে যে যাহা বলুক না কেন, মাতা সন্তানের শুভ কামনা ভিন্ন অন্য ভাব মনে স্থান দিতে পারেন না। তাই লোকে বলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ইহার অর্থ এই যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এমন যে মাতা, আমরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি? সন্তান যদি দুদিনের জন্যও বিদেশে যায়, তবে মার নিকটে সেই দুইদিন দুই বৎসরের মত বোধ হয়, সর্ব্বদা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, আর আমাদের একটু অসুখ হইলে মা অস্থির হইয়া পড়েন, এবং আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। আমরা যখন মাতার অবাধ্য হই, তখন ভাবি না যে মাতা আমাদের প্রতি কত স্নেহবতী, দেখিতে পাই যে তিনি আমাদের অবাধ্যতায় কষ্ট পাইলেও আমাদের সেই দুষ্ট ব্যবহার শীঘ্রই ভুলিয়া যান, আমাদিগের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার পীড়ার সময় তাঁহার সেবা করিব, মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিব এবং আরও নানারূপে তাঁহার বিনোদনে সযত্ন হইব। যাহার এ সংসারে মা নাই, তাহার কোথাও আদর নাই, সে হয়ত কোথায় দাঁড়াইয়া খাবার চাহিতেছে, সে কথাও কেহ শুনে না, সে কাঁদিয়া অস্থির হইলে কে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দেয়? অন্য লোক থাকিতেও সে এ সংসারে মা বিনা অনাথা। এমন যে স্নেহময়ী মাতা আমরা তাঁহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। মা যখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব যেন সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞাবহ হইতে পারি, এবং তাঁহার হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন না করি।

## শাশুড়ী ভক্তি

শাশুড়ী মার অনুরূপা সত্য বটে, কিন্তু মাতাকে জন্মাবধি দেখিতেছি, জন্মাবধি তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি, সুতরাং মাতার প্রতি ভক্তি যেরূপ স্বতঃ উৎপন্ন হয়, শাশুড়ীর প্রতি সেরূপ না হইতে পারে। তবে শাশুড়ী যে আমাদের মাতৃস্থানীয় এবং মাতার স্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী প্রণয়ে স্বামীর সহিত যুক্ত হয়েন। যদি স্বামী তাঁহার মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণীর পক্ষেও শাশুড়ী-ভক্তি অতিশয় স্বাভাবিক, এবং সহজ হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ও সহজ হউক আর না হউক, সর্ব্বপ্রযত্নে শাশুড়ীর প্রতি মাতার মত ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। অনেক বধূর ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে সে কখনও দেখে নাই, যাঁহার স্নেহ কখনও অনুভব করে নাই, তাঁহারই বধূ হইতে হইল। সে জানে না শাশুড়ী কাহাকে কেমন স্নেহ করেন, এরূপ স্থলেও সহজে ভক্তির উদয় হয় না। আমাদের ভক্তি প্রভৃতির অন্যের ভাবসাপেক্ষ। সচরাচর দেখা যায় যে, যিনি যাহাকে যে পরিমাণে স্নেহ করেন, তিনি সেই পরিমাণে স্নেহ পাইয়া থাকেন। সেই প্রকার শাশুড়ী বধূকে স্নেহ করিলেই, বধূ

তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন কোন স্থানে শাশুড়ীর দোষে, কোন স্থানেই বা বধূর নিজের দোষে শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এখন কাহার প্রথমে ভক্তি এবং স্নেহ করা উচিত? বধূ কন্যাস্থানীয়া, এবং শাশুড়ী মাতৃস্থানীয়া, এরূপ স্থলে বোধহয় প্রথমে শাশুড়ীর বধূকে স্নেহ করা উচিত। কারণ বালিকা সহজেই ভ্রম করিতে পারে এবং তাহা কতকটা মার্জ্জনীয় বটে। যে নূতন স্থানে আসিয়াছে, কিরূপে চলিতে হইবে, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে জানে না। প্রথম সে যখন আসে, তখন তাহাকে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখন তাহার নূতন স্থান ভাল লাগে না। যে প্রকার অরণ্য হইতে একটি পক্ষী ধরিয়া পিঞ্জরে রাখিলে তাহার নিকট সে পিঞ্জর সুবর্ণময় হইলেও তাহার নির্ম্মিত বাসা অপেক্ষা কখনও ভাল লাগে না; সেই প্রকার বধূ যখন নূতন বাড়ীতে আসে, তখন তাহার কিছুই ভালো বোধ হয় না। পাখী যেরূপ উত্তম খাদ্য না পাইলে পোষ মানে না, সেইরূপ বধূ কিরূপে তাহার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় দেখিতে পারে? এইজন্য শাশুড়ীর উচিত যে প্রথম সেই বালিকাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। একমাত্র স্নেহই তাহাকে ভুলাইয়া রাখে এবং কেবল স্নেহের দ্বারাই বধূগণ বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী হয়েন। স্বভাবতঃ সকল বধূ শাশুড়ীকে ভয় করেন। শাশুড়ীর পক্ষে বধূর প্রতি যেরূপ স্নেহ করা উচিত, বধূরও সেইরূপ শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি করা উচিত। যদি শাশুড়ী কখন কোন বিষয়ে বিরক্ত হন, তবে বধূর উচিত যে সহিষ্ণুতা গুণে তাহা সহ্য করেন। আর কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বধূর উচিত নয়। কিন্তু আজকাল অনেক বধূই যাঁহারা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছেন. তাঁহারা শাশুড়ীকে দুই একটী কথা বলিতে ক্রটী করিতেছেন না, কিন্তু বধূদের পক্ষে মাতার অনুরূপ সেই শাশুড়ীর প্রতি ব্যবহার করিয়া শিক্ষার কুফল প্রদর্শন করা উচিত নহে। শাশুড়ী যত দুষ্ট হউন না কেন, বধূর তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া অনুরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন শাশুড়ীর কন্যারা নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ী থাকেন, আর শাশুড়ী কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশে বাস করিতে থাকেন, সেই দুঃখের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝান কর্ত্তব্য যে, বধূরাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া, পীড়ার সময় ঠিক মায়ের তুল্য সেবা করিতে হইবে, এক কথায় কন্যার যত কার্য্য সকলি বধূকে করিতে হইবে।

উল্লিখিত শাশুড়ী-ভক্তি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রথমে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিলে বধূরা শাশুড়ীকে স্নেহ করেন না (অনেক স্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে) তবে কি শাশুড়ীর প্রতি স্নেহ করা উচিত নয়? শাশুড়ী স্নেহ না করিলে বধূর শাশুড়ীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাই এখানেই উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বধূ বালিকা, তাহার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু বধূ আর চিরদিন বালিকা থাকেন না, ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইয়া উঠেন; তখন আর সে বালিকা ভ্রম থাকে না। অনেক শাশুড়ী আছেন, তাঁহারা বধূকে স্নেহ করেন না, আর অনেক বধূ আছেন যাঁহারা শাশুড়ীর এই প্রকার ব্যবহারের সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কদাচ উচিত নয়। শিক্ষিতা হইয়াছেন, বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন একবার বধূর শাশুড়ীর প্রতি পূর্বোল্লিখিত প্রকারে ভক্তি করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন যে শাশুড়ী পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বধূকে স্নেহ করিতে পারেন। বোধহয় বধূর এইরূপ কোমল ব্যবহারে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে

পারিবেন না। তাহা হইলে বধূরা যখন পীড়ায় অস্থির হইয়া মাগো, বাবাগো বলিয়া ডাকিবেন, তখন কি শাশুড়ী তাহাদের প্রতি মাতৃস্নেহ বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারিবেন? উচ্চ পদ বা উচ্চ মান সম্ভ্রমের ভ্রমে পড়িয়া যদি শাশুড়ীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে চরিত্রের অত্যন্ত গুরুতর দোষই প্রকাশিত হয়। দিনে দিনে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে সুশিক্ষিতা রমণীগণ গুরুজনের প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আপনাদের সুশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবেন।

ভাদ্র ১২৯৮ শ্রীমতী হরবা রায়, কটক।

# লজ্জাশীলতা

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে; যে ভাবেই আরম্ভ হউক ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া আশা করি। সুবর্ণ দগ্ধ হইয়াই বিশুদ্ধ হয়, সত্য এক বিতর্কতেই পুনরুদ্দীপিত হয়। তাই এ দেশব্যাপী আন্দোলনে হতাশার কারণ দেখিতে পাই না; তবে কি না আগে—বাল্যকালে যাহা বড় নিকটে বোধ হইত এখন দেখিতেছি তাহা অনেক দূরে! মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল হউক—নিঃসন্দেহ তাহা হইবেই।

যাহা হউক এই বিরোধ ব্যবধানের মাঝখানেও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক অমন কতকগুলি জিনিস আছে যে তাহাদের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। "লজ্জাশীলতা" সেই জাতীয়। "লজ্জা রমণীর প্রধান অলঙ্কার" একথা সর্ব্ববাদিসম্মত, নির্লজ্জতার অপেক্ষা সৌন্দর্য্যনাশক পদার্থ রমণীর আর কি আছে? বেহায়া মেয়ের রূপ তো নয়ই, গুণও—আমার বোধ হয় ভাল করিয়া ফুটিতে পায় না। সৌন্দর্য্য শারীরিক বস্তু নহে, আত্মার দেবত্বই সৌন্দর্য্য। সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর মত সুন্দর কে? শারীরিক আকৃতি যাহাই হউক তথাপি তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়! ইহার কারণ তাঁহাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যেই অপরের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তাই আজি আমরাও বলিতেছি, লজ্জাশীলতা রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য—প্রধান অলঙ্কার। লজ্জাশীলা রমণীকে অন্য বসনে সাজাইতে হয় না, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিকট হীরা মুক্তা মলিন হইয়া পড়ে। লজ্জা রমণীর এমনই মাতৃদত্ত ভূষণ! এখন কথা এই প্রকৃত লজ্জা কাহাকে বলে? এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কাহারও বিবেচনায় ঘোম্‌টা টানিয়ে বেড়ানই লজ্জা, কাহারও বিবেচনায় জড় বা মূকের মত চুপ করিয়া থাকা লজ্জা, কাহারও মতে বাহ্যিক বা আন্তরিক বিষয়ই লজ্জা ইত্যাদি মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে প্রকৃত লজ্জাশীলা রমণী কাহাকে বলিব? যে রমণী নিতান্ত নিরীহের মত মুখ বুঁজিয়া থাকেন, একটী কথার উত্তর দিতে হইলে বা বয়স্যাদিগের সহিতও আলাপ করিতে হইলে মৃতপ্রায়া হইয়া পড়েন, তিনি কি লজ্জাশীলা? আর যিনি মিষ্ট হাস্য ও শিষ্টালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, যাঁহার সরস সদালাপে অপরের বিষাদাকুল মনও প্রীত ও আমোদিত হইয়া থাকে, তিনি কি

নির্লজ্জা? প্রথমোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে গৌরবান্বিতা হলেও তাঁহার প্রকৃতি সাধারণের অনুকরণীয় নহে; আর শেযোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের নিকটে অপ্রীতিকরী হলেও আমরা তাঁহার পদানুসরণ করিতে চাহি। "বউড়ি কে ভ্যালা চুপ" একথা সময় বিশেষেই ব্যক্তিবিশেষে প্রযোজ্য। এ জগতে সদ্ব্যহার ও মিষ্টালাপের মত মধুর জিনিস আর কি আছে?—আর এই দুটির মত দানীয় সহজসাধ্য জিনিসই বা মানবের আর কি আছে? অতএব এই অমূল্য সহজসাধ্য পদার্থ বিতরণ করিতে যিনি কৃপণতা করেন—প্রশংসা করা দূরে যাউক, আমরা তাঁহাকে 'দুর্ভাগ্য' বলিয়া মনে করি( !), দানীয় পদার্থের যদি "অগ্র পশ্চাৎ" থাকে, তাহা হইলে এই দুটি জিনিস সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেয়। তদ্ভিন্ন ইহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই পরিতুষ্টি সাধন করে। এই সকল কারণে আমরা বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি করিতে পারি না এবং নীরব নিশ্চল প্রকৃতিকেও "বাস্তবিক লজ্জাশীলতা" মনে করি না, লজ্জাশীলতা কেবল ঘোম্‌টা টানাও নহে, কেবল বিনয়ও নহে।—আসল কথা লজ্জা কোনও "মূল পদার্থ"নহে, "যৌগিক পদার্থ" মাত্র। কোনও একটী বৃত্তির নাম লজ্জা নহে, কতকগুলি বৃত্তি ও শক্তি একত্রিত হইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম "লজ্জা" বলা যায়, এই বৃত্তিগুলি "মূল পদার্থ" ও লজ্জার উপকরণ বলিয়া আমরা যথাসাধ্য ইহাদিগের বিষয় আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলাম।

লজ্জার প্রথম উপকরণ নম্রতা—নম্রতা মানব হৃদয়ে যেমন মধুর, সেই রকম শক্তিমতী, নম্রতার কার্য্য বিনয়। বিনীত মুখের সর্ব্বত্রই জয়। হিংসাকে ভালবাসায়, শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিবার ক্ষমতা কেবল বিনয়েরই আছে। বিনয়ীর মুখে কেমন এক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা দেখিলে নিতান্ত পাযাণ হৃদয়ও স্নেহোদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এ জগতে নিতান্ত নরপিশাচ বা নরপিশাচী ভিন্ন অন্য কেহ বিনয়ীর শত্রু হইতে পারে না। বিনয়ের সংস্পর্শে মানব-হৃদয়ের অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ঔদ্ধত্য দূর হয়, মানবহৃদয় স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হয়। বিনীত ব্যক্তি বিশেষ কারণে কাহারও প্রতি বিরক্ত বা কুপিত হইলে, তাহাকে কর্কশ ভাবে কি রুক্ষ শাসনে ব্যথিত করিতে পারেন না, পরের অন্তরে ব্যথা দিয়া কখনও আমোদানুভব করিতে পারেন না। তিনি আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক বা যশের লোভেই অন্ধ হন না। তাঁহার আলাপ মধুর, ব্যবহার মধুর, হৃদয়খানি মধুরতায় পূর্ণ, অহঙ্কার বিনয়ের শত্রু, বিনয় দশজনের জন্য, অহঙ্কার কেবল আপনার জন্য, মানবকে নিয়োজিত করে। অহঙ্কারী আপনার ভরে আপনি ভাঙিয়া পড়িতেছে, সে যেন কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতেই জগতে আসিয়াছে! অহঙ্কার মানবকে বাস্তবিকই এক সৃষ্টিছাড়া পদার্থ করিয়ে তোলে! তাহার হৃদয় যেন একটী অরক্ষিত রাজ্যের মত যথেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ! নিজের শুভাকাঙ্খী আত্মীয়ের মুখে আত্মদোযের কথা শুনিলেও তাহার অসহ্য হয়, সে জগতকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, জগৎও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যাঁহার মনে অহঙ্কার আছে তাঁহার অন্যান্য শতগুণ থাকিতে পারে, কি( লজ্জাশীলতা অবশ্য নাই। লজ্জাশীলের আত্মাদর আছে, নিলর্জ্জ ব্যক্তিই অহঙ্কারের বোঝা বহিতেছে। নম্রতা ও অহঙ্কার, আলোক ও আঁধার। একের অভ্যুদয়ে অপরে বিনষ্ট হয়, তাই বলিতেছি, এই বিশাল মানবজগতে আমি কতটুকু বস্তু? এই বিষয়ে যত ভাবিবে, হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। এই উপায়ে রমণী অহঙ্কার পরিহার ও নম্রতা অভ্যাস করিতে পারিবেন, এ জগতে নম্রতা ব্যতীত লজ্জাশীলতা গঠিত হয় না।

লজ্জাশীলতার দ্বিতীয় উপকরণ সঙ্কোচিতা—যেমন একপক্ষীয়েরা বিনয়কে লজ্জা বলেন, সেইরূপ অপর পক্ষীয়েরা সঙ্কোচকেই লজ্জা মনে করেন। সেকালে সত্য দ্বাপর নহে, আমাদেরই ঠাকুরমা দিদিমাদিগের সময়ে এই সঙ্কোচিতাই প্রধানত লজ্জারূপে পরিগণিত ছিল। আমরাও সঙ্কোচিতাকে লজ্জার উপকরণ বলিয়া বিবেচনা করি। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে বঙ্গবধূর ঘোম্‌টা, ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের "জাল", আরব রমণীর "মুখোস"। রমণী সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার অন্তরে কি এক জড়সড় ভাব উপস্থিত হইতে থাকে, তিনি আপনাআপনি আপনাকে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই ভাব হইতে রমণী জীবনের স্বতন্ত্রতা, এই ভাবকে আমরা সঙ্কোচিতা বলিতেছি। সঙ্কোচিতার বাড়াবাড়িতে রমণী জীবন জড় প্রায় করা এবং সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কেবল ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা অবশ্য অন্যায়। তবে এই স্বাভাবিক বৃত্তি উপযুক্তরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া লজ্জাশীলা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কোনও পুরুষের সহিত প্রগল্‌ভতা করিবেন না, কোনওরূপে অসংযতাবস্থায় তাঁহাদিগের নিকট যাইবেন না, এবং হীনচরিত্র বা অজ্ঞাতচরিত্র পুরুষের সম্মুখীন হইবেন না। সঙ্কোচিতা হইতে রমণী পুরুষমাত্রকেই এক প্রকার সম্ভ্রম করেন, রমণী যে কথা মাকে বলিতে পারেন, সে কথা বাপকে বলিতে পারেন না, যে কথা প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীকে বলিতে পারেন, সে কথা প্রাপ্তবয়স্ক ভাইকে বলিতে পারেন না, কারণ পরস্পরের জাতীয় সম্ভ্রম, যখন একান্ত আত্মীয়দিগের নিকট জাতীয় সম্ভ্রম আবশ্যক, অমন অপরের নিকটে যে অবশ্য কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বড় দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঘোম্‌টা টান' ভগিনীদিগের মধ্যেও জাতীয় সম্ভ্রম বা সঙ্কোচিতার বিরোধী কথা শুনিতে হয়। বাসর জাগা ও তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপলক্ষে বঙ্গরমণীগণ যেরকম কুরুচির পরিচয় দেন, তাহা শুনিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়।[১]

লজ্জাশীলতার অনুরোধে বঙ্গরমণী জীবন বিসর্জন দিতেও কাতর হন না, আর লজ্জাশীলতার অন্তরায় স্বরূপ এই সকল কদাচার কি তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না? যতদিন না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও সুরক্ষিত হইতে পারিবে না। আর এক কথা, সঙ্কোচিতার অনুরোধে বঙ্গ রমণীর পরিচ্ছদের উৎকর্ষসাধন অবশ্য কর্তব্য। লজ্জশীলা রমণী তো পাতলা কাপড় পরিতেই পারেন না, কি( পুরু কাপড় হইলেও কেবল একখানি মাত্র সাড়ী বা ধুতী হইতে লজ্জা যন্ত্রণা রক্ষা হয় না। আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখে যাইতে হইলেও কত জড়সড় হইতে হয়। আমাদের এদেশ গ্রীষ্মপ্রদান দেশ, এদেশে রাশীকৃত বস্ত্রাদি পরিবার আবশ্যকতা হয় না; তবে লজ্জাশীলতার অনুরোধে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, কুমারী হউন, সধবা হউন আর বিধবাই হউন, একটী সেমিজ পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলেই চলে। ইহাতেও যাঁহাদিগের অসুবিধা বোধ হয়, তাঁহারা একটি পুরু লংক্লথের বা জিন সিটিনের বডি গায়ে রাখিতে পারেন। হাতা ছোট হইলে গৃহকার্য্যেও অসুবিধা হয় না, লজ্জাশীলতাও রক্ষা হয়, তবে যিনি পাতলা কাপড় পরিতে বাধ্য, তিনি সেমিজ না পরিলে তাঁহার কাপড় পরার উদ্দেশ্য বিফল হয়, একথা সকলের স্মরণীয়। এতদ্ভিন্ন বিকট উচ্চহাসি, চেঁচান প্রভৃতিও সঙ্কোচিতার অনুরোধে রমণীর পরিহার্য্য।

১ বামকুলহিতৈষী ডাক্তাব যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালিব মেয়েব নীতিশিক্ষা" পুস্তকে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা কবিয়াছেন, তাহা বঙ্গমহিলার অবশ্য পঠিত।

লজ্জাশীলতার তৃতীয় উপকরণ স্থিরতা—চাঞ্চল্য লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়. লজ্জাশীলা রমণী শান্তস্বভাবা। কথা, কার্য্য বা চিন্তা কোনও বিষয়ে তিনি স্থিরতা অতিক্রম করেন না। সহসা কাহাকে কটুবাক্য বলা, ঝগড়া করা, স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া এসকল চঞ্চল স্বভাবের লক্ষণ। শান্তস্বভাবা রমণী কখনও এরূপ কার্য্য করেন না। তিনি সহসা বিরক্ত বা উত্তেজিত হন না; তাঁহার কর্ত্তব্য, তিনি ধীরভাবেই পালন করেন।[১] এ জগতে মানব জীবন অসম্পূর্ণ—আদর্শ জীবন কচিৎ মিলে। সেই জন্য পরের কোনরূপ ত্রুটিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার করা মানব মাত্রেরই অকর্ত্তব্য, যে রমণী দাস দাসীদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন, শাশুড়ী, ননদ বা মাতাদিগের সহিত মুক্তকণ্ঠে বিবাদ কলহ করেন এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত সন্তানদিগের পিঠে মুক্তহস্তে চড় চাপড় প্রয়োগ করেন, তিনি কখনই শান্তস্বভাবা নহেন বা তাঁহার লজ্জাশীলতা উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তবে এজগতে "শাসন" কখনও দোষাবহ নহে। পারিবারিক জীবনে সুশাসনের বহুল প্রয়োজন। সেই জন্য রমণী যখন সন্তান বা দাস দাসীদিগের শাসনকর্ত্রী হইবেন, বিশেষ আবশ্যক হইলে রুক্ষ শাসনও প্রযোজ্য কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন স্থিরতার সীমা অতিক্রান্ত না হয়, যেন লজ্জাশীলতার হানি না হয়। শান্তস্বভাবা রমণী সুখদুঃখে একান্ত "আত্মহারা" হইয়া পড়েন না, সংসার তরঙ্গের বিক্ষোভে হাল্ দাঁড় ছাড়িয়া দেন না! সুখ দুঃখ স্থিরভাবে বহন করেন। তিনিও বীরমাতা মেরি ওয়াসিংটনের মত প্রাণাধিক পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ ও দেবোচিত যশ শুনিয়া পুলকে দিশাহারা হন না, ধীরে ধীরে সংবাদদাতা (মার্কুইস ডি লেফেট্) কে বলিতে পারেন, "জর্জ্জি খুব ভাল ছেলে, সে যে এ রকম কাজ করিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?" ধন্য মেরী ওয়াসিংটন! তুমি যে দেশের লোক হও না কেন, বঙ্গবাসিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত দেবীর স্থৈর্য্য তাহারা গ্রহণ করিবার যোগ্যা হয়। স্থিরতা লজ্জাশীলা রমণী কুলের অবশ্য গ্রহণীয়।

লজ্জাশীলতার চতুর্থ উপকরণ সহিষ্ণুতা—লোকে রমণী জাতির সহিষ্ণুতার সহিত মা বসুমতীর সহিষ্ণুতার তুলনা করিয়া থাকেন। পৃথিবী-মূর্ত্তি সহিষ্ণুতার আদর্শ। জগতে প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তাদি যাইতেছে আসিতেছে, ঝড় জল, বজ্রাঘাত, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত ঘটনা হইতেছে, মানবগণ আহার পানীয় বাসের আশয়ে প্রতি নিয়তই বসুধাবক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি বসুমতী জননী অকাতরে সকলই সহ্য করিতেছেন। এই জড় সহিষ্ণুতার ন্যায় জীবন্ত সহিষ্ণুতা রমণী হৃদয়ে সম্ভবে। যে জাতি মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা ও গৃহিণীরূপে নর নারীগণের পরিচর্য্যা করিতে নিরতা, সে জাতির সহিষ্ণুতা তো স্বাভাবিক সম্পত্তি, এই স্বাভাবিক সম্পত্তি হারা হইলে রমণী নিতান্ত দীনা হইয়া পড়েন। তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, যে কর্ণধার প্রবল তুফানে নৌকা রক্ষা করিতে পারেন তিনি যেরূপ প্রশংসনীয়, যে ব্যক্তি সংসারের ঘূর্ণাবর্তে নিজের সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে প্রাচীনা মহিলাগণ সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ, তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতার বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এমন কথাও শুনিয়াছি, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়া হইলেও আত্মীয়দিগের নিকটে সে কথা

১ অব্যবস্থিত চিত্ত বা বদমেজাজি, রমণীর বড় কলঙ্ক। তাহা চাঞ্চল্যেরই ফল।

প্রকাশ করিতেন না, গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেও স্বামী প্রভৃতির কর্ণগোচর করিতে দিতেন না, আমি এরূপ সহিষ্ণুতাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ভরসা করি বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সহিষ্ণুতা কেহই অলম্বন করিবেন না, প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতও বিষে পরিণত হয়, বাড়াবাড়ি সকল বিষয়েই অনর্থকর। তবে যেখানে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সেখানে অসহিষ্ণু হইলে রমণীর বড় নিন্দার কথা। কমলার জ্বর হইয়াছে, চিকিৎসাও হইতেছে; কিন্তু জ্বরের অনেক জ্বালা, মাথাব্যথা, গায়ের জ্বালা, হাত পা কামড়ানি ইত্যাদি; কমলা যদি ধীরভাবে এই যন্ত্রণাগুলি সহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতার গৌরব—তাঁহার লজ্জাশীলতার প্রশংসা; নচেৎ তিনি যদি অসহিষ্ণুতার জন্য "বাবারে, মারে গেলুম রে!" ইত্যাদি রবে চীৎকার করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি নিস্তেজ বলিতে হয় এবং লজ্জাশীলতারও ক্রটি অনুভূত হয়। এইরূপ গৃহকর্ম্ম, আত্মীয়গণের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখ বিপদ প্রভৃতি হইতে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়, ছোট বড় সকল বিষয়েই যিনি সহিষ্ণুতা-পরায়ণা, তাঁহার লজ্জাশীলতাই গৌরবান্বিত।

লজ্জাশীলতার পঞ্চম উপকরণ পবিত্রতা—আমরা এতক্ষণ যে সকল বৃত্তি ও শক্তির কথা বলিলাম, সেগুলি লজ্জাশীলতার অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসাদিস্বরূপ, আর পবিত্রতাই লজ্জাশীলতার প্রাণ। লজ্জাশীলতার মুখ্য উদ্দেশ্য পবিত্রতা। সেই জন্য পবিত্রতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইলেও লজ্জাশীলতার দারুণ অবনতি হয়। মন্দ চিন্তা করিলে, মন্দ পুস্তক পড়িলে, মন্দ কথা বলিলে এবং মন্দ লোকের সহিত বেড়াইলে মানুষ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়; এই সকল দোষের একটী মাত্রও চরিত্র স্পর্শ করিলে পবিত্রতার ক্ষতি হয়, পবিত্রতাহীন হইলে রমণী জীবন রাক্ষসী জীবনে পরিণত হয়, অতএব রমণী প্রাণপণ চেষ্টায় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। ফুলের গাছ অনেক যত্নে বাড়াইতে হয়, কাঁটা গাছ আপনা হইতেই বাড়ে। উদ্যান-রক্ষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে উৎপাটন করে। মানবের সদ্বৃত্তিগুলি এই ফুলের গাছের মত, সদ্বিষয় আলোচনা কর, সচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর, সজ্জনের সঙ্গ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই সাধুতা অভ্যাস হইবে, ফুল ফুটিয়া—সৎভাবে পারিজাত ফুটিয়া—তোমার হৃদয়কে নন্দন বন করিবে, অসদ্বৃত্তিগুলি কাঁটা গাছের মত, তাহাদের বিষয়ে মানব একটু অলস বা অন্যমনস্ক হইলেই তাহারা নন্দন বন কণ্টাকাকীর্ণ করিতে চায়, আমরা যদি বিবেককে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখি, যদি বিবেক আমাদের উদ্যানরক্ষক রূপে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, তাহা হইলে কাঁটা গাছগুলো আমাদের ফুল বনে কখনও জন্মিবে না; তাহারা যে উদ্দেশ্য জন্মিয়াছে, তাহাই সাধন করিবে[১], আমাদের পবিত্রতার বিকাশের পক্ষে বাধা দিতে পারিবে না। আত্মসংযম, সংযতেন্দ্রিয়তা ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফলই পবিত্রতা। একজন পুণ্যবান বা পুণ্যবতীর সহিত পাপাত্মা বা পাপীয়সীর তুলনায় কত দূর পার্থক্য অনুভূত হয়। আলোকে আঁধারে, ভালোবাসা হিংসায়, স্বর্গে ও নরকে যেরূপ প্রভেদ, ইহাদিগের পরস্পরেও সেইরূপ প্রভেদ! ইহার কারণ একজন পবিত্র অপরে অপবিত্র! একজন দেবতা আর একজন নারকী! এই পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

১ "নিকৃষ্ট বৃত্তি" অর্থে কার্য্যসাধিনী বৃত্তি। তবে ইহাদিগের দ্বারা যে মানবের ক্ষতি হয়, সে মানবের দোষে। একথা ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। প্র. লে.

আমরা এই স্বর্গীয় পদার্থকে হৃদয়ের হার করিতে শিখিব কবে?

পবিত্রতার অনুরোধে রমণী অপবিত্র চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন না। পবিত্রতার ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইবেন না। আমোদ-প্রমোদের সময় বয়স্যাদিগের প্রতি কোনও বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিবেন না। জগতে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের শত শত জিনিস আছে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দর শিল্প, সুরুচিসম্পন্ন সুমধুর কবিতা ও সঙ্গীতাদি, হাস্যরস পূর্ণ বিশুদ্ধ গল্প ও তামাসা, এই সকল হইতে লোকে যেরূপ প্রীত হন, তাঁহাদের হৃদয়ও সেইরূপ উন্নত হয়, তাই বলিতেছি দেশীয় ভগিনী এই সকল পবিত্র আমোদ উপভোগ করিয়া আপনার রুচি অধিকতর পবিত্র করিবেন।

পবিত্রতা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকি; কথা কি না ধর্ম্ম ও সত্য পবিত্রতার জীবনী। ধর্ম্মই পবিত্র, সত্যই পবিত্র, যিনি পবিত্রতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি ধর্ম্ম ও সত্যে আত্মসর্মপণ করিবেন, অধর্ম্ম ও অসত্যের নাম অপবিত্রতা, পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ পবিত্রতার সনাতন ক্ষেত্র, গৌতমী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী হইতে খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী পর্য্যন্ত পবিত্রপ্রাণা দেবীগণ এইখানে বিরাজ করিয়াছেন, ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই তাতে বড় দুঃখ ভাবি না, যদি ভারত কন্যার হৃদয়ে পবিত্রতা রত্ন—তাঁহাদিগের জাতীয় সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে এ সকল দুঃখেও সুখের বিষয় আছে, সৌভাগ্যও আছে! এ রূপ দুঃখই আমাদের প্রার্থনীয়।

পবিত্রতা হৃদয়োদ্যানে লজ্জাবতী লতা। লজ্জাবতী মানব-কর স্পর্শে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পবিত্রতা অপবিত্রতার বাতাস বহিলেই সেই রূপ সঙ্কুচিত হয়, পবিত্রতাকে স্বাভাবিক শক্তিতে বাড়িতে দেওয়াই রমণীর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, লজ্জাশীলতা জীবন্ত রূপে রমণী হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারিবে।

লজ্জাশীলতা রমণীর প্রথম শিক্ষণীয়, আগে রমণীকে লজ্জাশীলতা তার পরে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এ শিক্ষায় অর্থব্যয়ও করিতে হয় না, গুরুতর শ্রমও করিতে হয় না, জগদীশ্বর মানবহৃদয়ে যে নম্রতা, সঙ্কোচিতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা-পিপাসা দিয়াছেন, তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই মিলিয়া মিশিয়া রমণীর প্রধান অলঙ্কার লজ্জাশীলতারূপে পরিণত হয়। ইহার জন্যে আমাদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। লজ্জাশীলতা শিক্ষাকে "বিকল্পে" নীতিশিক্ষা বলা যায়।

শ্রীমাঃ।

ফাল্গুন ১২৯৮

## শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য

মাতার যত প্রকার কার্য্য আছে তন্মধ্যে সন্তানপালন সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর। সন্তানকে সমাজোপযোগী ও সর্ব্বগুণভূষিত করিয়া যিনি সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই ধন্য মাতা। শুধু স্নানাহার করাইয়া বড় করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে মাতার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না, তাহা ত পশুমাতা পক্ষিমাতাও করিয়া থাকে। শাবক আপনাকে যত দিন রক্ষা

করিতে না পারে, যত দিন খুঁটিয়া খাইতে না পারে, তত দিন মাতৃক্রোড় হইতে পরিত্যক্ত হয় না, কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ, সন্তানের প্রতি মনুষ্যমাতার অন্যান্য জীবের মাতার অপেক্ষা আরও অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আছে, তাই মনুষ্যমাতার সন্তানপালন অতি গুরুতর কার্য্য। কেন না যে সকল সন্তানের উপর ভাবী সমাজোন্নতি নির্ভর করিতেছে—যাহাদের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে শুভাশুভ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাদিগকে স্তন্য পান করাইয়া, বসন ভূষণাদিতে সুসজ্জিত করিয়া দিলেই মাতার কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত হইল না—ধাত্রীকরে অপর্ণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না, যেহেতু স্নান, আহার করান, ক্রোড়ে ধারণ করা, "বাবা, যাদু" বলিয়া সোহাগ করা, বহুমূল্যের বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে চেষ্টা করা, প্রহার করা, যমের বাড়ী যাইতে আদেশ দেওয়া ইত্যাদি ব্যতীত মাতার সন্তানের প্রতি দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য আছে, সেই দুইটী কর্ত্তব্য পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ যে একটী নহিলে অপরটী বৃথা বা মূল্যহীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসার হইয়া পড়ে। সেই দুইটী কর্ত্তব্য জানিয়াও যে মাতা সন্তানের প্রতি তাহা পালন করিতে উপেক্ষা করেন, সেই মাতা সন্তানের নিকট, সংসারের নিকট, সমাজের নিকট, ভগবান প্রজাপতির নিকট অবশ্যই অপরাধী। ঐ দুইটী কর্ত্তব্য কি, তাহা আমরা নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, শিশু আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানে না—আপনাকে আপনি বুঝে না, এ অবস্থায় মাতার ন্যায় স্নেহশীল ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত শিশু একদিনও বাঁচিতে পারে না, অতএব শিশুর স্বাস্থ্য মাতার হাতে। যদি কোন মাতা সংসারে কার্য্যের ব্যস্ততা বশতঃ সন্তানকে অনিয়মে অর্থাৎ অদ্য সকালে কল্য বিকালে, পরশ্ব দু-প্রহরে স্নানাহার করান, তাহা হইলে অবশ্যই মাতার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইল। "বৌটী অতিশয় ভদ্রলোক, দেখ সেই সকালবেলা ছেলেটী একবার কোলেও করে নাই।" প্রাচীনাগণের মুখে এই অচলা প্রশংসা শুনিবার জন্য তিনি সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্যপান না করাইয়া, রাত্রিতে বা সন্ধ্যার পর মূহুর্মুহু স্তন্যপান করান, তাঁহার প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছাকে ধিক! যিনি নিজের সন্তানটীকে একজন অসদ্বংশজা, অশিক্ষিতা, অসভ্যা, বেতন পাওয়ার কারণেই যে ছেলেটীকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য সেই ধাত্রীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া নিজের বেশ বিন্যাস করিবার ও অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে এমন কি বন্দোবস্ত করিলেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল? সন্তানকে নিজের নিকট সর্ব্বদা রাখা, অন্ততঃ শিশুর স্নান আহার ও তাহার শারীরিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে দিন যে সময়টুকু লাগে, সেই সময় পর্য্যন্ত শিশুকে নিজের তত্ত্বাবধনে রাখা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি নিজের টাকা ও গহনাগুলি অন্যের হস্তে দিয়া সে অপব্যবহার করিবে বা নষ্ট করিবে বলিয়া শঙ্কিত হও, তবে প্রাণাধিক সন্তানের পালন ভার অন্যের হস্তে দিয়া কি কিছুমাত্র শঙ্কা হয় না? রাগভরে সন্তানকে স্তন্যপান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় ও কিসে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে "ধাত্রীশিক্ষা" ও "মাতৃশিক্ষা" পাঠ করিলে মাতারা নিশ্চয়ই সাহায্য পাইতে পারেন। যাহা হউক শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে লেখিকা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও প্রসূতিগণকে শিশুর স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, তাহা জানিবার জন্য ও শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লজ্জিতা নহে। শিশুর বাহ্যে, প্রস্রাব, দুধতোলা ও কৃমিদোষ ইত্যাদির প্রতি মাতার সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশু-পালন জন্য "ভারতকামিনী"ও প্রসূতিদিগের বিশেষ

সাহায্য করিতে পারে। বালক বালিকাদের কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ মলের কাঠিন্য, দড়কা, প্রস্রাবের অস্বাভাবিক বর্ণ, কৃমিদোষ ইত্যাদি যে শিশুদিগের কি ক্ষতি করে এবং ওই সব রোগের টোটকা ঔষধ আর উক্ত রোগসমূহ হইতে প্রসূতিদের পূর্ব্বেই স্বাধীন হইবার উপায় উপরিউক্ত তিনখানি পুস্তকে সুন্দররূপে লিখিত আছে, তাই প্রসূতিগণ নভেল, নাটক ও উপন্যাসাদির স্থলে উক্তরূপ পুস্তকাদি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। শিশুদের পেট ভরিয়াছে, আর খাইতে চাহিতেছে না, কিন্তু জননী যে দুধটুকু বা যে ভাতগুলি খাওয়াবেন সংকল্প করিয়াছেন, শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুজুর ভয় দেখাইয়া বা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া উহা শিশুকে খাওয়ান নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। শিশু যাহা খাইতে পারে তাহা আপনিই ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খাইবে, অধিকন্তু মিষ্ট দ্রব্যাদি বালকেরা পেটে না ধরিলেও খাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করে না, কোথায় জননী তাহার ভরাপেটে কিছু না খাইতে দিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া আরও কিছু বাধ্য করিয়া খাওয়ান, ইহা কি নিতান্ত অনুচিত নহে? শিশুদের হাত পা নাড়িয়া, হামাগুড়ি দিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে দেওয়া উচিত; যতক্ষণ না তাহাদের কোন রকমে আঘাত পাইবার বা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের ঐরূপ খেলায় বাধা দেওয়া অনুচিত।

(ক্রমশঃ)

ভাদ্র ১২৯৯

## শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস। অভ্যাস একবার পাকিয়া দাঁড়াইলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। এই অভ্যাস পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতেই বোধ হয় পাকিয়া দাঁড়ায়, কেন না পণ্ডিতেরা বলেন, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ ॥" অভ্যাস পরিণত হইলেই উহা চরিত্র বলিয়া অভিহিত হয়। কেননা—Man is a bundle of habits অথবা, "Habit is second nature." অতএব সন্তানের অভ্যাসের দিকে মাতার তীব্রদৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সঞ্চালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বালক বালিকাগণ মাতার বাধ্য ও অনুগত থাকিবে ইহা অসম্ভব নহে। যদিও কন্যাগণ ঐ বয়সে শ্বশুরালয়ে থাকেন ও সন্তান-জননী হইয়া পড়েন, তবুও তখন মাতার স্নেহ ও মাতৃদত্ত শিক্ষাকে তাঁহারা সমধিক আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। মাতা সর্ব্বদা সন্তানের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন, অধিক, অনাবশ্যক আদর বা সোহাগ তাহাদের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত নহে। কোনও অপরাধ করলে দুমদাম করিয়া প্রহার ও ঝড় বৃষ্টির মত গালি বর্ষণ করিয়া শিশুদিগকে উক্ত্যক্ত করিয়া ক্রোধ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, বরং ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তাহাদের প্রিয় বস্তু হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে ও মিষ্ট কথায় উপদেশ দিলে বিশেষ ফল লাভ করা যায়। শিশু দুরন্ত হইলে মাতা

সর্ব্বদা যেন তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা না করেন। উহা করিলে শিশুর দুইটী বিষয়ে বড়ই অপকার করা হয়, প্রথমতঃ ঐ দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি তাহার ব্যায়াম; দ্বিতীয়তঃ তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাহস, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া সংকুচিত হইয়া যায়। শিশু দৌড়াদৌড়ি ক্রীড়াকূর্দ্দন করুক, কিন্তু মাতার চক্ষু যেন পাহারা দেয় যাহাতে তাহার আঘাত না লাগে কিম্বা যাহাতে সে অন্যকে আঘাত না করে। এইরূপে তাহারা যে কোন কার্য্য করুক প্রথমে তাহাদিগকে বাধা না দিয়া উৎসাহ দিবেন, আর মন্দ কার্য্য করিতে দেখিলে বাধা দিবেন। বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না ঐ কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিয়া সেরূপ কার্য্য আর যাহাতে না করে সে বিষয়ে উত্তমরূপে উপদেশ দিবেন, আর জননীও সেরূপ কার্য্য কখনও সন্তানগণ সমক্ষে করিবেন না, মাতৃ চরিত্রের প্রতিবিম্ব সন্তান চরিত্রে প্রায়ই প্রতিফলিতা হইয়া থাকে, অতএব যিনি সুসন্তান কামনা করেন, তাঁহার নিজে অগ্রে সর্ব্বগুণভূষিত হওয়া চাই, কেন না যাহার মাতা পিতা ও শিক্ষক অসচ্চরিত্র হয়েন, সেই সন্তান কখনই সচ্চরিত্র হইতে পারে না। মাতা সর্ব্বদা মন্দ কার্য্য সমূহে শিশুর ঘৃণা ও সৎকার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবেন, সন্তানকে ননীর পুতুল জ্ঞান না করিয়া তাহাকে মনুষ্য জানিয়া মনুষ্যোচিত কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবেন, সন্তানকে অলস অবস্থায় কখনও থাকিতে দিবেন না। আলস্য রোগের ন্যায় মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে, সন্তানকে সৌখিন হইতে দেওয়াও ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শিশুগণ মাতা কর্ত্তৃক যেন বাল্যাবধিই যথোপযুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করে অর্থাৎ উহাতে যেন শিশুদের রুচি জন্মে। আমি একটী একাদশ মাসের শিশুকে দেখিয়াছি সে তাহার দুধ খাইবার সময় হইলে, যেখানে দুধ থাকিত, সেইখানে হামাগুড়ি দিয়া যাইত, এবং মাতা যতক্ষণ আসন না দিতেন, ততক্ষণ বসিত না এবং কাষ্ঠাসন ধরিয়া টানাটানি করিত। মাতা পিঁড়ী দিলে তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করিত এবং পানান্তে দুইখানি হস্ত উঁচু করিয়া মাতার দিকে দৃষ্টি করিত। মাতা যতক্ষণ গামছা আনিয়া তাহার হাত মুখ না মুছাইয়া দিতেন, ততক্ষণ শিশু ঐ অবস্থায় থাকিত। ইহা অবশ্যই মাতার গুণ সন্দেহ নাই। এই প্রকৃতি আরও দুইটী সন্তান আছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু একটী দিনও তাহাদের হাতে পায়ে ধূলা-কাদা দেখি নাই এবং, বিকালে খেলার পর তাহারা আপনা আপনিই গামছা ভিজাইয়া গাত্র মুছিত, পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিত, ইহারা ৪ বৎসর বয়স অতীত হইলে; স্নান করা, গা মুছা, জুতা পায় দেওয়া, কাপড় জামা পরার জন্য আর মাতার সাহায্য গ্রহণ করে না। অতএব মাতা যাহা অভ্যাস করান, তাহাই সন্তানের চরিত্র। বালকবালিকাদিগকে সময় সময় খেলিতে বা নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতে না দিয়া সর্ব্বদা পড়াইবার, শেখাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া পুস্তক ও কালি কলম যমের তুল্য দেখে, মাতাও তাহাদের নিকট ভক্তির পাত্রী না হইয়া কেবল ভয়ের চক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। লেখা পড়া শিক্ষার উপকারিতা এবং উহা শিখিলে অনেক ভাল ভাল বিষয় জানা যায় ইত্যাদি মাতা প্রথমে সন্তানের নিকট সময়মত বলিবেন, শিশুর পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পড়া করা হইয়াছে, দেখিলে তাহাকে উৎসাহ দিবেন, শিশু যদি নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মাতা নিজে তাহাকে যথার্থ যাহা দিতে পারেন সেই বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া শিশুকে পাঠে মনোনিবিষ্ট করাইবেন। পাঠ সমাপ্ত করিলে তাহাকে প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান করা

কর্ত্তব্য, উহা না দিলে শিশুর কোমলান্তঃকরণে অবিশ্বাসের, মিথ্যার, জননীর বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করার বীজ রোপণ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

আশ্বিন ১২৯৯

## শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিশুদের যখন কথা বলিবার শক্তি জন্মে, তখন শিশু আধ আধ বোলে জননীর নিকট "মা! এটা কি, ওটা কি?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকে। সে সময় মাতা ঐ বস্তুর যথার্থ নাম ও বিষয় গোপন করিয়া শিশুর কৌতুক জন্মাইবার জন্য কোনও কাল্পনিক বিষয়ের উল্লেখ করিবেন না, কিম্বা "কি জানি বাপু! আমি তোমার সহিত আর বকিতে পারি না" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। শিশু যদি সান্ধ্য মেঘের লোহিত বর্ণ দর্শন করিয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করে "মা, ওটা কি?" মাতার উচিত, "বুড়ি সিন্দুর মেলিয়া দিয়াছে" না বলিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাই মেঘ লাল হইয়াছে" বলা। শিশুদের নিকট মন্দ বিষয় গোপন করিয়া কেবল ভাল বিষয় সর্ব্বদা বলাও উচিত নহে, কেননা সংসারে যখন ভাল মন্দ দুই আছে, আর শিশুগণও সেই সংসারক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, তখন একদিন না একদিন মন্দকে জানিতে পারিবে; তখন সেই মন্দের ফল না জানিয়া হয়ত উহাতে লিপ্ত হইবে, তজ্জন্য যেটি মন্দ কার্য্য তাহার বিষয় গোপন না করিয়া উহার অল্পকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ঐ কার্য্যের প্রতি শিশুর ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। এক কথায় যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, এমন সমস্ত কার্য্যে সন্তানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া মাতার উচিত, কুসঙ্গ হইতে সন্তানকে দূরে রাখাও মাতার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। যে বালক কুসংসর্গে থাকে, তাহাকে উপদেশ দাও, প্রিয় বস্তু দাও, মিষ্ট বাক্য বল, আর গালি দাও, প্রহার কর, বা অন্যান্য প্রকার শাস্তি দাও, কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিবে না। শাস্তি ও উপদেশের ফল ক্ষণস্থায়ী; তাহাকে আবার ঐ কুসঙ্গ ধরিবে, অমনি উহা চলিয়া যাইবে।

কার্ত্তিক ১২৯৯

# হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম

## বামাগণের রচনা

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের গৃহাশ্রম যে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ ইহা বিবাগী আর্য্য ঋষিগণও স্বীকার করিয়াছেন, শ্লোকটি ইহার প্রমাণ—

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিনো জ্ঞানেনান্বেন চান্বহম
গৃহস্থৈনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ [য.]

কিন্তু এই গৃহাশ্রমে নারীই পুরুষের প্রধান সহায় সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্মে নারীর অধিকার পুরুষের সহিত সমানভাবেই বিস্তৃত। সেইজন্য স্ত্রীর গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক, না করিলে বানরের হস্তে বহুমূল্য হীরক প্রদান করিলে তাহা যেরূপ ব্যবহৃত হয় গৃহধর্ম্মে অনভিজ্ঞা রমণীর হস্তেও পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেইরূপ ব্যবহৃত হয়। অতএব গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা ও উহা পালন করা রমণীর জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষা শৈশবে পিতৃগৃহে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা বিলাসের কুসুম শয্যা নহে, সখের পুতুল সাজান নহে— সোহাগের গোলাপটি নহে, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার লীলাক্ষেত্র নহে এবং বাসনা পূরণের চাতুর্য্য নহে। উহা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই কয়েকটি উপদেশের উপর নির্ভর করিতেছে—

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেস্য প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যাশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বস্ব ॥
গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং তত।
সুস্নাতা যুদ্ধবেশাচ প্রবিযেৎ সুরমন্দিরম ॥
শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পতুর্হিতার্থিনী ॥
পাকযজ্ঞাং পুনির্বত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন
পতি পুত্রাতিহীন ভৃত্যানন্যান পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপাণীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙাক্তে সুখ্যাং সতী ॥ [য.]

এই সারগর্ভ উপদেশ কয়েকটির উপর গার্হস্থ্যধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিণামদর্শিতা ও আনুভাব গ্রাহিতাশক্তি পরিচালনা করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি সাহায্যে প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও অলোভ দ্বারা হিন্দু নারীকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তাহাকে পারিবারিক সুখের জন্য সাধারণের হিতের জন্য সর্ব্বপ্রকার আশ্রমীর জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে কেননা—

যথা বায়ুসংসমত্রি বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তোঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥ [য.]

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাহাতে যে কর্ম্মগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলে যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহাতে শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দুনারীগণ যদি গৃহকার্য্যে অশিক্ষিতা হইয়া বি. এ., এম. এ. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, যদি ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ, কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, সেক্‌সপিয়র বায়রণ, সেলি, স্কট, পোপ ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থগুলি জলের মত আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন, জ্যামিতির অনুশীলনগুলি এক মিনিটের মধ্যে কসিয়া দিতে পারেন—যদি অঙ্কশাস্ত্রে লীলাবতী ও জ্যোতিষে খনার জ্ঞান লাভ করেন, এবং বররুচি গ্যালিলীয় নিউটন প্রভৃতিকে পরাস্ত

করিতে পারেন—অদ্ভুত বিজ্ঞান রহস্যগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারেন, যদি সঙ্গীত বিদ্যাদিতে দেবী সরস্বতীকে পরাভূত করিতে পারেন আর গৃহধর্ম্ম কর্ম্মের কোন ধার না ধারেন, তাহা হইলে তবুও আমরা তাঁহাদের শিক্ষার অপূর্ণতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা না হইলে গৃহধর্ম্ম পালন করা বড়ই কঠিন। সুতরাং শৈশব হইতেই হিন্দু নারীগণের ঈশ্বর ভক্তির সহিত সুনীতি ও গৃহকার্য্য শিক্ষা করা উচিত। হিন্দু নারী যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবেন। ঈশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মে রত এই কথাটি স্মরণে রাখিবেন, তাহা হইলে তিনি সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যগুলিও পালন করিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অতি নীরস হইলেও উহা ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করা রমণীর কর্ত্তব্য। এইরূপে দুর্ব্বল কোমল হৃদয়া রমণীগণ ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হৃদয়ে বল আনয়ন করিয়া কর্ত্তব্যের উর্ব্বর ভূমিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন। আমার অন্তর্জগতের কার্য্যগুলি ঈশ্বর সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন, সর্ব্বদা মনে এইরূপ ভাব থাকিলে, অন্যায় কার্য্য করিতে কোন মতে লোকের সাহস হইতে পারে না (অবশ্যই বিশ্বাসী ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিগণের) গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আপনাকে উত্তমরূপে গঠন করা আবশ্যক, আত্মগঠন না করিলে এই ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইতে পারে না। সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ক্রোধ, আলস্য, বিলাসিতা, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিবে। লেখাপড়া শিক্ষা দ্বারা মনকে সমুন্নত, সংসারের আয় ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব রাখিয়া কার্য্য করা বালক বালিকাদিগকে পাঠাভ্যাস করানও ইহাতে চলিতে পারে, সুতরাং লেখাপড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিলে অনেক সময়ে নিজের ও সংসারের উপকার হইতে পারে। যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও কঠোর কর্ত্তব্যগুলি পালন করা উচিত, তেমনি সেই ইচ্ছাকেও বিবেক দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনের অসৎ প্রবৃত্তিগুলি উন্মূলিত না করিতে পারিলে আপনাকে বশে আনিয়াছ মনে করিও না, কারণ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নিশ্চয় ছিদ্র পাইলেই কার্য্যের সহিত যোগ দিতে ছাড়িবে না। সর্ব্বভূতে দয়া করাই ধর্ম। সর্ব্ব জীবের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করাই স্নেহ। সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন করাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতিথি, অভ্যাগত পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের সুখ সাধন করাই হিন্দু রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম। গৃহে অন্নের অভাব হইলেও অতিথি অভ্যাগতের প্রতি আদর যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা—

"তুনানি ভূমিরুদা যাকচতুর্থাচ সুনৃতী।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছন্দ্যান্ত কদাচন ॥ [য.]

যখন অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র কুটুম্ব, পরিজনগণের তৃপ্তি সাধন করাই রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ পাক কার্য্যটীতে তাঁহাকে সুদক্ষা ও নিরলসা হওয়া চাই, নতুবা কখনই তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন না। কেননা আহার, সুনৃত বচন ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই সর্ব্বজীবের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে পাক করিতে না জানিলে বা না করিলে হয়ত আহারে কাহারও তৃপ্তি লাভ নাও হইতে পারে, সেজন্য পাকের ভারটা রমণীগণ নিজে নিজে বহন করিলে ভাল হয়। কোন পরিবারের মধ্যে ঠাকুর বা বামুনদিদির উপর পাকের ভার দিলে অনেক সময় অসুবিধা হইয়া থাকে। ঠাকুর বা বামুনদিদি বেতন লইয়া পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, সুতরাং

বেতনটার উপর যত যত্ন থাকিবে রসুইটির প্রতি ততটা যত্ন থাকা সম্ভব নহে। কেননা তাঁহাদের রসুই করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বেতন পাওয়া। ঠাকুর বা বামুনদিদি ভাল রসুই করেন না। একথা আমরা অনেক পরিবারের মুখে শুনিয়া থাকি এবং কোন কোন গৃহিণী সে কারণ বাবুর জন্য নিজে পৃথক রসুই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্যক পালন করা হয় না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রমণীগণের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পারিবারিক সুখের জন্য—অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্বদিগের জন্য। একদিন কোন গৃহস্থের বাটীতে একটি দুঃখিনী রমণী তাহার ক্ষুধা-কাতরা বালিকার জন্য একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করায় গৃহিণী "ঠাকুর, ঠাকুর" করিয়া ডাকিতে থাকিলে ঠাকুর রসুই ঘর হইতে উত্তর প্রদান করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ঐ বালিকাটিকে চারটি ভাত দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "এখন ভাত কোথা পাব, একজনের মাত্র ভাত আছে। সুতরাং ভাত দেওয়া হইবে না।" গৃহিণী নীরব, আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি একজনের ভাত আছে তবে তাহা হইতে এক মুঠা ভাত এই বালিকাটিকে দেওয়া হইল না কেন? যাঁহার ভাত তাঁহার কম হইলে ঠাকুর আর চারটি ভাত চড়াইলেও তো পারিতেন।" গৃহিণী বলিলেন "ঠাকুরকে তাহা বলিতে আমার সাহস হয় না, অতিথি অভ্যাগতের ভাত রাঁধিতে বলিলে ঠাকুর চটিয়া বলেন যে, আমার ৪ টাকা বেতনে এতগুলি লোকের ভাত রাঁধাই ঠকা, তাহাতে আবার উপরি লোকের ভাত রাঁধিতে হইলে এ কার্য্য আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে গৃহিণী যদি নিজে রসুই করিতে জানিতেন ও নিজে রসুই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি, পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনগণকে মন্দ রান্না খাইতে হইত না। দুঃখিনী বালিকাটিও একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়া হতাশ চিত্তে তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত না। এ কারণে রসুই কার্য্যের ভার গৃহিণী নিজে লইলে বড়ই সুখের হয়। এখন ২০ টাকা বেতনের কেরাণী যিনি তাঁহার স্ত্রীরও একটি রসুয়ে নাহলে চলে না, কিন্তু হিন্দু মহিলা মহানুভবা দ্রৌপদী দেবী সম্রাজ্ঞী হইয়াও পাক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং পাক কার্য্যকে তিনি নিষ্কার্য্য মনে না করিয়া যত্নের ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন, কথিত আছে যতক্ষণ দ্রৌপদী দেবী আহার না করিতেন, ততক্ষণ গৃহের অন্ন ব্যঞ্জন অক্ষয় থাকিত। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে ইহাতে তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সর্ব্বশেষে আহার করা এই তাৎপর্য্যটী গ্রহণ করিতে পারি। অর্থাৎ আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন অভ্যাগত আসিলে তাঁহার নিজের অন্নগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার রসুই করিতেন এবং আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে নিজে আহার করিতেন ও তাঁহার আহারের পর আর অন্ন ব্যঞ্জন থাকিত না। বনে অবস্থান কালেও দ্রৌপদী উক্তরূপে সুন্দর গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। বনবাসী পাণ্ডবালয়ে দুর্ব্বাসার সশিষ্যে ভোজনের বিষয়ে হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য। মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে যদিও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী যুবা সূপকারগণ পরম যতনে উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিত, কিন্তু দ্রৌপদী দেবী তখনও সকলের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে আহার করিতেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহিণীটি যদি বাবুর সহিত দশটার সময় আহার না করিতেন, তাহা হইলে দুঃখিনী বালিকাটিকে নিজের ভক্ষ্য অন্ন হইতেও কিছু অন্ন দিতে পারিতেন। ধিক আমাদের বিলাসিতায়—ধিক আমাদের সুখে—ততোধিক ধিক এখানকার ইংরেজ অনুকারী বাবুদের, তাঁহারা যত পারেন ইংরেজের গুণগুলি ত্যাগ

করিয়া দোষগুলির অনুকরণ করিয়া সাহেব হউন, কিন্তু স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" [য.] এই সম্মানটুকু আর্য্য ঋষিগণ আমাদের যে গুণের আদর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই গুণের মাথা যে বাবুরা খাইতে বসিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখ।

(ক্রমশঃ)

কার্ত্তিক ১৩০১

# হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রমণীগণের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সংসারের কার্য্যকলাপ যাহাতে সুশৃঙ্খল হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অবস্থা যাঁহার যেরূপই হউক না কেন নারী যদি গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্ম পরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে কুটীরও গৃহস্থ আলয় হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই মনে হয় "ন গৃহম গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে", এই বাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। গৃহের জিনিস পত্রাদি সুশৃঙ্খল ও পরিস্কার রূপে রক্ষা করা, যখন যে জিনিষ আবশ্যক হয় তখন তাহা ঠিক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া, গৃহ প্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখা এবং প্রাতে ছড়া ঝাঁট দেওয়া বিশেষ আবশ্যক, কেন না সমস্ত দিবস ও রাত্রির প্রস্রাব এঁটো বালক বালিকাগণের মলত্যাগাদির স্থান হইতে যে দুর্গন্ধ জন্মে টাটকা গোময় জলে গুলিয়া প্রাঙ্গণ আস্তাকুঁড় ও পথাদিতে ছড়া দিলে সেই দুর্গন্ধ সকল বিনষ্ট হয়। (কিন্তু এখন আর গৃহিণীগণ এ সকল কার্য্যে মনোযোগ করেন না, বাবুদের বাবুগিরির ঢেউ অন্তঃপুরে লাগিয়াছে, তাই স্ত্রীগণের বাবুগিরি, বিলাসিতা, সৌখিনতা ও শ্রমকাতরতা দর্শন করিলে প্রাণে এক প্রকার হতাশার ছায়া পড়িয়া ক্ষোভ কালিমায় হৃদয় কলুষিত এবং জীবনটাকে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ করিয়া ফেলে।) সন্ধ্যার সময় ঝি এক একটী আলো সকল ঘরে দিয়া গেল, আলো দিতে বিলম্ব হইলে ঝি! "আলো দিয়া যা" এই চিৎকার গৃহিণীর চরম চেষ্টা হওয়া উচিত নহে, সন্ধ্যা হইলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা গন্ধক ও ধূনার ধূয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে যদি মশক, আরসুলা, চামচিকা প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে আলো ও ধোঁয়ায় তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং গৃহের দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। গৃহে রসুয়ে ও চাকর চাকরাণী রাখাই দোষের, একথা আমরা অবশ্যই বলিতেছি না। আপনারা ন্যায্য খরচ চালাইয়া আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণে কোন কষ্ট না দিয়া, অতিথি ও দীন বাঙালীকে তাহাদের প্রার্থিত এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করিয়া, পারেন তো চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখুন, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা ও অযত্ন করে কিংবা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে নিজেই গৃহকার্য্যাদি করা ভাল। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রী পরিজনগণ গৃহ কার্য্যে সাহায্য করিবেন। আর যদি গৃহধর্ম্ম পালনোপযোগী ব্যয় কুলাইয়া চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখিতে পারেন ও তাহারা আপনার ও পরিজনগণের মনোনীত হয় তাহা হইলেও বসিয়া শুইয়া তাস খেলিয়া গল্প করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। বড়ি, কাসিজ

সেমীজ কম্ফর্টার, তোয়ালে, গামছা, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, লেপ, তোষক, গদি, উপাধান ও তাহার আবরণ এবং ছেলেদের পোষাক প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া সেলাইয়ের কল, সূচি ও কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত করিলে সব মায়ের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। ঈশ্বর না করুন রমণী বিধবা হইয়া দুরবস্থায় পড়িলে অর্থের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে, সেই সময় নানাবিধ কার্য্য দ্বারা রমণীগণ স্বচ্ছন্দে নিজ জীবিকার উপায় করিতে পারেন, এ কার্য্য অনিন্দিত ও হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। যাঁহারা রসুয়ে নহিলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ অথবা প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া রন্ধনের কষ্ট লইতে অস্বীকৃত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। বিড়ালে খাওয়া, কুক্কুরে খাওয়া, কাকে ঠোকরান, মনুষ্যশূন্য ঘরে অধিকক্ষণ আলগা থাকা খাদ্যের তাপ বাহির হইতে না পারিয়া ঢাকুনি ঘামিয়া পড়া জিনিষ, ডেয়ো পিপীলিকা লাগা ও অপরিষ্কার খাদ্য কি আত্মীয় পরিবার, কি অতিথি কি চাকর চাকরাণী কাহাকেও খাইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশুদ্ধ জল বায়ু মনুষ্যের জীবনের ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ব্যবহারের জলটা যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। জল বিশুদ্ধ করার কয়েকটি সহজ উপায় আছে। (১) উচ্চ ছাদে পরিষ্কার গামলা ও জালা পাতিয়া রাখিলে যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা বিশুদ্ধ জল। বৃষ্টি কালে প্রাঙ্গণে চারিখানি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে একখানি কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়ের ঠিক মধ্যস্থলে একটি নুড়ি রাখিয়া দিবে এবং তাহার নীচে উচ্চ একখানি জলচৌকি বা টুলের উপর খড়ের বিড়া পাতিয়া তদুপরি কলসী বা গামলা বসাইয়া দিলে বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, কিন্তু এই জল অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যায় না, কারণ অধিকদিন হইলে পোকা জন্মে। জলে প্রথম যখন পোকা জন্মে তখন সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষুর অগোচর, অনুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে অনুবীক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু তবুও ঐ পোকা দেখিবার একটি সহজ উপায় আছে, সে উপায়টি এই, নির্বাত বা অল্প বায়ুযুক্ত স্থানে একটি পরিষ্কার কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ঢালিয়া টেবিলের উপর অথবা কোন উচ্চ ও আলোক যুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে যখন জলটা বেশ স্থির হইবে, সেই সময়ে যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ঐ জলের উপর নীচে ভাসিয়া ভাসিয়া নড়িয়া বেড়ায় তাহা হইলে জানা যায় পোকা জলে জন্মিয়াছে। যদিও ঐ ক্ষুদ্র পোকাগুলি জলের ময়লার ন্যায় দেখায়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে পাত্রস্থ জল স্থির হইলে ময়লা জলের নীচে পড়া সম্ভব, নীচে উপর নড়িয়া বেড়াইবে কেন? যখন জানা যাইবে যে জলে ঐরূপ পোকা জন্মিয়াছে তখন স্নান পান ও রসুই করিবার জন্য আর সে জল ব্যবহার করিবে না। (২) জলে ফটকিরি দিলে জল পরিষ্কার হয় এবং নির্ম্মলা ঘসিয়া দিলেও জল পরিষ্কার হয়। (৩) ফিল্টার—ফিল্টার ক্রয় করিবার সুবিধা না হইলে বাটীতে কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে জল ফিল্‌টার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিরূপে ইহাতে জল বিশুদ্ধ করা হয়, তাহা বোধ হয় এখন অনেক গৃহস্থই জানেন। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য। গৃহিণীর লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্যক এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব নভেল নাটকের পরিবর্ত্তে 'শরীর পালন' 'স্বাস্থ্যরক্ষা' 'ধাত্রীশিক্ষা' এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকগুলি মনোযোগের সহিত গৃহিণী পাঠ করিয়া যাহাতে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহার যথাসাধ্য করিবেন ও ধাত্রীশিক্ষা লিখিত ঔষধগুলি আনাইয়া গৃহে রাখিবেন। এইরূপে যাহা কিছু সংসারের আবশ্যক লাগে, তাহা যত্নে সংগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত ও হৃষ্টান্তঃকরণে

গৃহকার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন এবং আয়োচিত ব্যয় করিবেন, হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ইহাই রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন—যথা "সদা প্রহৃষ্টয়া ভার্য্যে গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। সুসংস্কৃতো পস্করয়া ব্যয়েতামুক্তহস্তয়া"। [য.]

ঈশ্বরের নীচেই স্বামী রমণীগণের আরাধ্য ও প্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের প্রধান সহায় স্বামী। স্ত্রী ও স্বামী উভয় মিলনের মহান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম চর্য্যার জন্য পবিত্র বিবাহ বন্ধন আবশ্যক। হিন্দুর বিবাহ যে কেবল মাত্র ধর্ম্মমূলক তাহা "কুমারসম্ভব" কাব্যে সপ্তম সর্গর "বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষবৎসে। বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী। মিতেন ভর্ত্তা হ সহ ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি ॥" [য.] এই শ্লোকটি পাঠে জানা যায় এবং অন্যান্য প্রমাণও আছে কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ বৃদ্ধি ইহবার সম্ভাবনা। যাহা হউক "নারায়ণাৎ পরাং কান্ত ধ্যায়তে সততং সতী। তদাভাবরহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন॥"[য.] এই কথাটি স্মরণে রাখিয়া সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা রমণীর কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব নাই, সে গৃহ ত শ্মশান হইতেও ভীষণ। তাহাতে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিসের? পতি যদি অসচ্চরিত্র পতিকে সচ্চরিত্র করাই সেই রমণীর কর্ত্তব্য, কেননা "সংস্মরন্তমপিপ্রত্যং বিষয়েষ্বেক পাতিম্। ভার্য্যাবাপ্নের্তি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥ ব্যালগ্রহী যথা ব্যালং বিলদুদ্ধরতে বলাৎ। তৎদদ্ভর্ত্তারমাদায় তে নৈব সহ মোদতে"।[য.] স্বামীকে ভোজ্য ভক্ষ্য পেয় সরল ব্যবহার অকপট প্রণয় ও সুমিষ্ট বচন দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে এবং ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবে, স্বামীর সুখ নিজের সুখ, স্বামীর নিন্দা নিজের নিন্দা ও স্বামীর মঙ্গল নিজের মঙ্গল বলিয়া মনে করিবে। নিজের জন্য পতিকে কখন কায়মনোবাক্য ক্লেশ প্রদান করিবে না। পতি যাহাতে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়েন তেমন কার্য্যে পতিকে নিযুক্ত করিবে না। পতির সৎকার্য্যের সহকারিণী হইবে, অকারণে সর্ব্বদা নিজের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার সমুচিত চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার ব্যাঘাত জন্মাইবে না, নিজে সর্ব্বদাই পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান পতি ভালবাসা হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে, কিন্তু পতি যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্যগুলি যত্নের সহিত পালন করিয়া অবসর মত তোমাকে ভালবাসেন তাহার চেষ্টা করিবে। বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'রাজা ও রাণী'তে এ বিষয়ে দুইটি স্ত্রী চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, ঐ দুই স্ত্রী চরিত্র হিন্দু রমণীগণের অনুকরণীয়। ইলা একস্থলে কুমারকে বলিতেছেন—আমি দিবানিশি তোমায় ভালবাসিব, তুমি অবসর মত বাসিও, আমি সারানিশি তোমার লাগিয়া হেথায় বসিয়া রহিব, তুমি অবসর মত আসিও। হেথায় বসিয়া থাকার অর্থ হৃদয় সর্বক্ষণ তব ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। এইরূপ পতিভক্তিই প্রকৃত পতিভক্তি ইহাই প্রকৃত পতিব্রতার ধর্ম্ম। পুরুষের সংসারে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া দশদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার পথে বিচরণ করিলে, দশ দশা বহিবার জন্য মস্তক পাতিয়া থাকিলে, তবে ত পৌরুষ।

কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা রমণীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চিন্তাকে স্বাধীনভাবে চারিদিকে বিচরণ করিতে না দিলে বিশ্বে প্রেম বিস্তৃত করিতে না দিলে তিনি ত স্ত্রৈণ নামে অভিহিত হইবেনই। আরও তাঁহার মাতাকে পুত্র প্রসবিনী না বলিয়া মাংস পিণ্ড প্রসবিনী অথবা বন্ধ্যা বলিলেও ক্ষোভ মিটিবে না, সুতরাং স্বামীকে নাক ফোঁড়া বলদ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়তা করাও কর্ত্তব্য। কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া রমণীর কর্ত্তব্য। উক্ত গ্রন্থের নায়িকা রাণী সুমিত্রার স্বামী রাজা বিক্রম দেব স্ত্রৈণ্যতা পরবশ হইয়া

যখন স্বীয় কর্ত্তব্য রাজ্যপালন পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেন, তখন রাণী সুমিত্রা বড়ই ব্যথিত হৃদয় হইতেন। বাস্তবিক সংসারের প্রিয়তম বস্তুতে কোনও খুঁত আছে জানিতে পারিলে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হয় এবং সেই খুঁত নিখুঁত করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাই রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রম দেবকে তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—রাজ্যে অরাজকতাজনিত অনাহারী ও অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন স্ত্রৈণ রাজার জ্ঞানোদয় হইল না, বরং উহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন সুমিত্রা দেবী মনে ভাবিলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তর না হইলে রাজা স্বকর্ম্মে মনোযোগ দিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি গোপনে ছদ্মবেশে পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সুমিত্রা স্বামীকে ভাল বাসিতেন না, সুমিত্রার ভালবাসা সাধারণ রমণীগণের ভালবাসা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সুমিত্রা পতি বিরহিতা হইয়া পতির বিরাগভাজন হইবার ভয় না করিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্যপথে লইবার জন্য পাগল। এইরূপ কার্যই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। অতএব স্বামীর কর্ত্তব্যপথের কন্টক হওয়া কখনই সহধর্ম্মিণীর উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণ ১৩০১

## হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম
### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দাসদাসীগণকে পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের সহিত ইয়ারকি দেওয়া বা পরিহাসাদি করা কর্ত্তব্য নহে এবং তাহারা যেখানে হাস্য পরিহাস ও গল্পগাছা করে, তথায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের পীড়া হইলে চিকিৎসা করাইবে—চিকিৎসককে টাকা দিবে এবং পীড়িতের শুশ্রূষা করিবে। রোগী ভাল হইলে যদি তোমার আর্থিক অভাব থাকে, তবে না হয় তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লইবে। কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা গেলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তাহাকে মনোনীত না হইলে জবাব দেওয়া ভাল, কিন্তু গালি গালাজ দেওয়া উচিত নহে। গৃহে কোন উপাদেয় খ্যাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে অন্যান্য পরিবারগণের ন্যায় উহাদিগকেও দেওয়া উচিত। গৃহিণীর নিকট মাতার ন্যায় স্নেহ ও শাসন প্রাপ্ত হইলে উহারাও সন্তানের ন্যায় ভক্তি ও ভয় করিয়া গৃহের কার্য্যগুলি নিজের কার্য্যের ন্যায় মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিবে এবং ঐ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিবে না।

গাভীগণ হিন্দুদিগের মাতার ন্যায় পূজ্যা। আমরা ইহার অর্থ যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহা এই যে গাভীদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধের ন্যায় মনুষ্যশরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। যে সকল শিশু অন্ন

অথবা তদ্রূপ কোন জিনিষ ভক্ষণ করিতে পারে না এবং যে শিশুগণ স্তন্যে বঞ্চিত, গাভীদুগ্ধে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্য কিছু আহার না করিয়াও এক গাভীদুগ্ধে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন যাগযজ্ঞ হোম বিবাহদি ক্রিয়াকলাপে গাভীদুগ্ধ ও ঘৃত একটি প্রধান সামগ্রী। এমন উপকারিণী গাভীকে মাতৃস্থানীয়া ধরিয়া হিন্দুগণ কেমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। গাভীগণ অতি নিরীহ স্বভাব এবং উদ্ভিদ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করে—হিংসা প্রবৃত্তি ইহাদের আদৌ নাই। সুতরাং এই সুন্দর স্বভাবাপন্ন জীবকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুগণ কুণ্ঠিত হইবেন? গাভীর বিষ্ঠা মূত্রও গৃহস্থের অনেক উপকারে আইসে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মপরায়ণা গৃহিণীগণ এই গাভীকে অতি ভক্তির সহিত যত্ন ও পালন করিবেন। এইরূপ যে পশুগণ আমাদের উপকারে আইসে এবং আমাদের প্রতিপাল্য তাহাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান করা রমণীর কর্ত্তব্য। গৃহপালিত পক্ষিগুলির প্রতিও যত্ন চেষ্টার ত্রুটি হওয়া উচিত নহে। স্বাধীনতা বঞ্চিত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীগণ যদি গৃহস্থের আশ্রয়ে আসিয়া অনাহারে অযত্নে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে কি তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না? যদি না হয় তবে তুমি হৃদয়হীনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের যোগ্যা নও। অতএব গৃহপালিত পক্ষীদিগকে জননীর ন্যায় আহার প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। প্রাণাযথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামাদিতে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু। দয়াং কূর্ব্বন্তি সাধবঃ।—এই উপদেশটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিবে।

স্বাস্থ্য যখন সকল ধর্ম্মের সকল কর্ম্মের ও সকল সুখের মূল তখন রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা যদি তুমি তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিতে না পার তবে রোগীর কোন উপকার করে না। ঔষধাভাবে পথ্যদ্বারা রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পথ্যাভাবে বাঁচিতে পারে না। যা না করে বৈদ্য তা করে পথ্য, এই কথাটি অতি সার। সুতরাং পথ্যাদি দ্বারা রোগীর শুশ্রূষা করাও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্তর্গত।

এখন আর তপোবন নাই সংসার-ত্যাগী ফলমূলাহারী সংযতেন্দ্রিয় বনবাসী আর্য্য ঋষিগণও নাই এবং সহমরণ প্রথাও নাই, সুতরাং বিধবাগণকে যখন গৃহে থাকিয়াই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে, তখন সধবা রমণীগণকেও ঈশ্বর এবং পতি পদে মতি রাখিয়া উক্ত প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিতে হইবে। সধবা রমণীগণের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণে তাঁহাদের প্রভেদ এই যে তাঁহারা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। একদা মহামুনি বশিষ্ঠ, ভগবান বামাগুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

বহির্ব্যাপারসং রম্ভোহৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরবর্ত্তান্তরেবন বিহয় রাঘব ॥ [য.]

হিন্দু বিধবাগণের এইরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা উচিত। পরিজন অতিথি গৃহপালিত পশুপক্ষীগণের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত না করিলে তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইবে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ।
মৎস্যাদ্ধারণ প্রযুক্ত সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ [য.]

সতীধর্ম্ম যে কেবল মাত্র স্বামীকে লইয়া তাহা নহে, তাহা হইলে স্বামীর চাকরীস্থানবাসিনী, শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর প্রভৃতিকে অবজ্ঞাকারিণী—পরিজনগণের সহিত কলহপ্রিয়া—পরিজনদিগের মধ্যে কেহ গলা শুকাইয়া মরিলেও এক বিন্দু জল না দিয়া,

বাবু (স্বামী) আসিলেই মিছরী ভিজা ও খাবারাদি লইয়া যাঁহারা হাজির থাকেন, তাঁহারা কি পবিত্র সতী নামের যোগ্যা? কখনই নহে। শাণ্ডিলী নাম্নী একটি সতী রমণী স্বর্গে গমন করিলে স্বর্গবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবি! তুমি কি পুণ্যে এত উচ্চ স্বর্গে আসিয়াছ? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী যেই সুধাময় নীতিপূর্ণ বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া[১] প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তৎপরেই বলা হইয়াছে যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখভোগ করেন।

শ্রী কুমুদিনী রায়।

মাঘ ১৩০১

# অবরোধে হীনাবস্থা

**বামারচনা**

আমাদের দেশে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে আমরা এ প্রথা ভালো বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানবজীবন পশুর অপেক্ষাও হেয় ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব?... আমাদিগকে সৎজ্ঞান লাভের জন্য সমাজের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষাতেই মানবহৃদয় গঠিত, শিক্ষা অভাবে মানবের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না— কুশিক্ষায় মানব অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। সৎশিক্ষাতেই মানবহৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সৎশিক্ষা অভাবেই আমরা এত হীন হইয়া যাইতেছি এবং সেইজন্যই সমাজের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু হায়! আমরা কি জন্য এত হীন হইয়া পড়িতেছি সমাজ যদি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে আমরা সমাজের চক্ষুশূল হইয়া শতবাধা বুকে বহিয়া জীবনযাপন করিতাম না। যদি আমাদের প্রতি সমাজের এক বিন্দু কৃপাদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আমরা আর্য্যবংশীয়া বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম আমাদের জীবনও আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত হইত। আর্য্যমহিলাদিগের জন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা স্বইচ্ছায় এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতিমস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেন। তাঁহাদের এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের শরীরও যে রক্তমাংসে গঠিত আমাদের শরীরও সেই রক্তমাংসে গঠিত, তবে তাঁহারা অধিক বলশালিনী ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্না ছিলেন কেন? আমরাই বা এত হীনবল কেন? ইহার একমাত্র কারণ সমাজ নয় কি? সমাজ তাঁহাদিগকে

১। এই সংকলনে উদ্ধৃত হয়নি।

পালিতপক্ষীর ন্যায় অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই বলিয়াই তাঁহারা সৎজ্ঞান সৎসাহস সৎকীর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। আমদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্য যদি অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের পবিত্র জীবন আমাদিগের ন্যায় হীনাবস্থায় যাপন করিতে হইত। ভগিনীগণ! আইস আমরা এ ভীষণ অবরোধ প্রথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনকে উন্নতিপথে লইয়া যাইবার জন্য একান্তমনে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ডাকি। তাঁহার কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই এই হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিব ও আমাদের জীবন প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের ন্যায় বরণীয় ও আদরণীয় হইবে।

১৩০২ বৈশাখ

নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী
হুগলী

# হিন্দুরমণী

## বামারচনা

পাঠিকা ভগিনীগণ! আমি একজন হিন্দুরমণী। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি সভ্যতায় আমাদের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা সকলেই জানেন। আমাদের এখন খুব উন্নতি হইতেছে। আমরা এন্ট্রান্স, এফ. এ. বি. এ. এম. এ. পাশ করিতেছি, আমরা ডাক্তার হইতেছি, আমরা স্বাধীনতার নির্ম্মল বাতাসে মনের সাধে উড়িয়া বেড়াইতেছি। পুরাতন অধীনতা, পুরাতন আচার, ব্যবহার, পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদ, কিছুই আমাদের মনে ধরে না। আমাদের অনেকেই এখন পূর্ণমাত্রায় বিবি হইয়া উঠিতেছেন— সাড়ী ত্যাগ করিয়া গাউন, বালা ছাড়িয়া ব্রেসলেট, চিক ফেলিয়া নেকলেস পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে হাটে বাজারে সভা সমিতিতে অনেকেই বাহির হইতেছেন, এবং অনেকে বাহির হইতে না পারিলেও পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছেন। আমরা এখন একটী নূতন বস্তু হইয়া উঠিতেছি। রন্ধন করিতে বলিলে আমাদের মুণ্ডপাত হয়। অপরের দ্বারা নিজ সন্তান পালন করিতে পারিলেই আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে, বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা যেন বড়ই সুখী হইয়া উঠিয়াছি। পাঠিকা ভগিনি! আমাদের অবস্থা ত এই। বাস্তবিকই কি আমরা এখন বড় সভ্য ও সুখী হইয়াছি? বাস্তবিকই কি এখন আমাদের উন্নতি হইতেছে? বাস্তবিকই কি আমাদের অবস্থা পুরাকালের হিন্দুরমণী অপেক্ষা উন্নত হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা। আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনীগণ অপেক্ষা আমাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, সে সম্বন্ধে আইস ভাই পাঠিকা একটু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগে, বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে ও তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মূর্খ ছিলাম, ভ্রান্তি তামসে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন বিদ্যার বিমল আলোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছে। আমরা সুশিক্ষার প্রভাবে শিখিয়াছি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে নর ও নারী উভয়েই সমান, তবে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? তাদের পদানত হইয়া থাকিবে কেন? তুমি আমি দুইই সমান, তবে

আমি তোমার অধীন থাকিব কেন?

এই যুক্তি লইয়া আমরা এখন স্বাধীন হইতেছি। স্বাধীনতা সুখের সামগ্রী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এখন অধীনতা কাহাকে বলে ও বাস্তবিক আমরা অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলাম কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরের মুখাপেক্ষী, এক কথায় কারাগারে বন্দী, সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃতরূপে অধীন বলিতে হয়। আমাদের অবস্থা কি কারাবদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ স্থান? আমরা পুরুষের অধীনা দাসী বা হিন্দুরমণীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়, এ কথা সমাজ মর্ম্মানভিজ্ঞ স্থূলদর্শী কয়েকজন বিদেশীয়ের রচনা মাত্র। ভগিণীগণ! তোমরা বল দেখি,—আমরা আমাদের গৃহে আমাদের স্ব স্ব পতির অধীনা দাসী বা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের পতিরাই আমাদের আজ্ঞাকারী দাস! আমি তো যতদূর চাহিয়া দেখি, হিন্দুসমাজে, হিন্দুপতির উপর হিন্দুরমণীর যতদূর আধিপত্য, এরূপ আর কোনও দেশে, কোনও সমাজে, কোনও জাতির মধ্যেই নাই। যে ইংলন্ড এখন সভ্যতার গরিমায় ফুলিয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের নিকট সভ্যতার আদর্শ বলিয়া অভিমান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না, সেই ইংলন্ডের ইতিহাস একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যখন রাজা অষ্টম হেনরী নিরাপরাধা রাণী ক্যাথেরাইনকে ত্যাগ করিলেন, রাণী অ্যান বোলিন্ ও ক্যাথেরাইন হাওয়ার্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন, তখন ইংলন্ডের, সমস্ত ইউরোপের সমস্ত স্ত্রী স্বাধীনতা কি করিয়াছিল? ভারতে হিন্দুর ইতিহাসে, পুরাণে বা জনশ্রুতিতেও এরূপ দুর্ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাও কি? আমরা দাসীভাবাপন্না অধীনা কে বলে? পরের কথা শুনিয়া আমরা নিজ অবস্থাকে ধিক্কার বা সমাজকে দোষ দিই কেন? হিন্দুসমাজ রমণীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ রমণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোনও শাস্ত্রকার সেরূপ হিতকর নিয়ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজে রমণীর আসন অতি উচ্চ। "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়" এরূপ কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যতীত আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন কি? হিন্দুরমণীগণ অধীনা ও দাসীভাবাপন্না যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহাদিগকে দেখাইতে চাই যে, হিন্দুসমাজের উপর রমণীর যেরূপ আধিপত্য, অন্য দেশের রমণীর তৎসমাজে সেইরূপ আধিপত্য আছে কিনা সন্দেহ। আকর্ষণী শক্তি যেরূপ বক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্য সাধন করে, সেইরূপ রমণী অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার, কি সামান্য গৃহকার্য্য, কি গভীর রাজনীতি, এক কথায় সকল বিষয়েই তাঁহার প্রভুতা পরিচালন করেন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে বঙ্গদেশের উপকূল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন চৌহান বংশীয় প্রবলপ্রতাপ সম্রাট পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে মাহোবারাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। পৃথ্বীরাজ বিপুলবিক্রমে অসংখ্য বাহিনী লইয়া মাহোবা আক্রমণ করিলেন। মাহোবা ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাহোবারাজ সম্রাটের সমকক্ষ ছিলেন না। মাহোবা রাজ্যে এমন কোন বীর ছিল না যে, প্রবলপ্রতাপ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হয়। কোন কারণবশতঃ মাহোবা-সেনাপতি দেশরাজের বীর পুত্রদ্বয় তাহাদের মাতার সহিত কনৌজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়ান্তর না

দেখিয়া মাহোবারাজ এক সভা আহ্বান করিলেন, সভ্যগণের মধ্যে কেহই সময়োপযোগী সুমন্ত্রণা দানে সক্ষম হইলেন না।

পরে রাণী মলিনা দেবী প্রস্তাব করিলেন যে, "এখন রাজ্যে মাহোবার বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিদ্বয় (দেশ রাজের পুত্রদ্বয়) অনুপস্থিত", এই হেতুবাদে পৃথ্বীরাজের নিকট কিয়দ্দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করা হউক ও কনৌজ হইতে বীরদ্বয়কে আনিয়া দেশরক্ষা করা হউক। সকলেই রাণীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন ও তদনুযায়ী কার্য্য হইল। আবার যখন পাপিষ্ঠ সিরাজ-উদ্দৌলার দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইয়া ন, তাহার অসহনীয় অত্যাচারে ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল; যে সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞ রত্নগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের পরিত্রাণ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই ঘোর বিপ্লবসময়েও রমণীর মন্ত্রণা, রমণীর যুক্তি, রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল, যে সভায় মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, ধনিশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন, রাণী ভবানী দেবীও সেই সভায় সযত্নে আহূতা হইয়াছিলেন। বীরপুরুষগণ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন "শুন রাণীর কি মত"। এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ ব্যাপারে আহূতা হইয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কেন, সভ্যতার আদর্শ, স্ত্রীশিক্ষার লীলাভূমি ইংলন্ডে কয়জন স্ত্রীলোকের কথা রাজনীতিজ্ঞেরা শুনিয়া থাকেন? পাঠিকা ভগিণীগণ! বল দেখি, হিন্দুরমণী স্বাধীনা, কি অধীনা? বল দেখি, আমরা এখন স্বাধীনতা পাইতেছি, না হারাইতেছি? আমি কতকগুলি পতিপরায়ণা তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইব যে, পুরাকালে আমাদের চরিত্র কিরূপ দৃঢ়প্রাণ, কিরূপ সরল ও মন কিরূপ উদার ছিল। আমি ধারাবাহিকরূপে এক একটি রমণীর বিবরণ প্রকাশ করিব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী অরুন্ধতীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিব না, কারণ কোন কোন বিদুষী ঐ সকল চরিত্র অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাব্যোপন্যাসের নায়িকাচরিত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করিব, তাহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরু ইংরাজের ইতিহাসে জ্বলদক্ষরে প্রভাসিত। সেই সকল দেবীচরিত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখাইব আমরা কি ছিলাম, কি হইলাম।

(ক্রমশঃ)

আশ্বিন ১৩০২ — শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী
কাটবরা লেন, হুগলী।

# হিন্দুরমণী

## বামারচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের ইতিহাস পাঠক পাঠিকার নিকট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নাম অপরিচিত নহে। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা-সংযুক্তাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই অপরূপ বিবাহ কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে, অনেক গাথা গীত হইয়া থাকে। ঐ বিবাহের কিছুকাল পরেই যবনেরা ভারত আক্রমণ করে। একদিন

রজনীতে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা পত্নী সংযুক্তাদেবীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত আছেন, রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন। প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীকে জাগাইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী রম্ভার ন্যায় অলোকসামান্য রূপবতী এক কামিনী সজোরে আমার এক বাহু আকর্ষণ করিল। পরে সেই মায়াবিনী তোমাকে আক্রমণ করিল। যখন তুমি অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে, প্রেতবৎ এক ভয়ানক হস্তী আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল। নিদ্রাভঙ্গ হইল দেখি, রম্ভা কি দানব কেহই নাই। আমার হৃদয় ভয়ানক কম্পিত হইতেছে, বিধাতাই জানেন, ভাগ্যে কি আছে!!"

প্রেমময়ী সংযুক্তা উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় যশ ঐশ্বর্য্য বা সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? মৃত্যু কেবল মানবেরই অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট নহে, দেবতারাও মৃত্যুর অধীন। সকলেই পুরাতন বাসত্যাগে অভিলাষী, কিন্তু মরিতে জানিলে মৃত্যুতেই মানবকে অমর করে। প্রাণনাথ! আত্মচিন্তা, পাপ স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভের চিন্তা কর। শাণিত কৃপাণ হস্তে শত্রুদলে প্রবেশ পূর্ব্বক অরাতি মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী থাকিব।" সংযুক্তা দেবীর উক্তি শ্রবণ করিলে মনে পড়েঃ—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি,
তথা শারীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"[স.]

এবং

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি ॥"[য.]

কোনও বর্ত্তমান সভ্যদেশের রমণী এতাদৃশ ধর্ম্মানুগত সারগর্ভ তেজস্বী বাক্য উচ্চারণ করিতে কি সমর্থা হইয়াছেন? যাহা হউক, নিশাবসানে রাজা নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত গুরুপুরোহিতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা অশুভনাশমানসে নানাবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব রক্ষাকবচ লিখিয়া মহারাজকে অর্পণ করিলেন। তিনি তাহা নিজ উষ্ণীষে ধারণ করিলেন। বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি নানাবিধ দৈবক্রিয়া হইতে লাগিল। কিন্তু শান্তিস্বস্ত্যয়ণে কি দৈবের গতি প্রতিরোধ করা যায়? যদি মনুষ্য কোন প্রকার অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডাইতে পারিত তাহা হইলে এত ভোগ ভুগিতে হইবে কেন? যৎকালে দিল্লীর রাজপুত বীরবর্গ একত্রে এক সামরিক সভা আহ্বান করিয়া গজনীর সুলতানের গতি প্রতিরোধ করিবার উপায় অবধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ ঐ সভা হইতে গোপনে নিক্রান্ত হইয়া প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীর সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরামর্শ চাহিলে সংযুক্তাদেবী উত্তর দিতেছেন; "উপদেশ দিবার জন্য কে কোথায় নারীকে আহ্বান করে? জগতে তাহারা অবলা বলিয়া কথিতা, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। তাহারা সত্য বলিলেও কে তাহাতে কর্ণপাত করে? তথাপি জগতে রমণী না থাকিলে কি হইত? দেখ শিবের সহিত শক্তি সর্ব্বদা সম্মিলিতা। আমরা যুগপৎ অশক্তি ও শক্তি বিপরীত গুণের আধার। জ্যোতিষী প[illegible]ত শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অবধারণ করিতে

বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বরবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লোকমুখে যাহা শুনিয়া ছিলেন, রাজ্ঞী তাহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক সুন্দরী। রাণী অতি সমাদরে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। নানাবিধ প্রেমালাপে সময় মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব রাণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার গা কেমন করিতে লাগিল, অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। পাখা চলিল, শীতল সলিল সেক করা হইল, কোনও ফলোদয় হইল না। খাঁ সাহেব অধীর হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাণী এই সময় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "শুন খাঁ, তোমার শেষের দিন উপস্থিত, আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু একত্রে সম্পাদিত হইবে। তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ সে সমস্তই বিষাক্ত! কি করি বল, সতীত্ব রক্ষা করিবার, অপবিত্রতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার অন্য উপায় রাখ নাই।" রাণীর এই উক্তি শ্রবণে সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাণীও তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া নিম্নে নর্ম্মদা সলিলে আত্মবিসর্জন করিলেন, এ দিকে বিষের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া খাঁ সাহেবের মৃত্যু হইল।

সতীত্বের মহিমা হিন্দুরমণীর ন্যায় অন্য কোন দেশের রমণী বুঝিয়াছে কি!

অগ্রহায়ণ ১৩০২ — শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী

# সহধর্ম্মিণী

সংস্কৃত ভাষায় পত্নীর একটি প্রতিশব্দ সহধর্ম্মিনী। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই। এই সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ— যে (পতির) সহ ধর্ম্ম আচরণ করে। পত্নীর অনেক প্রতিশব্দ আছে—স্ত্রী, জায়া, ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি। এই প্রতিশব্দ সমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অর্থবাচক—পতি পত্নীর বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞাপক। অন্যান্য ভাষাতেও পত্নীর এইরূপ বহুতর প্রতিশব্দ আছে। যথা ইংরাজীতে wife, better-half ইত্যাদি। এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতে পত্নীর প্রতিশব্দগুলি যেমন একঘেয়ে—একার্থবাচক, সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি সেরূপ নহে। ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি সবই প্রায় প্রণয়জ্ঞাপক। সংস্কৃতে সেইরূপ প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য উচ্চতর ভাবজ্ঞাপক শব্দও এই ভাষায় আছে। জায়া, সহধর্ম্মিণী তাহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোন ভাষাতে আছে কিনা জানি না, না থাকিবার কারণও যথেষ্ট আছে। তাহা খুলিয়া বলিতেছি। ধর্ম্মাচরণ সকল জাতিতেই করিতেছে, সকল জাতিতেই করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মকে এমন সর্ব্বকালব্যাপী বুঝি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিতে করে নাই। প্রাচীন জাতির ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এখন যে দুইটী প্রবল জাতির সহিত আমাদের সংস্রব রহিয়াছে, তাহাদের কথাই বলিব। দেখ, এই ইংরাজ জাতি। ইহারা কি ধর্ম্মাচরণ করে না? কে বলিবে? স্বার্থত্যাগী পরময় জীবন দীনদয়াল যীশুখ্রীষ্টের কথা নাই বা বলিলাম,

এখনও এমন উদারচেতা পরোপকারী প্রবীণ অনেক খ্রীষ্টান আছেন, যাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দেখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইঁহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া কে বলিতে পারিবে যে, খ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম্মাচারী লোক দেখা যায় না? খ্রীষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া কে বলিতে পারিবে যে, প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাচরণ করে না? যেমন খ্রীষ্টান সম্বন্ধে বলিলাম, মুসলমান সম্বন্ধেও সেইরূপই বলিতে পারি। এই দুই জাতিই সম্মুখে দেখিতেছি, তাই ইহাদের কথাই বলিলাম—মনে হয়, অন্যান্য সব জাতিই এইরূপ ধর্ম্মাচারী।

ইহারা সকলেই ধর্ম্মাচারী সত্য। কিন্তু হিন্দুর ন্যায় নহে। খ্রীষ্টানের ও মুসলমানের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—তাহার সহিত কেবলমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ—অবশিষ্ট কার্য্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। যেমন এই...[১] নিকট আহার, শারীরিক অভাব নিবারণার্থ সুখজনক ক্রিয়া বিশেষ। তাঁহারা আহারে এই দুইটী বিষয়ই খুঁজিয়া থাকেন—শরীরের পুষ্টি ও রসনার আনন্দ। মুসলমানেরাও এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক স্বীকার করেন। হিন্দুরা সেরূপ করেন না—অন্ততঃ পূর্ব্বে করিতেন না। তাঁহাদের জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি হইতে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম সকল কার্য্যই সেই একাভিমুখী। হিন্দুর ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, এমন কোন কার্য্যই নাই, থাকিতেও পারে না। অপরাপর জাতি যাহাকে সুখ বলে, হিন্দু তাহাকে সুখ বলে না, হিন্দুর সুখের ধারণা ও সংজ্ঞাই পৃথক—সেই সুখের ধারণা বা সংজ্ঞা এইরূপ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মানুষ সকল কার্য্যেই সুখ চাহে—সুতরাং হিন্দুর সকল কার্য্যেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কারণ সেই ধর্ম্মের রেখার কণামাত্র অতিক্রম করিলেও হিন্দুর সুখ হওয়া অসম্ভব। তাই হিন্দুর যেমন আহারে, তেমনি বিহারে সেই ধর্ম্মকার্য্যই প্রধান কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর বিবাহেও দাম্পত্য সুখ বা পতি পত্নীর ইন্দ্রিয়-সুখই মূল লক্ষ্য নহে— এবং হিন্দুপত্নীর প্রধান প্রতিশব্দ হিন্দুজাতি মধ্যে প্রণয়িণী নহে—সহধর্ম্মিণী।

এই সহধর্ম্মিণী কথাটাই ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগের পতি পত্নীর সম্বন্ধ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুজাতির মধ্যেই এই সম্বন্ধটা যেন দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে। সেই কথাটা দেখাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুর নিকট, গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালনের জন্য আশ্রম বিশেষ। এই "আশ্রম" কথাটাতেই সাংসারিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই হিন্দুগণ ধর্ম্মোদ্দেশে করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। হিন্দুর আহারও ধর্ম্মবিশেষে। হিন্দুর আহারের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে—আহার কালে যে প্রকার অবস্থায় থাকিবার বিধি আছে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাতেই উপরোক্ত কথাটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সে সব মন্ত্রের কথার উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর ঘরকন্নাও ধর্ম্মাচরণ, এই ধর্ম্মাচরণে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন আর হিন্দু পত্নীগণ যেন সে কথা মনেই করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন, কিন্তু

১। অস্পষ্ট, পড়া যায়নি।

ঘরকন্না একটা ধর্ম্ম—যেমন পূজা ধর্ম্মাচরণ—যেমন অতিথিসেবা, দান, ব্রতাদি ধর্ম্মাচরণ, ঘরকন্নাও যে ঠিক্ তেমনই একটা ধর্ম্ম— এ কথা বর্ত্তমান কালের হিন্দুপত্নীগণ যেন ভুলিয়া যাইতেছেন। এই ভয়ানক ভুল হইতেই সমাজের স্ত্রীজাতির এখন অবনতি হইতেছে, আমি এইরূপ মনে করি, কেন করি, তাহা বলিতেছি।

দেখ হিন্দুপত্নী যাহাকে ধর্ম্মাচরণ মনে করে—তাহা কত সাবধানে, কত যত্নে, কত শঙ্কিতচিত্তে করিয়া থাকে। হিন্দুর পূজার ঘর, পূজার সজ্জা—কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর!

এই পূজা উপাসনার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বুঝিয়াই হিন্দুপত্নী এমন পবিত্রচিত্তে, এমন পবিত্রশরীরে, এমন সযত্নে, এমন সাবধানে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু যেটা ঘরকন্না—তাহাতে হিন্দুপত্নী এমন পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কায়ের আবশ্যকতা মনে করেন না। তাই ইহাতে এত শৈথিল্য, এত অশান্তি, এত কলহ, এত পদস্খলন। তাঁহারা মনে করেন ঘরকন্নাটা না করিলে শরীর চলে না—সংসার চলে না, তাই তাহা অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা "ঘরকন্না"ই ধর্ম্মানুষ্ঠান—তাহাই সুখের উপায়, তাহাই প্রকৃত সুখ, এরূপ আর মনে করেন না। তাঁহারা ঘরকন্না করিয়া শরীর বাঁচাইয়া সহজ উপায়ে সুখলাভ করিতে চাহেন। হিন্দুর গৃহে এখন আর সে নিঃস্বার্থপরতার উজ্জ্বল উদাহরণ নাই।

হিন্দু পত্নীকে প্রকৃত প্রস্তাবে "সহধর্ম্মিণী" বলা যায় না। তাঁহারা এখন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁহারা নিজেরাও তাহাই ভাবেন। স্বামীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছোট বড় সকল কার্য্যে, কোন্ হিন্দুপত্নী দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? স্বামীর কি অনুষ্ঠেয়, কি অনুষ্ঠেয় নহে, স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে কি কর্ত্তব্য, কি নহে—কোন্ পত্নী এখন তাহার সন্ধান রাখিয়া থাকেন? তাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন একটা বিষয়ের—চাহেনও সেই একটা বিষয়। তাঁহারা পাইতেও চাহেন কেবলমাত্র স্বামীর ভালবাসা, দিতেও চাহেন তাহাই। সে ভালবাসার অর্থ অনেক সময়ে দুটো মিষ্ট কথা আর দুটো আবদার মাত্র। কিন্তু এই কুহকিনীই তাঁহাদিগের যেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

এ "ভালবাসা"টা যে কি, তাহা তাঁহারা দেখেন না, দেখিতে পারেন না, দেখিতে চাহেনও না। এ ভালবাসা যে অনেক স্থলেই শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সুখ-মোহ কি এমনই একটা কিছু, তাহা তাঁহারা বুঝেন না! না বুঝিয়া এই নিদারুণ হলাহল পান করিয়া, তাঁহারা নিজেরা বিকৃত হইতেছেন—পতিদিগকেও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন।

কেন এমন হইল, জানি না। পাশ্চাত্য প্রণয়ের আপাত মধুর কাহিনী পড়াতেই পতির নিকট হইতেই কি "ভালবাসা" পদার্থটা এমনভাবে হিন্দুগৃহে স্থান পাইয়াছে? জানি না। কিন্তু ইহাও হইয়াছে যে, ইহা পতিপত্নীর অস্থিমজ্জার সহিত এমনই মিশিয়া পড়িয়াছে যে, বুঝি এই বৃত্তিটার পরিতৃপ্তিই এখন হিন্দুদম্পতির একমাত্র এবং অতিমাত্র সুখ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নবেল, নাটকগুলি এই ভাব পরিবেশনের সহায়তা করিতেছে। যে নবেল লেখে, সেই এই ভালবাসার কাহিনী লইয়া লেখে। সেই কাহিনী যে গ্রন্থে ভাল আছে, সেই গ্রন্থই ভাল। কুন্দ, আয়েষা যত লোকের মনে ধরে, শান্তি, প্রফুল্ল তত তাহাদের মনে ধরে না। এমনই অধঃপতন ঘটিয়াছে বটে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। কাহার দিকেই বা তাকাই? সমাজে শিক্ষিতা বলিয়া যাঁহারা খ্যাতা, তাঁহারা ত এই ভালবাসার অধিকার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা কি আর ইহা জন্মে সহধর্ম্মিণী হইতে চাহিবেন? "ঘরকন্না" তাহাদিগের নিকট

অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। ইহা ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত ত নহেই, প্রত্যুত অতি ঘৃণাজনক হীন কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা চাহেন উচ্চ বিষয়ের দিকে—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত—তাঁহারা কি ঘরকন্নার কথা ভাবিতে পারেন? আর যাঁহারা অশিক্ষিতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঘরকন্না করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাবিয়া নহে—না করিলে চলে না বলিয়া যেমন উপাসনা, যেমন পূজা, যেমন ব্রত, যেমন যজ্ঞ, তেমনই যে "ঘরকন্না" এ কথা তাঁহারা জানেনই না, তাই এখন আর আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম নাই। আছে যা, তাহা বিহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানমাত্র। গৃহস্থাশ্রমে এখন আর সহধর্ম্মিনী নাই—আছে প্রণয়িনী মাত্র।

সত্য বটে, এখন দুই একজন পত্নী পতিকে উচ্চকার্য্যে সহায়তা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ ভালই কথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী না হইবেন, যে পর্য্যন্ত ঘরকন্নাকে পত্নীগণ ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোনও ফল হইবে, আমি এরূপ মনে করি না।

তাই আবার ইচ্ছা হয়, এই হিন্দু পত্নীগণকে আবার সেই গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিব। ঘরকন্না যে একটী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা বুঝিয়া যদি শিক্ষিতা কামিনীগণ "সহধর্ম্মিণী"র ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তবে আবার আমাদিগের এই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্গের ফল পাইতে পারি। হায়! কবে এই আশা সফল হইবে? কবে হিন্দুরমণী আবার সেই "সহধর্ম্মিণী"র উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বামীর ছোটবড় সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন? এমন দিন কি হইবে?

পৌষ ১৩০৩

## আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

অনেক সময়েই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—আমাদের বর্ত্তমান জীবনই কি প্রকৃত রমণীজীবন? যে রমণীজীবন প্রেম ও পবিত্রতা, গাম্ভীর্য্য ও স্ফূর্ত্তি, শান্তি ও মাধুর্য্য, দৃঢ়তা ও সরলতার আধার, ইহাই কি সেই রমণীজীবন? আমরা কি আজকাল সেই প্রকৃত রমণীজীবন যাপন করিতেছি? এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি কেবল রমণীজীবনের বিকৃতিই দর্শন করি। যে রমণীজীবন প্রেমে সমস্ত জগৎকে আপনার করিবে, হৃদয়ের ভিতরে টানিয়া লইবে, তাহাতেই আজ স্বামী পুত্র কন্যা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। "রমণীহৃদয় সংকীর্ণ নীচ আত্মসুখাভিলাষী" আজ এই সকল অখ্যাতিতে জনসমাজে পুণ্য রমণী-জীবনের কি বিষম দুর্গতিই ঘটিয়াছে! যে রমণীজীবন আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রেরিত হইল, তাহার পরিণাম কিনা এই হইল! যে প্রেম পর কি তাহা বুঝিবে না, সকলকেই আপনার করিবে, সেই প্রেম কিনা বিশ্বসংসার দূরে থাকুক, এক পরিবারস্থ লোককে পর মনে করিতেছে। যে রমণীচিত্ত শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শ তাহা কিনা আজ চঞ্চল চিন্তাবিহীন, ভাসাভাসা হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষা, চিন্তা, চেষ্টা, বিশ্বাস ও আদর্শের অভাবই আমাদের প্রধান অভাব। লেখাপড়া আমরা যাহা জানি তাহা কিছুই নহে, কিন্তু যেটুকু জানি তাহা দ্বারা জ্ঞান লাভের চেষ্টা কোথায়? বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে জ্ঞানলাভ ও জীবনের উন্নতিসাধন তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না। চিন্তাশীলতাই শিক্ষা ও উন্নতির মূল। অনেকে লেখাপড়া না জানিয়াও এক চিন্তাশক্তি দ্বারা বহু জ্ঞান লাভ করেন, নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হন। লেখাপড়া চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে এইমাত্র।

ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না; কিন্তু একমাত্র প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি প্রভাবে তিনি রাজকার্য্যের অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে এরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। চিন্তাশক্তি খর্ব্ব হইতে হইতে আমরা এত লঘুচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, গভীরভাবে কিছু ভাবিতে পারি না কেবল অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই। ভূমণ্ডলে কি জন্য আসিয়াছি কি জন্য আছি, সে বিষয় একবারও ভাবি না, কেবল সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছি। জীবনের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নাই, তাহা আবশ্যকও বোধ করি না। চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সকল অবস্থার মধ্য হইতে যে জীবনের উপাদান ও শক্তি সংগ্রহ করা যায়, তাহা আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না; তাই অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন ও চরিত্রের প্রভা প্রকাশিত হয় না।

জীবন থাকিলে কি এইরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি? একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবনীশক্তি থাকে তাহা ততক্ষণ সহস্র বাধাতেও অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। তাই বলি, যদি জীবন থাকিত, তবে চিন্তা ও চেষ্টা অবশ্যই হইত। আমরা মৃত সমাজের অত্যাচারে, শিক্ষার অভাবে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অভাবে আমরা মৃত—তাই সকলই বিকৃত। আমরা কেবল অসার বিষয় লইয়াই মত্ত, বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়াই মুগ্ধ, একবারও ভিতর খুঁজিয়া দেখি না। সংসারে যতদিন আছি বাধ্য হইয়া কতকগুলি কাজ করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু কিছুই উপযুক্তরূপে করিতে পারিতেছি না। স্বামীর প্রতি কি কর্ত্তব্য, সন্তানের শিক্ষা ও জীবনগঠন বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, আত্মীয় পরিজনের, প্রাণের ভগিনীগণের ও স্বদেশের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা জানিও না। পালনও করি না। মৃতজীবনে তাহা পালনের আশাও নাই।

প্রাচীনা রমণীদিগের বিশ্বাস অনেক দৃঢ় ছিল, এখনও তাঁহাদেরই মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের কার্য্য সেরূপ দেখা যায় না। বিশ্বাসই জীবনের ভিত্তি, বিশ্বাসই জীবনের গতি ও আদর্শ ঠিক করে। সেই বিশ্বাসের অভাবে আমাদের লঘুতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদর্শ আরও মলিন হইয়াছে। রমণীহৃদয়ই বিশ্বাসের উজ্জ্বল ছবি প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত স্থল। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীগণ বিশ্বাসে এবং ব্রহ্মবিদ্যায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, শিক্ষা ও উন্নতিতে ঋষিগণের সমতুল্যা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও প্রাচীনা রমণীগণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন করিতে কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন। এদেশের এবং বিদেশের কত রমণী বিশ্বাসের জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল আমরা কোন্ ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য সব সহ্য করিতে পারি, জীবন প্রদান করিতে পারি? এখন কি আমাদের মধ্যে প্রাচীনকালের রমণীর ন্যায় দুই একটী রমণীও পাইব না? স্বাধীন কালের সে সমাজ নাই, সে কিছুই নাই, সবই মৃত।

কত প্রাণের ভগিনী সমাজের পেষণে, অবস্থার পেষণে পড়িয়া রমণীজীবনের পবিত্রতা হারাইয়া চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। আমরা যদি আজ প্রকৃত রমণীজীবনের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতাম, আজ যদি সমাজে আমাদের শক্তি কার্য্যকরী হইত, তবে বুঝি প্রাণের ভগিনীগণের এই অপবিত্র চিত্র, যাহা অপেক্ষা রমণী মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ মনে করে, সেই চিত্র দেখিতে হইত না। জনসমাজ পবিত্র হইত, পবিত্রতাতে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ পুনরায় পুণ্যক্ষেত্র হইত। আমাদের জীবনের দায়িত্ব কত! আমরা নিজ জীবনের উন্নতি করিব, সমাজকে উন্নত করিব, দেশকে উন্নত করিব। রমণীজীবনের মৃতভাব দূর না হইলে সমাজ কখনও সজীব হইবে, 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না'। যে নিজে নিদ্রিত মৃত সে অপরকে কিরূপে জাগাইবে, জীবনপ্রদান করিবে? রমণী শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বলা হইলেও হৃদয়ের শক্তিতে দুর্ব্বলা নহে। সমস্ত সমাজ পরোক্ষভাবে রমণীশক্তিতে চলিতেছে, পরাধীনা হইলেও মা এবং সহধর্ম্মিণী রমণী, তাই রমণী প্রভাবই জনসমাজে সর্ব্বোপরি কার্য্য করিতেছে। রমণীই পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা সন্তানকে গঠিত করিব, অপর সকলের উন্নতির সহায় হইব, প্রেমে সকলকে আপনার করিব। আত্মহারা হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বামীকে ভালবাসিব, পরমদেবতা পরমেশ্বরকে ভালবাসিব, তাঁহারই হইব। স্বামী, পুত্র কন্যা, পরিবার, সমাজ সকলকে লইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইব। আমাদের প্রেম এই ক্ষুদ্র সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিবে না, কিন্তু সেই মহান অনন্ত দেবতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। আমরা যে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, জীবনের সঙ্গী স্বামী, স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও ভাই ভগিনী পাইয়াছি, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমদর্শন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিব। এইত আমাদের প্রেমের আদর্শ। আমরা এই উচ্চ আদর্শে উঠিতে না পারিয়া নীচে পৃথিবীর ভাব লইয়া পড়িয়া থাকি, তাই আমাদের এ প্রেমে জীবনের উন্নতি হয় না। তাই প্রেম সঙ্কীর্ণ, তাই প্রেমে স্বার্থপরতা, বিষয়ের আবিলতা। যাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য সব পাইয়াছি, তাঁহাকেই ভুলিয়া থাকি, তাঁহার দানের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া চলি, তাই এ দুর্গতি।

আমাদের এই দুর্গতি দেখিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারি? যদিও আমাদের এই শোচনীয় দুর্গতির মূল সমাজ, যদিও সমাজের পেষণে প্রাণের আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে আমরা সমস্ত জগৎ হইতে এতদূরে পড়িয়াছি, এত পতিত হইয়াছি, তবুও ইহাতে কি আমাদের নিজের দোষ নাই? আমাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, যাহা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আছে, তাহার উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা ও চিন্তা আছে কি?

অন্যের উপর দোষ দিয়া নিজেরা নিশ্চষ্ট থাকিলে কি কখনও কল্যাণ আছে? আমরা নিজে চেষ্টা না করিলে পুরুষসমাজ কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা আজকাল আমাদের জন্য অনেক করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেক রমণী আছেন যাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ; যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি বিকৃত হয় নাই; তাঁহারা দেবী। এরূপ অবিকৃতা, প্রকৃতি-দুহিতা অনেক দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, রমণীজীবনের আদর্শ কি বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহাদিগকে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। একবার ভাবিয়া দেখি

ইঁহাদের সংখ্যা কত কম, আর আমাদের ন্যায় বিকৃত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের সংখ্যাই কত বেশী। এই বিস্তৃত সমাজমধ্যে সমস্ত রমণীমণ্ডলী জাগ্রত না হইলে একজন, দুইজনে কি করিবেন? সমস্ত বঙ্গদেশ আমাদের নিদ্রাতে মৃত, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আর কত কাল নিদ্রাতে মগ্ন থাকিব? অনেক ঘুমাইয়াছি, এখন আর ঘুমাইলে চলিবে না।

আমরা অতি ক্ষুদ্র সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের কাজ নাই? যদি আমরা আমাদের মৃত শক্তিকে জাগাইতে পারি, তবে কি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, যুবক, বৃদ্ধ বালক কাহাকেও অপবিত্রতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে? তাহা হইলে কি পৃথিবী স্বর্গধাম হয় না? সত্য সত্যই এরূপ হইলে পৃথিবীতে ভগবানের শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচারিত হইতে পারে, আমরাও ধন্য হইতে পারি, কৃতার্থ হইতে পারি, রমণীজীবন সার্থক করিতে পারি। তাই কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। চেষ্টা করিলে অবশ্যই অবস্থা ফিরিবে। যদি আমরা আমাদের অভাব বুঝিয়া থাকি, তবে পরস্পর এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক প্রাণে পরস্পরের উন্নতির জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করি। ইহাতে অবশ্যই আমাদের জীবনের কল্যাণ সাধিত হইবে, সমাজের উন্নতি সংসাধিত হইবে। আমরা অজ্ঞান, মূর্খ, চিন্তাবিহীন, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল হই না কেন, যদি প্রাণের প্রকৃত অনুরাগের সহিত চেষ্টা করি, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব। চাই কেবল চেষ্টা, যত্ন, বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ। আমাদের উন্নতির জন্য যদি আমাদিগের অপ্রেম, কুটিলতা বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে কি তাহা আমরা করিব না? কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি স্বার্থ ছাড়িতে হয়, সুখ ছাড়িতে হয়, কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সেজন্য কি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব না? অভাব অসংখ্য, তাই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। যদি পবিত্র রমণীজীবন ধারণ করিয়া সংসারে, পরিবারে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপন করিতে না পারিলাম, তবে জীবনধারণে কি ফল? কেবল কি পশুর মত শারীরিক সুখভোগ ও শারীরিক সুখে মানসিক তৃপ্তির জন্যই জীবন ধারণ করিব?

পরমেশ্বর করুন, আমাদের যেন আর সেরূপ দুর্গতি না হয়। তিনি আমাদিগকে বলপ্রদান করুন, এখন হইতে আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি।

বৈশাখ ১৩০৪ দীনা বঙ্গবালা।

## প্রকৃত স্ত্রী

জগতে কি পুরুষ কি রমণী, সকলেরই এক একটী দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব যদি যথোচিত কর্ত্তব্যাচরণ করিত, তাহা হইলে সংসার কত সুখের হইত! নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য না করায় সুখময় সংসার দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দায়িত্বানুসারে সকল কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করা দূরের কথা, আমাদের উপর যে এক একটা গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, আমরা তাহা স্মরণও করি না। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যই সুখদুঃখের ভিত্তিস্বরূপ। অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে সংসার

যে দুঃখময় হইবে—এ পাপ জীবনের অবসান কত দিনে হইবে বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সংসারে আমাদের এক একজন নারীর হস্তে আমাদের স্ব স্ব পতির জীবনের ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাকে সুখী করা ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মঙ্গল সাধন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ক্ষুদ্রজীবনের পক্ষে আর একটী জীবনের ভার লওয়া কি কম দায়িত্ব? আর একজনের সুখশান্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া চলা কি সহজ কার্য্য? কিন্তু সে কার্য্য সহজই হউক আর দুরূহই হউক, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং স্বামীর সুখের পথে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু হায়! আমরা এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারি না। পারি না বলিয়াই সংসারকে দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা (স্ত্রীজাতি) প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিতাম। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী জীবনে অধিকতর সুখ আর কি আছে? কিন্তু হায়! আমরা সে সুখের পবিত্র পথ অন্বেষণ করিতে যত্ন করি কই? সে সুখের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে শ্রম যত্ন চেষ্টা সতর্কতা ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্যগুলি আবশ্যক। কিন্তু আমরা এই দ্রব্য কয়টী ব্যয় করিতে সক্ষম হই কি? 'না সহিলে ক্লেশ কোথা মিলেরে রতন' আমরা কি একবার একথা স্মরণ করিয়া থাকি? সতত আমরা যে সুখকে সুখ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অসুখ ও অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের সুখের প্রথম পথ বিবাহ, দ্বিতীয় পথ স্বামী ও স্ত্রীর নিজ দায়িত্বানুসারে কার্য্য করা।

বিবাহ জীবনের প্রধান মহোৎসব। এই মহোৎসবে স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয় আনন্দসলিলে ভাসমান হয়। কিন্তু আমরা যে মহোৎসবকে সুখের সোপান ভাবিয়া তাহাতে আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, সেই মহোৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে হৃদয় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের চিন্তাভাবে ভারাক্রান্ত হয়। যাঁহারা এই মহোৎসবের গুরুত্ব বুঝিয়া যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য ও সুখী। বিবাহের পর মুহূর্ত্ত হইতেই মানবজীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজন অবলা রমণীর উপর একজন যুবকের সুখ শান্তি আশা ভরসা অর্থাৎ জীবনের সমস্ত নির্ভর, ইহা কি কথার কথা? যাহাতে সংসার সুশৃঙ্খল থাকে, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা সুখশান্তি লাভ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে কল্যাণলাভ করিতে পারে, স্ত্রীর পক্ষে তাহা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রমণী এই সকল কর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ ঈশ্বর বা অগ্নি সাক্ষী করিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদমন্ত্র পড়াইয়া স্বামীকে গ্রহণ করিলেও আমরা তাঁহাকে প্রকৃত স্ত্রী বলিতে বাধ্য নহি। প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়। হয়ত অনেক পাঠিকা ভগিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন স্বামীকে ভালবাসে না এরূপ রমণী জগতে অতি অল্পই আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়, স্বামীকে ভালবাসেন এরূপ রমণীই জগতে অতি দুর্লভ। স্বামীকে ভালবাসিতে হইলে নিজের স্বার্থ বলি দিতে হয়। কিন্তু হায়। এই স্বার্থপর জগতে কয়জন রমণী নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাও তাহা হইলে যে কার্য্যে তুমি সুখী হও, সে কার্য্য যদি তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র বিরক্তিকর হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিও। তিনি যাহা খাইতে ভালবাসেন তাহা খাওয়াইও, তিনি যাহা দেখিতে ভালবাসেন তাহা দেখাইও। মূল কথা সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মনোরঞ্জন করিও। যদি স্বামীকে ভালবাসিবে—প্রকৃত স্ত্রী হইবে, তবে নিজের সুখদুঃখের দিকে আদৌ লক্ষ্য

অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছারখার হইতে দেখা যাইতেছে। ও স্থলে এক পক্ষ বিচারক শাশুড়ীদিগের ও আর একপক্ষ বধূদিগের সম্বন্ধে দোষভার ন্যস্ত করেন। এমতে প্রকৃত দোষী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমরা নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী প্রবাদ বচন দ্বারাই ইহার আলোচনা করিব। আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ বচনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক নহে।

"বৌ ভাঙলেন সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলেন নাদা, ও কিছু নয় দাদা ॥"

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষটুকুও প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে এবং গিন্নির প্রকাণ্ড দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না। এই প্রবাদ বচনটিতেই শাশুড়ীর স্বার্থপরতার ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

হিন্দু সমাজে রমণীগণ বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ স্থলেই তখন বালিকাদিগের বয়স চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে না। তখন তাহারা কর্ত্তব্যের কি বুঝে? জীবনের শিক্ষা শেষ না হইতেই তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সৎশিক্ষা লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থান কোথা? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, এই সময় হইতে শাশুড়ীগণ বধূদিগের কার্য্যকলাপ লইয়া খুঁটিনাটী আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে একটী বধূর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া সোনার সংসার ভস্মীভূত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। অধিকাংশ স্থলে নাবিকের দোষে যেমন তরণী জলমগ্ন হইয়া আরোহীদিগকে বিপন্ন করে, গৃহিণীর দোষে তদ্রূপ সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া তৎসহ যোগিগণকে সেই অনলে ভস্মীভূত করে।

প্রবাদ বচনেও আছে—

"গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট"

অতএব গৃহিণীর উদারচিত্ত হইয়া সকলকে সমান স্নেহ যত্ন প্রদান করাই কর্ত্তব্য। মৃদু ও মধুর বাক্যে বধূদিগকে উপদেশ প্রদান করা শাশুড়ীদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বনের পাখী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর যত্ন সহ লালন পালন করিতে হয়, পরে সে পোষ মানিয়া থাকে, একটী অপরিচিতা অবোধ অবগুণ্ঠিতা বালিকাকে গৃহে লইয়া আসিয়া, সমুচিত আদর যত্ন না করিলে সে বশীভূত হইবে কেন? এ সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভূদেববাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠে বেশ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়।

অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, প্রাচীনকালে বিশেষরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমর প্রাঙ্গণে, কি সংসার ধর্ম্মে, সকল স্থলেই আবশ্যক মত নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও রমণীহৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে কিছুকাল স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, স্ত্রীজাতি মনুষ্যজাতি মধ্যে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই সমাজে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমশিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। মধ্য সময়ের লোক ইহা বুঝিতেন না, সুতরাং ঐ সময় হইতে বধূদিগের প্রতি শাশুড়ীদিগের অযথা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন

সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সংবাদ পাওয়া যায়। হা দুর্দ্দৈব! কৌশল্যা, কুন্তী প্রভৃতি দেবীগণ, তোমরা এখন কোথা!!

"গতস্য শোচনা নাস্তি!!" সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখনও স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ করিলে সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়া সংসারে শান্তির আলোক দেখা যাইতে পারে।

রমণী জননী জাতি। সুতরাং উদার চিত্তে জগতে প্রেমার্পণ করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই আত্মার বাছাবাছি করিয়া থাকেন, উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে মিশাইয়া সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্বসেবারূপ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়খানিই প্রকৃত স্বর্গ। এইরূপ স্বর্গ লাভের চেষ্টা করা রমণীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্ষমাশীলতা স্ত্রীজাতির একটী প্রধান ভূষণ। যিনি ক্ষমাশীল, নশ্বর জগতের জীবের কথা কি, তিনি দেবতাদিগেরও আদরণীয়। যথা----

"অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ,
যোনৎহতঃ প্রতিহন্যান্বঃ থাতয়েৎ
হন্তশ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়স্ত্যাগতায়।

উদ্যোগ ৩৫/১২৭০

শাস্ত্র প্রকৃত স্ত্রীর লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তার মনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যা ও দেবতুল্যং করোতি হি।
বশ্যাভাবেন সুমনা সুব্রতা মুখদর্শনা। [য.]

অনুশাসন ১৪৬/৬৭৮৫ [য.]

অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া সুখদর্শনা হয়েন, সেই প্রকৃত স্ত্রী। আবার—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাককর্ম্মাভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী ॥ [য.]

আদিপর্ব্ব।

অর্থাৎ তিনিই ভার্য্যা যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষ ও পুত্রবতী এবং যাঁহার হৃদয় বাক্য ও কার্য্য সকল পবিত্র ও যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

রমণী মাত্রেরই প্রকৃত স্ত্রী হইবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃত চেষ্টার পুরস্কার শ্রীভগবান অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যথোচিতরূপে পালন করিতে পারি না, সেইজন্যই আমাদের এত অধঃপতন ঘটিতেছে।

"যাতাধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্ণবঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যচ কারকঃ ॥ [য.]

অর্থ—কূপখননকারী যেরূপ ক্রমে নিম্নগতি এবং প্রাচীরগাথক উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়, মানব সেইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে উচ্চতা ও নীচতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিজ উচ্চাভিলাষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমরাও সফলকাম হইতে পারিব।

নশ্বর জীবন কয়দিনের জন্য? সৎকীর্ত্তিই প্রকৃতজীবন, ভগিনীগণ! আইস আমরা সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত জীবন লাভের চেষ্টা করি, ভারত আবার সীতাসাবিত্রীর পবিত্র ছবি লইয়া ধন্য হউক।

ফাল্গুন ১৩০৪

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

## একালের শাশুড়ী বউ

আমাদের সমাজে একাদশ দ্বাদশ বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই অধিকাংশ কন্যার বিদ্যাচর্চ্চা পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ১৫/১৬ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, এবং তাহাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ কন্যারা বিবাহের পর শ্বশুরালয় গমন করিয়া আদর্শ বধূ হইতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ম বাঙ্গালি সমাজে বহুল প্রচলিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্কা বালিকা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার দু এক দিবসের মধ্যেই পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় আইসে। এখন হইতে সে বউ। তাহার স্বামীর পরিবারের মধ্যে সে একটি নবাগত ব্যক্তি। এই নূতন পরিবারের সকলেই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কয়জন তাহার যথার্থ আত্মীয়?

পরিবারবর্গ ও পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে নববধূ দেখা ও তাহার সমালোচনা করা প্রথম কর্ম্ম। পুরাতন প্রথা-মত শাশুড়ী স্বয়ং বউকে ঘরে তোলেন। বরকনে আসিবামাত্র একটা হুলস্থুল বাধিয়া যায়, সকলেই বউ দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে ব্যস্ত। সকলেই বর ও তাহার পরিবারের বন্ধু কিন্তু তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হন যে, পরিবারের মধ্যে বধূও একজন। এই ভ্রমে সমালোচনা আরম্ভ করিয়া কনের ও তাহার আত্মীয়গণের কুৎসা করিতে আরম্ভ করেন। দেখা গিয়াছে, এক স্থলে নববধূকে অভ্যর্থনা করিবার সময় সমাগত নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন, 'এমন সোনার চাঁদ ছেলে তার যোগ্য কি এই বউ?' কেহ বা বেয়ানের উদ্দেশ্যে উপহাস করিয়া সম্পর্ক বিরুদ্ধ কিছু বলিলেন। কেহ বলিলেন "বিবাহের যোড় ভাল হয় নাই। কি খেলো কাপড় দিয়াছে, আর অল্প টাকা দিলেই ভাল চেলি হইত।" কেহ-কেহ 'ওমা গহনা দেখ, যেন ফুঁ দিলে উড়ে যায়!' আর একজন বলিয়া উঠিলেন 'দানসামগ্রী দেখেছ কি? উহা কিরূপে সভায় বাহির করিয়াছিল? লজ্জা করে নাই?' নববধূর সম্মুখেই এইরূপ আরও কত কথোপকথন চলিতে লাগিল। কোন্ বউ নিখুঁত সুন্দরী, কাহার বৈবাহিক অনেক টাকা দিয়াছিল, এ প্রকার অনেক কথা সে সময় হইল। হায়। কেহ ভ্রমেও ইহা বিবেচনা করিলেন না যে, বধূ নিজের রূপ অথবা অর্থের ত্রুটি সম্বন্ধে কিছু প্রতীকার করিতে পারে কি না?

কন্যার তৎকালীন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। এইমাত্র সে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে। স্নেহময়ী মাতা, পিতা, ভগিনীর অশ্রুভরা মুখ সে এখনও ভুলে নাই, তার উপর মাতৃ-পিতৃনিন্দায় তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, আর সহ্য হইল না—কাঁদিয়া

ফেলিল। তখন একবাক্যে সকলে 'ওমা এত বড় মেয়ের কান্না কেন গো? চুপ কর, আর কেঁদ না,' ইত্যাদি বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, মধ্যে দুএকজন বউয়ের হইয়া দুচার কথা কহিলেন, কিন্তু দশজনের মুখের নিকট একজনের কথা কে শোনে? কাজেই তাঁহাকে নীরব হইতে হইল।

বিবাহের কনে প্রায় ৭/৮ দিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, সে কয়দিন ধরিয়া বউ সম্বন্ধে এইরূপে আন্দোলন হইয়া থাকে। সপ্তাহ গতে নববধূ পিতৃগৃহে গমন করে। সচরাচর বৎসরেক পর পুনরায় শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসে। তথায় আসিয়া বধূ দেখে তাহাকে কেহ মাতার মত স্নেহ করে না, বরঞ্চ কোন কাজ করিতে না জানিলে বা না পারিলে, কিম্বা তাহার দ্বারা সামান্যমাত্র কোনও ক্ষতি হইলে, তাহাকে ক্ষমা করা দূরের কথা, পরিবারস্থ সকলে শতমুখে তিরস্কার করেন। এ সময় তাহার কোমল মনে সম্ভবতঃ ইহাই উদয় হয় যে 'মা ত আমার সহিত এরূপে ব্যবহার করিতেন না. ইহারা কেন আমাকে এত তিরস্কার করে?' এ সময় বধূরা স্বামী ভিন্ন আর কাহারও ভালবাসা পায় না, এ নিমিত্ত সংসারের ভিতর তাহাকে আপনার বলিয়া জানে, সুতরাং সুখদুঃখের কথা স্বামীকে না জানাইলে প্রাণের কষ্ট ঘুচে না। এদিকে পুত্র নিজ মাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

শাশুড়ী ঠাকুরানী মনে করেন, বউ আসা পর্য্যন্ত পুত্র তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করে না। ভাবিলেন, ইহা বউমার শিক্ষা, কেননা মাতার চক্ষে আপন সন্তান মন্দ দেখা কঠিন।

ইহার পূর্ব্বে পুত্র আমার নিকট আসিয়া 'মা এটা দাও, ওটা দাও', কত কথাই বলিত এখন আর সে ভাব নাই। অনর্থক এ প্রকার কয়েকটি কথা মনে আন্দোলন করিয়া, অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া মনে মনে বউয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। বউ পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার লইবে ও তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে, এবং তাঁহাকে নিজ মাতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, পূর্ব্বে ইহাই তাঁহার মনে ধারণা ছিল । কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল কি? হয়ত বউ ভাল কাজ করিতে পারে না, কারণ তাহার মাতা গৃহস্থালির কার্য্য তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে কন্যাকে কেবল লেখাপড়া, কার্পেট বোনা ইত্যাদি এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং গৃহিণীর মনের মত বউ হইল না। তিনি প্রতিবাসিনীদের নিকট বৈবাহিকার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অধিকাংশস্থলে এই লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত হয়। বউ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। শাশুড়ীও বউমাকে আর সেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন না। অল্পমাত্র সাংসারিক কারণে পরস্পরের মনে অসন্তোষের বীজ জন্মিতে থাকে। এ অবস্থায় বউ একটু অন্যায় করিলে (জ্ঞানতই করুক বা অজ্ঞানতই করুক, তাহা বিবেচনা না করিয়া), সক্রোধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। এ অবস্থায় শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া অসম্ভব বলিতে হইবে। তৎপর বউ শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া আপন শিশুপুত্র কন্যাদিগকে অকারণে প্রহার করিয়া নিজের ক্রোধ শান্তি করেন, ইহাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। পৌত্রপৌত্রীকে বিনাপরাধে শাস্তি দেওয়া যেন তাঁহাকেই শিক্ষা দেওয়া, সুতরাং এরূপ অন্যায় অত্যাচারদর্শনে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতে সঙ্কুচিত হন না। শাশুড়ীর সহিত বাগযুদ্ধে আঁটিতে না পারিয়া পরিশেষে বধূমাতা

স্বামীর উপর সমস্ত রাগ ঝাড়িয়া তাঁহাকে পৃথক হইতে অনুরোধ করেন। কতক দিন দম্পতীর মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে, স্ত্রী শাশুড়ীর অধীনে থাকিতে একবারে অসম্মত। এজন্য মনে মনে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—নিশ্চয়ই ভিন্ন হইতে হইবে। স্বামী বেচারা মহাবিপদাপন্ন।

এদিকে স্ত্রীর অনুরোধ, ওদিকে গর্ভধারিণী মাতাকে ত্যাগ করা,—বিষম সমস্যা হইয়া পড়িল। কতস্থলে দেখা গিয়াছে বিপন্ন স্বামী এরূপ স্থলে দুইচারিটা আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর বাক্যরূপ স্রোতে ভাসিয়া গেল এবং নিজেও তাহাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল, সুতরাং পরিণামে স্ত্রীর জেদই বজায় থাকিল। পৃথক হইয়াও বধূর মনে উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিল না, শাশুড়ীর প্রতি আক্রোশ বদ্ধমূল রহিল। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় কিম্বা পীড়াকালে যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতেও অগ্রসর হইতে চাহেন না, বা এক কপর্দ্দক দ্বারা সাহায্য করাও আবশ্যক মনে করেন না।

সে কালের অনেক শাশুড়ী বউকে ভালবাসিতেন না, অপরন্তু কেহ কেহ বউয়ের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলেও তনু রোমাঞ্চিত হয়, সুতরাং ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে বউরা স্বাধীন হইতে আরম্ভ করিত। কোন কোন বউ হিংসা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িত না, কেহ কেহ বা মনের কষ্টে আত্মহত্যা করিত।

পাশ্চাত্ত্যরীতির অনুকরণেই হউক, কিম্বা সে কালের শাশুড়ীদিগের অমানুষিক ভয়ানক যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতেই হউক, একালের অধিকাংশ বধূ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বশীভূত হইতে চাহেন না। এখনকার বউরা আধুনিক শিক্ষাভিমানিনী (শিক্ষিত হউন বা না হউন) হওয়াতে আর শাশুড়ীদের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। প্রাচীনাদের গ্রাহ্য করা বা তাঁহাদের মতে কার্য্য করা নিজেদের পক্ষে অপমান মনে করেন। এজন্যই অনেকের মধ্যে সদ্ভাব থাকে না।

অনেকে ইহা অবগত নহেন যে, কিরূপ ব্যবহার করিলে পরস্পরের মনোবিবাদ জন্মিতে না পারে, সম্ভবতঃ আপন আপন উচিতানুচিত বিবেচনা করিয়া চলিলে কাহারও সহিত কলহ হওয়া সম্ভব নয়। শাশুড়ীর উচিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদি আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া বালিকা বধূ যখন প্রথম শ্বশুরগৃহে আসেন, তখন তাহাকে কন্যাসম যত্ন ও স্নেহ করা। যত্নে শোণিতা পিপাসু হিংস্রপশুও সিংহব্যাঘ্রও মানবের বশীভূত হয়। তবে বালিকাবধূ কেন শাশুড়ীর বাধ্য হইবে না? বধূ তাহার পিতা মাতার বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ বলিলে বিরক্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। একথাও মনে করা কর্ত্তব্য যে, স্নেহ না করিলে স্নেহ পাওয়া যায় না। বালিকাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে না, অতএব অপরের প্রতি মায়ামমতা একদিনে জন্মে না। ক্রমে ক্রমে সে যখন বুঝিতে পারিবে বাটীর সকলেই তাহাকে আপনার মত ভাবে এবং তদনুযায়ী স্নেহ করে, তখন তাহার ভালবাসা স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি জন্মিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই একদিন নববধূ হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে শাশুড়ীর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু নিজে শাশুড়ী হইলে আর পূর্ব্বের বিষয় স্মরণ করেন না। বধূ অবস্থায় যেরূপ দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আপন বধূর প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলে তাঁহ'' আদর্শ শাশুড়ী রূপে পরিগণিত হইতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ প্রবন্ধ পাঠে কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে, একালের সমুদায় শাশুড়ীই বউদের কষ্ট দেন ও তাহাদের সহিত বিবাদ করেন, কিম্বা সকল বধূগণ শাশুড়ীদিগের সহিত কলহ করেন ও পৃথক হন, তাহা নয়। অনেক শাশুড়ী বধূদিগকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করেন। কন্যা ও বধূকে সমচক্ষে দেখিলে, তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়া অসম্ভব, ইহা তাঁহারা অবগত আছেন। অপরন্তু এই ভাবেন, পুত্র একাকী ভালাবাসা ও সেবা যত্ন সমস্ত করিতে সক্ষম হইতে পারে না, এ জন্য তাহার প্রতিনিধিরূপে বধূ নিযুক্ত হইয়াছে; একারণে তাহাকেও নিজ তনয়ার মত স্নেহ করা উচিত। সুবুদ্ধিমতী শাশুড়ীর গুণে ও যত্নে মোহিত হইয়া বধূগণ আপনা হইতে তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং সুবোধ সুশীলা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে পরিবারবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। মাতার মত শাশুড়ী পাওয়াতে বধূও তাঁহাকে মাতৃসম ভালবাসেন, এরূপ স্থলে শ্রদ্ধাভক্তি আপনি জন্মে। লক্ষ্মীসম বধূর গুণে অনেক দুরন্ত শাশুড়ীও শান্ত হন। এ প্রকার সুগৃহিণীদের গৃহ সোনার সংসাররূপে পরিণত হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩০৫ শ্রীমতী সত্যবতী দেবী।

# গার্হস্থ্য প্রবন্ধ

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যে কি মধুর তাহা বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদ্‌গত করিয়া দেওয়া অসম্ভব। ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর সহকৃত প্রেম যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, পরম শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র জনক জননী যে প্রকার সুখ লাভ করেন, অসদ্ব্যবহার করিলে তদ্রূপ অসন্তোষে কালযাপন করেন। সুতরাং ভাই ভগিনীর প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার না করিলে, জনক জননীর প্রতিও সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। যাহাদের সঙ্গে শৈশবাদি একত্র বাস হেতু পরস্পরের আনন্দে আনন্দিত, দুঃখে দুঃখিত এবং বিপদে বিপন্ন বোধ করিয়া আসিতেছি। তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। ভাই ভগিনীগণের পরস্পর স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশপূর্ব্বক সতত মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অধুনা প্রায় সকল পরিবারেরই ভ্রাতৃবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কিরূপ আক্ষেপের বিষয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধরূপ মহাবিষ প্রবিষ্ট হইলে পরিবারস্থ সকলকে দুঃখ ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত করে। এখানকার মনুষ্যগণ যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাহাতে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করাই বিধেয়। পরন্তু এ কথা স্বীকার্য্য বটে যে, যদি সহোদরবর্গ পরস্পর প্রণয় ও সদ্ভাবে বদ্ধ হইয়া, সপরিবারে একান্নে সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ন্যায় ভাগ্যবান্‌ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ অতিশয় প্রার্থনীয় সুখামৃত সঞ্চারিত হইবার অতি অল্পকাল পরেই বিদ্বেষ বিষ বাহির হইতে থাকে। ভ্রাতৃগণের প্রত্যেকেরই কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, পরস্পরকে স্নেহযত্ন

সহকারে পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা বিধেয়। পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেক আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া, সকলকে সুখী করিতে পারিলেই, গৃহ শান্তিধামে পরিণত হয়।

প্রভু ও ভৃত্যের যে পবিত্র সম্পর্ক, তাহাও পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ভৃত্যদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট সেবা প্রাপ্ত হইতে হইলে, তাহাদিগকে পরুষবচন না বলিয়া, সদয়ভাবে সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজের স্বভাবও অকলঙ্কিত হয়। যদি দেখা যায় ভৃত্যের স্বভাব অতিশয় দূষিত ও শাসনের বহির্ভূত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যকে অন্যত্র যাইতে বলাই বিধেয়। কারণ, দুষ্ট লোককে পরিবারে আশ্রয় দিলে, বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। যদি তাহার দোষ ত্রুটি সামান্য হয়, তাহার প্রতি কোমল শাসন বা ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

অতিথি এবং গৃহ পালিত জীবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করাও পারিবারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। অতএব এ দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধন হইল না জানিতে হইবে।

সাংসারিক সর্ব্ব কার্য্যে নিপুণতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পুরুষ গৃহকার্য্য সম্পাদনোপযোগী দ্রব্যসকল সংগ্রহ করিয়া দিবেন ও স্ত্রী সেই সকল দ্রব্য গুছাইয়া লইয়া পরিপাটীরূপে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সুগৃহস্থ হইতে হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য হইত অতি বৃহৎ কার্য্য পর্যন্ত প্রত্যেক কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা প্রয়োজন। পরিবারের সকলে যাহাতে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়, স্ত্রীলোকের সে বিষয়ে গভীর মনোযোগ দান প্রয়োজন। এ জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করা ও নিয়মমতো পরিশ্রমের বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ দেশবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছেন, কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিলেই আমরা দূর করিতে পারি। ইংরেজ জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ৫০/৬০ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিরাও রীতিমত ভ্রমণ, কুর্দ্দন প্রভৃতি অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্যে সতত রত থাকেন। দীর্ঘজীবী মহাত্মাদিগের জীবনেও পরিদৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই রীতিমত অতি প্রত্যূষে, চারি কি সাড়ে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পক্ষীদিগের কলকণ্ঠের সহিত স্বীয় কণ্ঠস্বর ও বিধাতার গুণগান মিলিত করিতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহারা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা খাদ্য বিষয়েও অতিশয় পরিমিতাচারী ছিলেন। বস্তুতঃ, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেই কার্য্যপটুতা লাভ সহজ। আমরা অনেক সময়ে অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই। আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্তন করিলে, সেগুলি সমূলে বিনষ্ট হয়, অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করি। আবার আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যাই। ঈশ্বরদত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সমুদায়ের সুব্যবহার, মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, ব্যায়াম, দেহ সম্মার্জ্জন প্রভৃতি দীর্ঘায়ু লাভের অব্যর্থ উপায়। বস্ত্র এবং শয্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া নিতান্ত উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক-যুবতী পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে কার্য্য করা অজ্ঞানতা মনে করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে কতিপয় সুপ্রথা পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া

আসিতেছিল। সেগুলি অবজ্ঞা করিলে পীড়িত হইতে হয় সন্দেহ নাই। প্রাতঃকালে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, গোময় প্রক্ষেপ ও সন্ধ্যাকালে পুনরায় চারিদিকের সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, ধূনা দেওয়া আবশ্যক। এতদ্দ্বারা বাড়ীর বাতাস পরিষ্কার হয় এবং স্বাস্থ্য উত্তম থাকে।

(ক্রমশঃ)

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৬

## গার্হস্থ্য প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহকর্ত্রী নিজে রন্ধনকার্য্য না করিলে বা রন্ধনের তত্ত্বাবধান না লইলে, রন্ধন কখন পরিষ্কৃত ও উত্তম হয় না। পানীয় জল প্রতিদিন পরিষ্কার পাত্রে ধৌত করিয়া রাখা হয় কি না, এ সব সামান্য বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। পরিচারকদিগের হস্তে খাদ্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত অবিধেয়। গৃহের জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখা হইল কিনা, গৃহপালিত জীবজন্তুগুলি রীতিমত আহার্য্য পাইল কি না ও সযত্নে রক্ষিত হইল কিনা, প্রতিদিন এ সকল বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ জন্যই ইংরেজদিগের কাব্যে "গৃহস্বামীর সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট হওয়া উচিত" এই নীতি কথাটা শুনিতে পাই। একদা জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনার ঘোড়ার এরূপ পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইল?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "প্রভুর চক্ষু দ্বারা।" বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গৃহের যে কার্য্যে প্রভুর সুদৃষ্টি না থাকে, তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। গৃহকর্ম্মে ও সাংসারিক ব্যয়ে সতত ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কোন একটী কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, গৃহস্বামীর নিজের সে বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা উচিত। যদি গৃহস্বামী পরিচারক অথবা অপর কোন লোকের উপর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে সে কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হয় না। যদি কেহ যথার্থই নিজের কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অন্যের উপর ভার দিয়ে, নিশ্চিন্তে না থাকিয়া, নিজেরই আপন কর্ম্মে মন দেওয়া উচিত। কথামালায় উল্লিখিত "সারসী ও তাহার শিশু সন্তান" নামক গল্পটী দ্বারা আমরা ইহার সত্যতা অনুমান করিতে পারি।

স্বয়ং সাধারণ ভাবে, অর্থাৎ বিশেষ মনোযোগ না করিয়াও, কোন কার্য্য করিলে যেরূপ সুসম্পন্ন হয়, অপরে যত্নের সহিত সেই কার্য্য করিলেও তদনুরূপ হয় না। "ইসপের গল্প" নামক গ্রন্থে বর্ণিত "গোশালে প্রবিষ্ট হরিণ" নামক গল্পটী এ বিষয়ের যাথার্থ্য সুন্দর রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলেই, তদ্বিষয়ে আপনাকে মনোযোগী হইতে হইবে। গৃহের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি গৃহস্বামীর সুদৃষ্টি না থাকিলে, গৃহকার্য্যসমূহ কোন কালেই উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না।

নরনারীকে এইভাবে স্বীয় গৃহ সুগঠিত করিতে হইবে যেন সেই গৃহপালিত সন্তান, আত্মত্যাগ, বিনয়, সত্য ও সাধুতা প্রভৃতি গুণরাজি দ্বারা বিভূষিত হয়। সেই গুণরাশি কালকের জীবন সংগ্রামে যেন ঢাল তরবারির কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যখন সে বিপদ পরিপূর্ণ সংসার মরুভূমির উপর দিয়া বিচরণ করিবে, তখন গৃহের অভ্যন্ত উপরি উক্ত সুধাময় গুণাবলী অদৃশ্য স্বর্গীয় দূতের ন্যায় বালকের সহায় হয়, এবং নিরাশার মধ্যে হৃদয়ে আশার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়।

গৃহিগণ নিজ নিজ গৃহ উল্লিখিত গুণসমূহে সুশোভিত না করিলে, তাঁহারা নিজেরাও সুখ শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন না এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানগণ হইতে কেবল স্বার্থপূর্ণ ও মৌখিক শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবেন। নরনারীর প্রভাবেই গৃহ শান্তিধামে পরিণত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিতে পারে, আবার নরনারীর অযথা আচরণে সুখশান্তিপূর্ণ গৃহ পিশাচাগারে পরিণত হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গৃহের যাবতীয় সুনীতি ও সুশৃঙ্খলা; পারিবারিক শিক্ষা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এ সমস্তই একটী মহতী নীতির অন্তর্নিবিষ্ট। সেই নীতি সূত্রটী এই— সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন। যেমন একমাত্র ধান্যপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে তূষ, তণ্ডুল, অন্ন, চিপীটক, খৈ প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রীই প্রস্তুত করা যায়; যেমন দুগ্ধ প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা দধি, মাখন, ঘৃত, ছানা, প্রভৃতি বাহির করা যায়; সেইরূপ একমাত্র বিশ্ব-দেবতার চরণারবিন্দে প্রাণ মন সংযোগ করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি সর্ব্বসম্পদই সুলভ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের সহবাস এমনই মধুর, এমনই শীতল স্পর্শ, এমনই মোহ-নিবারক, এমনই সন্নীতি-প্রস্ফূরক যে, একমাত্র তাহাতে যোজিত-চিত্ত হইলে, দম্পতীর হৃদয়ের সর্ব্বসন্তাপ নিবারিত হয়। অন্তঃকরণের অপসংস্কার অপনোদিত হয়, স্মৃতিশক্তির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের শুভ্র কিরণ প্রবিষ্ট হয়। দম্পতী যদি সেই জ্ঞানের আলোকে নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিতে অভ্যাস করেন, তবে অচিরেই তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনসমূহ স্ব স্ব সন্তানদিগকে সৎপথে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয়। আর তন্নিবন্ধন অচিরেই সমস্ত পারিবারিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়। অতএব নরনারীর সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রাণমন সমর্পণ করা অত্যাবশ্যক।

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬

শ্রী বিনোদিনী সেন
পূর্ণিয়া।

## রমণীর কার্য্যক্ষেত্র

উদারনীতিপরায়ণ পুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিরীক্ষণপূর্ব্বক চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে কার্য্যও পৃথক পৃথক হইলে সমাজের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সমধিক সম্ভাবনীয়।

নরনারী উভয়ের মনোবৃত্তিনিচয়ের বিভিন্ন বিকাশ, প্রবণতা ও অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের বিচিত্র বর্দ্ধনশীলতা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, উভয়ের ক্রিয়া প্রাঙ্গণে একটী বিভেদক প্রাচীর বর্ত্তমান; ঈদৃশ সীমাচিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়াই সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিদেরা মনে করেন পুরুষ মস্তিষ্কের কার্য্যে এবং স্ত্রী হৃদয়ের কার্য্যে শ্রেষ্ঠ; পুরুষ রুক্ষশাসনে তৎপর, স্ত্রী প্রেমের কমনীয় কান্তির সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যে হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ। একটী ছিন্নবসন পরিহিত দীন দরিদ্র অথবা শীর্ণকায় জরাজীর্ণ অসহায় ব্যক্তি স্ত্রীলোকের হৃদয় সমুদ্রে যেমন সহজে দয়ার তরঙ্গ তুলিয়া তাহার নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুনদী প্রবাহিত করিতে পারে, পুরুষের বজ্রকঠিন প্রকৃতির উপর তাহার তাদৃশ প্রভাব বিস্তার সুদূর পরাহত।

এই সুবিস্তৃত সংসারসমুদ্রে মাতৃ-স্তন শিশুজীবনের ভেলাস্বরূপ। উহাকে অবলম্বন করিয়াই অসহায় শিশু প্রাণান্তিক শত্রুকুলে পরিবেষ্টিত হইয়াও সুখে ও নির্ভীক হৃদয়ে সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, আবার যাহার বিবর্ত্তনে, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতুনিচয়ের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, সেই অযত্নসম্ভূত অনায়াস লভ্য পদার্থ শিশু মাতৃস্তন হইতে গ্রহণ করিয়াই দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। পরন্তু পুরুষ সেই স্বাভাবিক সম্পদে বঞ্চিত।

ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাগণ গৃহকার্য্য সন্তানপালন ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা দরিদ্রের দুঃখমোচন মাতৃপিতৃহীন সন্তানের পালন এবং ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী থাকেন। দিগন্ত-বিশ্রুত-নামা ওয়াশিংটনের পত্নী একটী আদর্শ মহিলা। ইনি স্বামীর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াও একদিকে যেমন স্বহস্তে রন্ধনাদি সমাধা করিতেন, আশ্রিত ও আগন্তুক ব্যক্তিবর্গের পানাহার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, অপরদিকে তেমনি গভীর মস্তিষ্ক বিলোড়ন পূর্ব্বক আবশ্যকতানুসারে রাজনীতি প্রভৃতি জটিল ও দুরবগ্রাহ্য তত্ত্বে স্বামীর সহায়তা করিতেন।

ভগিনী ডোরার অতলস্পর্শ হৃদসমুদ্রে সন্তরণ করিলে কাহার না প্রাণ পূর্ণতায় প্রসারিত হয়। ফলতঃ অন্তরে সুগভীর অনুরাগ ও অদম্য উৎসাহ সঞ্চারিত হইলে করুণাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে স্ত্রীজাতি হৃদয় বৃত্তি বিস্ফূরণে কতশত অনুকূল উপায়ই না প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ বিশ্বসংসারে কত লোক রোগ শোক দরিদ্রতায় প্রপীড়িত; কত লোক আমাদিগের চতুর্দিকে তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, অভাবের তাড়নায় নিষ্পেষিত, কিন্তু কাহার প্রাণ পুণ্যশীলা ভগিনী ডোরার ন্যায় পরদুঃখে কাতর? কাহার প্রাণ সেই পবিত্রহৃদয়া কামিনীর ন্যায় সেবাব্রতে ব্রতী? কাহার প্রাণ তাঁহার ন্যায় এই ব্যাধিময় সংসারে চিকিৎসালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক রুগ্ন ও ভগ্ন প্রাণকে ক্লেশের করাল হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর ও আকুল?

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক সদাশয়া মহিলা দেশ, কাল ও জাতির বিচার না করিয়া দলে দলে নানাস্থানে গমনপূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী ও ভগিনীর ন্যায় স্নেহে কত শত রোগী দুঃখীকে নিরন্তর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্ত করিতেছেন। অনেক ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক অজ্ঞ মহিলাকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত করিয়া দিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে গৃহকার্য্য সন্তানপালনাদি লইয়াই অধিকাংশ স্ত্রীলোক ব্যস্ত; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; আজকাল কেহ কেহ বিদ্যালোচনাতে মনোনিবেশ করিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের

সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনীয়। গৃহকার্য্য সন্তানপালন আত্মীয় স্বজনের সেবা এই সকলের মধ্যে আমরা লিপ্ত রহিয়াছি সত্য, কিন্তু গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য, সন্তানপালনে অভিজ্ঞতা, আত্মীয়বর্গের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার— এ সকল বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে সামান্য একখানি চিঠি শুদ্ধরূপে লেখাও কষ্টকর। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈধব্যদশাগ্রস্ত, তাঁহাদিগের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্যক্ষেত্র প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা আপনাদিগকে দুর্ভাগ্যজীব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়াও দেখিতেছেন না যে এদেশে পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা ও পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুর প্রতিপালনের জন্য সুদূর আমেরিকা ইউরোপ হইতে দয়াবতী মহিলারা দলে দলে আগমন করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চারিদিকে প্রদর্শন করিতেছেন!

অন্যান্য দেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে স্বালম্বনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এদেশে ভদ্রসমাজে অধিকাংশ স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কিছুই শিক্ষা করেন না। পিতা ভ্রাতা স্বামী ও পুত্রের উপর তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্ভর করে, অসময়ে আত্মীয়বিহীনা হইলে দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। যদি বিদ্যা ও কার্য্যাদি শিক্ষা এদেশের স্ত্রীসমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত তবে আর এসকল দুঃখপূর্ণ অবস্থা গোচর হইত না।

অপরাপর দেশের স্ত্রীলোকেরা যে সকল সৎকার্য্য দ্বারা জীবন অলঙ্কৃত করিতেছেন, আমরা কেন সে সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিতেছি না? ভগবান যে উপাদানে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরাও কি সেই উপাদানে গঠিত নই? তাঁহারা যেরূপ বল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ বলশালী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে কিনা তাঁহারা সুশিক্ষা কৌশলে ও অবিশ্রান্ত অনুশীলনে সেই সমস্ত শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, পরমেশ্বর প্রদত্ত অক্ষয় ধর্ম্মভাণ্ডারে প্রত্যেকেরই যে প্রবেশাধিকার আছে, উদ্যমশীল মানবগণ স্ব স্ব জীবনের উদাহরণে এই মহাসত্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ফলতঃ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে সফলতা লাভোপযোগী অনুকূল ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চারিদিকে অসংখ্য কর্ত্তব্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। অভিরুচি ও উদ্দেশ্যভেদে যিনি যে ক্ষেত্রেই কেন অবতীর্ণ হউন না, সমস্ত বৈষম্যের মধ্যেই একটী সাম্যভূমি আছে, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটী স্থলে একতা বিদ্যমান। সেই সাম্যভূমিই সাধনভূমি; স্বভাবের নিয়মানুসারে সদৃঢ় সংযত নিষ্ঠা সমন্বিত একাগ্রচিত্ত ও আগ্রহবান হইলে এই সাধনভূমি অসংখ্য ফুলে ফলে সুশোভিত হয়, ইহা একটী অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। অতএব প্রকৃত গৃহিণী, পত্নী ও কন্যা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে সুশিক্ষার অধীন হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহকার্য্য যেমন আবশ্যক অপরাপর কর্ত্তব্যগুলিও তেমনি প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সুফলের প্রত্যাশা করা যায়। গৃহের যাবতীয় লোকদিগের স্বাস্থ্য গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। তিনি যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী অবগত হন ও তদ্রূপ কার্য্য করেন, রন্ধন, পানীয় ও পরিচ্ছদাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেন, তবে সকলেই স্বাস্থ্যসুখভোগ করিতে পারে।

স্ত্রীর মিতাচারিতার অভাবে অনেক স্বামী দরিদ্রাবস্থাপন্ন ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হন। 'ক্ষুদ্র

একটী ছিদ্র' যেমন বৃহৎ জাহাজকে জলমগ্ন করে' তদ্রূপ গৃহিণীর একটী সামান্য দোষও ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্যের প্রধান কারণ স্বরূপ হয়। মিতাচারিতা বা অমিতাচারিতা দ্বারা ঐহিক সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কেবল সাংসারিক কার্য্যে নয়, ব্যবহারেও মিতাচারিতা প্রয়োজন। পিতা মাতা পতি পুত্র কন্যা ও অপরাপর সকলের সঙ্গে ব্যবহারে মিতাচারিতা অবলম্বন না করিলে উহা সীমা অতিক্রম করে এবং জীবনে বিষময় ফল প্রসব করে। বিপদ ও দরিদ্রতার জন্য পূর্ব্ব হইতে আপনাকে প্রস্তুত না করিলে অনেক কষ্টে পতিত হইতে হয়।

সৎকার্য্যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মণিমাণিক্য অপেক্ষাও মূল্যবান। চরিত্রের বল ও কার্য্যকারিতার আশা করিলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আবশ্যক। নির্ভীক থাকিলে ও বুদ্ধিশক্তি স্থির রাখিলে ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবনপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেমন আবশ্যক, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভের জন্য শৃঙ্খলা তদ্রূপ প্রয়োজন। রন্ধনাগার, পরিচ্ছদাগার অধ্যয়ন-গৃহ, শয়নগৃহ, সূচিকার্য্যালয়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই শৃঙ্খলা চাই, এতদ্ব্যতীত যখন যাহা প্রয়োজন তাহা প্রাপ্ত না হইয়া ত্যক্তবিরক্ত হইতে হয়। নিয়মপূর্ব্বক কার্য্য করিলে প্রকৃতি তেজস্বিনী হয় এবং বিরক্তিজনক ঘটনার সম্ভাবনা কম থাকে।

গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারবর্গের প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, দয়া এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ আচরণও আবশ্যক। নতুবা গৃহের সন্তানসন্ততি ও দাসদাসীর নিকট উহা আশা করা যায় না এবং সুখশান্তি সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলে আনন্দের সহিত আদেশ পালন করে। সত্যপরায়ণা দয়াবতী ও ধার্ম্মিকা গৃহিণীকে যুবা বৃদ্ধ সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে বাধ্য হয় এবং আপনাআপনি তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।

গৃহস্থ দাসদাসীর সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিরাখা প্রয়োজন, কারণ প্রভু ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাদিগের প্রাণ মন ও আত্মা ক্রয় করেন না, কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করেন মাত্র। তাহাদিগকে স্নেহ মমতা দ্বারাই বশীভূত করা যায়।

এই সকল বিশেষ বিশেষ গৃহকর্ম্মের ও ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক পরিবার এক একটী রাজ্য বিশেষ। এই রাজ্য শাসনে উৎকৃষ্ট জ্ঞান, গম্ভীর বিচারশক্তি, পরিপক্ক অভিজ্ঞতার নিপুণতা, পরিশ্রম এবং সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা আবশ্যক।

প্রজাশাসন অপেক্ষা পরিবার শাসন কম কঠিন নয়। ইহা শিক্ষাবিহীন লোকের শক্তি সাধ্য নহে। পুরুষজাতির মধ্যে উত্তম রাজা অতিশয় বিরল নয়, কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তম গৃহকর্ত্রী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনুপযুক্ত রাজা যেমন রাজ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য বিশেষ, অজ্ঞ স্বার্থপর অশিক্ষিত অলস চরিত্রবিহীন গৃহিণীও তেমনি গৃহের পক্ষে অতিশয় দুরদৃষ্ট বিশেষ। তাই বলি গৃহরাজ্য পালনে রাজ্যশাসন অপেক্ষা কম বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োজন নয়।

গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে অপরাপর হিতকর্ম্ম সাধনও আবশ্যক। যখন আমরা দেখি সামান্য কৃষক হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই পরোপকারার্থে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন তখন একজন গৃহকর্ত্রীই কি কেবল সৎকার্য্য সম্পাদনে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবেন? নিঃসম্বল উদাসীন সন্ন্যাসী যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পথক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত

পথিকদিগের উপকারার্থে নির্জ্জন মরুভূমির পার্শ্বে বৃহৎ কূপ খনন করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন তবে এই ধনধান্যপূর্ণ সংসারে অবস্থান করিয়া একজন গৃহকর্ত্রী কেন না সাধারণের হিতকর কার্য্যসাধনে অধিক সমর্থা হইবেন?

শিক্ষা অভাবে আমরা গৃহকার্য্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানপালন, চরিত্রগঠন আত্মীয়বর্গের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার এবং অভাবের তাড়নায় বা ঘোর দারিদ্র্য নিষ্পেষণেও অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ রহিয়া জীবনের সাফল্য সাধন করিতে পারিতেছি না। অন্ধের মত জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি। আবার যাহারা বৈধব্য দশাগ্রস্ত, পরাধীনভাবে কত কষ্টে তাহাদিগকে দিনাতিপাত করিতে হয়। পীড়িতের সেবা, পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়ের পালন, ইঁহাদিগের অনায়াসসাধ্য হইলেও এসকল বিষয়ে ইঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না। কেহ পরপ্রত্যাশী হইয়া কেহ বা অলসভাবে এমন মহামূল্য জীবন অতিবাহিত করেন। বিশুদ্ধ হৃদয়ে ইঁহারা জগতে অনেক কার্য্য করিয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারেন।

যতদিন আমাদিগের দেশে প্রত্যেক গৃহের স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম সন্তানপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়সকল সম্যক্‌রূপে অবগত না হইবেন, অর্থকরী কোন বিদ্যা ও চরিত্রগঠন বিষয়িনী শিক্ষা প্রাপ্ত না হইবেন, ততদিন এ দেশীয় ললনাকুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা অলীক কল্পনা মাত্র।

এস ভগিনি, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া পবিত্র এবং মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক আমরা জীবনের সদ্ব্যবহারে অগ্রসর হই। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মহাপ্রভু আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন, আমাদিগের জীবন ধন্য হইবে এবং শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা ইহজীবন অবসান করিয়া পরজীবনে প্রবেশ করিতে পারিব—-ইহপরজীবন ধন্য হইবে।

বৈশাখ ১৩০৭ — শ্রী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

## বিবাহিত জীবন

মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। বিবাহদ্বারা মনুষ্য সেই ধর্ম্মসাধনের সহায়তা লাভ করে। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই বিবাহ এত পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। বিবাহ দ্বারা দুইটি অপূর্ণ মানব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; উভয় মানবাত্মা একত্রীভূত হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। দম্পতীর প্রেম পবিত্র হইলে, তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। নিত্য তাঁহারা একাত্মা হইয়া ভগবানের পূজায় প্রাণমন সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ, মনুষ্যজীবনে বিবাহ একটা অতি পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। জীবনে এ কর্ত্তব্যটি সুসাধন করা অতিশয় সহজ ব্যাপার নয়। এ কর্ত্তব্যে সাধুতা, প্রেম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হইতে পারে । এ কার্য্যক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এ পবিত্র কার্য্যের জন্য আমরা নিজেকে কতদূর উপযুক্ত করিয়াছি। নম্রতা, সুমিষ্ট ব্যবহার, অকপট ও বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত পতির জীবনেব সৎসঙ্গী হইতে পারিব কিনা

সে বিষয় পূর্ব্বে চিন্তা করিতে হইবে। মনুষ্যের চরিত্র স্ত্রীলোক দ্বারা গঠিত। কারণ তিনি শৈশবে জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়া প্রাঙ্গণে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, যৌবনে পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন। এজন্যই জ্ঞানীগণ বলেন, মানবের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবের বীজ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী-চরিত্রে বপন আবশ্যক। স্নেহময়ী জননীর প্রভাব যেমন বালকের জীবনে কার্য্য করে, প্রেমময়ী ভার্য্যার প্রভাবও তেমনি যৌবনে পতির জীবনে কার্য্য করে। পতির হৃদয় পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে পরাজিত হইলে, তাহার জীবনের উপর পত্নীর প্রভাব অধিকতর বিস্তারিত হইতে পারে।

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, অসদাচারী স্বামী পত্নীর পবিত্র প্রেমের প্রভাবে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার স্ত্রীর চরিত্রহীনতা হেতু অনেক সজ্জনকেও বিপথে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। বাপ্পা রাউ, গ্যারিবল্‌ডী, নেপোলিয়ান, গ্ল্যাড্‌স্টোন প্রভৃতি জগতের 'বিখ্যাত' মনীষীবৃন্দ সকলেই পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সচরাচর আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বিপদে ও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে, পুরুষ অনেক সময় পত্নীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রোৎসাহিত হন। সুতরাং এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা নিঃসংশয়রূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে যৌবনে পত্নীর প্রভাব মনুষ্যজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রসব করে। বিষম দরিদ্র ও দুঃখপূর্ণ অবস্থাতেও সুনিয়ম, শৃঙ্খলা সংযমন প্রভৃতি দ্বারা তিনি জীবনে কষ্ট দূর করিয়া, প্রেমবিস্তার পূর্ব্বক সুখ বিধান করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমময়ী পত্নী আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, পতির উন্নতিতে মগ্ন থাকেন এবং স্বামীর জীবন প্রবাহের সহিত আপনাকে ভাসমান করেন। জ্ঞানবতী ও বিচক্ষণা স্ত্রী স্বামীর সৎস্বভাবরূপ পুষ্পে যখন কোন অনিষ্টকারী কীট প্রবিষ্ট হইতে দেখেন তখন তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই সকল কারণেই, জ্ঞানিগণ বলেন স্ত্রীলোকের পক্ষে, এ জগতে উৎকৃষ্ট স্বামী লাভ করা স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পুরুষের পক্ষেও এ জগতে সাধ্বী ও গুণবতী স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। যদি একে অপরকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে নাও পারেন, তথাপি জীবন-পথের সৎসঙ্গী হইবেন সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে সহায়তা করিয়া বিপদ লঘু করিতে পারেন, আনন্দ পরিবর্দ্ধন, তৎসঙ্গে মানসিক সদ্ভাব দৃঢ় করিতে পারেন।

দাম্পত্য জীবনের মঙ্গলের জন্য উভয়কে উভয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকের চরিত্রেই কিছু না কিছু ত্রুটির ন্যায় গুণ থাকা সম্ভব। স্বামীর চরিত্রে যে সকল সদ্ভাব বর্ত্তমান স্ত্রী তাহা গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকে, স্বামী তাহার অংশভাগী হইবেন। আমরা অনেকেই স্বীয় অজ্ঞানতা বিষয়ে অন্ধ। দম্পতী পরস্পরে প্রকৃত প্রেমে সম্মিলিত হইয়া, একে অপরের চরিত্রের অজ্ঞতা ও তাহার ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিবেন। এ সকল কার্য্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অতিশয় প্রয়োজন। তৈলবিহীন দীপ যেমন প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্যনিচয় তদ্রূপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই সকলের অভাবে দাম্পত্য জীবনে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। একে যে বিষয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করিবেন, অপরে কিছুতেই তাহাতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিবেন না। যদি তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমিত না হয়, সদ্ভাবে উভয়ে একত্র হইয়া, সে বিষয়ের মীমাংসা করিবেন ও একমতাবলম্বী হইবেন। সংসারের অন্ধতামসে যদি কেহ পথভ্রষ্ট হন, অপরে জ্ঞান লণ্ঠন

হস্তে করিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবেন। উভয়ে উভয়কে প্রকৃত প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিলে 'বাহিরের ক্লেশ ও প্রলোভন হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ' হওয়া যায়। আত্মীয় পরিজন সন্তান-সন্ততি বা দাসদাসী সমীপে উভয়ে কখনও মনোমালিন্য প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে উভয়েরই অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দম্পতী পরস্পরে এরূপ ব্যবহার করিবেন যে, তদ্দ্বারা পতিপত্নী জনকজননী গৃহকর্ত্তা গৃহিণীর ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষা পায়। পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান দৃষ্ট হইলে, তাহার মূলকারণ এইটী জানিতে হইবে যে সেই গৃহের দম্পতী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সম্মানপরায়ণ।

স্ত্রী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম্মালঙ্কৃত হইলে স্ত্রীচরিত্র অপূর্ব্ব শোভান্বিত হয়। সতীত্ব দ্বারা মানবী দেবী বলিয়া অভিহিতা ও পূজিতা হন। পুরাণ গ্রন্থে অনেক পতিব্রতা নারীর অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সতী প্রভৃতি মহিলাকুল একমাত্র পতিপরায়ণতা গুণেই জগতের নমস্যা ও পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন। বাস্তবিক যে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্য নিজের রুধির বিন্দু বিন্দু উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ধন্যা।

প্রকৃত দম্পতীযুগল, পরস্পর পরস্পরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া সাধ্যানুরূপে সংসারধর্ম্ম সমাপনান্তে আপনাদের অস্তিত্ব সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের মহাসত্তাতে নিমগ্ন করিয়া কৃতার্থ হন। চরিত্রবতী স্ত্রীর জীবনস্রোত পতির জীবনস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে জগতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। ফলতঃ দাম্পত্য জীবন বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হইলে এবং দম্পতীর প্রেম পবিত্র প্রেমের আধার প্রভু ভগবানের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলে, জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্যের আর অবধি থাকে না। দাম্পত্য প্রেম প্রভাবে যদি জগতের কোন উপকার সাধিত না হইল, যদি পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় প্রতিপালিত না হইল এবং সেই প্রেম বিশুদ্ধভাবে প্রেমের জলধিতে গিয়া না মিশিল, তবে দাম্পত্যজীবন বৃথা।

মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৭ — শ্রী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

## স্বর্গগতা মাতৃদেবী অপূর্ব্বসুন্দরী ঘোষ*

আজ আট মাস হইল আমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানী ইহসংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমাদের গৃহ শূন্য ও ঘোর অন্ধকারময়! শত অনুসন্ধানেও তাঁহাকে আর পাইব না, তবে তাঁহার গুণরাশি মনে হইলে বিমল আনন্দ অনুভব করি বলিয়া আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

জননীদেবী সে কালের বাগবাজারের "ব্রহ্ম" উপাধিধারী দত্ত বংশোদ্ভবা ছিলেন। তখনকার সময়ে দত্ত মহাশয় ধনে ও মানে কলিকাতার মধ্যে এক প্রসিদ্ধ বংশ ছিলেন।

* ঝামাপুকুর নিবাসী বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পত্নী, ৩ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের লেন।

জননীদেবী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনও ইঁহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মার মুখে এরূপ গল্প কতবার শুনিয়াছি যে তাঁহার শৈশবাবস্থায় যে দাসী তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিত, তাহাকে দেশী বস্ত্র পরিতে হইত; কারণ, কোন সময়ে তাঁহার পিতামহ দাসীকে মোটা বস্ত্র পরিয়া তাঁহার আদরের পৌত্রীকে কোলে লইতে দেখিয়া দপ্তরখানায় বলিয়াছিলেন যে, যে দাসী শিশুকন্যাপালনে নিযুক্তা, তাহাকে যেন দেশী বস্ত্র পরিহিতা রাখা হয়, তাহা না হইলে "মেয়ের গায়ে ছড় যাইতে পারে।" এরূপ হইবার কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে; বংশের মধ্যে আমার দাদামহাশয়ের দুই কন্যা ব্যতিরেকে আর কেহই ছিল না, তাহাতে আমার মা আবার কনিষ্ঠা ছিলেন। যাহা হউক, এইরূপ ভালবাসার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তিনি বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করিলেন। সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে মানুষ যখন হীনাবস্থা পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার সকল বিষয়েই একটা অস্ফুট অভাব অনুভূত হয়। সে অভাবের অনুক্ষণ পূরণ না হইলে মনকে বিমর্ষ করিয়া তুলে। এ ক্ষেত্রে মা'র আমার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিল। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এমন সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, যখন যে অবস্থায় পড়িতেন, তখনই সেই অবস্থায় আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। কাজেই স্বামিগৃহে আত্মীয়বর্গের নিকট শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পারিবারিক কার্য্যে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শ্বশুরের অল্প আয় সত্ত্বেও সংসারে অল্পদিনের ভিতর এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তাহা অনুমানে সম্যক বুঝা যায় না। পারিবারিক জীবনে এমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার শ্বশুরকুলে আত্মীয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু আজীবন এরূপ সমভাবে তাঁহাদিগের সকলকার পরিচর্য্যা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। বড় মানুষের ঘর হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আসিলে সকলেরই মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা বাড়িয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সে দোষ মাতাঠাকুরাণীকে লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই। কুমারী-জীবনে পিতৃগৃহে সাংসারিক কার্য্য তাঁহাকে কিছুই দেখিতে হইত না। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তিনি রন্ধনকার্য্য পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডাইল চড়াইয়া সাংসারিক অন্য কি কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন তাঁহাকে উহা নামাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি তখন সদ্য-পরিণীতা কূলবধূ, রন্ধন-বিদ্যার কিছুই ধার ধারিতেন না। কাজেই তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন; আবার ওদিকে "জানি না" বলিলে তখনকার দিনে সকলেই নিন্দা করিবেন। এই ভয়ে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে খুব অধিক পরিমাণে লবণ ও মরিচ বাটা দিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদেশ পালন করিলেন। অবশ্যই ভোজন-বেলায় তাহা কাহারও মুখে উঠিল না; কিন্তু এই অপারদর্শিতাই ভবিষ্যতে রন্ধন বিদ্যায় তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট শিল্পী করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার শ্বশুরের সামান্য মাত্র আয় ছিল; কাজেই সে আয়ে ৭/৮টি পুত্রের ভরণপোষণ ও তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল। আর্থিক ব্যাপারে সাহায্য করার ভার ঠাকুরদাদার কনিষ্ঠের উপরেই ন্যস্ত হইল। সে কালে তিনি রাজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কনিষ্ঠ দাদামহাশয়ের আংশিক সাহায্য সত্ত্বেও অনেক সময়ে দাদামহাশয়কে ছেলেদের সাময়িক অভাব নিবৃত্তির নিমিত্ত আকুল হইতে হইত। কনিষ্ঠ এসব বিষয়ে মুক্তহস্ত হইলেও তিনি

শালীনতাবশতঃ সকল সময় সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে পারিতেন না। এ সময়ে তাঁহার পুত্রবধূই তাঁহাকে অকাতরে সাহায্য করিত। কতবার এমনও দেখা দিয়াছে যে, ঠাকুরমা একেবারে কপর্দ্দকশূন্যা হইয়া বিরলে ক্রন্দন করিতেছেন, আর মা আমার তাঁহার অভাব পূরণার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নিজের হস্তে না থাকিলেও লোকের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও আত্মীয়বর্গের ঋণমোচন করিতেন। একবার আমার কোন আত্মীয় ঋণের দায়ে জড়িত হইয়া পড়েন; মা জানিতে পারিয়া তাঁহার অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে দায় হইতে মুক্ত করেন। শুধু আত্মীয়বর্গের জন্য নহে, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় কোনরূপে সুস্থির থাকিতে পারিত না; এই জন্যই হীনাবস্থা প্রতিবাসীবর্গ চিরকালই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। আবার এদিকে বাবার আয়ও নিতান্ত অল্প ছিল; তাহা দ্বারা সুশৃঙ্খলে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া কোথা হইতে তিনি স্বীয় ক্ষমতানুসারে বদান্য হৃদয়ের পরিচয় দিতেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুধাবন করিবার শক্তি নাই। বাস্তবিকই, ভগবানের অনুগ্রহ না থাকিলে লোকে কেন তাঁহার সংসারকে "সোনার সংসার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? কষ্টে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাঁহার জীবনের আর একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। পারিবারিক জীবনে সহিষ্ণুতার নিত্য প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বল্পাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যাঁহাদের সহিত বসবাস করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অকপট ও নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব হইবেন এইরূপ আশা করা যায় না। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক ভ্রান্তির জন্য যদি আমরা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে সুখের ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য তাঁহাদের দোষগুলি দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সচেষ্ট হওয়া উচিত, তাহাতেও যদি তাহার নিরাকরণ না হয়, তাহা হইলে পারিবারিক শান্তির জন্য আমাদের তাহা সহ্য করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। মাতাঠাকুরাণী জীবনে এ সহ্যগুণের পরাকাষ্ঠা বহুবার বহুকার্য্যে দেখাইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বহুল করিতে অনেকেই বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কেমনই মধুর প্রকৃতি ছিল যে, তিনি ঐ সমস্ত কথা গায়ে মাখিতেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার কোন কোন আত্মীয়-পত্নীরা তাঁহার সহিত অনেক সময় সামান্য কথায় বাক্যালাপ বন্ধ করিতেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহারাই আবার তাঁহার সেবায় পরাস্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক স্বকৃত অপরাধের ক্ষালন করিতেন। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, চিরকালই তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনে যাহা সৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট করিতে সতত যত্নবতী থাকিতেন। মাতা যেমন সন্তানের জীবন গঠনে সিদ্ধহস্ত, সংসারে আর কেহই সেরূপ নহেন। প্রতি কার্য্যে সন্তান মাতার জীবনেরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে এবং সুফললাভে তাঁহারই আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। এরূপ উপদেষ্টাকে যাঁহারা অবহেলা করেন, তাঁহাদিগের পরিণাম সহজেই অনুমেয়।

মা'র একটী বিশেষ গুণ ছিল; সেটি বৈরাগ্য। বেশবিন্যাসের প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না; ভোজ বা আমোদস্থলের নিমন্ত্রণে পারতপক্ষে তিনি যাইতে চাইতেন না। যদি বা কোনরকমে সম্মত হইলেন ত সামান্য পোষাকেই তথায় যাইতেন; আহারাদির ব্যবস্থাতেও উহা নিয়ত লক্ষিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে, তবে কাহার জন্য এত যত্ন করিব?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাবার অকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন সংরারে ঝি চাকরের বাহুল্য কিছুই ছিল

না। সাংসারিক প্রায় সমস্ত কার্য্যই মাকে করিতে হইত। পরিশ্রমে তিনি কখনই কাতর হইতেন না। দিনে হইক, রাত্রিতে হইক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিজনবর্গের সেবার্থে হউক বা অতিথি আগন্তুকের পরিচর্য্যার্থেই হউক, কখনও বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার দৈনিক জীবন হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন এবং স্নানান্তে আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া রন্ধনশালায় আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিযা ভোজনান্তে বেলা ২ ঘটিকার সময় উপরে উঠিতেন। কয়েকঘণ্টা ধরিয়া রামায়ণাদি পুরাণ গ্রন্থ পাঠ বা কোন সারগর্ভ সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বেলা ৫টার সময় আবার পরিজনবর্গের আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হইতেন। শেষে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১১টার সময় আবার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিতেন। মা আমার খাটিয়া খাটিয়া সারা হইতেন, কিন্তু কখনও কাহাকে "শ্রান্তি বোধ করিতেছি" একথা বলিতে শুনি নাই। আত্মীয়ভোজন প্রভৃতি বাড়ীর কোন বৃহৎ ব্যাপারেও মা'কে অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সে উদ্যম, সে উৎসাহ দেখিলে তাঁহার পবার্থপরতাকেই ধন্য ধন্য করিতে হয়। আত্মীয়বর্গের গৃহে কোন কার্য্যে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইলে সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু একবার মা তথায় উপস্থিত হইলেই শত বিশৃঙ্খলার মধ্যে মন্ত্রবলে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইত, ইহাই তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব। এখন তাঁহার অভাবে শুধু আমাদের গৃহ নহে, আত্মীয়বর্গ সকলকারই গৃহে হাহাকারের একটা অস্ফুট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

মা'কে কখনও কাহারও প্রতি রূঢ় কথা বলিতে শুনি নাই। তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মিষ্ট ছিল। এই জন্য লোকেও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। আমার দাদা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার যখন বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহারই অনুরোধে এদেশীয় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার ও ইউরোপীয় দুই তিনটি মহিলার সহিত তিনি পরিচিতা হয়েন। তাহার পর এই সমস্ত পরিবারে তাঁহার এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যে, কিছুদিন যদি মা'কে না দেখিতে পাইতেন ত ছুটিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং মা'র ওই বিদেশিনী বন্ধুদিগের মনে তাঁহার বিনয়, নম্র-ব্যবহার ও প্রকৃতি-মধুর স্বভাব দেখিয়া এমনই একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দু রমণীমাত্রেই তাঁহাদিগের বন্ধুর ন্যায় সরলপ্রকৃতি। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত না হইলেও তাঁহাদিগের সরলতার পরিচায়ক। যখনই তাঁহারা স্বদেশ হইতে এই প্রবাসে আসিতেন, তখনই মায়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিমন্ত্রণাদি রক্ষা না করিয়া দেশে ফিরিতেন না। মাও তাঁহাদিগের ক্ষণিক অবস্থিতিকালে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। বিলাতে তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূতা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে শীতের সময় যখন তাঁহারা শেষবার এ দেশে আসিলেন, তখন একদিন তাঁহাদিগের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে মা দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এ স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ মা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কথাবার্তা কহিতেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের দেশের মিষ্টান্নের কথা উঠিল; তাহাতে মিস্ নো—নামক তাঁহাদিগের জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন যে, ইংরাজী মিষ্টান্নের শ্রেষ্ঠত্বের সহিত এ দেশীয় দ্রব্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না। ইহাতে মা কথায় কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায় না বলিয়া, তাঁহাদিগকে একদিন দেশীয় মিষ্টান্ন খাইতে অনুরোধ করিলেন। ঐ দিনে মা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ক্ষীর ও ছানার

কয়েকটি মিষ্টান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যথা সময়ে তাঁহারা উহা ভোজন করিয়া দেশী মিষ্টান্নেরই জয় ঘোষণা করিয়া গেলেন। মাও পরিতোষের সহিত তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। মায়ের এই উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া আমার দাদাকে লক্ষ্য করিয়া মিস্ মু— সর্ব্বদা বলিতেন যে, "এমন মায়ের ছেলেরা যে ভাল হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি!" দাদার যে সমস্ত ব্রাহ্ম বন্ধু আমাদের বাড়ীতে নিত্য আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগকে আদর যত্ন করিতে ক্রটি করিতেন না। আত্মীয়বর্গ এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময় ব্রাহ্ম বলিয়া উপহাস করিত, কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও কর্ণপাত করিতেন না। সকল দেশে সকলকালে উদার হৃদয়ের ব্যবস্থাই এইরূপ, তাহাতে তিনি কেন ক্ষুণ্ণ হইবেন।

নিজে তাদৃশ শিক্ষিতা না হইলেও তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। দাদার বিবাহ সময়ে তাঁহার সঙ্কল্পই ছিল যে, শিক্ষিতা বধূ ঘরে আনিবেন, এবং তাঁহার এ সঙ্কল্পও পূর্ণ হইয়াছিল। ইদানীন্তন আমার কন্যাদিগের শিক্ষাকার্য্য তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

পরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত অনেকেরই জানা ছিল, নিজে হিন্দু হইলেও অপর ধর্ম্মের কখনও নিন্দা বা বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। তাঁহার প্রৌঢ়া আত্মীয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কতবার তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার মনের একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্মময়ম্ জগৎ"; তবে আর তীর্থ যাত্রায় ফল কি? ঘরে বসিয়া ব্রততে তীর্থযাত্রার ফললাভ করিতে ত পারি; তবে সুদূর প্রবাসে যাইবার আবশ্যকতা কি? হিন্দুর গৃহে যে রমণী প্রৌঢ়াগণের সমক্ষে এ কথা বলিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মমত কতদূর উদার ও উন্নত!

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছিল; ইদানীং ঐ ভগ্নস্বাস্থ্যেই সমস্ত কার্য্য দেখিতেন। পরিশেষে গত ১৫ই জুলাই তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভিষকবর্গের শত চেষ্টায়ও কোন ফল ফলিল না। ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজী ১৯০১ সালের ৩১-এ জুলাই, বাঙ্গালা ১৫ই শ্রাবণ, বুধবার রাত্রি ১১৷৷ টার কিছু পরেই আমাদিগের ঘরে বিষাদরাশি ঢালিয়া, সন্নিকৃষ্ট-প্রতি হৃদয়ে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া, মা আমার অনন্তধামের পথে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার অমূল্য জীবনপ্রদীপ অসময়ে নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু যে শোকাগ্নি তিনি আমাদিগের হৃদয়ে জ্বালিয়া গেলেন, তাহা চিরকালই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে।

এখন তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করুক, এই আমার করুণ প্রার্থনা।

বৈশাখ ১৩০৯ শ্রীমতী শরৎশশী দত্ত।

# পত্রাবলী

**প্রথম পত্র—ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।**

**শ্রীচরণ কমলেষু**

দাদা বাবু! আমি আর পত্র লিখিব কি? আপনারা কলিকাতায় আছেন, কতই সুখে আছেন, এ বনবাসিনীর দুঃখের কথা আপনারা বুঝিবেন কি করিয়া! "এম, এ" পাশ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমাকে এই বনবাস-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! এ যে কি রকম ভয়ানক স্থান, তাহা আপনি বোধ হয় ধারণাও করিতে পারিবেন না। এখানে না আছে জলের কল, না আছে পাকা রাস্তা! এই গরমের সময় একটু বরফও মিলে না—একটু লেমনেড্ও পাওয়া যায় না। চারিদিকে বন বাগান, মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। দোতলার ছাদে দাঁড়াইলে দেখিতে পাই, চাষা লোকেরা মাঠে লাঙ্গল চষিতেছে, রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, দরিদ্র রমণীরা কাপড় কাচিতেছে, এসব কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া যাই! আচ্ছা দাদা বাবু, বলুন দেখি এ দেশে—এ পোড়া দেশে লোকে কি সুখে বাস করে? এই তো শুনিলেন বাহিরের সুখ, ঘরের সুখও তদধিক! শাশুড়ী আমার যেরকম অবস্থায় থাকেন, তাহা দেখিলে চোখে জল আসে। তিনি স্বহস্তে রান্না করেন। খাবার তৈয়ার করেন, কুটনো কোটেন। —আরও আশ্চর্য্য কি চাকর যদি না আসে, তবে ঘরনিকানো, বাসন মাজা, সবই আপন হাতে করেন। আর বলিতে লজ্জা করে আমাকেও ঐ সব ঘৃণিত কাজ শিখাইতে চাহেন! লজ্জা ও অপমানে আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। আমার এই কষ্টের কথা যদি আপনার ভগিনীপতির কাছে বলি, তিনি কোনও প্রতীকার করা দূরে থাকুক, আরও বলেন "তুমি আমাকে ভাল বাস না; আমাকে ভাল বাসিলে এই কষ্ট দুঃখ কত ভাল লাগিত।" দাদা বাবু! আমি বাবার অত আদরের মেয়ে ছিলাম, আমার বিবাহের সময়ে বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ বাঙ্গাল দেশে আসিয়া মরিতাম না! এখন আপনার চরণে আমার বিনীত প্রার্থনা, আমাকে এখান হইতে কলিকাতায় নিয়া যান। বৌ-দিদিকে আমার দুঃখের কথা জানাইবেন। নিবেদনমিতি।

আপনার স্নেহের ভগিনী
গিরিবালা
যশোহর—চাঁপাঘাট

**২য় পত্র—ভগিনীর প্রতি ভ্রাতা**

প্রিয় ভগিনী! তোমার পত্র পাইয়াছি। পত্র পড়িয়া আমি যেমন বিস্মিত, তেমনি দুঃখিত হইলাম। এ জগতে স্ত্রীলোকের কয়টী প্রধান গুণ—সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, সেবাপরায়ণতা, সকলের উপর পাতিব্রত্য—তোমাতে যে তাহার একটি গুণও আছে তাহা তো বোধ হইল না! সতীশ—তোমার স্বামী; তাঁহার মত ধার্ম্মিক,—কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, সহৃদয় স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারা বড় ভাগ্যের কথা। তুমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছ, তাহাতে ভগবান্ তোমার উপরে রাগ করিতেছেন সন্দেহ নাই। ভগিনি!

গৃহ ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মাচরণ। যতই স্বার্থ-ছাড়িয়া পরের সুখের জন্য খাটিতে পারিবে, ততই ঈশ্বরের প্রেম তোমার ঘরে বিরাজিত হইবে।

আমাদের রমা তোমাদের ওদিকে গিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ী তোমার শ্বশুরবাড়ী হইতে তিন মাইল মাত্র দূরে। রমার শ্বশুর গঙ্গাস্নান করিতে এখানে আসিয়াছিলেন; তাঁহার মুখে রমার সুখ্যাতি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তুমি রমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিও। এখানে ছোট খোকার অসুখ; সে আরোগ্য হইলে তোমাকে আনিব। তোমার বৌদিদির আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা
শ্রী শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—চোরবাগান।

### ৩য় পত্র—রমার প্রতি গিরিবালা

রমা দিদি! শুনিলাম তুমি এখানে আসিয়াছ। আমাদের এত ভালবাসা ছিল, এখন এতটুকু পত্র লিখিয়াও মনে কর না! সবই আমার ভাগ্যের ঘটনা! ভাই, পাড়াগাঁয়ে মন টিকিতেছে কিনা, শ্বশুর বাড়ী কেমন লাগিয়াছে সব আমাকে জানাইও। সুরেশ বাবু কোথায় আছেন, কি করেন লিখিও। রমা দিদি! আমি পিতৃমাতৃহীনা, চিরদিনই দারুণ মনের কষ্টে কাটাইলাম, পাবি তো সে সব কথা—পরে লিখিব, আজি এই পর্য্যন্ত। ইতি।

তোমারই গিরিবালা
চাঁপাঘাট—যশোহর।

### ৪র্থ পত্র—গিরিবালার প্রতি রমা

প্রিয় গিরিবালা,

তোমার পত্র পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার কাছে পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই ক্রুটি হইয়াছে। ভাই, কি করিব, আজি ছয় মাস এখানে আসিয়াছি, সংসারের কাজে এখনও বড় একটা সময় পাই না; তার পরে লেখাপড়া না করিলে উনি দুঃখিত হন, অনেক সময় সেলাই ও কারু-কাজ করিতেও হয়, এই সব কারণে তোমাকে পত্র লিখিতে পারি না, আমার হৃদয় বুঝিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। ভাই, পল্লিগ্রাম আমার ত বড়ই ভাল লাগিয়াছে, মনে হয় যেন প্রকৃতি মায়ের শ্যামল স্নিগ্ধ রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমাদের ঘরের জানালা খুলিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে যখন চারিদিকে দেখিতে থাকি, তখন চাঁদের সেই বিমল জ্যোৎস্না, পাখীর সেই মধুর কাকলী, আর নিদাঘ নৈশ মৃদু বাতাসে সেই স্নিগ্ধতা আমার শরীর ও মন পুলকিত করিতে থাকে! দিনের বেলায় ঘাটে বাসন মাজি, আর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে বাতাস ঢেউ খেলাইতেছে দেখিতে থাকি, কি সুন্দর! আমাদের নিকটে নদী আছে, সকালে বিকালে সেখানে আমি জল আনিতে যাইয়া থাকি; ভাই সেই চিত্রানদী যখন কূলে কূলে পূরিয়া থাকে; তীরের আম, জাম, সিমুল, অশ্বত্থ, বট, বাঁশ প্রভৃতি যখন তাহাতে মুখ দেখিতে থাকে; দাঁড়ী মাঝিরা নৌকা বাহিয়া যখন গান গাহিতে থাকে; দণ্ডের আঘাতে চঞ্চল

ঢেউগুলি যখন বেলাভূমি চুম্বন করিতে থাকে আর সেই রজত নিঃস্রাব তুল্য সলিল-রাশি যখন উচ্ছলিত হইতে থাকে, তখন আমি আনন্দে, বিস্ময়ে, অবাক হইয়া থাকি! সে অনির্ব্বচনীয় সুখ লিখিয়া বুঝাইতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। এতো গেল বাহিরের সুখ—ঘরের সুখও আমার যথেষ্ট। আমি স্বহস্তে ডুমুরের দালানা, মোচার ঘণ্ট, লাউ ছেঁচকী প্রভৃতি যাহা কিছু রাঁধি, তোমার ভগিনীপতি এত আদরে তাহা খাইতে থাকেন যে লজ্জায় ও আনন্দে আমি গলিয়া যাইতে থাকি! এখানে যে নূতন স্কুল হইয়াছে, উনি তাহার হেড্ মাস্টার হইয়াছেন। রবিবারে আমি সমস্ত দিনই প্রায় এঁর কাছে থাকতে পাই। সে দিন আমাকে কত ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, নীতির কথা কতই শিখাইয়া থাকেন। ভাই, ভগবান্ তাঁহার এ অযোগ্য সন্তানকে এত সুখী কেন করিলেন, জানি না। তাঁহার দয়াকে শত ধন্যবাদ।

প্রিয় বোন! তোমার মনে কি অসুখ। সতীশ বাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার যখন অবকাশ হয়, আমাদের পত্র লিখিবে। আজি এই পর্য্যন্ত। ইতি।

তোমার রমা দিদি।

**৫ম পত্র—ভ্রাতৃজায়ার প্রতি গিরিবালা**

বৌদিদি,

এতদিনের পরে বুঝিলাম সংসারে মানব অসুখী হয় কেন? এ জগতে যে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, সুখ তাহারই করতলে। যে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট, তাহার কিছুতেই সুখ হয় না, নিত্য নূতন অভাব আসিয়া তাহার হৃদয় ও সংসার অধিকার করে। যে ছেলে, সত্য সত্যই...[১] সে কানা কড়িতেও খেলিতে পারে। বৌদিদি যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করিবেন এখন হইতে আমি যেন আমার নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারি। দাদাকে আমার প্রণাম দিয়া বলিবেন, আমি কলিকাতায় যাইব না। খোকার আরোগ্য সংবাদে সুস্থির করিবেন।

এখানে ইতি।
আপনাদেরই গিরিবালা

আষাঢ় ১৩১০ লেখিকা শ্রীমা।

## গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্ত্তব্য

গার্হস্থ্য আশ্রমের নিকট সকল আশ্রমবাসিগণ (অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ভিক্ষু প্রভৃতি) উপকৃত হইয়া থাকেন। এই জন্যই সর্ব্ববিধ আশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ। সমগ্র মানবের হিত সাধনই এ আশ্রমের প্রধানতম কর্ত্তব্য—ইহা জীবনের মহাশিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান।

নারী হৃদয় স্বভাবতঃ করুণা ও মমতার আধার স্বরূপ। সংসারে কোমলতর বৃত্তিগুলি

১। অস্পষ্ট, পড়া যায়নি।

অর্থাৎ দয়া, প্রীতি, স্নেহ, পবিত্রতা, প্রেম প্রভৃতির বিকাশ করিয়া গুরুজনবর্গের সেবা এবং সন্তানগণকে সদ্ভাবে পরিচালিত করিয়া, তাহাদিগের হৃদয় উচ্চ আদর্শে পূর্ণ করিয়া, সংসার ও সমাজে অমৃতস্রোত প্রবাহিত করাই গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্ত্তব্য। পতিগৃহে গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্ব উপদেশ দিতেছেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয় সখী বৃত্তিং স্বপত্নী জনে
ভর্ত্তুর্বি প্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেস্বনুৎ সেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণী পদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ [য.]

অর্থাৎ গুরুজনের সেবা ও সপত্নীদিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিবে, পতি কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও তাঁহার হিতসাধনে বিরত হইবে না, সংসারে সর্ব্বদা উদারতা প্রকাশ করিবে, সুখ সম্পদে গর্ব্বিতা হইবে না, এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিলে রমণীগণ সুগৃহিণী পদের যোগ্য হন, নতুবা তাঁহারা কুলের কন্টক স্বরূপ হন। মহর্ষীর এই অমূল্য উপদেশাবলী রমণী জীবনে প্রতিপালিত হইলে সংসারে কোনরূপ অশান্তির উদ্যম হইতে পারিবে না। বলিতে পার ইহা পুরুষ জাতির স্বার্থ সাধনের পরিচায়ক—কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঠিক তাহা বোধ হয় না। বস্তুতঃ এই নিয়ম কেবল আইনের বাঁধ নহে, সংসারে সুখলাভের ইহা মুখ্য উপায়। তাই বলিয়া কেবলমাত্র ঐ কয়টী বৃত্তির অনুশীলনেই নারী জীবন যাপিত হইতে দেওয়া সমাজের উচিত নহে। ঐ সকল কর্ত্তব্য সাধন নারী জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু চরম সীমা নহে; তাহাদিগরে আরও উচ্চ অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যতদিন তাহারা সে উচ্চতা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন সমাজে অধিকতর সুসন্তান লাভের সম্ভাবনা নাই। পুরুষ হইতে স্ত্রী জাতির শক্তির বহু প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের আত্মার অনুশীলনে অধিকার নাই, তাহারা কেবলমাত্র পুরুষ জাতির ক্রীড়নক বিশেষ হইয়া থাকিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, নারী জাতি জ্ঞান রাজ্যের পবিত্র প্রকোষ্ঠে কত দূর নীত হইয়াছিলেন। কি শাস্ত্র, কি কাব্য, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই রমণীগণের অপরিসীম প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ তাঁহাদের পতিনিষ্ঠতা, গুরুজন ভক্তি, সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান আধুনিক রমণীদিগকে দর্প করিয়া দেখাইবার সামগ্রী। তাঁহাদিগের আত্মা সম্যকরূপ অনুশীলিত হইত বলিয়াই—তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও জীবনকে এরূপ মধুময় করিয়া তুলিতে পারিয়া ছিলেন।

রমণীহৃদয় বড়ই বেগশালী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সেই বেগবত্তা যে দিকে পরিচালিত করা যায়, সেই দিকেই তীব্র ভাবে নিয়োজিত হয়। ভাল দিকে দাও, অমৃতময় ফল ফলিবে—মন্দ দিকে দাও অধোগতির চরম সীমায় নীত হইবে। তাহারা সুশিক্ষিতা হইলে সংসার শান্তিময় হইবে—রমণীর তেজস্বিতা, রমণীর একাগ্রতা সংসারকে বহু পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। নারী জাতিকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই ত্রুটি ঘটে। নারী জাতির শিক্ষাহীনতাই যাঁহারা সংসারের সুখ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত—তাঁহারা নিজেদের এবং ভাবী বংশধরগণের সুখের পথে কন্টক রোপন করেন মাত্র, কারণ নারী জাতি অশিক্ষিতা হইলে তদীয় সংসর্গে সুশীল স্বামীও দুঃশীল হইয়া পড়েন; পুত্র মাতৃহস্তেই গঠিত, কিন্তু উচ্চ আদর্শের অভাবে তাঁহাদের চরিত্র বিকৃত হয়—গৃহের অন্যান্য সহযাত্রিগণ অধঃপতিত হন। রমণীরা যতই জ্ঞান রাজ্যে আরূঢ় হইতে

পারিবেন, সংসারও ততই উন্নত হইবে। প্রত্যেক সংসার উন্নত হইলেই—সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে রমণী জাতি গৃহিণী ও জননী, সে জাতিকে কদাচ অশিক্ষিত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সংসারে গুরুজনবর্গের সেবা, দাসদাসী প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার প্রভৃতি কার্য্যের সহিত স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা এবং নিময়িত রূপে আত্মার অনুশীলন করা নারী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংসারের সমাজের ইষ্টানিষ্ট গভীর ভাবে অনুভব করিয়া কবিতা বা চিত্রাদির সংযোগে তাহা উজ্জ্বল রূপে অঙ্কিত করিয়া সমাজের সমক্ষে উপনীত করিয়া সমাজকে উন্নতি পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করা রমণীর উচিত। রমণীহৃদয় স্বতঃই শিল্পময়—রীতিমত সেই প্রবৃত্তির অনুশীলন করিলে ভারতে এক নবীন যুগ উপস্থিত হইতে পারে, ভারত আবার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে। রমণীগণ কেবল আহার নিদ্রা, রাঁধা বাড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিলে অথবা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চাকরী করিতে ছুটিলে সমাজের উন্নতি হইবে না। তাহাদের আত্মার অনুশীলন, দেবানুরক্তি, কঠোর সংযম, আত্মত্যাগ, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। নারী জীবন এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও তাঁহাদের গৌরবে সমাজ উজ্জ্বল হইবে। নারী জাতির এই অমূল্য গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণে সংক্রামিত হইয়া সংসারে অমৃতস্রোত বহিয়া যাইবে।

পৌষ-মাঘ, ১৩১০ — শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

## নারী-আদর্শ*

১। সঙ্ঘমিত্রার (বা প্রাস্কোরিয়ার) মত সুকন্যা হই।
২। সীতার মত সতী হই।
৩। সাবিত্রীর মত পতিপ্রাণা হই।
৪। গৌরীর মত স্বামি-সোহাগিনী হই।
৫। দ্রোপদীর মত গৃহিণী হই।
৬। অরুন্ধতীর মত পতিকুলে অচলা হই।
৭। বিদুলার (বা কর্ণিলিয়ার) মত মাতা হই।
৮। যমুনার মত ভগিনী হই।
৯। গান্ধারীর মত ধর্ম্মপক্ষপাতিনী হই
১০। কুন্তীর মত বিপদ্‌কে বন্ধু বলিয়া দেখি।
১১। সুভদ্রার মত আশ্রিত-বৎসলা হই।
১২। সুমিত্রার মত স্বার্থত্যাগিনী হই।

* হিন্দুসমাজে যদিও সুকন্যা, সুমাতা ও সুভগিনীর অদ্যাবধি অভাব নাই, কি( পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে নামোল্লেখ করা যায় এ শ্রেণীর এমন আদর্শ নারী দুর্লভ। ভার্য্যাই হিন্দু নারীজীবনের আদর্শ স্থানীয়, এজন্য পুরাণে শত শত সতীর নাম পাওয়া যায়। আমরা অগত্যা বিদেশীয় ও আধুনিক কয়েকটী নাম লইয়াছি। যাহারা এই অভাব পূরণ করিবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের প্রেরিত নাম প্রকাশ করিব। —বা, রো, স।

১৩। ভগিনী ডোরার মত বিশ্বসেবিকা হই।
১৪। অন্নপূর্ণার মত দানশীলা হই।
১৫। বেহুলার মত পতিসেবিকা হই।
১৬। ভিক্টোরিয়ার মত সম্রাজ্ঞী হই।
১৭। লক্ষ্মীর মত সুরূপা ও শীলবতী হই।
১৮। সরস্বতীর মত গুণবতী হই।
১৯। দুর্গার মত বীরাঙ্গনা হই।
২০। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।
২১। তৃণের মত বিনীত হই।
২২। তরুর মত সহিষ্ণু হই।
২৩। সূর্য্যের মত তেজোময় ও চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ হই।
২৪। গঙ্গার মত পাবনী হই।
২৫। লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা হই।
২৬। খনার মত জ্যোতিষী হই।
২৭। লীলাবতীর মত গণিতজ্ঞা হই।
২৮। দুর্গাবতীর মত তেজস্বিনী হই।
২৯। গার্গীর মত ব্রহ্মবাদিনী হই।
৩০। মৈত্রেয়ীর মত অমৃত-পিপাসু হই।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২

## পারিবারিক প্রসঙ্গ

পরিবারের কর্ত্রী রমণী। সুতরাং পরিবারের মধ্যে সেকালেও রমণীর কর্ত্তৃত্ব ছিল, একালেও আছে। তবে সেকালে ও একালের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

সেকালে একান্নবর্ত্তী প্রথা অতিশয় প্রবল ছিল। এক একটী পরিবারও অতি বৃহৎ ছিল। তখন এক এক পরিবারে সচরাচর চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক দেখা গিয়াছে। এক এক ব্যক্তির ঊর্দ্ধদিকে পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতামহী এবং নিম্নদিকে পুত্র, পৌত্র, কন্যা দৌহিত্রগণ পরিবারে বাস করিত। ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ পরিজনবর্গ সহিত ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু পরিবারের শাসন সংরক্ষণ, নিয়ম, সুশৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের শুদ্ধতা ও খরচপত্রের ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ পুরুষ থাকিতেন তিনিই করিতেন। গৃহের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ কর্ত্রী থাকিতেন, তিনি বধূদিগের ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাদিগের মধ্যে কে কোন্ কাজটি করিবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং তাহাদের কার্য্যশৈথিল্যে ও অন্যায়াচরণের জন্য শাসন করিতেন। এই রকম গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় আরও দুই চারিটী কাজ ছাড়া কর্ত্রীর বড় বেশী মাথা খাটাইতে হইত না।

তা বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে যে গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার বড় প্রয়োজন হইত না, তাহা নয়; যিনি বুদ্ধিমতী গৃহকার্য্যে নিপুণা, সুচতুরা, সহৃদয়া ও সুগৃহিণী হইতেন, এবং আপনার নয়নের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টি সর্ব্বত্র সমানভাবে রাখিতে পারিতেন, তাঁহার দ্বারাই বৃহৎ পরিবারের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা পাইত, নচেৎ যে গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধি স্থূল, হৃদয় ক্ষুদ্র, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ: যিনি সকল ব্যাপারেই অসন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর কর্ত্তাটির সঙ্গে ঝগড়া জুড়িয়া দিতেন, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই বধূদিগের খুঁৎ ধরিয়া তাহাদের পিতৃ-মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার অসংখ্য দোষ ত্রুটি অতি নিপুণতার সঙ্গে দেখাইয়া দিতেন, আর সেই জন্য তাহাদের পিতৃমাতৃকুলের নানা অপযশ ঘোষণা করিয়া সময় অসময় তাহাদিগকে গঞ্জনা দিতেন, সে গৃহকর্ত্রীর গৃহ কলহবিবাদেই পূর্ণ থাকিত; শান্তি এবং শৃঙ্খলা একেবারেই দেখা যাইত না।

সুতরাং সেকালের গৃহকর্ত্রীদিগের দায়িত্ব যে নিতান্ত কম ছিল, তাহা নহে। তবে তরুণী বধূদিগের প্রকৃত দায়িত্ব একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহারা নিজেদের সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, শাশুড়ীদিগের শাসন মানিয়া এবং গালিগালাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যদি ঝি-চাকরাণীর মত অনবরত খাটিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রশংসার অভাব হইত না। তাঁহাদের স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য কেশবিন্যাস ও অঙ্গের সুষমা বৃদ্ধির চেষ্টা ছাড়া আর বড় বেশি কিছু আবশ্যক হইত না। স্বামীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক ও দেখাসাক্ষাৎই বা কতটুকু সময়ের জন্য।

অনেকে হয়ত আমার এই বর্ণনা পাঠ করিয়া রাগিয়া যাইবেন এবং চোখ রাঙাইয়া কহিবেন "এ কালের শিক্ষা বিকৃত বেহায়া বাবুদিগের বিলাসিনী ঘরণীর চেয়ে সেকালের শ্রমশীলা নিঃস্বার্থপ্রাণা তরুণীরা কি মন্দ?"

নিঃস্বার্থপ্রাণা তরুণীদিগকে কেহই মন্দ বলে না। বাস্তবিকই তাঁহাদের সেবাপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও অক্লান্ত দেহে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার দুঃখ এবং করুণারও উদ্রেক হয়। হাজার হোক তাঁহারাও রক্ত মাংসে নির্ম্মিত মানুষ, এই সুন্দর ও বিচিত্র ধরণীর সমস্ত সুখ-সৌন্দর্য্য জ্ঞান-প্রীতি সাহিত্য ও কলা শুধুই পুরুষের জন্য রাখিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য অবিরত কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠুর স্বার্থত্যাগের বন্দোবস্ত করা,—কথায় এবং কেতাবে পত্রেই শুনায় ভাল; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যে অতি মর্ম্মান্তিক, তাহা যাহাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিবার মত হৃদয় আছে, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন।

সেইজন্য আমরা সেকালের সামাজিক প্রথার প্রতিই কটাক্ষপাত করিতেছি, সেকালের বধূদিগকে কিছুই বলিতেছি না।

সে কথা যাক! এখন একালের গৃহকর্ত্রীদিগের কথাই বলি, একালে আর সেকালের মত একান্নবর্ত্তী প্রথা নাই, এক একটী সুবৃহৎ পরিবারও নাই; একালে রমণীদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কিন্তু আমরা যে বলিলাম সেকালের মত একান্নবর্ত্তী প্রথা নাই। এ প্রথা কে উঠাইয়া দিল? অনেকে হয়ত বলিবেন, "ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক, পাশ্চাত্য কুহকে মোহাচ্ছন্ন, নবভাবাপন্ন লোকের দুর্বুদ্ধির জন্যে হিন্দুর এই পরম মঙ্গলজনক প্রথাটী উঠিয়া যাইতেছে।"

আমরা বলি একথা ঠিক নয়। একান্নবর্ত্তী প্রথা আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে আপনা

আপনিই উঠিয়া যাইতেছে, ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি হয়ত উকীল, তিনি কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করেন। তাঁহার পত্নী এবং সন্তানেরাও সঙ্গে থাকে। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মুনসেফ ও সবজজের কার্য্য করিয়া বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে রোগের জন্য সস্ত্রীক কারসিয়াঙ্গের ন্যায় ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করিতে হয়। তা ছাড়া ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তির একছেলে সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন, তিনি সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানেই বাস করেন। অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে কেহ পাটনা কলেজে, কেহ শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, কেহ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করে; তাহারা সকলেই অবিবাহিত। যখন তাহাদের বিবাহ হইবে, তাহারা কর্ম্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহারাও পরিবার লইয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে বাস করিবে। তাহা হইলেই দেখুন সকলেরই একান্নভুক্ত হইয়া এক পরিবারে বাস করিবার সুবিধা হইল না। সুতরাং একান্নবর্ত্তী প্রথা রক্ষা হয় কিরূপে?

তবে যেখানে পিতাপুত্র, ভাইবোন সকলেই এক শহরে থাকেন, সেখানেও যদি শুধুই আপনার সুখবৃদ্ধি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর গহণার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অন্যায় কার্য্যের আর সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু যে সকল স্থানে একজন যুবককে কর্ম্মোপলক্ষ্যে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতে হয়, সেখানে তাঁহার তরুণী ভার্য্যাকেও শ্বশুর শাশুড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামীর কাছেই যাইতে হয়। এই জন্যই একালের পরিবার প্রথায় পার্থক্য অত্যন্ত অধিক, এবং একালের পরিবারের কর্ত্রীদিগের দায়িত্ব ও কার্য্যের গুরুত্বও অনেক বেশি। যে তরুণ বয়সে রমণীদিগের বুদ্ধি অপক্ক এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব থাকে, সেই বয়সেই স্বামীর সঙ্গে দূর বিদেশে গিয়া একটি পরিবারের কর্ত্রী হইয়া বসিতে হয়। সেখানে আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, পরামর্শ দিবার কেহ নাই; বিপদের মুহূর্ত্তে সাহায্য করিবার কেহ নাই, মনের অস্থিরতা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সময় কাহারও নিকট সান্ত্বনা ও বল পাইবারও আশা নাই। অথচ ঐ সকল অবস্থার মধ্যে স্বামীর সুখস্বাস্থ্য, সন্তোষ ও মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে। গৃহের রান্নাবান্নার সুবন্দোবস্ত ও চাকর চাকরাণীর কার্য্যের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অতিথির পরিচর্য্যা ও চিত্তবিনোদন এবং অনুষ্ঠানোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে; স্বামীর শ্রমোপার্জ্জিত অর্থের যাহাতে অপব্যয় না হয়, অমিতব্যয়ের জন্য যাহাতে স্বামীকে ঋণগ্রস্ত ও অসুখী হইতে না হয়;—এই সকল বিষয়েই মনোযোগী হইতে হইবে।

অতএব এ সময় পারিবারিক সুখের জন্য রমণীদিগের যে কি সুশিক্ষা, মার্জ্জিত বুদ্ধি, গৃহকর্ম্মে অভিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মবলেব প্রয়োজন, তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এখনও অধিকাংশ রমণীর মধ্যে ঐ সকল গুণের সমুচিত বিকাশ ও ঐ সকল ভাবের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সেই জন্য অনেক পরিবারে পারিবারিক সুখ শান্তিও সুদুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত পারিবারিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইলে, পরিবারের কর্ত্রীদিকেও এ কালের আদর্শানুসারে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং অনিষ্টকর সামাজিক কুপ্রথাগুলিকেও দূর করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

ভাদ্র ১৩১৩

# পারিবারিক প্রসঙ্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বপ্রথমেই বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া রমণীদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট শিক্ষা দ্বারা রমণীদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে—তাঁহারা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তরুণ বয়সে কিরূপে পরিবারের কর্ত্রী হইবেন?

অনেকে বলিবেন "হা কপাল, শিক্ষা পাইলেই যদি রমণীগণ উপযুক্ত গৃহকর্ত্রী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর অনেক পরিবারে লেখাপড়া-জানা মেয়ের দুর্গতি দেখিতে হইত না।"

স্বীকার করি, কোন কোন লেখাপড়া জানা মেয়ের গৃহেও পারিবারিক শৃঙ্খলা নাই, তাই বলিয়া সকলের সম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কথা বলা উচিত। আমরা দুই রকমই দেখিয়াছি। আমার পরিচিতা শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেই এমন সুগৃহিণী আছেন যে, তাঁহারা স্কুলে পড়ার সময় সংসারের কোন কাজই জানিতেন না। কিন্তু বিবাহের পর নিজের যত্ন ও চেষ্টায় এমন উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে শিখিয়াছেন ও এমন শৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাইতেছেন যে, তাঁহাদের পরিবারে অতিথি হইয়া যথার্থই সুখী হওয়া যায়। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন লেখাপড়া-জানা মেয়ের পরিবারও দেখিয়াছি যে, তাঁহার সাংসারিক কোন অভিজ্ঞতা নাই, না রান্নাবান্না করিতে জানেন, না সন্তানদিগের প্রতি যত্ন করিতে পারেন; স্বামী অর্থোপাজ্জন করিতেছেন, কিন্তু পত্নীর বুদ্ধির দোষে সে অর্থ কোথা দিয়া জলের মতো চলিয়া যাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। খরচ বাঁচাইয়া দু টাকা সৎকার্য্যে দান করা ত দূরের কথা, বরং অপব্যয়ের জন্য মাসে মাসে ঋণও করিতে হয়। কিন্তু দুই এক জায়গায় এই রকম হইলেও ইহাতে কি শিক্ষার দোষ দেওয়া যায়? শিক্ষার দোষে এ রকম হয় না, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে হয় বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌরাত্ম্যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী পুরুষদিগের পক্ষেই অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, মেয়েদের পক্ষে ত সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক এক রাশি বইয়ের বোঝা মাথায় বহিয়া এক একটা পরীক্ষায় পাশ হইতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষার পথ পরিষ্কার হওয়া ছাড়া আসল শিক্ষা জিনিসটা অতি অল্পই হয়। গৃহকার্য্যের শিক্ষা ত হইবারই যো নাই, কেমন করিয়া হইবে? সকালে উঠিয়াই মেয়েদিগকে একরাশি বই লইয়া পড়িতে বসিতে হইবে; তার পর স্নানাহার, তারপর স্কুলে যাওয়া, আবার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়া;—বলুন ত ইহাতে মেয়েরা ঘরের কাজ শিখিবে কখন?

তবু মেয়েরা বাড়ীতে মা বাপের কাছে থাকিলে দেখিয়া শুনিয়াও অনেকটা কাজকর্ম্ম শিখিতে পারে। কিন্তু বোর্ডিঙে থাকায় সবই হয় মাটী। অথচ মফস্বলের লোকের মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে বোর্ডিঙে রাখা ভিন্নও আর উপায় নাই।

এ অবস্থায় মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত আবশ্যক। তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী এমন হইবে যে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে, অথচ তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদিতে সুশিক্ষিতা হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কর্ত্রী হইবার উপযোগী সাংসারিক শিক্ষাও লাভ করিবেন। মেয়েদের স্কুল এবং বোর্ডিঙ উভয় স্থানেই যদি এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলেই উচ্চ শিক্ষা দ্বারা রমণীদিগের যথার্থ উন্নতি হইবে, সমাজেরও কল্যাণ হইবে।

দুঃখের বিষয় স্ত্রী শিক্ষার প্রতি এ দেশের লোকের যথেষ্ট অনুরাগ নাই, এ বিষয়ে অর্থশালী লোকদিগের নিকট অর্থ সাহায্য পাইবারও আশা নাই, কাজেই গবর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রমণীদিগের জন্য স্কুল ও বোর্ডিঙ স্থাপন করিতে হয়। সে সকল স্কুল ও বোর্ডিঙে আবার গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত বিশ্বাবিদ্যালয়ের রীতি নীতিই প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যাহা হউক, মেয়েরা গৃহকার্য্য শিখুক আর না শিখুক, কোনও উন্নতিশীল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এখন আর কন্যাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন না।

কিন্তু এই রকম শিক্ষাপ্রণালীরও দোষ যে একেবারে নিবারণ করা যায় না, তাহা নহে। মেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখনই কলেজের বাহির হন, তখনই পিতামাতা তাঁহাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন বিবাহের পরিবর্ত্তে জননী যদি কন্যাটিকে গৃহস্থালী শিখাইয়া গৃহকর্ত্রীর উপযুক্ত করেন, এবং তাহার পর বিবাহ দেন, তবে আর কোনও গোলই থাকে না।

যাহা হউক কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যখন কোন কোন মেয়ের গৃহকার্য্য শিখিবার সুবিধা হয় না তখন তাহার সংশোধন আবশ্যক। এই ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীটা উল্টাইয়া দিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে গৃহকর্ম্ম শিখিবারও বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই ত ঠিক হয়।

অতএব মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে পরিবারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন না; লেখাপড়া না শিখিলেই অক্ষম হইবেন। কেন যে অক্ষম হইবেন, তাহা আমরা এই বামাবোধিনীরই কোন কোন প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র কথা বলি।

পারিবারিক সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত করিতে অনেক গুণের প্রয়োজন। সে সকল গুণের কথা অগ্রেই বলিয়া আসিয়াছি। একমাত্র রান্নাবান্না ও গৃহস্থালীই পারিবারিক সুখের আদর্শ নয়। শুধু রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী একটি অশিক্ষিত মেয়েও করিতে পারে । সুতরাং ঐ সকল কার্য্য অভ্যাস করিলে একজন শিক্ষিতা মেয়ে যে খুব ভাল করিয়াই গৃহকার্য্য করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা ব্যতীত গৃহাদির সাজ সজ্জা ও পরিপাট্য, দাসদাসীদিগের কার্য্যের শৃঙ্খলা, অর্থাদির সদ্ব্যবহার, অতিথি অভ্যাগতের মনোরঞ্জন, সন্তানদিগের শিক্ষা ও শাসন—ইহা ত উৎকৃষ্ট শিক্ষা ভিন্ন কিছুতেই উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবার কথা নয় । পূর্ব্বে অনেক গৃহকার্য্য পুরুষদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এখন বাড়ীর পুরুষ ত কেবল একজন মাত্র। তাঁহাকে অর্থোপার্জনের জন্যই অনবরত বিব্রত থাকিতে হয়, কাজেই এখন এই সকল পারিবারিক কর্ত্তব্য মেয়েদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ঐ সকল কার্য্য ব্যতীত পরিবারে প্রকৃত পতিব্রতা রমণীর আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য—স্বামীর চিত্তবিনোদন করা, স্বামীর চিন্তার ভার লঘু করা, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হওয়া। সেকালের রমণীদিগের এ সকল বিষয়ে ভাবনাই করিতে হইত না, আর এখন স্বামী শুধু স্ত্রীর ভাল রান্না খাইয়া এবং গৃহকর্ম্মের নিপুণতা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন না। তিনি বন্ধুবান্ধবহীন দূরদেশে তাঁহার স্ত্রীকেই জীবনের সখীরূপে পাইতে চাহেন। অবসরকালে স্ত্রীর সঙ্গেই সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে কথা কহিয়া হৃদয়ের ভাববিনিময় করিতে চাহেন, এবং দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বপ্রকার অভাবের

সময় স্ত্রীকেই সাহায্যকারিণীরূপে দেখিতে চাহেন। এই জন্য ত প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নারীদিগের শিক্ষার এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। নারীগণ শিক্ষা না পাইলে কেমন করিয়াই বা শিক্ষিত পতির উপযুক্ত সঙ্গিনী হইবেন?

তাই বলি, বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী পরিবারের সকলের সুখশান্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই রমণীদিগকে সুপ্রণালীসঙ্গত উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানের প্রয়োজন।

তদ্ভিন্ন পারিবারিক সুখশান্তি বিধানের জন্য এবং পারিবারিক উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, নারীদিগের সুগভীর ধর্ম্মভাব ও সুনির্ম্মলা ঈশ্বরভক্তির প্রয়োজন। এদেশের নারীগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মশালী, তাঁহাদের কোমলচিত্তে সহজেই ধর্ম্মভাবের স্ফূরণ হয় এবং ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইয়া ওঠে, এজন্য এদেশের পূর্ব্বতন এক একটী পরিবারের রমণীগণের মধ্যে আশ্চর্য্য ধর্মবিশ্বাস দেখা যাইত, এক একটী রমণী পতিপুত্রের কল্যাণের জন্য ও পারিবারিক মঙ্গল কামনীয় কত ব্রত, উপবাস, দান ও দেবার্চ্চনা করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের পরিবার হইতে সে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও আর উহাতে আস্থা নাই। এখনও যেটুকু আছে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রবেশ করিলে তাহাও থাকিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রমণীদের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসও চলিয়া গেল, অথচ তাহার স্থানে কোনরূপ নূতন ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া উঠিল না। কেমন করিয়াই বা উঠিবে? বর্ত্তমান সময়ে পুরুষেরা প্রাচীন দোল দুর্গোৎসব করেন না, গুরুর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন না; অথচ তাঁহারা যে দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্বাসানুযায়ী কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহাও নয়, কাজেই তাঁহারা আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সংসর্গে রমণীগণও ধর্ম্মানুষ্ঠান একরকম ত্যাগই করিয়াছেন, ইহার পরিণাম কি শোচনীয়, আমরা একবার ভাবিয়া দেখি না। আমার বোধহয় এইজন্যই আজকালকার ছেলেরা ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা স্কুল কলেজে ত ধর্ম্মশিক্ষা পায়ই না, তারপর পরিবারে পিতামাতাকেও যদি ঈশ্বরার্চ্চনা করিতে না দেখে, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা কিরূপেই বা উপলব্ধি করিবে?

সুতরাং প্রত্যেক পরিবারেই ঈশ্বরার্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীলোকেরই আপন আপন আত্মার কল্যাণের জন্য, সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য প্রতিদিন পরিবারস্থ সকলকে লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পরিবারে এবং নারীজীবনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত না হইলে, যে পরিবারে যতই অর্থসম্পদ ও মানসম্ভ্রম থাকুক না কেন, সেখানে প্রকৃত সুখশান্তি কখনই পরিলক্ষিত হইবে না। নারীজীবনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি না থাকিলেই পরিবারে অন্যায় আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা ও সমাজবিরুদ্ধ রীতিনীতি প্রবেশ করিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নীতিও সুখের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

এ কথা ধনী দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত যে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারা যায় না। একটী কবিতায় আছে

সুখ সুখী করে কাকে,
ধর্ম্ম যদি নাহি থাকে,
সংসারেতে কত হয় অভাব আত্মার!

কোথায় জুড়াব প্রাণ?
চির-নির্ভরের স্থান
বিশ্বপতি বিনা বিশ্বে কোথা আছে আর?

ঠিক কথা! সংসারে শুধুই সুখের বন্দোবস্ত থাকিলে মানুষ সুখী হয় না। এই সংসারে আমাদের অভাব কত! এমন কোন্ সুখী পরিবার আছে, যেখানে রোগ আসে না, শোক আসে না, পরীক্ষা আসে না, সংগ্রাম আসে না? এমন একটী পরিবারও নাই। ধনীর পরিবারই হউক আর দরিদ্রের পরিবারই হউক, দুঃখ, তাপ ও বিপদ সর্ব্বত্র আসিবেই আসিবে। কিন্তু তখন মানুষ আর কাহার মুখ চাহিয়া শোকের যন্ত্রণা ও বিপদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে? কাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে স্থির থাকিতে পারে?

সে ত আর কাহারও নয়, একমাত্র ঈশ্বরের। যে পরিবারের লোকের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর নাই, সে পরিবারে লোক যে বিপদের আক্রমণে, শোকের দুর্দ্দিনে ও পরীক্ষা প্রলোভনে নিরুপায় হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কথাটা আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। আমাদের পরিচিতা এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা আছেন। সংসারে ধন-জন-মান-সম্পদ তাঁহার সকলই ছিল। তিনি ধর্ম্মশীলা এবং গুণবতী রমণী। তাঁহার স্বামী জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে, সম্মানে, সম্পদে এবং স্বদেশানুরাগে একটী সহরের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। একটি পুত্রকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই রমণীর পার্থিব সুখের আর কোনই অপ্রতুল ছিল না।

কিন্তু হায়! এ সুখ আর অধিক দিন রহিল না। অসময়েই তাঁহাকে বিধবা হইতে হইল। বিধবা হইয়াও বিলাত প্রবাসী পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অবশেষে সেই পুত্রটীও নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। এই অবস্থায় আমরা যখন উক্ত শ্রদ্ধেয়া রমণীকে দেখিতে গেলাম, তখন মনে করিলাম তিনি হয়ত এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতেও পারিবেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা হইল, তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, কোন দুঃখই যেন তীব্রভাবে তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাঁহার অন্তরের প্রবল ধর্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার যে প্রবল নির্ভর তাহাই যেন তাঁহাকে সমস্ত দুঃখ বিপদের তীব্র জ্বালা হইতে দূরে রাখিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশান্তভাবে রুগ্ন সন্তানের সেবা করিতেছেন। এই রমণী আমাকে নিজের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, "এই কত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাকে কোন্ সুখ দিতে বাকী রাখিয়াছেন? সকল রকম সুখই ত দিয়াছেন। আর সহসা আজ আমাকে তিনি দুঃখের মধ্যে ফেলিয়াছেন বলিয়া আমি কি তাঁহার করুণায় অবিশ্বাসী হইব? কখনই নয়। আমি সকল বিপদের মধ্যেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইতেছি। আগে বুঝিতে পারি নাই, অকালে স্বামীর কেন মৃত্যু হইল? এখন পরিষ্কার বুঝিতেছি, স্বামী বাঁচিয়া থাকিলে প্রাণাধিক পুত্রের এই পীড়া দেখিয়া পাগল হইয়া যাইতেন। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত কি নাই? কে বলিবে সন্তানের এই পীড়ার মধ্যে আবার দয়াময়ী জননীর কি মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে?"

আমি ত এই মনস্বিনী রমণীর বিশ্বাসের তেজ ও নির্ভরের বল দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত! কেবল আমিই যে এইরূপ বিস্মিত হইয়াছি, তাহা নয়, একজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মহিলা ধর্ম্মপ্রচারার্থ মাঝে মাঝে এই পরিবারে আগমন করেন। তিনি উক্ত শ্রদ্ধেয়া রমণী সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "এ দেশে এইরূপ ধৈর্য্যশীলা রমণী খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি বিধবা হইয়াছেন শুনিয়া আমি গেলাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু সান্ত্বনা আর দিব কি? তিনি এমন প্রশান্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন যে আমি দেখিয়া অবাক্।"

যে রমণীর যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তি থাকে, তিনি দুঃখবিপদ ও পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে এইরূপ করিয়াই অন্তরে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন এবং প্রশান্তচিত্তে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব এখন সকলেই ভাবিয়া দেখুন পরিবাবে প্রত্যেক রমণীর কতটা ধর্ম্মবিশ্বাস ও কতখানি ঈশ্বরভক্তির প্রয়োজন।

যদি রমণীগণ ঘরসংসার করিয়া বাস্তবিকই সুখী হইতে চাহেন, যদি একালের গৃহকর্ত্রীগণ উচ্চতম পারিবারিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংসারেব সুখশান্তি বিধান করিতে ও আপন আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যেন সুপ্রণালী সঙ্গত উচ্চশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। তাহা করিলে পতি পুত্রকে সুখী করিতে কিম্বা নারীজীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।

আশ্বিন ১৩১৩ — শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

## হিন্দু স্ত্রীলোকের জীবনপ্রণালী

হিন্দু স্ত্রীলোকগণ, ধর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিয়া, যে যে কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করা সকলেরই অবশ্য উচিত। ধর্ম্মই জগতের সার বস্তু। কেননা মৃত্যুর পর ধর্ম্মই মনুষ্যের অনুগামী সুহৃদ্, এতদ্ব্যতীত অপর সমস্তই শরীরের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হিতোপদেশকর্ত্তা নিম্ন শ্লোকে ইহাই লিখিয়াছেন:—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ [য.]

ধর্ম্মজীবন ব্যতীত মনুষ্যের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ বিধি ব্যতীত হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কতকগুলি স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পাতিব্রত্যই প্রধান ধর্ম্ম। পতিই হিন্দু স্ত্রীলোকগণের পরমদেবতা; পতিতে ভক্তি রাখিয়া পতির বিশ্বাসিনী হইয়া, পতির সহিত ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধ করিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সমগ্র হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধেয়। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের যে সকল অভিধা আছে, তন্মধ্যে 'সহধর্ম্মিণী' ও 'অর্দ্ধাঙ্গিণী' এই দুইটীই সর্ব্বপ্রধান। পতির অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া

পতির সুখে সুখিনী—পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী এবং পতির অর্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভাগিনী হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করাই প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পতি যাহাতে ধর্ম্মপথে থাকিয়া, দেশের, সমাজের ও পরিবারবর্গের প্রতি ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে পতিকে পরামর্শ প্রদান করিতে হিন্দু স্ত্রীলোকগণ কোন মতেই বিস্মৃত হইবেন না। পতি যদি ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে অগ্রসর হন, তদ্দর্শনে পত্নী উদাসীন থাকিলে, কিংবা স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সেই বিষয়ে প্ররোচনা দিলে, পত্নীকেও পতির পাপের অংশভাগিনী হইতে হয়; অতএব সৎপরামর্শ দ্বারা পতিকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন "কার্য্যেঽপি পত্নী মন্ত্রী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ। স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাৎ বেশ্যা চ শয়নে শুভা।"[য.] পতি যদি মোহান্ধ হইয়া পত্নীকে বিষম অত্যাচারে উৎপীড়িত করেন, পত্নী ক্রোধ, দুঃখ এবং অভিমান সংযমপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কুব্যবহার বা কটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধীরতার সহিত অবিচলিতভাবে পতির সেবা যত্ন করিয়া তাঁহার প্রিয়া হইতে চেষ্টা করিবেন। এমন অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদিগের স্বামী চরিত্রহীন ও বিপথগামী হইলে, তাঁহারা এতদূর হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া পড়েন যে, কতকগুলি অজ্ঞ প্রতারক অর্থলোলুপ লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া নানাবিধ বন্য বৃক্ষলতার বাকলমূল অর্থ দিয়া ক্রয় করতঃ পতিকে সেবন করাইয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুমাত্র সুফল ফলিতে দেখা যায় না, বরং নানাপ্রকার কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের একটী প্রবচন আছে—"থাক সয়ে পাবে রয়ে।" অতএব অনর্থক ঐ সকল 'গুণতুক' না করিয়া সমস্ত কষ্ট ও উৎপীড়ন অটল ভাবে সহ্য করিয়া পতিকে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের পথে ফিরাইবার নিমিত্ত সর্ব্বমঙ্গলময় পরমব্রহ্মের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি একদিন না একদিন সেই কাতর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। পতি পত্নীর মধ্যে সামান্য কোন বিষয়ে মতের দ্বৈধভাব হইলে, পত্নী নিজের প্রাধান্য রাখিবার নিমিত্ত পতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বীয় মতাবলম্বী হইতে জেদ করিবেন না। ইহাই দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত। দাম্পত্য কলহে মন অশান্ত হয়, মন অশান্ত হইলে মনুষ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পতির সহিত একমত হইয়া সাংসারিক, সামাজিক ও পারমার্থিক সকল কর্ম্ম সংসাধন করাই সমস্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত বিহিত।

হিন্দু স্ত্রীলোকগণ সাংসারিক আয় অনুসারে অনুধাবনপূর্ব্বক ব্যয় করিবেন এবং সেই আয় অনুসারে যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। নতুবা ভবিষ্যতের বিপদের সময় অর্থের প্রয়োজন হইলে অন্যের নিকট ঋণ করিতে হয়। ঋণজালে জড়িত হইয়া ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণী ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। অন্যের উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার দ্রব্য ইত্যাদি দেখিয়া তদনুরূপ বস্ত্রালঙ্কার দ্রব্যাদি লাভার্থে অক্ষম পতিকে বিব্রত করিলে, তিনি ঋণ করিয়া অথবা কোন নীচবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, নতুবা উপায়ান্তর নাই। এতাদৃশ অন্যায়ভাবে পতিকে পীড়ন করিলে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিয়া সুখশান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা হয় না। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ সংসারে সুখ শান্তি সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থ সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। হিন্দুদিগকে

স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা ব্যতিরেকে অনেকগুলি জ্ঞাতিকুটুম্বকেও প্রতিপালন করিতে হয়। হিন্দুজাতির পাশ্চাত্যবাসীদিগের ন্যায় কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র লইয়া সংসার নহে। ইহাদের অসহায় অক্ষম জ্ঞাতি কুটুম্বের ভরণ পোষণ করিতে এবং তাঁহাদিগকে সংসারে আশ্রয় দিতে হয়। তাঁহাদিগের আহারাদি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রদানের ভার হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের উপর ন্যস্ত থাকে। যে হিন্দু স্ত্রীলোক সেই আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি ভক্তি, স্নেহ, সেবা যত্ন করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাঁহারই গার্হস্থ্য ধর্ম্মজীবন অব্যাহত থাকে। এই পারিবারিক ভক্তি স্নেহ সেবা যত্ন করিতে করিতে মনুষ্য বিশ্বজনীন ঐ সকল ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ হিন্দু স্ত্রীলোক এই একান্নবর্ত্তিতার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া স্বার্থসুখের নিমিত্ত পতির সন্নিধানে আশ্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও তাঁহাদের নামে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগকে সংসার হইতে ভিন্ন করিয়া দেন। যাঁহারা বা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভরণপোষণ ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভৃত্য ও মনিবের ন্যায় ব্যবহার করেন। এরূপ আচরণে আশ্রিত ব্যক্তিগণ বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন, কিন্তু শঙ্কায় সে ভাব গোপন করিয়া থাকিতে হয়। তাঁহাদের মনে এ প্রকার কষ্ট দিয়া ভরণপোষণ ও আশ্রয় দেওয়ায় কিছুমাত্র পুণ্যার্জ্জন হয় না। অধিকন্তু অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং যত্নপূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সকল হিন্দু স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ পুত্র, কন্যা ও সকল পুত্রবধূকেই সমানভাবে স্নেহযত্ন করিবেন, কাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক বা কিঞ্চিৎ ন্যূন করিলে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অবৈধ বিরোধ ভাব আসিয়া পড়ে। পুত্র জননীর প্রতি কুব্যবহার করিলে তাহা যে পুত্রবধূর পরামর্শেই করিতেছে, সে বিষয়ে নিজের চক্ষু কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে, বৃথা সংশয়ান্বিত হইয়া অকারণে বধূর প্রতি ক্রোধ বা কুব্যবহার করা আদৌ উচিত নহে। অন্যের প্রমুখাৎ কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া বিশ্বাস করা মহাপাপ। মাতাপুত্রের বিবাদ কখনই অন্তরস্থ ও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু বধূ পরের কন্যা, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সত্য বা অমূলক কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে, একবার যে ক্রোধের ছায়া হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহা ইহজন্মে অপনোদন করা অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে। বধূরা ননদ, জা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত যথাযোগ্য ভক্তি ও স্নেহপূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করিবেন, কদাচ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ক্রোধ বা হিংসার ভাবকে মনে স্থান দিবেন না। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত কোনপ্রকারে বিবাদ হইতে না পারে, সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিবেন। তাঁহারা শ্বশ্রূকে ভক্তি সেবা করিবেন। যদি শ্বশ্রূর লাঞ্ছনা গঞ্জনা বা দুর্ব্যবহারে নিতান্ত অস্থির হন, তাহা হইলেও নিজের সুখশান্তির নিমিত্ত স্বামীকে তাঁহার জননীর সহিত পৃথক্ হইয়া, সংসারী করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে শ্বশ্রূর মনে ভয়ানক আঘাত দেওয়া হয়। "মুনির শাপ মনস্তাপ" উভয়ই সমান। সুতরাং ভিন্নসংসারী হইলেও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় না। শ্বশ্রূর সন্নিধান হইতে তাঁহার পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তাঁহারা শ্বশ্রূ, ননদ, জা কিম্বা ভ্রাতৃজায়ার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবেন, বধূ কন্যারাও পরম্পরানুক্রমে সেই আদর্শে গঠিত হইবে। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ পরিবারস্থ কাহারও সহিত কোন বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবেন না। একত্র বাস করিতে হইলে অনেকের অনেক

উপদ্রবই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে সকল কথা স্বামীর কর্ণগোচর হইতে দেওয়া উচিত নহে। অধিকাংশ পুরুষই স্ত্রীর প্ররোচনাবাক্যে সাংসারিক কলহে মনঃসংযোগ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া পড়েন। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ গৃহবিবাদে মন না দিয়া শিশুগণ যাহাতে ভবিষ্যতে ধর্ম্মজীবন অক্ষত রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদুপযুক্ত উপদেশ দিবেন। শিশুদিগের হৃদয় দর্পণ স্বরূপ, তাহার সমীপে ভালমন্দ যে চিত্র ধরিবে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হইবে। অতএব যাহাতে তাহাদিগের বাল্যকাল হইতে নীতি, জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহার মনোনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবেন।

হিন্দু স্ত্রীলোকগণ নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলার্থ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের চরণে মন সংযুক্ত রাখিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দান, পরোপকার, এবং অতিথিসৎকার, প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোক হৃষ্টচিত্তে যথাসাধ্য দান ও ক্ষমতানুযায়ী পরোপকার এবং অতিথিসৎকার করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। ইহাতে মনে শান্তি, আনন্দ ও পবিত্রতার উপলব্ধি হয়। সমস্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত গৃহস্থালীর কর্ম্ম ও রন্ধনকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে । শরীব সুস্থ থাকিলে সমুদায় সৎকর্ম্ম অনায়াসে সাধন করা যায়। গৃহকর্ম্মসমাপনান্তে আত্মোন্নতির জন্য পুরাণ, ইতিহাসাদি জ্ঞানমূলক গ্রন্থ পাঠ করা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দু সধবা ও হিন্দু বিধবা উভয়ের ধর্ম্ম এক হইলেও সকল কর্ত্তব্য আবার সমান নহে। সধবার অনেকগুলি কর্ত্তব্য বিধবার পক্ষে পালনীয় বটে, কিন্তু বিধবার ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ, উপবাস ব্রতাদি পালন এবং অসূর্য্যম্পশ্যাভাবে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া যে সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব রোগীর পরিচর্য্যা করা যুক্তিসঙ্গত, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা ও সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি কতকগুলি অতিরিক্ত কর্ত্তব্য আছে। আবার বিধবার পক্ষে অনেকগুলি ত্যাগ স্বীকারও প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় দমন, ভোগবিলাস, ও আমোদ উৎসবাদি বর্জ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিয়মগুলি প্রথমতঃ অতি কষ্টকর হইলেও উহা ক্রমশঃ অভ্যাসবশতঃ সকলেরই সহ্য হইয়া যায়। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

## জ্ঞানদা ও প্রমদার কথোপকথন

প্র। তুমি না ভাই জ্ঞানদা সেদিন বলেছিলে যে, সংসার সম্বন্ধে আমার মনে যখন যে সন্দেহ হবে তোমার কাছে বলিলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে, আরও বলেছিলে সমাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বেশ পরিষ্কার হ'লে তারপর ধর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেবে।

জ্ঞা। তাত বলেইছিলাম, তাকি অস্বীকার করছি? এখন আমার একটু অবসর আছে, তোমার মনে যদি কোনও সন্দেহ থাকে ত বল্‌তে পার।

প্র। তোমার ত অবসর খুঁজেই পাই না। তবে কি ভাগ্যি আজ তোমার একটু অবসর হয়েছে। আজ কদিন থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখি, তা তোমার ত অবসর কখন হয় বুঝতে পারি না।

জ্ঞা। তোমার ত আর আমাদের মত্‌ সংসারের কাজ কর্ম্ম নাই। সমস্ত দিন পাঁচ রকম আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছ। তোমার প্রমদা নামটী বেশ সার্থক হয়েছে।

প্র। কেন মানুষের নামের আবার একটা অর্থ আছে নাকি?

জ্ঞা। তা বুঝি জান না? অনেক সময় নামেতে ও রাশিতে এমন মিল হতে দেখা যায়—যে, মানুষ ঠিক তাহার নামের মত কাজ করিয়া থাকে। কখনও কখনও "দীনবন্ধু" নামের লোককে বাস্তবিকই "দীনবন্ধু" হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে আবার কোটিপতির পুত্রের নাম কাঙ্গালীচরণ কিম্বা দুঃখীরাম রাখা হইল। ঘটনাক্রমে দেখা গেল, সেই লোক জীবনে বাস্তবিকই যথেষ্ট দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিল। এই দেখ না কেন তোমার নাম প্রমোদা—আমি উহার কি অর্থ করি জান—প্রমোদা প্রমোদপরায়ণা অর্থাৎ সে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ প্রকার বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করে।

প্র। কেন আমোদ প্রমোদ কি কার্য্যের মধ্যে নহে?

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! তোমাকে ছোট ভাগ্নীর মত স্নেহ করি ও ভালবাসি। সেই জন্য কিছু উপদেশ দিবারও অধিকার রাখি। তা না হইলে বাস্তবিকই আমার কতটুকুই বা জ্ঞান এবং উপদেশ দিবার কি শক্তিই বা আছে? তোমার ভালর জন্য তোমাকে দুটী কথা বলিব, তাহাতে যদি অপ্রিয় বলিতে হয় অথবা তোমার মঙ্গলের জন্য নিজের যদি কিছু প্রশংসা করিতে হয়, সেজন্য কিছু মনে করো না। কার্য্যের কথা যদি বলিলে, তবে কাজ কাহাকে বলে শুন। স্বভাবের ভিতর নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে অনেক সময় সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কর্ম্মতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন। এই দেখ না কেন, পশু পক্ষী প্রভৃতির ভিতরে পুরুষগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহসের ও শক্তির ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে, স্ত্রীরা সন্তানাদি প্রতিপালন প্রভৃতি গৃহ-নিবদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। আমার মনে হয়, আমাদিগের ভিতর এইরূপ কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা স্ত্রীলোকের কার্য্য তোমার মতে কি হওয়া উচিত?

জ্ঞা। স্ত্রীলোক বলিতে যদি "স্ত্রী" বুঝ, তবে তাহার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

প্র। তুমি দেখিতেছি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবে মনে করিতেছ।

জ্ঞা। প্রয়োজন হলে বল্‌তে পারি। দেখ! সংসারের সুখ, দুঃখ, শান্তি অশান্তি স্ত্রীর চরিত্র ও ব্যবহারের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক স্ত্রী অথবা গৃহকর্ত্রীর অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

প্র। তুমি বুঝি "ভগবানের উপাসনার" কথা বল্‌ছ?

জ্ঞা। না প্রমোদা! উপাসনা নয়, প্রার্থনা। আর উপাসনার বিষয় তুমি যাহা বুঝেছ এবং ভগবানের উপর তোমার যতদূর ভক্তি আছে, তা এক কথাতেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের মহিমা বর্ণন, তাঁহার বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়া, সে অনেক দূরের কথা। প্রথমতঃ সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করা উচিত।

প্র। তা প্রার্থনার কথা কি বল্‌ছিলে বল।

জ্ঞা। প্রত্যেক গৃহিণীরই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে ভগবৎচরণে গৃহবাসী সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যে গৃহের সকল কার্য্যের ব্যবস্থার ভার আমার উপর ন্যস্ত আছে, তাহার কঠোর দায়িত্ব আমার শক্তিতে বহন করা অসম্ভব। ইহা বিশেষরূপে অনুভব করা চাই, এবং অনুভব করিয়া সেই মহাশক্তিশালী শক্তিপ্রস্রবণের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপায় আমি অক্লেশে সংসারের এই গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইব।

প্র। তোমার কথায় ভাই যেন বোধ হইতেছে, সংসার তোমার নিজের নয়, উহা অপর এক জনের, যে কেবল তোমাকে উহার দায়িত্ব বহনের ভার দিয়েছে।

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! এ প্রশ্নের উত্তর তুমি এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সংসারতত্ত্বের পর ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে প্রার্থনার বিষয় যাহা বলিতেছিলাম শুন।

প্র। বল! শুনিতেছি।

জ্ঞা। ষোল আনা সংসারের দায়িত্ববোধ না থাকিলে কেহ কখনও সুগৃহিণী হইতে পারে না। আমার শক্তির উপর, আমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচক্ষণতার উপর এই গৃহবাসী সকলের সুখ শান্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এবং নিজের শক্তির উপর অত্যধিক বিশ্বাস না থাকিলে, প্রার্থনা আপনা আপনি প্রাণ হইতে বাহির হইয়া আইসে। যেমন তুফানের সময় নদীবক্ষে নৌকারোহী সন্তরণাক্ষম

ব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রথমে ভগবানের চরণে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া পরে আপনার তৎ সাধনোপযোগী ইচ্ছা ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। বিগত রজনীতে সকলে যে নিরাপদে তাঁহার মাতৃক্রোড়ে শায়িত হইয়া নিদ্রায় অচেতন থাকিযাও এ দীর্ঘ সময় যে নিরাপদে অতিবাহিত করিলাম, তাহার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিব। তৎপরে ভক্তিভরে সেই গৃহদেবতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গৃহবাসী সকল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া গৃহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।

প্র। তোমার প্রার্থনা, প্রণাম, নমস্কার প্রভৃতির পালা যেরূপ লম্বা, তাহাতে এই সকল কর্ম্মেই যে বেলা ৮টা বাজিয়া যাইবে।

জ্ঞা। তোমার মত বেলা ৭টায় শয্যা ত্যাগ করিলে বেলা ৮টা কেন ১০ বাজিয়া যাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ভেবে দেখ! যদি রাত্রি ৪টার সময় শয্যা ত্যাগ করা যায়, তবে কতক্ষণে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে! বিশেষতঃ যাহা দৈনিক অভ্যস্ত ব্যাপার, তাহা সহজভাবে স্বল্প সময়েই সমাধা হইতে পারে। আরও ভাবিয়া দেখ! এই সকল পবিত্র ক্রিয়ার পক্ষে প্রভাতের নীরবতা ও স্নিগ্ধতা অতিশয় অনুকূল।

প্র। তা ভাই! ৭টার সময় যে উঠি, তাতে আমার অপরাধ কি? বেহারাটা তখনও চা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে না।

জ্ঞা। বুঝেছি। চা না খেলে তোমার বুঝি ভাল ক'রে ঘুম ভাঙে না, আর প্রার্থনা করা ত একেবারেই অসম্ভব। আজ কাল চাএর সঙ্গে উপাসনার নিত্যসম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিতে পাই প্রথমে না হয় পশ্চাতে চা থাকিবেই, তা না হইলে মেজাজ একেবারে বেঠিক্ হইয়া যাইবে। তা মন্দ নয়—চা খেয়ে শরীর একটু তাজা করে নিয়ে প্রার্থনা করাটা মন্দ নয়।

প্র। কেন ভাই! ছেলে বেলায় পিসিমার কাছে শুনেছি, খালি পেটে থাকিলে অসুখ করে, সেই জন্য কিছু খেয়ে নিয়ে কাজে লাগা ভাল নয় কি?

জ্ঞা। চুপ কর ভাই! আর বলিস না। পিসিমার কাছে শোনা গল্প সবগুলিই কি বিশ্বাস করিয়াছ, না সেই মত কার্য্য করিয়া থাক। কত রাক্ষস, রাক্ষসীর, ভূত প্রেতিনীর গল্প শুনিয়াছ, সেগুলিও কি ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক। যাক সে কথা—এখন যা বলি তাই শোন।

প্র। তুমি অত যত্ন নিয়ে কথাগুলো বল্‌ছো, আমি আর বসে বসে কাণ দিয়ে শুন্‌তে পার্‌বোনা।

জ্ঞা। না প্রমোদা, এসকল ঠাট্টা নয়, এ কার্য্যগুলিকে সাধারণতঃ লোকে সংসারের

অতি ক্ষুদ্র কার্য্য বলিলেও আমি এগুলিকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি। সুতরাং এ সকল বিষয় লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক জানিবে। যদি এ সকল কথায় তোমার কোনও উপকার হয় মনে কর তবে আমি বল্‌তে প্রস্তুত আছি। নচেৎ নহে।

প্র। রাগ কেন কর ভাই! ভাল না লাগ্‌লে আমি কি এমন বৈকাল বেলায় দুঘণ্টা পিয়ানো না বাজাইয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসি?

জ্ঞা। পিয়ানো আবার কবে হ'লো!

প্র। তা বুঝি জাননা? সেদিন আমি জেদ করে বল্লেম যে, হারমোনিয়ামটী একেবারেই ভাল নয়, তাহার পরিবর্তে একটী ভাল পিয়ানো চাই। তা তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, "দেখা যাক" বলে চলে গেলেন। তার পরে ৩৫০্ টাকা দিয়ে এই পিয়ানোটী এনে দিয়াছেন।

জ্ঞা। ভাল, শুনে সুখী হলাম যে তুমি অতগুলো টাকা জমিয়ে স্বামীর হাতে দিতে পেরেছ।

প্র। তা কেন? তাঁর হাতে ১০০্ টাকা ছিল, বাকি টাকা বোধহয় ধার ক'রে নিয়েছেন।

জ্ঞা। বটে! বোধ হয় ধার ক'রে। সেটা ঠিক্ জান না—জানিবার প্রয়োজনও বোধ হয় দেখ নাই। জিনিস পেলেই হ'ল, কোথা হ'তে কি উপায়ে আসিল তাহা আর দেখিবার প্রয়োজন কি? "সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।"

প্র। তুমি ভাই! কথার ফেরে যাহোক্ খুব বলে নিচ্ছ।

জ্ঞা। বল্‌বার মত কাজ কল্লেই বল্‌তে হয়। আমি না বলি অপর একজন বলিবে! কেহ না দেখে, কেহ কিছু না বলে, তোমার ব্যবহার ও বিবেচনায় ফল সময়ে তোমার সংসার-তরুতে ফলিবেই ফলিবে। তোমাদের পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। যাক্ সে কথা—যাহা বলিতেছিলাম, সংসারেরর দ্বিতীয় কর্ম্ম এই যে, গৃহে যদি কোনও রোগী, শিশু, আতুর বা অক্ষম ব্যক্তি থাকে, তবে তাহাদের ব্যবস্থা করা এবং সকলের বিধিমতে পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা। তৃতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে অথবা দাসদাসীর দ্বারা গৃহাদি পরিষ্কার করা এবং তৎপরেই সাধারণের আহারাদি ব্যবস্থা করা বিধেয় এবং সকলের আহারাদি উপযুক্তরূপে সমাধা হইল কিনা তাহাও পরিদর্শন করা উচিত।

প্র। তোমার ব্যবস্থা মতে গৃহিণীর নিজের আহারটী দেখি সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল।

জ্ঞা। অগ্রে হইবার ব্যবস্থা কোনওদিন ছিলনা ও কোনওদিন হওয়াও উচিত নহে। তুমি

গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, জননীরূপিনী হইয়া কি করিয়া গৃহের একটি প্রাণী অভুক্ত থাকিতে নিজে ভোজন করিতে পার! বাটীস্থ সকলের আহার হইলে তোমার দেখা উচিত কোনও অজানিত অতিথি অভ্যাগত অথবা তোমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্নের প্রত্যাশায় কেহ উপস্থিত আছে কিনা? যদি থাকে তবে গৃহের মঙ্গলার্থ তাহারও বিধিমত পরিচর্য্যা করা উচিত। এমনকি গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের প্রতিও যেন ক্রটী না হয়। তৎপরে নিজে যে ভোজন করা যায় তাহা শীতল কদন্ন হইলেও সুস্বাদু পলান্নের অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্র। তুমি তাহলে নিত্য পলাও খাও দেখ্ছি।

জ্ঞা। অবশ্য একবার সেই উপাদেয় অন্নের আস্বাদন পাইলে কেহই আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্র। আহারান্তে কার্য্যের কিরূপ ব্যবস্থা তাহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইতেছি।

জ্ঞা। অবশ্য একটু নিদ্রা দিবার ব্যবস্থা আমি কখনই করিব না, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কারণ, দিবানিদ্রা যে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি করে এবং শরীরকে একেবারে জড় করিয়া তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহারের পর সাংসারিক এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আছে, যাহা সে সময়ে না করিলে আর সমস্ত দিবসে হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। যথা?

জ্ঞা। যথা—ঘরদ্বার প্রভৃতি পরিষ্কার করা, শয্যাদি রচনা, বালক বালিকাদিগের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তুমি হয়ত বলিবে এগুলি দাসদাসী এবং পাচক প্রভৃতির কার্য্য।

প্র। আমি ত তাই মনে করি।

জ্ঞা। তা নয়, ওটী তোমার ভ্রম! ঐ সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিলে হৃদয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, অপরে করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমার সংসারের কার্য্য তুমি না করিলে, না দেখিলে, তাহাতে যে আনন্দ তাহা তুমি নিজে উপভোগ করিতে পারিলে না, অপর পক্ষে বেতনভোগী লোকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্যগুলি করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনও আনন্দ অথবা শান্তি নাই। কাজেই সংসারের যে সুখ তুমি স্বেচ্ছায় উপভোগ না করিয়া অপরের উপর ভার দিলে, তাহারাও তাহা উপভোগ করিতে পারিল না।

প্র। তুমি ভাই! মিষ্টি করে বেশ দুচার কথা শুনাচ্ছ।

জ্ঞা। আমি ত ভাই! পূর্ব্বেই বলেছি, রাগ কর্‌লে চল্‌বে না। একটু ঘা দিয়ে কথাগুলো না বসালে হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে বস্‌বে কেন?

প্র। তোমার কথাগুলি হৃদয়ে যে ভাবে বস্‌ছে তা যে আর কখনও ভুলবো এমন মনে হয় না।

জ্ঞা। আমিও তো তাই চাই।

প্র। হ্যা ভাই জ্ঞানদা, তুমি একটী কথা বল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়েছ।

জ্ঞা। বুঝেছি—ভুলি নাই—বলি নাই কেন শুন্‌বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।

প্র। তা কোন কার্য্যেই ত নামটী মাত্র কর্‌লে না।

জ্ঞা। নাম করলেই ত সাধারণ হয়ে গেল, জিনিষটা যে অসাধারণ। যেমন সকল কার্য্যের প্রারম্ভে সিদ্ধিদাতা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে—সেইরূপ সংসারধর্ম্মের সকল কার্য্যই স্বামীকে লইয়া। তাঁহার সন্তোষ ও তৃপ্তি কল্পনা না করিয়া তুমি সংসারের কোনও কার্য্য করিতে পার না। যদি কর তবে তাহার ফল শুভ নহে। সংসার ধর্ম্মের এইটী প্রধান সূত্র ও মূল মন্ত্র ইহা মনে রাখিবে।

প্র। সাধ্যমত তোমার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিব।

জ্ঞা। তুমি তবে এখন কিছুক্ষণ জপ করিতে থাক, আমার কিছু কার্য্য আছে, এখন উঠলেম।

প্র। আমিও তবে চল্লেম—দেখি তোমার কথামত কত দূর কার্য্য ক'রতে পারি। সময়ান্তরে আরও অনেক বিষয় শুনিবার ইচ্ছা রহিল।

মাঘ ১৩১৪

# নারীর গৃহধর্ম্ম

মানবশিশু নারীজাতির কোমলহস্ত গঠিত। পুণ্য-জ্যোতি বিভাসিত গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেশ বিদেশের সহস্র মহৎ লোকের পুণ্যময় জীবনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সভ্যতার প্রাদুর্ভাবের সহিত বঙ্গগৃহে বিষম পরিবর্ত্তনের বন্যা অশাসিত ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনাদর্শ গৃহে অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা একান্তই আশঙ্কাজনক ও ভারতনারীর অগৌরবের কারণ। আমি সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহই যেন ইহা মনে না করেন। নিষ্ঠা, সংযম, ভগবানের করুণায় প্রগাঢ় বিশ্বাস, সাধুতা কোন

সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। গৃহই পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সুখ ও শান্তি ও আরামস্থল। এই রাজ্যটীতে স্নিগ্ধ শান্তি, শুদ্ধতার বিমল স্রোত প্রবাহিত করার সম্পূর্ণ ভার নারীজাতির হস্তে। আমরা সেই পরম নিষ্ঠাবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমার পবিত্র স্মৃতি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও উপকৃত হই। তাঁহারা সংসারের মহাপ্রতিকূল অবস্থায় ঘোর রোগ শোকের তুফানে, যে প্রকার বীর নারীর ন্যায় সংগ্রাম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন সংসারকে ধর্ম্মের বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ ত তাহা স্মরণ করিয়া কত উপকৃত হইতেছি। সংসারের অগণিত কঠোর ও জটিল কর্তব্য সংসাধনে তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কদাচ বিন্দু পরিমাণে ইতস্ততঃ করেন নাই। এত কর্ম্মকোলাহলে ডুবিয়াও স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠান ভুলিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। আমাদের কোমল শৈশব হৃদয়ে উপকথা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলিয়া যে ভাব উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারিনা। ঘোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখনই তাঁহারা গভীর নিশীথকালে বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইতে গমন করিতেন, আমরা এতগুলি আবদারে সন্তান গল্প বলিবার জন্য তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। দৈনিক জীবনে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই অসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে পূজা করিত। এই উচ্চস্থানই নারীর আরাধ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভাবের অনিবার্য্য প্রবাহে ভারতের গৃহে গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মবিহীনতা ও অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া মিতাচারপূর্ণ বাঙালীর গৃহ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ করিয়াছে। এখনকার মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা ও মামীগণ অনেকেই আমার ঠাকুরমাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গৃহের মধ্যে সন্তানাদির হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভা বিস্তার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আশা করি, এই ধৃষ্টতা মার্জনাপূর্ব্বক আধুনিক মহিলাগণ ভবিষ্যৎ বংশীয়দের অগঠিত হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সতত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে যত্নবতী হইবেন।

অগ্রহায়ণ ১৩১৫ স্বর্ণপ্রভা বসু।

## স্ত্রী চরিত্রের প্রভাব

আমরা দেখি এ জগতে সকলেই এক উদ্দেশ্যে ধাবমান। সেটী কি? সুখ। সুখের জন্য আমরা কিনা করিতেছি? কিসে সকলের অপেক্ষা অধিক ধন ও মান লাভ করিব, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের অধিকারী হইব, এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব লইয়া আমরা প্রতি নিয়ত ঘূর্ণায়মান। ধন, মান ও সুখের লালসায় আমরা কত শত অন্যায় কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেও সুখ লাভ হয় না; কারণ প্রকৃত সুখ একমাত্র সচ্চরিত্রতায়। আমরা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত সত্য; কিন্তু এক একটী করিয়া চরিত্রের দোষ ও

ক্রুটিসকল খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃত চরিত্র লাভে সচেষ্ট নই। পরম পিতা পরমেশ্বরের রাজ্যে আমরা সকলেই সমানরূপ সম্পত্তি লাভপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই আপন আপন বৃত্তিগুলিকে সতত ন্যায় পথে পরিচালনা করিয়া আদর্শ চরিত্র লাভ পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে। সচ্চরিত্রতার মহিমা অপার। ইহা ইহকালে মানবকে দেবত্বে পরিণত করে এবং পরকালেও অনন্ত সুখের অধিকারী করে। জগতে এমন কিছু নাই, যাহার সহিত এই দুর্লভ রত্ন উপমিত হইতে পারে। পশুতুল্য ব্যক্তিও এই মহারত্নের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সংসারে সকলে সমান জ্ঞানী বা ধনী হয় না, কিন্তু চরিত্র উৎকৃষ্ট হইলে জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য বহুদূর প্রসারিত হয় সন্দেহ নাই। ইহার নিকট ধন, মান, জ্ঞান, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা, বিনীত ব্যবহার যাহাই হউক না কেন কিছুই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। চরিত্র প্রভাবে একদিকে যেমন লোকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা লাভ অনিবার্য্য, অপর দিকে তদ্রূপ বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। চরিত্রবিহীনতায় মানুষকে এরূপ ঘৃণিত করে যে তাহার নাম মাত্র শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। হাজার যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের এ স্বাভাবিক ভাব দূর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ চরিত্র সুগঠিত হইলে এ জগতে ভীষণ প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষ্যার মধ্যেও আবাল বৃদ্ধ বণিতার শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করা যায়। ব্যক্তিনিষ্ঠ সচ্চরিত্রতা প্রত্যেক জাতি ও সমাজের আশা ভরসা। যে দেশবাসী যে পরিমাণে চরিত্রবান, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে।

সমস্ত জাতির সমাজে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-চরিত্র কার্য্য করে। স্ত্রীলোক গৃহরাজ্যের রাণী। সুতরাং গৃহরাজ্যের সুখ শান্তি ও সুনিয়মের মূলে স্ত্রী-চরিত্র কার্য্য করে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নানা আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া সন্তানচরিত্র গঠিত হয়। সন্তানগণের চরিত্র এবং জীবনের উপরেই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি বা অবনতি দণ্ডায়মান। সন্তানচরিত্রই দেশীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি।

রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ সুকোমল ও প্রেম পরিপ্লুত। কিন্তু কেবল কোমলতাগুণে সংসারে শান্তি সংস্থাপন বা মহত্তর উদ্দেশ্য সংসাধন অসম্ভব। প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণার্থ নারীহৃদয় বজ্রবৎ সুকঠিন আবরণে আবৃত রাখা আবশ্যক। যেহেতু রমণীগণ যদি হৃদয় হইতে বিকৃত সৌন্দর্য্যস্পৃহা সংযত করিয়া, সত্য, ন্যায় ও প্রেমের সুকোমল শাসনশক্তি বিস্তারে যত্নবতী হন, তবে পরিবার ও প্রতিবেশিমণ্ডলে সদ্ভাব ও সুখলাভ সহজ হইয়া উঠে। শালীনতা স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ। সাধুভাব ও বিনয়প্রভাবে জগতে স্ত্রীজাতি অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কারণ, পবিত্র চরিত্রের নিকট জগৎ পরাজিত। অহঙ্কার দ্বারা অনেক সময় আমরা ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকি। বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে চরিত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া যায় এবং প্রগলভতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নানা দোষে চরিত্র ক্রমে ক্রমে কলঙ্কিত হইতে থাকে। পুষ্প যেমন সৌরভরাশি বিস্তার পূর্ব্বক মানুষের মন মুগ্ধ করে, চরিত্রও তদ্রূপ নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য ও মূল্যবৃদ্ধি করে। চরিত্ররূপ চারাগাছ সদ্ভাবরাশি দ্বারা এভাবে বেষ্টন করিতে হইবে, যেন কেহ পদদ্বারা নষ্ট করিতে না পারে, অথবা অঙ্কুর ছাগল প্রভৃতিতে বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া গেলে, সদ্ব্যবহার স্বতঃ প্রবাহিত হয়। যাহার হৃদয় পবিত্র তাহার বাক্য কখন নীচ হইতে পারে না। যিনি যথার্থ বিনয়ী এবং যাঁহার স্বভাব

প্রেমপূর্ণ, তাঁহার ব্যবহার বা বাক্য কখন কর্কশ হইতে পারে না। অথচ তাঁহার ব্যবহারে বা বাক্যে তোষামোদের লেশমাত্র থাকে না।

আমরা চরিত্র সুসংগঠন অপেক্ষা অর্থোপার্জনকে বিদ্যাভ্যাসের মূল কারণ বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃত চরিত্র লাভ না করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন সত্ত্বেও মানব কখনই যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

অনেক স্ত্রীলোক বিশ্বকর্ত্তার বিধানে সন্তুষ্ট না হইয়া স্ত্রীজীবনকে অধিকতর দুঃখজনক মনে করেন। মঙ্গলময় মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া অসন্তুষ্ট ও অলসভাবে জীবনকে দুঃখময় করেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে? স্ত্রী জাতি তাঁহার চরিত্র প্রভাবে জগতে কিনা করিতে পারেন, তাঁহাদের সৎশিক্ষা ও সদ্ব্যবহারই সন্তান চরিত্রের ভিত্তিভূমি। এক একটী সন্তান সংসারে কি মহৎ কার্য্য না সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত অসদাচারী, বিপথগামী, দুর্দ্দান্ত পতি, পত্নীর পবিত্র প্রেমে পরাজিত হইয়া সৎপথাবলম্বী হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? বিবেকের প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ফলাফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, এই সংসারেই স্বর্গ-সুখ মিলে। ফলতঃ চরিত্র জীবন নৌকার মাস্তুল বিশেষ। চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে ধর্ম্মভাব স্বতঃ সন্দীপিত হয়। স্বর্ণাভরণের উপরে চাকচিক্য, গোলাপের মধ্যে সুগন্ধ এবং সুশোভন দৃশ্যের উপর সূর্য্যকিরণ যেরূপ মনোমুগ্ধকর, চরিত্রের মধ্যে ধর্ম্মভাব সেইপ্রকার উজ্জ্বল ও হৃদয়রঞ্জক। চরিত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন মণি-কাঞ্চণ যোগের ন্যায় পরম রমণীয়। আত্মজ্ঞান লাভ জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। ধর্ম্মকার্য্যও গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণনীয় বটে, কিন্তু সাংসারিক বাহ্যকার্য্যের অতীত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভও জীবনের একটী কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা, সময় ও শক্তির প্রয়োজন। আমরা সাংসারিক কার্য্যে এত মুগ্ধ ও ব্যস্ত যে, মুক্তি-সাধনরূপ মহৎকার্য্য বিস্মৃত হইয়া থাকি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এবিষয়ে অধিকতর উদাসীন। শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ স্ত্রীপুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহারা সমান। উভয়ের মধ্যে পরমাত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে উভয়েরই সমান যত্ন থাকা আবশ্যক।

আত্মা অবিনশ্বর এবং ইহার অলঙ্কারও তদনুরূপ হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা হীরকের জ্যোতিতে কি হৃদয় জ্যেতিষ্মান হইতে পারে? মুক্তা-জ্যোতিতে কি বিবেকবুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী হয়? জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে কি চরিত্রের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আত্মার যথার্থ অলঙ্কার সত্য, পবিত্রতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, আশা, প্রেম, আনন্দ ও নম্রতা। পরিণামদর্শিতা, তিতিক্ষা, শিষ্টতা এই সকল হৃদয়ের অলঙ্কার। এই সকল গুণ দ্বারা মানুষের অন্তর শোভিত হয়।

ঈশ্বরে ভক্তি চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুকুট। ইহার অভাবে কোন গুণই বাঞ্ছনীয় বা মনোহারী হইতে পারে না। ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা মানুষ অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অপরকে সৎশিক্ষা দানে যত্ন করে। দিবানিশি সাধুকাজে ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসে, আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশায় তাহার জীবনের দিন সকল উজ্জ্বলতর হয় এবং ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইলে প্রফুল্লহৃদয়ে পরজীবনে গমন করিতে পারে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৫ — শ্রী বিনোদিনী সেন।

# গৃহকর্ম্ম

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের পরিবারের অনেক দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের কাছে হয়ত ঘরের কাজ করা অতি ঘৃণিত বিষয়। বাল্যকাল হইতে তাহাদের ঐ সংস্কারটী তাড়াইতে পারিলে আমি যারপরনাই সুখী হইব। আমাদের দেশের গৃহিণীরা যদি সকল কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সংসারের সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। মনে মনে কর্ম্মজ্ঞান কোন কাজের নয়; আর গৃহকর্ম্মে উত্তম রূপে কার্যতঃ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা আবশ্যক। নতুবা বয়সকালে উহা শিক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। মায়েরা যদি কন্যাদিগকে নিয়মিতরূপে দুচারটী সহজ গৃহকর্ম্ম করিতে দেন, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর সুশৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ সংসার চালাইতে সক্ষম হইবে। তাহা না হইলে, শ্বশুরবাড়ী গিয়া ছোট ছোট বউদিগকে যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা যিনি একবার ভুগিয়াছেন, তিনিই জানেন।

পরিবারের মধ্যে দুই তিনটা মেয়ে থাকিলে সংসারের সহজ কাজগুলি তাহাদের মধ্যেই ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজা, বিছানা করা, ঠাঁই করা পরিবেশন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, অধিক কি, জলতোলা, ঘর ধোওয়া ও বাসনমাজার কাজও বালিকাদিগকে শিখান আবশ্যক। কিন্তু উহা তাহাদিগকে এরূপভাবে শিখাইতে হইবে যে, তাহাতে তাহারা কালব্যয় করিলে চলিবে না। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজ বুঝিয়া লইবে, উহা দায়িত্বের সঙ্গে ঠিক্ সময়ে শেষ করিতে বাধ্য হইবে। অবশিষ্ট কাল তাহারা লেখাপড়া ও খেলাতে কাটাইবে।

বাল্যাবস্থা হইতেই মেয়েরা গৃহকর্ম্মকে যেন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে শিখে। তাহা না হইলে বড় হইয়া তাহারা কর্ত্তব্য কাজের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আমার মতে কন্যাদের নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, দোর জানালা ধোয়া, মেজে সাফ করা, আসবাব ঝাড়া প্রভৃতি কাজের জন্য স্বচ্ছন্দে তাহাদের উপরই নির্ভর করা যাইতে পারে। আর প্রত্যহ দুএকটা ব্যঞ্জন রাঁধাও বালিকাদিগকে শিখাইবে। রোজ দুই তিন ঘণ্টা সময় গৃহকর্ম্মে দিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কেননা, গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কাজ বলিয়া ধরা হইলেও, কোন গৃহিণী যে সমস্ত দিনই সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, এরূপ আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ স্ত্রীজাতি সংসারকাজের অপেক্ষাও উচ্চতর অন্যান্য কর্ম্মসাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে।

গৃহকর্ম্মের সঙ্গে জিনিসপত্র দেখাশুনা জামা সেলাই প্রভৃতি কাজও ধর্ত্তব্য। বালিকারা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ পরিশ্রম করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিবে কার্য্যত জ্ঞানের সহিত তাদের পরিচয় হইবে। উহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোককে নিজের হাত চালাইবার ন্যায় মন চালাইতেও শিখায়। সর্ব্বদা নারীজীবনের অন্যান্য উচ্চ কাজের মধ্যে থাকিলেও সে কখনও নিজ সংসারকে অবহেলা করিতে পারে না। হাজার শিক্ষিত হইলেও সে, নারী ও পুরুষজাতির কর্ত্তব্য যে স্বতন্ত্র, সংসারের সুখ-শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা যে গৃহিণীর যত্ন ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, এ মহাবাক্য কখনও ভুলিয়া যায় না।

যাহা হউক, পুস্তকে কাজের পথ দেখাইয়া দিলেও উহা দ্বারা গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া

এক প্রকার অসম্ভব। কেবল অভ্যাস বশতই উহাতে নিপুণ হওয়া যায়। তবে যে সব বালিকার পিতৃগৃহে মায়ের কাছে ঐ সকল কাজ শিখিবার সুবিধা নাই, আর যে মায়েরা নিজেই উহাতে অপটু, তাঁদের জন্য গোটাকতক কথা বলিলাম।

বৈশাখ ১৩১৭ মিসেস ডি. এন. দাস।

## স্ত্রীলোকের কাজ

বিবাহের কিছু পরে যেদিন বালিকা প্রথম শ্বশুরঘর করিতে যায়, সেইদিন তার জীবনের দুই কাল ভাগের প্রাচীর স্বরূপ। উহার একদিকে সে স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দ্বারা চালিত ও পথদর্শিত হইয়াছে; আর অন্যদিকে তাহাকে পরের গৃহে অনেক পরিমাণে নিজে বুঝিয়া ও পথ দেখিয়া চলিতে হইবে। ঐ দিন হইতে কয়েক বৎসরের শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি স্থিরীকৃত হয়। আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, কতশত প্রফুল্ল কর্ম্মিষ্ঠা বালিকা কাজের অভাবে বিমর্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নাই। তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া দেন না, এবং অল্প বয়স প্রযুক্ত তাহারা নিজেও কোন কাজ মনস্থ ও আরম্ভ করিতে অপারগ। স্কুলে যতদিন থাকে, বালিকারা লেখাপড়ার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করে ও খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়িবার পর তাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না। তাহারা সমস্ত সকালবেলা বিনাকাজে শুধু গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, স্নানাহারের পর হয়ত কোন অশ্লীল নবেল পড়িয়া বা নিদ্রাতে দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; তাসখেলা সচরাচর বিকেলবেলার সঙ্গী; এইরূপ প্রতিদিন, কত মাস, কত বৎসর কাটিয়া যায়।

এইরূপ জীবন যাপন করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে উন্নত থাকিবে ও উন্নত হইবে আমরা এমন আশা কখনই করিতে পারি না। এইরূপে সময় কাটাইলে কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা ও আত্মপ্রিয় হইয়া উঠে। পরের নিন্দায় তাহাদের বড় আনন্দ হয়, হিংসায় শরীর জ্বর জ্বর করে এবং নিজসুখ ও বেশভূষাতেই তাহাদের সমস্ত মন পড়িয়া থাকে। সমস্ত বুদ্ধিমান পুরুষ ও স্ত্রীলোক এ প্রকার নারীদিগকে ঘৃণা করেন, এবং সহৃদয় লোকে তাহাদের জন্য ব্যথিত হন। সকলে বলে তাহারা কিছুই করে না। কিন্তু তাহারা দিনরাত জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পূজিত নারী-নামে তাহারা কলঙ্ক দেয়; এবং যে স্ত্রীজাতি সংসারে মানুষকে মার্জ্জিত, পবিত্র ও মহৎ করিবার জন্য সৃজিত, সেই রমণীকুল তাহাদের জন্য পুরুষের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত হয়।

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে লোকে পরশপাথর লাভের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিত। কিন্তু আমরা যখন চারিদিকের কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন ভারত রমণীদিগের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন দেখি, তখন আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ সহকারে খাটিয়া এমন কবচ অন্বেষণে ব্যাকুল হই, যাহার স্পর্শে সোনার অপেক্ষাও

মূল্যবান দ্রব্য আমাদের হস্তগত হইবে,—নিঃস্বার্থ উন্নত নারীচরিত্র প্রতিগৃহের সেই রত্ন এবং ব্যগ্রভাবে পরিশ্রম—সেই পরশপাথর। উহা দ্বারাই নির্ব্বোধ চঞ্চলা বালিকাদিগকে আমরা বুদ্ধিমতী ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। উহার বলেই আমরা মুখরাকে সুশীলা ও অলসা নারীকে কার্য্যপ্রিয় করিতে পারি।

আমার এরূপ বোধ হয় না যে, কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া আলস্যে জীবন কাটায় তবে বাল্যকালে ঐ অভ্যাসটী একবার শরীরগত হইয়া যাইলে অধিক বয়সে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা কঠিন। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের অভাবেই একটু একটু করিয়া লোকে প্রথমে অলস ও অবশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

আমরা যদি প্রতি অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকের ইতিহাস খুঁজি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে দেখিতে পাইব যে, প্রথমে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না, পরে তাহার ঐরূপ অলস জীবন যাপনে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে নিজের আপাততঃ আমোদের জন্য দুই একটী বিষয়ে আস্থা হয়; পরিশেষে ঐরূপ আত্মসুখ তাহাকে স্বার্থপর, আত্মপ্রিয়, অলস ও ভাল কর্ম্মে অক্ষম করিয়া তুলে। সেই কারণে সর্ব্বাগ্রে, আমরা কি কাজ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা সকলের ভালরূপে জানা উচিত। কয়েক বৎসর হইতে আধুনিক বঙ্গমহিলাদিগের প্রতি নানারূপ দোষারোপ হইতেছে ও গালাগালি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে।

প্রাচীনেরা বঙ্গবালাদিগকে কলিকালের মেয়ে বলিয়া উড়াইয়া দেন আর নব্য পুরুষেরা তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিবার জন্য কত গ্রন্থই প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল যুবকেরা নিজে উপদেশ গ্রহণ করিলে ভারতের মহামঙ্গল হইত, তাঁহারা পর্য্যন্ত হিন্দুনারীকে লেকচার দিতে বসিয়াছেন! ছেলেবেলায় একটা বড় মজার গল্প শুনিয়াছিলাম! কোন্ একজন ছেলে নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা! বাবা কোথায়? আর মার কাছে যখন শুনিল যে, তাহার পিতা গরুর পাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, সে অমনি পিতার খাবার মাথায় করিয়া মাঠে ছুটিল! স্ত্রীলোকের প্রতি বঙ্গীয় যুবকদের উপদেশ দেওয়া দেখিয়া ঐরূপই মনে হয়। কোন বালকের ধর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে সে ভাবে, এখন অকর্ম্মণ্যা অশিক্ষিতা বাঙালী স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার বয়স তাহার যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ করাতে তাহাদিগেরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না, কারণ বর্ত্তমান বঙ্গবালার অবস্থা এরূপ শোচনীয়ই বটে।

যাহা হউক, এখন ও সকল কথা বাদ দিয়া আসল কাজের কথা আরম্ভ করিব। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই (ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে) একটী বিষয়ে সকলেরই একমত দেখা যায়। পরমেশ্বর জগতের কাজের জন্য জীবাত্মা সৃজন করিয়াছেন; আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের এক এক নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, সেই মনের মত কাজটী খুঁজিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নিজ সংসার, পরিবার বা প্রতিবাসীদের মধ্যেই নিজের অবকাশ-সময় কাটাইবার যথেষ্ট উপযুক্ত কাজ পান। তাঁহারা সচরাচর আপনাদের চারিদিকের লোকের প্রভূত উপকার করেন ও আপনারাও সর্ব্বদা সুখী ও প্রফুল্ল থাকেন। কখন কখন তাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও বাধ্য হন। কিন্তু মানুষের জীবন লোহার ন্যায়, মরিচা ধরিয়া ক্ষয় হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় হওয়াই ভাল। তাহা ব্যতীত, চালনা দ্বারা ঐ সকল পরিশ্রমশীলা নারীদিগের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং মহাবিপত্তি

কালে তাঁহারা অনেক মহৎ কাজ করিতে সক্ষম হন। আবার প্রতিগৃহে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পান না বা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কোন না কোন কাজে মন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি প্রকারে উহা আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানেন না। তাঁহারা কাজের মহত্ত্বের কথা পুস্তকে পড়েন বা পিতা ভ্রাতাদিগের মুখেও শুনেন এবং নিজেরাও জগতে কিছু না কিছু করিতে ব্যগ্র; কিন্তু তাঁহারা কি কাজ করিবেন ও কিরূপে করিবেন?

সাধারণ নারীদিগের ঐরূপ সমস্যা ভাঙ্গিবার আশায় আমি স্ত্রীলোকদিগের কি কাজ ও উহা কিরূপে করা উচিত, সে বিষয়ে কতকগুলি পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু কোন্ কাজটা কোন্ স্ত্রীলোকের যোগ্য ও সাধ্যায়ত্ত তাহা বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতি নারীরই নিজ নিজ মনোমত কাজ ঠিক করিয়া লওয়া ও উহা দায়িত্বপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। এ সংসারে কোন্ লোকের হাতে কোন্ বিশেষ কাজটা পড়িলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা সে শিক্ষা পাইয়া থাকি। কখন কখন বা হয়ত আমরা সাধ্যাতীত বা আমাদিগের অনুপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, কিন্তু অল্প দিন পরে তাহা ছাড়িয়া আর কোন বিষয়ে মন ফিরাইতে হইবে। যাহা হউক, আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ কাজ ও নির্দ্দিষ্ট কাজের স্থান আছে, তবে যতক্ষণ না আমরা ঐ কাজ বুঝিয়া ঐ স্থানটী পূর্ণ করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের নিশ্চেষ্ট বা সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে ধাত্রীবিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজের পথ ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য খোলা হইয়াছে। গরীব নারীদের ভদ্র ও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আশা করি, পাঠিকারা এরূপ মনে করিবেন না যে, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তই পরিশ্রম করিতে শিখান আমার অভিপ্রায়। সামান্য গৃহস্থ বা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কখন কাজের অভাবে আলস্যে জীবন যাপন করে না, তাহারা নিজে না রাঁধিলে কেহ খাইতে পাইবে না; না খাটিলে ছেলেমেয়েদিগের ভাতকাপড় জুটিবে না— এই ভাবনা তাহাদিগকে যে কোন কাজে হউক সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখে।

কিন্তু যে বালিকারা বা স্ত্রীলোকেরা সংসারে কোন কাজ করিতে বাধ্য হয় না, যাহাদের গৃহে পরিশ্রম করা বা বসিয়া থাকা দুইই সমান, যাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কাজের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ ধনবতী বা মধ্যবর্ত্তিনী মহিলাদের মধ্যেই আলস্য ও অপদার্থতার অধিক আশঙ্কা। তাহাদের সমস্ত গৃহকর্ম্ম, এমনকি সন্তানপালন পর্য্যন্ত কতকটা দাসদাসীদিগের দ্বারা সাধিত হয়; সুতরাং তাহাদিগের জীবনে কাহারও ভাতের মাছিটা পর্য্যন্ত তাড়ানর প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় তাহারা কখন কখন ঐ চির বিশ্রামে বিরক্ত হইয়া নিজ মনে—সংসারে আমি কি কাজ করিব?—এ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় না। কাজে কাজেই এরূপ অবস্থায় আলস্যলোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা যে উহার উত্তর খুঁজিতেও প্রয়াস পায় না, এ বড় আশ্চর্য্য নহে। তাহারা যদি এরূপ স্থলে কাহারও দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্মে দীক্ষিত ও পথপ্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে যে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজের দ্বারাই তাহাদের চিরবিমর্ষ জীবন আনন্দময় হইবে, আস্থাহীন মন স্ফূর্ত্তিময় হইবে, এবং হিন্দুর সংসার অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুখময় হইবে। তাহাদিগের মন প্রশস্ত হইবে ও

মনোবৃত্তিসমূহ পুষ্টিলাভ করিবে। তখন তাহারা নিজেকেও মান্য করিতে শিখিবে, এবং অপরের দ্বারাও সম্মানিত হইবে। কারণ—

জীবন গম্ভীর, কিন্তু আনন্দের ঘর—
কর্ম্মেতে যাপিত হলে—সুখের সাগর—
হরষের খনি উচ্চ আশায় পুরিত।

কোন কোন লোক মনে করেন যে, নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোকের কোমল রূপ কঠিন হইয়া যায়। এ প্রকার ভাবা অতি অবিবেচকের কাজ। কেননা, দরিদ্রপত্নী ও কৃষকবালাদের স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের লাবণ্য প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। কোন নারীর অবয়বে যদি তাঁহার সদ্ভাবের ও সৎকার্য্যের প্রভা প্রতিভাত হয়, তবে সে সুন্দর মুখ যে আরও কত অধিক উজ্জ্বল হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? একজন অলস, অকর্ম্মণ্য, ম্লান নারীর মুখের সঙ্গে একটী কর্ম্মক্ষম সতেজ বদন মিলাইয়া দেখিলে কোন্‌টি বেশী মনোহর দেখায়? এসিয়া ও ইউরোপের ধনবতী মহিলাদিগের মধ্যে কি আমরা এই প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাই না? আমাদের আসিয়িক ভগিনীরা ইউরোপীয় ভগিনীদের তুলনায় রূপে সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কিছুমাত্র হীন নন, কিন্তু ইউরোপীয় নারীদের কর্ম্মিষ্ঠ মুখের জ্যোতির কাছে আসিয়িক মহিলাদের প্রভা গ্যাসের পার্শ্বে বাতির আলোর মত মিট মিট করে। এমনকি, এক ভারতেই রাজপুত বা খোট্টা বালাদের সতেজ দীপ্তির নিকট বঙ্গবালার রূপের নিস্তেজ কিরণ তত ভাল খোলে না। অন্যদিকে, কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন লোকের চক্ষু তৎপর ও পরিশ্রমী লোকের চক্ষুর তুলনায় প্রাণশূন্য দেখায়। একজনের রূপ, সৌন্দর্য্য সকলই আছে, কিন্তু কাজের অভাবে তাহা এত নিষ্প্রভ হয়, উহা শূন্যতার অলস জীবন ও বিমর্ষ আত্মার প্রকৃত পরিচয় দেয়। অন্য জনের রূপ সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চক্ষুর উজ্জ্বলতায় তাহাকে মনোহারিণী করিয়া তুলে, আর উহাতে তাহার কত জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়। ঐ চক্ষু দ্বারা তোমার অন্তরাত্মা তাহার আত্মার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। সেইজন্য প্রকৃত উপকারী কাজ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য না কমাইয়া বরং উহাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ভাদ্র ১৩১৭

# হিন্দুগৃহে বধূ যন্ত্রণা

আজ বহুকাল পরে অনেক ভাবিয়া হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিতেছি। সেইজন্য আজ লেখনী ধরিয়া, আমার বঙ্গীয়া ভগিনীদিগকে সেকালের মত একালেও যে বধূর যন্ত্রণা আছে, সেই কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি। আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধুনা শিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মহিলারা যখন নিজেরা বধূ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শ্বশ্রূরূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন যেন তাঁহারা 'স্নেহের পুতলী' বধূদিগের প্রতি নিগ্রহ না করিয়া অনুগ্রহই প্রকাশ করেন।

হিন্দুসমাজের প্রায় ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি বড়ই অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। আমার অনুমান শতকরা ৫ জন বধূ শ্বশ্রুর স্নেহের অধিকারিণী হইতে পারেন। অবশিষ্ট ৯৫ জন শ্বশ্রুর কাছে অশেষ প্রকারে বাক্যের ও অন্যবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে ইহার কারণ কি? আমি অনুমান করি ইহার প্রধান কারণ দুইটী মাত্র—প্রথম হিন্দুসমাজে পুত্র উপযুক্ত, স্বাধীন এবং উপার্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় হিন্দুসমাজে উপযুক্তরূপে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে পুত্রবধূ বা শ্বশ্রু অশিক্ষিত হওয়া।

অশিক্ষিতা রমণীরা সময়ে সময়ে এক প্রকার কাণ্ডজ্ঞান রহিতা হয়েন। তাঁহারা রমণী হইয়া সময়বিশেষে রমণীর প্রধান ভূষণ যে দয়া, স্নেহ, মমতা এবং কোমলতা তাহা হইতে বর্জ্জিত হন।

দয়াময় পরমেশ্বর শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলকেই এমন কি জীব জন্তুদেরও হৃদয়ে 'অপত্যস্নেহ' সমভাবে দিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুটিত এবং বুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জিত হয় নাই, তাহারা সেই স্নেহকে স্বার্থজড়িত করিয়া নিজ শিক্ষাহীনতার পরিচয় নিজেরাই দিয়া থাকেন।

পুত্র জন্মিলে পুত্রসুখ দেখা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু সেই পুত্র কত রোগ, বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর পুত্রবধূর মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জানিনা, সেই স্নেহের ও আদরের ধনকে কিরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ এবং অযত্ন করা যায়। সেকালের বৃদ্ধা শ্বশ্রুদিগকে দেখিয়াছি ও তাহাদিগের কথা শুনিয়াছি, পুত্র যদি বধূর সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলেই মহা অনর্থের ব্যাপার ঘটে। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে, পুত্র বধূকে ভালবাসিলেই মাতৃভক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। হায়! তাঁহারা জানেন না, 'দাম্পত্য প্রণয়' এবং 'মাতৃভক্তি' যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পুত্র যদি মূর্খ হয় (আমি এ স্থলে মূর্খ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরহিত মূর্খের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এম. এ, বি. এ. উপাধিধারী হইয়াও যাঁহারা মূর্খের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানরহিত নির্ব্বোধ, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) তাহা হইলে ত কথাই নাই। বালিকা বধূর যন্ত্রণার মাত্রা ষোল আনা বর্দ্ধিত হয়। স্নেহ ও করুণার পরিবর্ত্তে অসহ্য বাক্যবাণ ও নিগ্রহই সর্ব্বক্ষণ তাহার সহচর হয়। মাতৃপ্রীত্যর্থে বালিকাকে কর্কশ বাক্যে এবং অপ্রিয় ব্যবহারে জর্জ্জরিত করিয়া সেই গুণধর পুত্র অনেক সময় মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। জননীও গর্ব্বের সহিত সকলের নিকট পুত্রের মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া ধন্য হন। এতদ্বারা ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার যে কি বিষময় ফল নিহিত হইল, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

আর সে বালিকা বধূর দশা! তাহার একমাত্র সম্বল অহর্নিশি অশ্রুজল। অল্প বয়সে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্নেহ সহানুভূতির পরিবর্ত্তে সে স্বামী ও শ্বশ্রু উভয়ের নিকট হইতে যন্ত্রণা ও বাক্যবাণ প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থলে জ্ঞানহীনা বালিকা যন্ত্রণা ও নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া হয়তো আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করে। আর শ্বশ্রুদেবী পুত্রের আর একটী বিবাহ দিয়া, এবং সেই সঙ্গে ৪/৫ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা যৌতুক লাভ করিয়া আরও সুখী হন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়? নববধূর উপর নিগ্রহ কি কম হয়? না, বরং মাতার লোভ আরও বৃদ্ধি হয়, এবং বার বার পুত্রের

বিবাহ দিয়া অর্থ উপার্জন ব্যবসার মধ্যে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতে কি পুত্র কখন শান্ত পায়? অবশ্য আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকল শ্বশ্রুই এইরূপ। যাহাদের স্ত্রীর সহিত 'প্রণয়' জন্মিয়াছে, তাহারা চিরদিনের মত মাতার দোষে শান্তিহীন হয়। এই সকল অশান্তির মূল কারণ একমাত্র হিন্দু রমণীর শিক্ষার অভাব।

পুত্র শিক্ষিত হইলেও শিশুকাল হইতে অশিক্ষিত মাতার যে সকল অভদ্রোচিত ব্যবহার দেখিয়াছে ও শিখিয়াছে, তাহা শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুলিতে পারে না। শৈশবের শিক্ষা ভোলা এক প্রকার অসম্ভব। জানিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইলেও কেন লোকের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব হয়! মাতা পরম গুরু বটে, কিন্তু মাতৃবাক্য হইলেই যে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তাহা মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ইহাতে ভয়ানক ক্ষতি হয়, এমনকি বংশটী পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়, সেটাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সেই বংশের সন্তানেরাও যে নীচতা, হীনতা এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার সকল শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আবার দেখিয়াছি অনেক শ্বশ্রুদেবীরা 'সূচী-ব্যাধি'-গ্রস্তা হয়েন। তাঁহাদের বধূদিগের যন্ত্রণার কথা প্রত্যক্ষ না করিলে লিখিয়া বুঝান সম্ভব নহে। তাঁহাদের একমাত্র পবিত্র দ্রব্য গোময়! তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্যেই গোময় মিশ্রিত বারি ক্ষেপন করিয়া সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গে বধুদেরও ৩/৪ বার করিয়া সেই গোময় মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া পবিত্র করিয়া লন। ইহার উপরে বাটীর পুরুষদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই!

গৃহীণীর 'ব্রহ্ম অস্ত্র' সম্মার্জনীর এতই প্রভাব যে, ভয়ে হ কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হয় না। সুতরাং পুত্রেরা তো কিছুই বলিতে পারে না। হিন্দুগৃহে পুত্রেরা নিজেই পরাধীন এবং জননীর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ। তাহাদের নিজেদের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলা একেবারে অসম্ভব। গৃহিণীরা এটাও বোঝেন না যে, কালে ইহারও একটা বিষময় ফল ফলিবে। সেই বালিকা পুত্রবধূরা বয়ঃস্থ হইয়া যখন ৪/৫ টী সন্তানের জননী হইবেন, তখন তাঁহাদের মানসপটে যে 'সূচী ব্যাধির' ছায়া পড়িয়া যায়, তাহার বিষময় কুফল এই হইবে যে, হতভাগিনীদিগকে নিজেদের 'ব্যাধি' লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা কখনইবা স্বামী পুত্রের সাহায্যের সময় পাইবেন, এবং কখনইবা তাঁহাদের সংসারের কর্ত্তৃত্বভার লইবার অবসর হইবে।

এতো গেল 'সূচী ব্যাধির' কথা। তাহার পর পিতা মাতার দেনা পাওনার বিষয় লইয়াও বধূর যে নিগ্রহ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অনেক স্থলে জনক জননী আদৌ বুঝেন না যে, তাঁহাদের সন্তানগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সকলেই সংসারের সাহায্য করিতে প্রয়াসী। ইহা কাহারও বলিবার বিষয় নহে। যাহার যেরূপ সঙ্গতি, সে সেই রূপই দিবে। তাহাদের সহিত অর্থ লইয়া বিবাদ বড়ই নীচত্বের পরিচায়ক। এইরূপে অর্থের জন্য সন্তানদিগের সহিত কলহ না করিয়া তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হইলে, অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে এমন অর্থ আনিতে পারিলে, তাহাদিগের বিবাহ দিলে কোন অনর্থই হয় না। যে কাপুরুষ নিজ স্ত্রীর ন্যায্য অভাব মোচন করিতে অক্ষম, এবং অর্থের জন্য যাহার স্ত্রীকে শ্বশ্রুর গঞ্জনা শুনিতে হয়, তাহার পক্ষে বিবাহ করাই বিড়ম্বনা মাত্র। আজ ভারতের এতাধিক দারিদ্রতাও সেইজন্য। ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম নাই বলিয়াই সে দেশের লোক এত উন্নত।

বধূ যদি ভদ্র বংশের এবং ভদ্র পরিবারের কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কেননা এ সকল বিষয়ে সে হয়তো একেবারেই অনভ্যস্ত। তবে অশিক্ষিতা মাতার কন্যা হইলে তাহার ততটা কষ্ট হয় না। কেননা সে পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া আছে এবং ভ্রাতৃবধূদের উপরে জননীর ব্যবহার দেখিয়া হয় তো শ্বশ্রুর নিকট সেইরূপ ব্যবহার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকে। আর যে ভদ্র পরিবারের কন্যা শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়েই ভদ্রোচিত ভাব পাইয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ ব্যবহার নূতন ও অদ্ভুত এবং কষ্টকর। কেননা, যে যেরূপ ভাবে প্রতিপালিত হয়, এবং শিক্ষাদীক্ষা পায়, সে তাহার বিপর্য্যয় দেখিলেই নূতন ও অদ্ভুত মনে করে। সে যাহা কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, সেই সকল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়।

এতো গেল মেয়েদের কথা, তাহা ছাড়া বধূকে পিত্রালয় পাঠাইবার সময় এক ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বধূর কোন আত্মীয় বা ভ্রাতা আনিতে গেলে, তাহাকে অনেক সময় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিতে হয়। বধূর পিতামাতা গৃহিণীকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া এবং রৌপ্যমুদ্রার শ্রাদ্ধ করিয়াও তাহার বিনিময়ে শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন না। আমার গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, বহু ভদ্র পরিবারের ভিতর এই সকল নীচ ও ইতরজাতীয় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নববধূর স্বামিগৃহে আগমনের পর অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের ঝি ও পাচিকার সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং সেই ঝি ও পাচিকার কার্য্য নববধূ দ্বারাই সম্পন্ন করান হয়, কি ভয়ানক অত্যাচার! যত কিছু নীচ কার্য্য তাহা করিয়াও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার উপর আবার বাক্যযন্ত্রণা এবং প্রহার পর্য্যন্তও অদৃষ্টে লাভ হইয়া থাকে।

কোন বালিকার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ সে যদি স্বামীর স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে সকল নীচ কার্য্যে অভ্যস্ত থাকে, অর্থাৎ সে যদি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে ততটা কষ্ট পাইতে হয় না। স্বামীর স্নেহে শ্বশ্রুদেবীর বাক্যসুধা বর্ষণ সহিবার ক্ষমতা হয়, আর যাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ 'স্বামিপ্রণয়'ও মিলে না, সে যদি নীচ কার্য্যগুলিতেও অনভ্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। ধনী এবং ভদ্র পরিবারের সন্তান হইলে ধনী পিতা হয়তো কেবলমাত্র এম.এ., বি.এ. পাশ দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন। বংশ চরিত্র কিছুই দেখেন নাই।

অনেক বধূর পরিধান বস্ত্র এমন অব্যবহার্য্য ও মলিন দেখিয়াছি যে, তাহা ভদ্রলোকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারেন না। কিন্তু বাড়ীর কাহারও সে দিকে লক্ষ্য থাকা দূরের কথা, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরাও একটা মহা অপরাধের বিষয় বলিয়া মনে করা হয়। বঙ্গদেশে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই ধোপার খরচে এত কার্পণ্য যে, সেরূপ অন্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। মোট কথা সকল প্রকারের যত কিছু যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে, সেই সকলই বালিকা বধূর উপর দিয়া যায়।

বধূর প্রতি অত্যাচার প্রত্যেক হিন্দু গৃহের মধ্যেই দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী মহিলাদিগের মধ্যে এরূপ ঘটে না। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিয়াছি যে, বঙ্গগৃহ অপেক্ষা হিন্দুস্থানের বধূদিগের প্রতি যন্ত্রণার মাত্রা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বয়ঃস্থা গৃহিণীদিগের মুখে শুনা যায় আজকালের বধূরা শ্বশ্রু, দেবর ও ননদের প্রতি

শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মেও বড় শিথিলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সকল কথা সত্য হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই! শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে ভদ্র ও অভদ্র কন্যাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়। কিন্তু বধূদিগের প্রতি শ্বশ্রুদিগের রূঢ় ব্যবহারই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়, তাহার কোন ভুল নাই! কারণ যাহারা বালিকা বয়সে শ্বশ্রুর নিকট যত অধিক যন্ত্রণা পাইয়াছে, তাহারাই বয়ঃস্থা হইয়া শ্বশ্রুর প্রতি তত শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকে।

কর্ত্তব্যে শিথিলতার একমাত্র কারণ অশিক্ষিতা মাতার সন্তান বলিয়া শিক্ষার অভাব। অনেক মাতা মনে করেন যে, শ্বশুরালয় গিয়া কন্যাকে তো খাটিতেই হইবে, সুতরাং তাঁহার গৃহে তাহার আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনেই করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশিক্ষা এ সকলের একমাত্র কারণ।

হিন্দুসমাজে যদ্যপি স্ত্রীশিক্ষায় উন্নতি বিধান করা হয়, এবং ছাত্রজীবনে যুবকদিগকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিয়া, উপযুক্ত বয়সে উপার্জনক্ষম হইলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে শিক্ষিতা রমণী বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বধূযন্ত্রণা শেষ হয়। মোট কথা, বাল্যবিবাহ প্রথা এককালে উঠিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। সকলেই জানেন যে, বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচারের কথা শুনা যাইত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল ভারতের প্রত্যেক জাতিই পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আশা করি হিন্দু ভগিনীগণ আমার এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সতর্ক হইবেন এবং ঘরে ঘরে শিক্ষিতা মাতা ও শিক্ষিতা শ্বশ্রুগণ নিজ নিজ কন্যা ও পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিয়া যন্ত্রণারূপ অত্যাচার হিন্দুর গৃহ হইতে উঠাইয়া দিবেন।

তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, বধূর নিকট কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। তাঁহারা আরো দেখিবেন যে, প্রতি বঙ্গগৃহ কিরূপ সুখ ও শান্তির ভবন হইয়া উঠিবে।

বালিকা-বয়সে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় কখন বয়ঃস্থা হইলে প্রসারিত হইয়া শ্রদ্ধা প্রীতি দিতে পারে না। তাহারই মধ্যে শ্বশ্রুদেবীরা যেটুকু লাভ করেন, সে কেবল একমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য বধূরা করিয়া থাকে।

ভগিণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা বা শাস্তি যাহাতে লোপ পায়, সকলের সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য!

ভগবৎকৃপায় আমাকে কখন বধূযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু কয়েকটী পরিবারের মধ্যে যে সকল দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনুষ্য সৃষ্টির উন্নত জীব হইয়া এ সকল যে বুঝে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্নেহ মমতা পাইলে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদান করিয়া থাকে, তবে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য তাহা কেন করিবে না? সিক্ত মৃত্তিকাতে যে ছাপ লাগান যায়, তাহা শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে চিরদিন রহিয়া যায়। অশিক্ষিত গৃহিণীরা যন্ত্রণা এবং দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা বালিকার কোমল হৃদয়ে যে ছাপ বসাইয়া দেন, তাহা তাহাদের জীবনের

চির সহচর হইয়া যায়। সুতরাং তাহারাই আবার যখন শ্বশ্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন শ্বশ্রুর নিকট যে ব্যবহার শিখিয়াছে তাহা বধূদিগের প্রতি করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, জননী ধৈর্য্যশালিনী ও মমতাময়ী হইলেও তাঁহার কন্যা বয়ঃস্থা হইলে কর্কশভাষিণী ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারও একমাত্র কারণ এই যে, নীচতার ভিতর থাকিয়া এবং সর্ব্বদা নানারূপ যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করিয়া তাহার স্বভাব বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। হিন্দুগৃহে দ্বাদশ বৎসরে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণরূপ হইয়া উঠে না। যে বয়সে পুতুলখেলার সময়, সেই বয়সেই তাহাদের বিষম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা সুশিক্ষার অভাবে কুশিক্ষাই পাইয়া থাকে। সে স্থলে কিরূপে ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির উন্নতির আশা করা যায়? আর তাহার আশাই বা কোথায়?

যে হিন্দুধর্ম্ম প্রভাবে চৈতন্যদেব আপামর সাধারণকে প্রেম বিলাইয়াছিলেন, সেই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ভগিণীগণ! আপনার কোন্ প্রাণে স্নেহের পুত্তলি আদরের ধন পুত্রবধূদিগকে স্নেহের পরিবর্ত্তে কষ্ট এবং যন্ত্রণা দিয়া থাকেন? যে জাতি নিজ পরিবারেব ভিতর স্নেহ, প্রেম দিতে অপারগ, বিশ্বপ্রেম সে জাতি কোথা হইতে শিখিবে? সে জাতির উন্নতির আশাও দুরাশা মাত্র। জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ যেন গৃহের রমণীগণের শিক্ষাবিধানে সচেষ্ট এবং যত্নবান হইয়া ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে শক্তি এবং উৎসাহ লাভ করেন। তাহা হইলে প্রতি হিন্দুগৃহ শান্তি ও সুখের আলয় হইয়া উঠিবে।

ইতি

আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১৮ শ্রীমতী জ—সান্যাল।

## সংসারে রমণীর অধিষ্ঠান

সংসার ক্ষেত্রে রমণীর অধিষ্ঠান কোথায়? কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—"রমণী দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী, মরুভূমে পান্থপাদপ।" এই পরীক্ষাপূর্ণ দুর্গম জীবন পথে চলিতে চলিতে মানুষকে কতই শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিরাশার গভীর অন্ধকারে পড়িতে হইতেছে। কত ব্যথা ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, ইহার কি শান্তি নাই? শান্তি আছে ঐ শীতল নির্ঝরিণী-সম স্নেহময়ী রমণীর নিকট। পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত, দুঃখতাপে তাপিত মানবের জন্য স্নেহময়ী রমণী। সকল-তাপ-হারি কোমল হৃদয় লইয়া সেবা-হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। অন্যের সুখশান্তির জন্য নিজের সুখশান্তি চিরতরে বিদায় দিয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানব তাই আত্মত্যাগিনী রমণীর নিকটে আসিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। সেইজন্যই মহাত্মারা বলিয়াছেন "দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী রমণী, মরুভূমিতে পান্থপাদপ, রমণী।" সকল সুখদাত্রী এই যে রমণী, সংসারে ইঁহার স্থান কোথায়? ভারতের ঋষিগণ ইঁহাদের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইঁহাদিগকে সংসারের কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শুধু

তাহা নয়, মানবজীবনেরও কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন। একটী রমণী কতকগুলি সন্তানের মাতা, কতকগুলি জীবনের ফলাফল তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দেবতারূপে গড়িতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পশুরও অধম করিয়া নরকের কীট সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সংসারকে নারী স্বর্গ করিতে পারেন, আবার ইহাকে নরকেও পরিণত করিতে পারেন।

প্রত্যেক নরনারী লইয়া সংসার, সমাজ ও জাতি গঠিত। এই নরনারী জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ সমাজ এবং জাতির কল্যাণ অক্যাণের উপর নির্ভর করিতেছে।

যে জাতির নারীগণ শিক্ষিতা নন, সুতরাং সংসার ও সন্তান পালনে অক্ষম, সেই জাতির উন্নতি নাই। যে সমাজের নারীগণ কোমলতা পবিত্রতা প্রভৃতি রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অক্ষম, সে সমাজের কল্যাণ নাই। যে জাতি বা সমাজ নারীকে ঘৃণা করে, নারীকে নির্য্যাতন করে, নারীহৃদয়ের গুণ সকল বিনাশ করে, যে জাতি বা সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জাতি বা সমাজ নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইতে দেয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রমণীই সংসারের প্রাণ, নারীকে বাদ দিয়া সংসার চলিতে পারে না। গৃহের কর্ত্রী নারী, তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী নারী, সুখালাপে পরিতোষিণী, বিষয় কর্ম্মে মন্ত্রিস্বরূপিণী, সৎকর্ম্মের সহকারিণী, দুঃখ, বিপদ, রোগ, শোকে সন্তাপহারিণী সর্ব্ব-কল্যাণ দায়িনীই রমণী। এই যে সংসারের প্রাণস্বরূপিণী রমণী ইহার স্থান কত উচ্চে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, এবং সুশীলা, সুশিক্ষিতা রমণীই যে এই সকল গুণের একমাত্র অধিকারিণী তাহাও বুঝিতে পারিবেন। প্রাণরূপিণী রমণী সংসারে না থাকিলে সংসার থাকিতে পারে না। সংসারের সর্ব্বোচ্চ স্থানেই রমণীর অধিষ্ঠান।

শ্রাবণ ১৩২০

## ভাগ্যবতী রমণী কে?

এই সংসারে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, কেহই দুরবস্থায় থাকিতে চাহে না। কিন্তু সকলেই সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। এক এক জন এক এক প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে, আবার হয়ত অপরবিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। অশিক্ষিত ও নীচমনা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, যে তাহারা কোন এক প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া অন্যকে তদ্‌ভাবে ঘৃণা করে। এই কারণেই সুরূপা কুরূপাকে, অলঙ্কার যুক্তা অনলঙ্কৃতাকে, ধনীর স্ত্রী দরিদ্রের স্ত্রীকে এবং বিদুষী মূর্খাকে ঘৃণার সহিত দেখে। মনের প্রকৃতিই অহঙ্কার, এই জন্য ঈশ্বর কাহাকেও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

কোন কোন নারী সৌভাগবতী বলিয়া অহঙ্কৃতা নহেন। কিন্তু তাঁহারা অপর স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যশীলা ভাবিয়া, নিজের দুরাবস্থা সহিত তাহাদের ভাল অবস্থার

তুলনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠার ন্যায় অন্যের সম্পদে শুকাইয়া যাওয়াও ভাল নয়। কোন এক পণ্ডিত বলিয়াছেন "যদি নিজেকে বড় বলিয়া মনে কর, তবে আরও বড়র দিকে দৃষ্টিপাত করিও, আর যদি নিজেকে ছোট বলিয়া মনে কর তবে আরও ছোটর দিকে দৃষ্টিপাত করিও।" আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে ভাবিলে যদি দেখা যায় যে আমা অপেক্ষা আরও ভাগ্যবতী আছে। তবে আর নিজকে বড় বলিয়া অহঙ্কার আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজকে দুরবস্থাপন্না বলিয়া বোধ করিলে যদি দেখা যায় যে আমা অপেক্ষা অধিকতর হীনাবস্থার কেহ আছে, তা হইলে নিজেকে ছোট ভাবিয়া মনে যে কষ্ট হয়, তাহা আর আসিতে পারে না।

সুখী কে? এই বিষয়ের উত্তরস্থলে নানাস্থানে নানাভাবে সুখের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে লিখিত আছে "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মূল আরোগ্য।" অতএব আরোগ্য বা ব্যাধিহীনতাই সুখ। কোন মহিলা যদি নিজেকে এবং পতিপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় সকলকে সুস্থদেহ দেখেন তাহা হইলে তিনি সুখে আছেন, ইহা ভাবুন বা না ভাবুন, বাস্তবিকপক্ষে ধরিতে গেলে তিনি তখন সুখের অধিকারিণী। শারীরিক সুস্থতা যে সর্ব্ব সৌভাগ্যের নিদান ইহা কি আর বলিতে হয়? কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি ভাল আছেন ত?" ইহার অর্থ এইরূপ যে শারীরিক সুস্থতা সর্ব্ব সৌভাগ্যের মূল, আপনি সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নাহেন ত?"

কিন্তু একটী কথা আছে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" শরীর থাকিলেই ব্যাধি আছে। অজ্ঞানতা, অনভ্যাস বা অমনোযোগবশতঃ অনেকগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা রোগগ্রস্ত হই। জল বায়ুর দোষে এবং সংক্রামক রূপেও আমরা অনেক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হই। সুতরাং পীড়া মনুষ্যের অনিবার্য্য। সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া গতায়ু হইয়াছেন, এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে আছে, যাঁহার প্রবাস দুঃখ নাই তিনিই সুখী। এরূপ সুখী গৃহস্থ বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে অতি বিরল। অনেক বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থই জীবলোকের সুখকরী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধনার্জনের জন্য প্রবাসে থাকেন। যে রমণী পতি পুত্র সহ একস্থানে থাকেন, সুতরাং স্থানান্তরে বাসজনিত অদর্শনের কষ্টে ব্যথিতা না হন তিনিই ভাগ্যবতী। বিদেশে বাস না করিয়া আত্মীয়গণ সহ একত্রাবস্থান করা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

যিনি ধনবান্ গৃহস্থের পত্নী বা নিজে ধনবতী এবং যখন যাহা অভিলাষ করেন, তখনই তাহা লাভ করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবতী। সকল গৃহস্থের ধনবান্ হওয়া অসম্ভব। যে গৃহস্থ ঋণ শূন্যে তিনিও সুখী। অল্প অল্প সঞ্চয় অনেক উপকারে আইসে। ঋণদায় অপেক্ষা কষ্টের বিষয় এবং সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর নাই। গৃহিণী যদি মিতব্যয়শীলা হন তবে অনেক স্থলে দেখা যায় যে স্বামীর ঋণদায় ঘটে না এবং অবস্থানুসারে অল্পাধিক সঞ্চয়ও হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে অমিতব্যয়শীলা গৃহিণী নিন্দনীয়া বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। অর্থের উপার্জন অপেক্ষা রক্ষণ, ব্যয় ও সঞ্চয়েই অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে-পরিবারে গৃহস্থ অর্থোপার্জন করিয়া গৃহিণীর হস্তে দেন এবং গৃহিণী ধর্ম্মোদ্দেশে, বিলাসিতায় এবং বিবিধ সাংসারিক ব্যয়ে অবস্থানুসারে মিতব্যয় করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান

দুরবস্থার দিনে সকল গৃহস্থের অবস্থানুসারে সঞ্চয় অসম্ভব হইলেও অন্ততঃ উপার্জ্জিত অর্থে বুঝিয়া চলিলে এবং ঋণ করিতে না হইলে সে গৃহস্থকে সুখী বলা যাইতে পারে। কারণ ঋণদায় সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের এবং সঞ্চয়শীলতা সকল সৌভাগ্যের নিদান।

যে রমণীর পুত্র পণ্ডিত, তিনি সৌভাগ্যবতী, এ বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ব পণ্ডিতের একই অভিমত। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন "বহুপুত্র ইচ্ছা করিবে।" শাস্ত্রের কোনও কোন স্থানে বা এরূপও আছে যে "গুণবান এক পুত্রও ভাল।" শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বা এরূপও আছে যে পুত্র না হওয়াও ভাল, কিন্তু মূর্খ পুত্র পিতামাতার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। শাস্ত্রের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উক্তিতে বোধ হয় যে পুত্রলাভ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু পুত্রগণ যাহাতে শিক্ষিত হন, মাতাপিতা তদনুরূপ চেষ্টা করিবেন। পুত্রজন্মের পর অনেক প্রসূতি রোগাক্রান্ত হন, পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মাতাপিতা অপরিসীম শোকাভিভূতা হন, বহু পুত্র থাকিলে পুত্রদের মধ্যে কাহারও না কাহার পীড়া লাগিয়াই থাকে, অনেক পুত্রের মধ্যে সকলকেই সাধু ও বিদ্বান হইতে দেখা যায় না। এই সকল মনে করিয়া বন্ধ্যা নারীগণ পুত্র না হওয়ার কষ্ট দূর করিবেন। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্র বিদ্বান ধার্ম্মিক অরুগ্ন, পিতৃভক্ত, সেই সকল পুণ্যবতী নারী সৌভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত বিদুষী রমণী সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের ভাজন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। নিজে বিদ্যাবতী হইলে তিনি পুত্র কন্যাদিগের সুশিক্ষা বিধানে বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। বিদুষী রমণীগণ যাহাতে পিতৃকুলের ও শ্বশুর কুলের গৌরব রক্ষা হয়, এবং কোন প্রকারে লোক সমাজে নিন্দনীয়া না হন, এইরূপ অনষ্ঠান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, কাজেই দুরাশার অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন না। তাঁহারা হর্ষে ও শোকে একেবারে মোহিতা হইয়া পড়েন না, সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা একই প্রকার থাকে। বাক্য, মন ও কার্য্যে তাঁহাদের অকপট ও সরল ব্যবহার দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের বাধ্য হয়। ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সৎগ্রন্থপাঠ, সাধু চরিত্রাদিগের সহিত সদ্ভাব প্রভৃতিতে তাঁহাদের মন দেবীর ন্যায় সদ্ভাবাপন্ন হয়। তাঁহারা অনর্থক কোন কার্য্যারম্ভ করেন না, অনর্থক কোন বাক্য ব্যয় ও ধনব্যয় করেন না এবং অনর্থক সময়ক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের মুখ প্রসন্ন, দৃষ্টি কুটীলতা বর্জ্জিত, আলাপ মধুর, ব্যবহার অহঙ্কার শূন্য। তাঁহারা দিবারাত্রির মধ্যে সময় বিভাগ করিয়া যখনকার যে কাজ তাহা তখন সম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হন না। তাঁহারা প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা করিয়া চরিত্রকে ক্রমশঃ দেবভাবাপন্ন করেন। এইরূপ বিদ্যাবতী ও চরিত্রবতী নারী প্রকৃত ভাগ্যশীলা সন্দেহ নাই।

বাসস্থানের দোষগুণ অনুসারে অনেকস্থলে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লাভ করিতে হয়। যদি এরূপ স্থানে বাস করা যায় যে তথায় উত্তম চিকিৎসক নাই, স্রোতস্বতী বা উত্তম জলাশয় নাই, তথায় উৎকট পীড়া হইলে নিরুপায় হইতে হয় এবং দূষিত জলে স্নান ও তাহা পানাদিতে অনেক পীড়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন গ্রাম ব্যাঘ্র শূকরাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যপূর্ণ বলিয়া যেমন ভয়ানক, কুটীল ও অসৎস্বভাব মনুষ্য-সমাকুল লোকালয় বলিয়া আবার তদপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। গ্রামে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নাই, সদুপদেশদানে সমর্থ সাধু চরিত্র ধার্ম্মিক নাই, অথবা বিদুষী ও ধার্ম্মিকা রমণী নাই, সুখ দুঃখের সময় আলাপ করিয়া শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এরূপ সখী বা সখা নাই, এরূপ

স্থান ভদ্র পুরুষ ও রমণীগণের পক্ষে সুখজনক নহে। যেখানে প্রতিবাসিগণের মধ্যে ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতা আছে, পরিবারস্থ সকলের মধ্যে অহর্নিশি কলহ লাগিয়া রহিয়াছে তথায় বাস করিলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? উল্লিখিত দোষ সকল বর্জ্জিত স্থানে বাস করিলে অনেক দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইবার সুবিধা এবং সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।

বিরক্তিকর ও অনাবশ্যক কার্য্যসকল ত্যাগ করিয়া কোন অভিমত সাধু বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনেক স্থলে সৌভাগ্যের কারণ হয়। বিদ্যানুশীলন, ধর্ম্মচিন্তা, অগর্হিত শিল্পবিদ্যানুশীলন ইত্যাদি সদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তৎকালে সুখের কারণ ও পরিণামে সৌভাগ্যের কারণ হয়। কিন্তু যদি অনিয়মিত বিলাসিতায়, সাধু নিন্দিত কুপুস্তক পাঠে ও শরীরক্ষয়কারী দুশ্চিন্তায় অধিক মনোনিবেশ করা হয়, তবে তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করা হয় না, বরং করগত সৌভাগ্যকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ ঐরূপ মনোনিবেশকে অলসতা রোগের একপ্রকার নিদান বলা যায়। আলস্যপরায়ণা নারী কখনও ভাগ্যবতী হইতে পারে না। আলস্য ত্যাগ করিয়া যে সকল রমণী স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশশীলা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সখীর ন্যায় আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করে। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবার গৃহস্থ বিশেষে নানা প্রকার। সেই সকলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

অকপটাচার বা সরল ব্যবহার সৌভাগ্যদেবীর আরাধনার প্রধান উপকরণ, কি পিতৃকুলে, কি শ্বশুর কুলে, কি স্বামীর সহিত ব্যবহারে, কি সমবয়স্কা ও পরিচিতাদিগের সহিত আলাপে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার কপটতাশূন্য ব্যবহার অভ্যাস করিলে, নারীগণ স্বর্গবাসিনী দেবীর ন্যায় হৃদয়বতী হন। সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্ব দিক হইতে তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করেন।

কি প্রকারে ভাগ্যবতী হইতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং তাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত কিনা সংক্ষেপে এই কথার উত্তর করিতে গেলে বলা যাইতে পারে "যে রমণীর সাধু ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট তিনিই ভাগ্যবতী।" সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলের সন্তোষ জন্মাইতে হইলে প্রথমতঃ অলসতা ত্যাগ করিতে হয়। কিরূপ ব্যবহার কাহার প্রীতির কারণ হয় তাহা জানিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার বুদ্ধি ও চেষ্টা দৃঢ়তর করিতে হয়, নিজের অভ্যাসগত কোন ব্যবহার গুরুজনদিগের বিরক্তির কারণ হইতেছে তাহা জানিয়া আপনার দোষ সংশোধন করিতে হয়। কাহারও কর্কশোক্তিতে বিরক্ত না হইয়া বাক্যসংযম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়। সকল অবস্থাতেই বিষণ্ণ ভাব, বিষণ্ণ ব্যবহার ও বিষণ্ণ মুখ ত্যাগ করিতে হয়।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "যে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট তথায় সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিরাজ করে।" মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে গৃহস্থের ভার্য্যা প্রিয়া অর্থাৎ অনুকূলাচরণশীলা এবং মধুরভাষিণী সেই গৃহস্থই সুখী। পতি ও পত্নী উভয়ের মধ্যে একের আচরণে অপর তুষ্ট হইলে এবং কর্কশ ব্যবহার ও কর্কশ বাক্য দ্বারা একে অন্যকে মনঃকষ্ট না দিয়া সদয় ব্যবহার ও মধুর বাক্যে পরস্পরের প্রীতি জন্মাইতে পারিলে সেই পরিবারের সৌভাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বুদ্ধিমতী মহিলার পক্ষে স্বামীর অভিমতানুবর্ত্তন দুঃসাধ্য নহে। স্বামী কিরূপ আলাপে পরিতুষ্ট হন, কিরূপ আহারে তাঁহার রুচি, কিরূপ ব্যয়ে মুক্তহস্ত ও কিরূপ ব্যয়ে

মিতাচারী, কোন সময়ে প্রয়োজনানুসারে কোন কোন দ্রব্য দ্বারা কিরূপ ভাবে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, কিরূপ বেশভূষায় সজ্জিতা দেখিলে তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, কোন সময়ে কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে তাঁহার অভিমতানুসারে চলা হয়, গৃহ ও গৃহোপকরণাদি কিরূপে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা যুক্ত দেখিতে তিনি ভাল বাসেন, স্থানান্তর হইতে ভবনে প্রত্যাগত হইলে কিরূপ শুশ্রূষায় তাঁহার তৃপ্তি বোধ হয়, এইগুলি বুঝিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। পতির নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন না করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের আচরণই পতিকে বশীভূত করিবার মূল মন্ত্র। যেমন করিয়া বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে সমস্ত বৃক্ষেই জল দেওয়া হয়, তেমনি সমস্ত সৌভাগ্যের মূল পতির প্রসন্নতা লাভের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সমস্ত সৌভাগ্যেরই কারণ হইয়া থাকে।

কোন নবপরিণীতা দুহিতাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় যদি মাতা তাঁহাকে একটি মাত্র এইরূপ উপদেশ দেন যে সর্ব্বপ্রকারে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও স্বামীর মতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবে তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাকে সকল উপদেশেরই সার কথা বলিয়া দেওয়া হয়। যিনি অকপট, সরল ও অনুকূল ব্যবহার দ্বারা সকলের প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করেন সেই রমণীই ভাগ্যবতী হইতে পারেন।

অগ্রহায়ণ ১৩২০

শ্রী অভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম
কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

# নারীর কর্ত্তব্য

নারীর কর্ত্তব্য যে কি তাহা পূর্ব্বপুরুষগণ চিন্তা করিয়া অনেক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনেক নারী তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন না, বা যাহা পাঠ করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন করেন না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে আপনা হইতেই দৃষ্টি পড়িবে। অপরের বলিয়া দিয়া করান, সকল বিষয়ে সম্ভবপর নহে, আপন হৃদয়স্থ বিবেক দ্বারা প্রণোদিত হইলে অনেক বিষয় আপনিই সুমীমাংসিত করিয়া লইতে পারেন।

নারী গৃহের রাজ্ঞীস্বরূপা। রাজা যেরূপ রাজ্যশাসন করেন, গৃহিণী তদ্রূপ গৃহে নিজ অধিকার পরিব্যাপ্ত করেন। গৃহে কেহ ক্লেশ পাইলে (যাহা মোচন করা সাধ্যায়ত্ত) বা কেহ বিপথগামী হইলে বিশেষতঃ বালক বালিকারা সচ্চরিত্র না হইলে গৃহিণী কতকাংশে ভগবানের নিকট দায়ী, এবং সমস্ত পরিবারের সহিত স্বয়ং ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। গৃহে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকিলে, জগদীশ্বরের মহিমা-মণ্ডিত স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, কেহ সহজে অসৎ কার্য্য করিতে পারেন না। সর্ব্বাগ্রে সমস্ত পরিবারে ধর্ম্মভাব জাগরূক রাখা উচিত। তাহার পরে জীবে দয়া, পশুপক্ষী, দুঃখী, তাপী, আত্মপর, দাসদাসী, সকলের প্রতি সমান দয়া শিক্ষা দিতে হইবে। দয়া যে হৃদয়ে বাস করে, সে হৃদয় কোমল

না হইয়া যায় না। অসাম্প্রদায়িক সাধুভক্তি শিক্ষা দিবে, নতুবা হৃদয় বিদ্বেষ ও নীচতার আগার হইবে। রাজা রামমোহন, খৃষ্ট, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, মুশা চৈতন্য, মহম্মদ. শ্রীকৃষ্ণ, সকলে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ভগবানকে ডাকিয়াছেন। যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলেই যে ভগবানকে ভাল বাসিতেন ও সেই জন্য ভক্তির পাত্র ইহা বালকবালিকাদের বলিয়া দেওয়া উচিত।

অনেক স্থলেই পত্নীর অবিবেচনায় পতির স্বভাবের বিকার হয়। স্বামীর অমতাবলম্বী, স্বার্থপরায়ণা, নারী আপনার ও গৃহের এবং স্বামীর ক্লেশের কারণ হয়েন। কেবল অসৎ কার্য্যে নারী স্বামীর পথে যাইবেন না, বরং তাঁহাকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিবেন, নতুবা সকল কার্য্যে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবেন, তিনি যাহা ভালবাসেন, তাহাই স্ত্রীর করা উচিত। তাঁহার সহিত বাকবিতণ্ডা করা, তাঁহার উপর প্রভুত্ব করা বা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা অশোভন। দেহ ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার ও যথাসাধ্য সুশৃঙ্খলায় রাখিবে। সংসারে শান্তি ও হাস্যমুখ থাকিলে সে সংসার জীবন-সংগ্রামে ক্লিষ্ট পুরুষের পক্ষে আরামের স্থল। যে গৃহে সুখ আছে, সে গৃহে স্বামী অসৎ পথের পথিক হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সমস্ত জগতের লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, সংসারপথের অগণ্য দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা সহিয়া মানব গৃহে যদি জুড়াইতে পায়, কোন ক্লেশ তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আর একটী কথা, নারীকে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ স্বার্থচিন্তা সকলরূপ উত্তম বিষয়ের মূলে বাধা দেয়। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই সুবিধা হয় না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নারীর সৌন্দর্য্য!

অনেক নারী সংসারে স্বামী পুত্র ব্যতীত অপর কাহাকেও রাখিতে ইচ্ছা করেন না। স্বামীর পিসিমা, কাকীমা, ভগিনীগণ এখন গলগ্রহ পদবাচ্য। বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে না রাখিলে লোকনিন্দা, সেজন্য তিনি দাসীরূপে সংসারে অবস্থান করেন। তিনি বৌমার মুখাপেক্ষী, বৌমা একটী পয়সা দিলে তবে খরচ করিবেন। তিনি পৌত্র পৌত্রীকে ভয় করিয়া চলেন, যদি বৌমার মুখটা একটু ভার দেখেন, অমনি ভয়ে শশব্যস্ত! নারীর এ বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, অবস্থা চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আমার অবস্থা যদি পরে ঐ প্রকার হয় তখন এই ব্যবহার পাইলে আমার অন্তরের অবস্থা কি প্রকার হয়?

নারীকে লোকে গৃহলক্ষ্মী বলে। লক্ষ্মী অর্থে—শ্রী, নারী শ্রীরূপিণী, তাঁহার অঙ্গের বাতাসে শোভাহীন গৃহ শ্রীসম্পন্ন হইবে, সংসারে তিনি শান্তি, সৌন্দর্য্য, ধন, জন প্রদান করিবেন। তিনি যেখানে থাকিবেন সন্তোষ তথায় আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে, শৃঙ্খলতা, ধর্ম্মভাব, আরাম তাঁহার অনুবর্ত্তী। এই নারীর মূর্ত্তি!

অবান্তরবাক্যপ্রিয়তা, অনর্থক-হাস্য-পরিহাসকারিতা, মিথ্যাবাদিতা, বিশৃঙ্খলা, ধর্ম্মভাববিহীনতা, অধিকবেশভূষাপ্রিয়তা নারীর মূর্ত্তি নহে। যাঁহার মস্তকে কর্ত্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি ঘুমঘোরে অচেতন, একবারও আপন দায়িত্বের বিষয় চিন্তা করেন না, শিশুর ন্যায় অজ্ঞানভাবে, অলসভাবে, আপন মহৎ জীবন কাটাইতেছেন, নষ্ট করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?

কতকগুলি শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যেও একটু দোষ আছে। অনেকে একটু লেখা পড়া শিখিয়া আর গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন না। তাঁহারা কি সত্যই পারেন না, না করেন না? নারী গৃহকর্ম্ম করে ও পুরুষ অর্থোপার্জন করে, ইহা বোধ হয় ভগবানেরই বিধান, সকল দেশে এই নিয়ম, অসভ্যজাতিদের মধ্যে পুরুষ পশুপক্ষী শিকার করিয়া আনে, নারী রন্ধন

করে। বালকবালিকারা খেলা করে, কোন কোন স্থলে বালিকারা রন্ধন করে, বালকেরা বাহিরের কার্য্যে যায়, বাজার করে। যদি শিক্ষিতাপত্নী বিবাহ করিয়া পুরুষের সংসার অধিক বিশৃংখল হয় তবে শিক্ষায় লাভ কি? শিক্ষিতাপত্নী সুচারুরূপে সংসার চালাইবেন গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন, তিনি অজ্ঞান নহেন, সংসার তাঁহার নিকট যে অনেক আশা করে।

অনেকে বলেন যে স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে প্রায়ই চাকরী করিতে যায়। অনেকে স্ত্রীলোকের চাকরী করাকে উপহাস করেন কিন্তু হয়তো ভাই ৪০ টাকা মাহিনা পান, তাঁহার স্ত্রী পুত্র ৪/৫টী, মা, ঠাকুরমা, কাকীমা আছেন, ২/১টী পুত্রসহ ভগ্নী বিধবা হইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন, সংসারে দরিদ্রতা পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিল, সে স্থলে ভগিনী কোন স্কুলে পড়াইয়া কিছু টাকা আনিলে মন্দ, একথা কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিবেন না।

নচেৎ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নারীর বিদ্যাশিক্ষা নহে, চরিত্র গঠনের, সংসার রক্ষার জন্য নারীর বিদ্যাশিক্ষা।

শ্রাবণ ১৩২১ শ্রী হেমনলিনী বসু।

# স্ত্রীর কর্ত্তব্য
## দ্বিতীয় অধ্যায়
## গার্হস্থ্য

হিন্দুর প্রথম আশ্রম গার্হস্থ্য। ইহার উপর হিন্দুর আর তিন আশ্রম নির্ভর করে। হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কঠোর এবং কষ্টসাধ্য। সংসারে রিপুগণের প্রাবল্যহেতু মানবদিগকে তাহাদিগের সহিত অহরহ সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া সংসারাশ্রমেই মানবের পূর্ণ মানবত্ব বিকশিত হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব, একাকী থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাহাতে না তাহার শান্তি, না তাহার সুখ, না তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয়। এবং অন্যদিকে এর ফলে সে ইহলোকে জ্ঞান কি ধর্ম্মের পথে উন্নতি লাভ করিয়া পরলোকের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে না। অসাধারণ প্রকৃতিসম্পন্ন দুই এক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সামাজিক সাহায্য ভিন্ন কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহস্থাশ্রম ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র আশ্রম। মাতা-পিতা, পতি-পত্নী, ভ্রাতাভগিনী, পুত্রকন্যা লইয়া যে সম্বন্ধ তাহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও স্বর্গীয়। অন্যান্য জীবের শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতে যত সময় ব্যয়িত হয়, মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করিতে হয়, মনুষ্যশিশুর প্রতি তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক চাই। মনুষ্যের ভাগ্য যেমন অবিশ্রান্ত দুঃখের অধীন, তাহাতে সুরসাল গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে শীতল হইবার স্থান আর কোথায়? গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিল, যে আপন'কে আপনি বিকাইল, তাহার জীবনধারণ-করা বৃথা। গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম্মসাধনের সোপান বলিয়াই

হিন্দুর চতুরাশ্রমের মধ্যে ইহার প্রাবল্য এত অধিক, কত শত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমলস্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতিগৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোকসমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে দয়া গৃহস্থাশ্রমেই মানবের প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরো উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জনসমাজের কল্যাণসাধন করে, অন্যদিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। উজ্জ্বল শ্বেতবস্ত্রে সামান্য দাগ লাগিলে যেমন তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়, তেমনই সংসারাশ্রমে যদি মানব রিপুপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় চরিত্রকে কলুষিত করে, তবে তাহা মানব-চক্ষে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

গৃহস্থাশ্রম একটি বৃক্ষ বিশেষ। ধর্ম্ম ইহার শাখা, মনুষ্য ইহার পত্র, দৃঢ়ব্রত ইহার মূল। দুঃখকলহ এবং তাপ ইত্যাদি ঝঞ্ঝাবাতে ইহা উন্মূলিত হইবার আশঙ্কা থাকে। পরন্তু শীলতা স্বীয় সুশীতল বারি অভিসিঞ্চনে বৃক্ষটিকে সুদৃঢ় রাখে, শাখা প্রশাখা ও পত্রাদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করায়, বৃক্ষকে ফল-পুষ্প সমন্বিত করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করে। সুমতি এই বৃক্ষের রস, ইহা বৃক্ষের সর্ব্বস্থানে গমন করতঃ বৃক্ষকে পুষ্ট করে। যতক্ষণ বৃক্ষ সুরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ ইহার সুশীতল ছায়ায় সুখে উপবেশন করিয়া ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষাদির প্রচণ্ড কিরণ হইতে মানব আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। যদি সুমতিরূপী রস এবং শীলতারূপী জল না থাকে; তবে বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া যায়; অথবা রিপু আদি প্রচণ্ড বাত্যা দ্বারা উৎখাত হইয়া পতিত হয়। তখন দুঃখ, কলহ, সন্তাপ প্রভৃতি আগমন করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করে। কুটুম্বাদির ক্লেশের আর অবধি থাকে না, যাহারা আপনার তাহারাও তখন পর হইয়া যায়। কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপও করে না। সংসারাশ্রম কঠোর হইলেও পরীক্ষা, শিক্ষা ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের দিকে ইহা যেমন সাহায্য করে, তেমন আর কোনো আশ্রমই করে না। এতদ্ব্যতীত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা দ্বারা জীবনকে মধুময় ও জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত করিতে সংসারাশ্রমই মানবের একমাত্র অবলম্বন।

কেহ কেহ সংসারাশ্রমকে শকটের সহিত তুলনা করেন। ধর্ম্ম ইহার ধুরা, ভ্রাতৃভাব এবং প্রীতি ইহার চক্র, স্ত্রীও পুরুষ ইহার বলদ। যদি পরিশ্রম ও সাহস সহকারে সুমার্গে চালিত হয় তবেই তো ইহার কল্যাণ হইয়া থাকে। নতুবা কুমার্গে পতিত হইয়া অচীরে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। কি-প্রকারে আপনার এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের ভাল হয়, স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল এই ভাবনা, এই চিন্তা এবং এই কার্য্য। আপনার সুখে সে আপনি সুখী এবং আপনার দুঃখে সে আপনি দুঃখী। পরের দুঃখে তাহার দুঃখ হয় না, পরের সুখে তাহার সুখ হয় না। স্বার্থপর ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা-ভগিনীর কোনো সম্বন্ধ রাখে না বা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানে না। সংকীর্ণতা তাহার হৃদয়কে এত ক্ষুদ্র করিয়া দেয় যে, তাহার মনে উচ্চভাবের স্ফূর্তি পায় না। স্বার্থপর লোক দ্বারা কোনো মহদ্ব্যাপার সাধন বা কোনো জাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। স্বার্থসংকুচিত হৃদয় লইয়া কেহ কোনোকালে উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করিতে পারে না। পরকে ভালবাসাই স্বর্গ। যদি ভালবাসা না থাকিত তবে পরের উপকার কে করিত?

সকলেই আপনার আপনার জন্য ভাবিয়া মরিয়া যাইত। ভালবাসা আছে বলিয়াই জগৎ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ভালবাসার জন্যই পিতামাতা সন্তানে লালন পালন করেন এবং তাহাদিগের প্রীতির জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন। ভালবাসার জন্যই স্বামী স্ত্রীতে, ভ্রাতা ভ্রাতায় অনুরক্ত হয়। ভালাবাসা না থাকিলে সংসারে নিত্য কলহ বিরাজ করিত। প্রভাতে সমীরণের হিল্লোলে যেমন পুষ্পকলিকাসকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের সমুদায় সদ্‌ভাব বিকশিত হয়। প্রকৃত প্রণয় সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত, উদার এবং সদ্‌ভাবাপন্ন না হইলে প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে পরের সেবা করিতে পার, এবং যাহাতে মলিন জিহ্বা হইতে একটি সুমিষ্ট কথা বাহির করিয়া বিষণ্ণ আত্মাকে সুখশান্তি দিতে পার তাহার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিবে।

ভালবাসা যদি গৃহস্থের মূল হয়, তবে বিনয় তাহার পুষ্প। এই পুষ্পের অবিদ্যমানে সংসার মরুময় হইয়া থাকে। মানবের পক্ষে বিনয় অমৃতাভিষিক্ত শরৎকৌমুদী। মানব জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে পারে, কিন্তু যদি সে প্রভার শমগুণ না থাকে, বিনয়-সুধা যদি তদভ্যন্তর হইতে নিঃস্যন্দিত না হয়, তবে জগতের চক্ষু কেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? যদি হৃদয়রঞ্জন করিতে চাও, ভাই-ভগ্নীদিগকে ভালবাসাসূত্রে বাঁধিবার যদি বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে জ্ঞান-প্রসূনে বিনয়-মকরন্দ নিত্য বিরাজ করে, সেই চিররুচিপ্রদ দেববাঞ্ছনীয় সুকোমল কুসুম শোভা সাদরে চক্ষে ধারণ কর। দেখিবে যেন স্বর্গের সম্পত্তি---অতি আদরের ধন এই বিনয়-রত্ন অযত্ন দ্বারা হৃদয়পুর হইতে নিষ্কাশিত না হয়। যে হৃদয় বিনয়ামৃতে অভিষিক্ত নহে, সেই শমশাস সদৃশ দগ্ধ হৃদয় আপনিও প্রকৃত সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পারে না, অন্যকেও তাহা প্রদান করিতে পারে না। যে-গৃহ বিনয় প্রসূনে পুষ্পিত সেই গৃহেই সুখরূপী ফল ফলিয়া থাকে, নতুবা অনন্ত কষ্ট আসিয়া গৃহাশ্রমকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। বিনয় অপসৃত হইলেই মানব-হৃদয়ে লঘুচিত্ততা আসিয়া পড়ে। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মে মানব সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিবে। গৃহস্বামী স্বীয় মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলেই তাহার আশ্রিতগণ বিফল হইয়া থাকেন। এই জন্য গৃহস্থের বিনয় থাকাই চাই এবং তৎসঙ্গে ধৈর্য্য থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্য না থাকিলে পারিবারিক কুশল ও শান্তি সংরক্ষিত হয় না। পরিবারের প্রকৃত ভার নারীগণের উপরেই পতিত হয়। তাঁহাদিগের কোমল হৃদয় সকলের জন্য যেরূপ ভাবিয়া থাকে, সকলের ব্যথায় যেরূপ ব্যথিত হয়, সকলের সুখের জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে এরূপ আর কে করে? নারী প্রকৃতি যত সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইবে, ততই তাহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

সংসারাশ্রমে শান্তি থাকা অত্যন্ত উচিত। যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী একত্র হইয়া বাস করা যায়, এই পৃথিবীতে সেই স্থান স্বর্গতুল্য। মানব যেদিন হইতে পরিবারবদ্ধ হইয়াছে তাহার পশুভাব সেইদিন হইতে দমন হইয়াছে অনেক পরিমাণে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখের পরিমাণ সহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্বার্থপর মনুষ্য সমাজের কল্যাণ-চিন্তা করে না, এবং সমাজের হিতের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত নহে, সে ব্যক্তিও পরিবারে কল্যাণ চিন্তা করে এবং পরিবারের সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ এই পৃথিবী মরুভূমি তুল্য হইলেও স্বীয় পরিবারে প্রত্যেকের শান্তি ও আরামস্থান। পারিবারিক কোমল স্নেহসম্বন্ধ কঠোর হৃদয়কে বিগলিত করিয়া ফেলে, এবং তাহা হইতেও সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থভাব ও দয়ার

সহস্র সহস্র পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। সংসারে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে, তজ্জন্য ভগবান মানবহৃদয়কে স্নেহ, দয়া প্রণয় প্রভৃতি স্বর্গের কুসুমে ভূষিত করিয়াছেন। এই গুণগুলি যে পরিবারে নাই, সে পরিবারে শান্তি থাকিতে পারে না! সংসারে যাহাতে মনোভঙ্গ না হয় সদাই তাহার চেষ্টা দেখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রমে মনোভঙ্গের প্রধান কারণ ঈর্ষা। ঈশ্বরের দয়া যত বেশ ধারণ করিয়া জীবের কল্যাণসাধন করে, হিংসাও তত বেশ ধারণ করিয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শারীরিক রূপ ও পারিবারিক সৌভাগ্য—এমন কি ধর্ম্মের উপরও লোকের হিংসা হয়। অন্যের ধন, ঐশ্বর্য্য কেন আমার অপেক্ষা অধিক হইল, অন্যে লোকের নিকট এত পূজ্য ও যশস্বী হইবে কেন, অন্যে জ্ঞানে ও বুদ্ধি কৌশলে আমাকে অতিক্রম করিল, অন্যের রূপ লাবণ্য যেমন, আমার তেমন নয়, অন্যের যতগুলি পুত্র-কন্যা, ভাল ভাল কুটুম্ব, আমার তেমন নাই; এই ভাবিয়া হিংসুকের মন পীড়িত ও বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে। হিংসা অতি স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মন হইতে উৎপন্ন হয়। যে আপনার সুখকেই সুখ বলিয়া জানে, অন্যের সুখে কখনও সুখানুভব করে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা হিংসাপরায়ণ হয়। আপনার পরিবার অতিক্রম করিয়া যাহার চিন্তা কখনও যায় না, তাহার হৃদয় উদার হইতে পারে না; জ্ঞানের অল্পতাতেও মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে। এই কারণে দেখা যায় এদেশের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবল। হিংসায় স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা হয়, সুরূপা হইলেও কদাকার হয় এবং তাহার যতই সদ্‌গুণ থাকুক সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিতে হইলে হিংসাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থের সদাই পরিশ্রমী হওয়া উচিত। আলস্য দরিদ্রতার কারণ, পরিশ্রম ব্যতীত গৃহস্থের গৃহ পালনও সম্ভবপর নহে। প্রথমত আলস্য অর্জ্জনের পথরোধ করিয়া দেয়, দ্বিতীয়ত সঞ্চিত ধনরাশির ব্যয় করিয়া থাকে। আয় বন্ধ হইলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হওয়া সুদূরপরাহত। অলস ব্যক্তির পক্ষে ঋণগ্রহণও অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ সে যখন স্বীয় অর্জ্জিত ধনরাশির ব্যয় করিয়াছে, তখন সে ঋণদাতাকে কি দিতে পারে? এমন পাপ কার্য্য নাই যা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি করিতে পারে না। এবং পাপে লিপ্ত হইলেই সে নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অসময়ে নিদ্রা, পরসহবাস দারিদ্র্যের হেতু। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি এগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রীতির হ্রস্বতা, বিবেক-শূন্যতা, বালকদিগের শিক্ষায় শিথিলতা, অসতর্কতা, বুদ্ধিভ্রংশতা, চিত্তচাঞ্চল্য, সৎসঙ্গের পরিহার, কুসঙ্গ, সজ্জনের সহিত বিরোধ, পরনিন্দা এবং শীলতার পরিত্যাগ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিপদের হেতু জানিবে।

গৃহই রমণীদিগের রাজত্ব; সুতরাং দায়িত্বও অধিক। পদ্যে যে সুখ অনুভব করা যায় না, সঙ্গীত যে-আনন্দ দিতে অক্ষম, গৃহ সে-আনন্দ দান করিতে সক্ষম। সংসারাশ্রমে স্বামীই রমণীর দেবতা। স্ত্রীলোকের পতির ন্যায় প্রিয়বস্তু ইহজগতে আর নাই। তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পারে না, এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতে পারে না, তেমনি স্বামী যদি না থাকেন, শতপুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের প্রসূত সন্তানগণ যাহাদিগকে তাহারা আপনার হৃদয়ের ধন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাও বড় হইলে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে, তখন তাহারা তাহাদিগের রহিবে না; কিন্তু তাহাদিগের যদি কেহ আপনার বলিয়া পৃথিবীতে থাকে সে

তাহাদিগের স্বামী। পৃথিবীতে বন্ধুগণ তোমাকে সামান্য অর্থদানে কুণ্ঠিত হইবেন, কিন্তু তোমার স্বামী তোমাকে তাহার মন-প্রাণ গৃহ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় দুর্লভ পদার্থ অকাতরে অর্পণ করিয়াছেন। এহেন স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে তোমাদিগের নরকেও স্থান হইবে না। অনাহারে, অনিদ্রায় যতবড় ব্রতেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, আর যত বিপুল ধনরাশি দীন দরিদ্রকে দান কর না কেন, কিম্বা কঠোর তপস্যা অবলম্বনে পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, অথবা সত্য পক্ষারূঢ় হইয়া যত ধর্ম্মোপার্জ্জন করা না কেন, তোমার পতিভক্তি না থাকিলে সে সমস্তই ভস্মাকারে পরিণত হইবে।

সংসারে স্ত্রীগণের স্বামীই পরিচালক। এই লোভময় ভীষণ সংসারে স্ত্রীজাতি অতিশয় দুর্ব্বল প্রকৃতি। তাই তাহাদিগকে স্বামীর করে সমর্পণ করিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত হন। স্ত্রীজাতি যৌবন মধ্যাহ্নে স্বামীর আশ্রয়ে উপনীত হইয়া পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। স্ত্রীজাতির স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, বিপদের বন্ধু, সম্পদের সখা, দুঃখের সহানুভূতি, আনন্দের প্রীতি, ধর্ম্মের সহায়, এমনকি সম্পদে-বিপদে, দুঃখে-সুখে এমন সমভাগী তাহাদের আর কেহ নাই। সংসার-ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী। দুইটী প্রাণ একই লক্ষ্য কবিয়া আজীবনের জন্য ফুটিয়াছে। স্বামী পথপ্রদর্শক, স্ত্রী অনুগামিনী, স্বামী কায়, স্ত্রী তাঁহারই ছায়া মাত্র। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীব অন্য গতি নাই। কিসে তাঁহার শুভ হইবে, স্ত্রীর জীবনে সেই ধ্যান ধারণা। স্বামীই স্ত্রীলোকের জীবন তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী, কাণ্ডারী। ব্যতীত নৌকা যেমন চলিতে সক্ষম না হইয়া বিপথে গমন করিয়া বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ স্বামীর সাহায্য ব্যতীত এই অনন্ত সংসার-সমুদ্রে স্ত্রী-জীবন দিশাহাবা হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে কষ্ট বোধ করে। অতএব স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হইতেই হইবে।

সংসারে পত্নীর দায়িত্ব অতি গুরুতব। কেবলমাত্র পতিকে যত্নপূর্ব্বক পানভোজন করাইলে, রোগের সময় তাঁহার শুশ্রূষা করিলে ও অন্যরূপে তাঁহার সুখস্বাস্থ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই যে স্ত্রীর উপযুক্ত পতিসেবা হইল, সহধর্ম্মিণীর কার্য্য হইল তাহা নহে, উহা আংশিক পতিসেবা বলা যাইতে পারে। পতিপরায়ণা হইতে হইলে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত পতিসেবা তো চাই-ই; তদ্ব্যতীত পত্নীকে স্বামীর ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবে। যে নারী উল্লিখিত কার্য্যসকলের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিয়া পতির আত্মার কল্যাণসাধন করেন, তিনিই প্রকৃত পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী; তাঁহার দ্বারা যথার্থ পতিসেবা হয়। পতি শরীর নহে, শরীরস্থ আত্মা। অনেক ভোগসুখপরায়ণা নারী স্বামীর শরীরের প্রতি আসক্ত, তাঁহার শরীর লইয়াই দিবা-রাত্রি ব্যস্ত। স্বামীকে ঈশ্বর-বিমুখ, ধর্ম্মভ্রষ্ট নীতিবিহীন দেখিয়াও সে স্ত্রীর মনে ক্লেশ হয় না, তাঁহাকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য যিনি যত্ন করেন না, সেই স্ত্রীকে কেমন করিয়া পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী বলা যায়? পতির সঙ্গে যিনি নীচ পাশব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক দিব্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তিনিই ধন্যা; তিনিই সতী পুণ্যবতী। তিনি নিজের জীবনের সদ্দৃষ্টান্তে, ন্যায়ের তীক্ষ্ণ শাসনে, প্রেমের আকর্ষণে, বিনয়-গাম্ভীর্যপূর্ণ সদুপদেশে তাঁহাকে ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করেন। স্ত্রীর উচ্চ ধর্ম্মভাব ও প্রাণগত যত্নচেষ্টা ও ব্যাকুলতায় পতির ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তিনি উচ্চজীবন লাভ করেন। ইহাকে বলে প্রকৃত পতিসেবা ও পাতিব্রত্য।

সতী পুণ্যবতী নারী সংসারের শ্রী, গৃহের লক্ষ্মী, ধর্ম্মের প্রকৃত সঙ্গিনী, স্বামীর যথার্থ

সহচরী ও বন্ধু। ইঁহার সহবাসে গৃহ পুণ্যধাম হয়, সংসার মধুময় হয়, সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠিত হয়, গৃহে শান্তি বিরাজ করে। প্রকৃত সতীত্ব নারীজাতির দেবদুর্লভ অলঙ্কার; জীবন সংগ্রামে ইহা তাঁহাদের অভেদ্য কবচ, পরিবার মধ্যে ইহা স্বর্গীয় কৌস্তুভমণি, ধর্ম্মজীবনে ইহা অদ্বিতীয় সহায়, জনসমাজে ইহা পবিত্র আদর্শ। সতীত্ব জনসমাজের মেরুদণ্ড, সতীত্ব সামাজিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি। সতী জননীর ন্যায় বাৎসল্য-পরায়ণা, সখীর ন্যায় হিতৈষিণী ও সৎ পরামর্শদাত্রী, কন্যার ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যানিরতা। তিনি পতিসেবার জন্য যে-সময়ে যে রূপ প্রয়োজন, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি সেই বেশ পরিগ্রহ করেন।

পতিসেবা নারীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। জনক দুহিতা সীতা অতুল ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ে পালিতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়াছিলেন। রাজদুহিতা জানকী শ্বাপদসঙ্কুল বন অপেক্ষা রাজান্তঃপুরই কষ্টকর স্থান জ্ঞান করিয়া মনের আনন্দে স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়া কুচক্রী সংসারের কঠোর নিষ্পীড়ণে কত কষ্টই ভোগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি স্বামীসেবা হইতে বিচ্যুতা হন নাই। দক্ষকন্যা সতী পিতার সন্নিধানে স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা স্বামীকে বিশ্বামিত্রের ঋণ হইতে পরিমুক্ত করিবার জন্য আপনাকে বিক্রয় করিতে স্বামীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিপদকালে তিনি পিতৃগৃহে না যাইয়া স্বামীর সহিত থাকিতেও সুখ বোধ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত থাকিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন, চিতোরের রাণী পদ্মিনী স্বামী ভীমসিংহকে দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিনের হস্ত হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা বেহুলা সর্পদৃষ্ট মৃত স্বামীর বিগলিত শরীর সঙ্গে লইয়া সামান্য ভেলাতে অকূল সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের জন্য মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের সন্নিধানে গমনপূর্বক স্বামীর প্রাণভিক্ষা লইয়াছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত সতী রমণীগণের নাম এখন পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের সুর্চ্চলা, চন্দ্র রোহিণী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, অগস্ত্যের লোপামুদ্রা, চ্যবনের সুকল্পা, কপিলের শ্রীমতী, ইন্দ্রের শচী, সগরের কেশিনী, সৌদাসের দময়ন্তী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, এবং নারায়ণের লক্ষ্মী পতিব্রতা ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। সতীত্বের গৌরব বুঝিত বলিয়াই রমণী-সম্মান, রমণী-মাহাত্ম্য একমাত্র ভারতবর্ষেই উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ যেখানেই অন্বেষণ করিবে, সেখানেই দেখিতে পাইবে—স্ত্রী জাতির সম্মান, পত্নীর আদর, সাধ্বীর মাহাত্ম্য; সেখানেই দেখিবে নারী-হেলার নিন্দা, পত্নী-অনাদরের কুৎসা, কুলবধূ সন্তাপের বিষময় ফল। তাই এত অধঃপতন-কালেও হিন্দুর ঘরে এই গৃহদেবতা লক্ষ্মীরূপিনী রমণীর আদর-গৌরব কমে নাই। এখনো হিন্দু বুঝে, হিন্দু ভাবে সাধ্বী রমণী স্বর্গের সৃষ্টি, লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, দেবীর প্রতিমা। তাই যে শক্তি ধনধান্যদায়িনী সংসার শ্রীবর্দ্ধিনী তাহা লক্ষ্মীরূপে,—যে শক্তি বিপদনাশিনী, শত্রু-দলনী, কালভয়নিবারণী, তাহা কালীরূপে—যে শক্তি জ্ঞানপ্রসবিনী, জ্ঞানদায়িনী, তাহা সরস্বতীরূপে—যে শক্তি সর্ব্বভূত বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বজননী, তাহাই আদ্যাশক্তি-ভগবতীরূপে এ দেশে পূজিত। ইহা অপেক্ষা রমণী-গৌরব ও রমণী-মাহাত্ম্যের উচ্চতা ও প্রবলতা আর কোথায় দৃষ্ট হয়?

মানবসমাজ উন্নত করিতে হইলে স্ত্রীগণকে পতিব্রতা হইতেই হইবে। স্ত্রীজাতি

সমাজের আকর্ষণ-দণ্ড। সদাচার ইহার মূল, ভক্তিই ইহার অঙ্গ, পরোপকার ইহার শীর্ষদেশ এবং আত্মত্যাগ ইহার আকর্ষণশক্তি। যতদিন এই কয়েকটি উপাদান অটুট থাকিবে, ততদিন শক্তি অক্ষুণ্ণ ও সমাজ অটল থাকিবে। ততদিন শতসহস্র রাজনৈতিক বিপ্লব দেশকে আলোড়িত করিলেও সমাজকে তিলমাত্র কম্পিত করিতে পারিবে না। হিন্দুর পবিত্র দাম্পত্য প্রণয় জগৎকে স্পর্ধা করিতেছে;—আজো হিন্দু মহিলার দেবভক্তি, গুরুভক্তি, পতিভক্তি, এই জগতে স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তির প্রভাবেই হিন্দুর প্রাচীন গরিমা আজ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বর্তমান যুগের মহিলাগণ প্রায়ই প্রকৃত পাতিব্রত্যের ধার ধারেন না। গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাস্তবিক পতিকে প্রণয় করেন না। তাঁহারা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিলাস-বস্তুর প্রকৃত প্রণয়িনী; পতি-প্রণয়িনী নহেন। যে-পতি অর্থশালী, উপার্জ্জনশীল, পত্নীর আজ্ঞামত বিলাসবস্তু সকল প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এখন পত্নীর প্রণয়ভাজন। যদি তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন তবে তিনি স্ত্রীর প্রণয়-অধিকারী নহেন। যে-স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ উপাদেয় পদার্থ প্রদান করিত, তাঁহার সামান্য পীড়া হইলে যাঁহার অসুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না, অর্থাগমের অভাব-প্রযুক্ত ঘোর দরিদ্র দশা উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রী সেই পতিকে সহস্র কটুবাক্য না বলিয়া শাকান্নও প্রদান করেন না। অনেক দুর্ভাগ্য পুরুষ এই অবস্থায় প্রত্যেক অন্নগ্রাস অশ্রুপাতের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে কি আমরা পতিপ্রেম বলিব? যে বিলাসবস্তুকে প্রণয় করে আমরা তাহাকে পতিব্রতা বলি না। বিলাস-প্রণয়িনী এবং বারাঙ্গনাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

যে সকল মহিলা অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিনা, কারণ যে-নারীর সৌন্দর্য্য নাই তাহার কিছুই নাই। সৌন্দর্য্যরক্ষা ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি বিষয়ে অবহেলা করা পাপ; কিন্তু আমরা এইমাত্র তাঁহাদিগকে বলিতে চাহি যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে, উহা অসারের অসার, দুই দিন পরে উহা জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্ন হইবে, শতযত্নেও উহাকে অক্ষয় রাখিতে পারিবে না। কৃত্রিমতা যত কম হইবে ততই স্বভাবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। একটী সতী নারীর পবিত্রতা লজ্জা বিনয়ের নিকটে অন্য নারীর হীরা-মুক্তা খচিত আভরণের কিছুমাত্র মূল্য নাই। সতীত্ব-ভূষণে যিনি ভূষিতা, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। স্বার্থত্যাগে, বিলাসবাসনা বর্জ্জনে, ঈশ্বরোপাসনায়, প্রেম ও পতিব্রতায়, পরসেবায়, চিত্ত-সংযমে, জিতেন্দ্রিয়তায় ও দয়াদাক্ষিণ্যে সেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। জরা-বার্দ্ধক্যে সেই সৌন্দর্য্যের বিনাশ হয় না, মৃত্যুতেও সেই সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় না।

যাহাতে স্বামী স্ত্রীতে কলহ না হইতে পারে তদ্বিষয়ে নারীগণের মনোযোগী হওয়া উচিত। স্ত্রী-পুরুষের কলহ অমানুষোচিত বিগর্হিত কার্য্য। পত্নী-পতিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন, সকল ব্যাপারে তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিবেন, তাঁহার দোষ-ত্রুটি দেখিলে ক্ষমা করিবেন। পতিও পত্নীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতিসম্পন্ন হইবেন, তাঁহার অপরাধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিচয় দিবেন, ইহাই স্বর্গীয় বিধি। মানগর্ব্বিত হইয়া প্রেমের ঝগড়ায় গালি তিরস্কার, লাঠালাঠি, আসুরিক ভাব। যদি কখনো কলহ সঙ্ঘটন হয়, তবে তোমাদিগের শুভ পরিণয় দিনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ো, তাহা হইলে

তোমাদের মনোমালিন্য তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। বিবাহ-দিনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে উভয়ে উভয়ের জীবনপথের সঙ্গী ও সঙ্গিনী হইবে। বিবাহ বাসরে স্বামী ও স্ত্রী কতসুখের কল্পনা মানস-পটে চিত্রিত করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন। স্বামীর মনে কত আশা, তাঁহার এই নবপরিণীতা ভার্য্যা কালে সুগৃহিণী হইয়া তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিবে, তাঁহার গৃহ প্রীতি ও পবিত্রতার আধার হইয়া তাঁহাদিগের দাম্পত্য-জীবন কত সুখময় করিয়া তুলিবে, হিংসা দ্বেষরূপ বিষবহ্নি তাঁহাদের সুখাগারে প্রবেশ করিয়া তাহা কলুষিত করিতে পারিবে না, সেখানে কেবলই চিরশান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা অনভিজ্ঞতার দোষে স্বামীর সেই আকাঙ্খিত বিষয়ের বিরোধী ব্যবহার করিয়া সংসার অশান্তিময় করিয়া তুল, তবে তাহা কি দুঃখের বিষয় নহে? উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া যে-আশা-প্রদীপের উজ্জ্বলালোকে সংসারে আপনাদের জীবনের পথ অতি সুখকর ও অতি সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছিল, স্ত্রীগণ আপনাদের ব্যবহার দোষে মনোমালিন্যরূপ মহাবাত্যা সৃজনপূর্ব্বক আপনাদের সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশাপ্রদীপকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়ো না। রমণী চেষ্টা করিলে গৃহকে স্বর্গতুল্য, করিতে পারেন, আবার স্বভাবদোষে তাহা নরকেও পরিণত করিতে পারেন। যে গৃহে রমণী কণ্ঠ হইতে অনবরত কর্কশবাক্য নির্গত হইতেছে, সে-গৃহ কলহ ও অশান্তির চির আবাস তাহাকে মূর্ত্তিমান নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর একদিকে, যে গৃহে রমণী নিজ সদ্‌গুণরাশি দ্বারা মধুরতা ও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন, যে-গৃহ হইতে নিয়ত আনন্দরোল উত্থিত হইতেছে, অশান্তি ও কলহ যে গৃহ হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গ বলিব না তো পৃথিবীতে আর স্বর্গের ছবি কোথায়? অনেক স্থলে পুরুষের কঠোর ব্যবহারে ও পুরুষের অবিবেচনায় গৃহের শান্তিভঙ্গ হয় স্বীকার করি; কিন্তু সে-গৃহের রমণী যদি স্নেহশীলা ধৈর্য্যশীলা হন, তবে সে অশান্তি কত দিন থাকে? আমি একথা বলি না যে পরিবারমধ্যে পুরুষের কোনো দায়িত্ব কোনো কর্ত্তব্য নাই। তাঁহারও গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। পুরুষ রমণীকে শ্রদ্ধা করিবেন, রমণীও পুরুষকে শ্রদ্ধা করিবেন। স্ত্রী ও পুরুষ দ্বারা সংসার গঠিত। পুরুষ-প্রকৃতি কঠোর, স্ত্রী কোমলতার আধার। এই কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণ অতি মধুর। কেবল কঠোর অথবা কোমলে সংসার চলিতে পারে না, তাই বিধাতা তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে দুইটি প্রাণ একত্র করিয়া একের অভাব অন্যটি দ্বারা পূরণ করিয়াছেন। তাই একের অভাবে অন্যটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই একজন গরম হইলে অন্যজনের নরম হওয়া চাই। নতুবা কলহ বাড়িয়া যাইবে।

স্বামী যদি কোনো ঘটনাচক্রে দাম্পত্য প্রেমের সরস রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়া কর্দ্দমময় সংসারে নিপতিত হয়, তবে বিদুষী, জ্ঞানবতী, উন্নতমনা সাধ্বী স্ত্রী সদা হাসি-হাসি-মুখে, মধুর সম্ভাষণে তাহাকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। রাগে, বিবাদে ও অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকিলে কোনো সুফল ফলিবে না বরং কুফলের সম্ভাবনা। অথবা স্বামীকে পরদাররত দেখিয়া নিজে পতিব্রতার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিবে না, বরং স্বামীর অধীন থাকিয়া তাহার মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। পত্নী যদি মনে প্রাণে পতির সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে, তবে পতিও তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বশ হইয়া যাইবে। কারণ সদ্‌গুণের ন্যায় আকর্ষণকারী বস্তু পৃথিবীতে অতি বিরল। কিন্তু পত্নী যদি

বিবাদ, রাগ, দ্বেষ ও কটুকর্কশ ভাষায় পূর্ণ হয়, তবে পতির অভিরুচি তাহার উপর হইতে অপসারিত হইয়া পরস্ত্রীতে ঘনীভূত হইতে পারে এবং যে অর্থ স্ত্রী বা তাহার সন্তান-সন্ততির সুখের জন্য সংগৃহীত হইত, তাহা না হইয়া পরের জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং তাহাতে স্ত্রী বা তাহার সন্তানাদির ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সদ্ভাব রাখে তবে সে-ধন আর অযথা খরচা হইতে পারে না—ইহা বড় অল্প লাভের বিষয় নহে।

সংসারে চরিত্রগঠনে নারী প্রধান সহায়। শৈশবে মাতা ও যৌবনে স্ত্রী চরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। পুরুষ স্ত্রীর স্নেহ, কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আনন্দে সুশোভিত রমণী পতির গৌরব ও স্বর্গের দেবীতুল্যা। যে গৃহে গৃহিণী ধর্ম্মবিরোধিনী, উগ্রপ্রকৃতি, কলহপ্রিয়া, নীচাশয়া, সেইগৃহ হইতে সুখশান্তি বহুদূরে পলায়ন করে। সেই স্থান পাপের আবাস হইয়া থাকে। এইজন্য স্ত্রীগণকে মিষ্টভাষিণী হইতে হইবে। বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া স্বামীর নয়নমুগ্ধকর আপাতরম্যা পুতুল না হইয়া তাঁহাকে হৃদয়মোহিনী দেবী হইতে হইবে। পতির নয়নের উপরে রাজত্ব করিয়া স্নেহ, কোমলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে হইবে।

কখনো গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়ো না। স্মরণ রাখিয়ো যে পরমেশ্বর স্ত্রী জীবন স্নেহ, প্রেম, দয়া, বদান্যতা প্রীতি ও ক্ষমা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহাতে কোনো একটির অভাব ঘটিলে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক সংসারের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁহাদের নিজ জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া চলা উচিত। রমণী সুগৃহিণী হইয়া প্রিয়জনের সকল অবস্থার সহায় হইবেন। পরিবারের কর্ত্রীর শাসন ও কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হইবে; সম্মানের আসন চির অচল থাকিবে; অথচ কোমল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ, প্রীতিবিস্ফারিত আনন, সস্নেহ সম্ভাষণ, মধুর বচন, শ্রান্ত জনের আনন্দ-বিধায়ক হইয়া প্রতিজনকে আকৃষ্ট করিবে। সকল হৃদয় সেই শীতল ছায়ায় আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য চিরদিন উৎসুক থাকিবে। যে সকল স্ত্রী ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বন্ধ হইতে স্বামীর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়, যাহারা নানাপ্রকার কুহক দ্বারা স্বামীর মনে তাঁহার পিতা, মাতা, সহোদর, সহোদরা এবং অন্যান্য বন্ধুদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাদর জন্মাইয়া দেয় তাহারা কখনই অন্তরঙ্গ নহে; তাহারা ভুজঙ্গিনী। পক্ষান্তরে যে সকল স্ত্রী আপনাদিগের স্বামীর হৃদয়কে দয়ার্দ্র এবং কোমল করিয়া পরসেবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহারাই যথার্থ সতী, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই সকলের শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র।

স্বামী প্রবাসে গেলে রমণী পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর বা মাতুলের অধীনে অবস্থান করিবেন। ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ, আমোদ প্রমোদে যোগদান ইত্যাদি তাঁহার সর্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য; নতুবা প্রনষ্টচরিত্র পুরুষের মন স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমার্গ হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে। যুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গে তাঁহার থাকা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাদিগের হাস্য-পরিহাসে মানসিক বিকৃতি হওয়া সম্ভব ও তজ্জনিত ভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাদিগের সহবাস প্রবাসগত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষে প্রশস্ত। গৃহকার্য্য, শিল্পকার্য্য, সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার কালাতিপাত করা

উচিত।

বিধবা রমণীগণের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্মকার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়, বিশ্বাস ও আত্মার পরিচয় দেয় তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপভাবে পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়-জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব অতি পবিত্র। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য, এ বিষয়টি সকলেরই শিক্ষা করা উচিত। শাস্ত্রীয় পুস্তক পাঠে মন কতকটা শান্ত হইতে পারে। নাটক নভেল বিধবাদিগের পক্ষে বিষ। প্রবাসগত স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে যে-যে বিষয়ের বিধান আছে, বিধবারও তাহা পালন করা কর্ত্তব্য।

রমণীগণের পরনিন্দা ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিজের গৃহস্থিত ব্যক্তিরই হউক বা প্রতিবেশীরই হউক কখনো নিন্দা করিবে না। পরনিন্দার ন্যায় গুরুতর পাপ আর নাই। মক্ষিকা যেমন ক্ষত পূঁজরক্ত অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, নিন্দুকেরা তদ্রূপ কোথায় একটু দোষ ও ছিদ্র পাইবে তাহাই মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করে। বিন্দুমাত্র দোষ পাইলে তাহারা তাহাকে নিজগুণে বড় করিয়া তুলে। ইহাতে যেমন নিজের ক্ষতি তেমন পরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং নিন্দার কালী মুখে মাখিয়া শ্রীহীন হইয়ো না; নিন্দার কলঙ্কে হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়ো না। ঈশ্বর যে তোমাকে কোমল রসনা দিয়াছেন, তাহা সদালাপ ও লোকের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য; কটূক্তি ও নিন্দা করিয়া জগতের অপকার করিবার জন্য নহে। লোকের গুণকীর্ত্তন করিয়া রসনাকে সার্থক কর; মানীর মান বাড়াইয়া নিজে মানী হও। ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া গুণান্বেষণ কর। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তুমিও সকল লোকের গুণ গ্রহণ কর। শূন্যগর্ভ অসার লোকেরা বিদ্বেষবশতঃই পরনিন্দা করিয়া থাকে।

রমণীগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং গৃহকর্ম্মও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাসময়ে নির্ব্বাহিত হইবে। রমণীগণ যদি অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, তবে গৃহের কার্য্যাদি অতি বিলম্বে সম্পাদিত হইবে। যাহারা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত থাকে, রোগ তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করে। বিলম্বে গৃহের কার্য্যারম্ভ করিলে বিশ্রামের অবসরও পাওয়া যায় না। ইহা রমণীদিগের পক্ষে অন্য একটি অসুবিধা। অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা রমণীদিগের একটি বিশেষ কার্য্য; শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা রক্ষার জন্য একার্য্য করিতেই হইবে। শারীরিক কার্য্য যথোচিত সম্পাদিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা মনও উত্তেজিত হয়, কেন না প্রধানত মানসিক উত্তেজনা-দ্বারাই ইচ্ছামত পেশীসকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এবং পরে শারীরিক কার্য্যসকল তদ্দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়াতে শরীরে স্ফূর্তি যেমন হয়, মনেরও তেমনি উৎসাহ ও আনন্দ হয়।

ভোজন প্রস্তুত হইলে প্রথমে বালক-বালিকা ও রোগী, তৎপরে বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইবে। অতঃপর গর্ভিণী স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, অতিথি, স্বামী ও ভৃত্যকে ক্রমানুসারে ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে স্বীয় অলঙ্কারাদি ঠিক ঠিক শরীরে আছে কি না

দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিবে। নতুবা যদি তাহা ভৃত্যাদির হস্তে আইসে, তাহা হইলে তাহা পুনঃপ্রাপ্তি একান্ত দুর্ঘট।

যদি কেহ কখনো তোমাকে কোন বিষয়ে উপদেশ দেন তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়ো না। সে উপদেশ তোমার মনোমত হউক বা না হউক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে একদিকে তোমার শিষ্টতা দেখানো হইল ও অন্যদিকে উপদেষ্টাও আনন্দিত হইলেন।

মিতব্যয়িতা রমণীগণের একটি প্রধান ধর্ম্ম। তাহা না থাকিলে পদে পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা । আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোনো ক্ষতি নাই, পরন্তু ব্যয় যদি আয় অপেক্ষা অধিক হয় তবে ঋণগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সহিতে হয়। এ বিষয়টি গৃহিণী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রম রমণীদিগের জানা উচিত যে, মিত্র সততা দ্বারা, শত্রু শীলতা দ্বারা, কৃপণ ধনদ্বারা গুরুজন সেবা দ্বারা, বয়োকনিষ্ঠগণ ক্ষমাদ্বারা, বিদ্বানগণ বিনয় দ্বারা, মূর্খ মিষ্ট কথা দ্বারা, পুরুষ সেবা দ্বারা, অভিমানী প্রশংসা দ্বারা, ক্রোধী শান্তভাব দ্বারা, আত্মীয় বন্ধুগণ স্নেহ দ্বারা, পরজন উপকার দ্বারা, প্রতিবেশী দয়া দ্বারা, সংসার মিত্রভাব দ্বারা এবং স্বামী ভক্তি দ্বারা বশ হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

চৈত্র ১৩২২

## স্ত্রীর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

### মিতব্যয়িতা

অপব্যয়ের বিপরীত মিতব্যয় কৃপণতাকে মিতব্যয় বলে না। পেট কাটিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে মিতব্যয় হয় না, অযথা খরচ না করা, অথবা অনাবশ্যক বস্তু ক্রয় না করাকেই মিতব্যয় কহে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অমিতব্যয়িতা একটী মহৎ দোষ। অর্থ উপার্জ্জন করা পুরুষের কার্য্য, কিন্তু ব্যয়ের ভার স্ত্রীলোকের উপর। মহিলাগণ যদি অপব্যয়ী হন, তবে সংসারে সুখ থাকিতে পারে না। বিলাসিতা অপব্যয়ের একটি প্রধান কারণ। নব-রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অধিক। কেশরঞ্জন, পমেটম্, এসেন্স, সাবান, চিকের রুমাল প্রভৃতি বিলাসোপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই লালায়িতা। অবস্থায় কুলাইলে এগুলিতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে এগুলি অর্জ্জন করার ন্যায় মহাভ্রম আর নাই। যে সকল রমণী এ রূপ অমিতব্যয়কে দেখিয়াও দেখে না, তাহারা অর্থ-সম্বন্ধে স্বামীর বিশ্বাসভাজন হইবার উপযুক্তা নহে।

অভ্যাস-দ্বারা সকল বৃত্তিই আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং, মিতব্যয়কেও অভ্যাস-দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে, মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে, অনবধানতা এবং অপব্যয়ের কু-অভ্যাস অলক্ষিতে জন্মিতে থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা

মিতব্যয়িতা দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে। সময়, স্বাস্থ্য, অর্থ—সকলই মিতব্যয়িতার অধীন। এইজন্য পৃথিবীতে ইহার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ আর নাই। মানব মিতব্যয়ী হইলে, তাহার মনে এক প্রকার সন্তোষ জন্মে এবং তদ্দ্বারা সে দীর্ঘজীবন লাভ করে। অমিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন; সুতরাং, সামান্য বিপৎপাতে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু মিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন বলিয়া, হঠাৎ কোনও বিপদে তাঁহারা ভীত হন না। পূর্ণমুদ্রা একেবারে জমান সুকঠিন, কিন্তু যদি পয়সার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে তবে টাকা স্বতঃই সঞ্চিত হইবে। যখন বিন্দু-বিন্দু বারি লইয়া অপার জলধির সৃষ্টি হয়, যখন সামান্য সামান্য বালুকণা লইয়া সাগরের উপকূল গঠিত হয়, তখন সামান্য সামান্য বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিলে যে মহান ব্যাপার সঙ্ঘঠিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লোককে টাকা জমাইতে দেখিলে, নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া তাহার দুর্নাম রটাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত নহে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, ধন অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, চাঞ্চল্য, দীর্ঘসূত্রতা, অনবধানতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীনতা কর্ম্ম পণ্ড করিবার প্রধান উপকরণ। পরন্তু দৃঢ়সংকল্প, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কার্য্য "হচ্ছে হবে" করিয়া দীর্ঘসূত্রী ব্যর্থমনোরথ হয়; কিন্তু উদ্যমী পুরুষ সঙ্কল্পিত কার্য্যকে অচিরে সমাধা করিয়া ইষ্টলাভ করে। মিতব্যয়িতা জগতের আশীর্ব্বাদ এবং অপব্যয় অভিসম্পাত স্বরূপ।

এই সকল কারণের জন্য মানবের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অর্থে মিতব্যয়ী হইলে চলিবে না; সময়, সামর্থ্য, অর্থ, আহার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। এগুলির মধ্যে কোনও একটিতে অপব্যয়ী হইলে মানবের সুখের অন্তরায় ঘটে। সকল প্রকার অপব্যয়ের উপরতি মানবের ইহকালে ও পরকালে সুখের কারণ হইয়া থাকে। মিতব্যয়িতায় অভ্যস্ত হইলে মানবকে চিন্তা বা কষ্টের অধীন হইতে হয় না। ইহা দ্বারা মানবের আত্মনির্ভরশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মান, সৌভাগ্য ও কার্য্যকারিত্ব শক্তি অচিরে মানবকে আশ্রয় করে। অভ্যুন্নতি অভ্যুদয়কাঙ্ক্ষী মানবের সামান্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। সংসারে কিছুই হেয় নহে। সামান্য সামান্য করিয়াই নর-নারীর উন্নতি হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় না করিলেই, মিতব্যয়িতা স্বতঃই আয়ত্ত হইয়া থাকে। নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে হইলে, "ইহা আমার আবশ্যক কিনা" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মনে জাগরিত হয়, কিন্তু ধারে ক্রয় করিলে এসকল প্রশ্ন উঠে না। ধার অপরিমিততার জনক। সংসারে অভাবের যতই বৃদ্ধি করিবে, ততই সুখ দূরে পলায়ন করিবে। যাহার অভাব যত কম সে ততই সুখী। খরচের একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই আন্দাজ-মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি সেই খরচে সঙ্কুলান না হয়, তবে কোন্ বিষয় হইতে খরচের হ্রাস করিলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। এইরূপে অভাবের হ্রাস করিলে খরচেরও হ্রাস হইবে।

শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্বামীর সহিত ব্যয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করা স্ত্রীর উচিত। খরচের জন্য কতকগুলি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেই, কিছু দিনে জানিতে পারিবে যে,

তদ্দ্বারা তোমার সকল খরচ চলিবে কিনা।

মানব যদি দৈববশে নির্ধন হইয়া পড়ে তবে তাহার কোনও দোষ নাই, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সঞ্চিত ধনের হ্রস্বতা সম্পাদন করে, তবে তাহার মত হস্তিমূর্খ জগতে আর নাই। অনেকে লোক-দেখান বাবু অথবা ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দরিদ্রতার কবলে পতিত হইয়াছে। বরং সংসারে নগণ্য থাকাও শ্রেয়, পরন্তু লোক-দৃষ্টিতে ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দেউলিয়া হওয়া উচিত নহে। ধনহীন হইয়া সংসারে থাকা যে কি জ্বালা, তাহা যাহারা ভুগিয়াছে তাহারাই জানে।

আয় বুঝিয়া ব্যয় করা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অন্য একটি উপায়। আয়াতিরিক্ত খরচের অনিবার্য্য ফল ঋণ। ঋণগ্রাহীর দিবস-রজনী অশান্তিতে যায়। ঋণ গ্রহণ করার দুর্গুণ অনেক। প্রথমতঃ, ঋণী ব্যক্তিকে লোকনিন্দার ভাজন হইতে হয়, দ্বিতীয়তঃ, সুদ দিতে দিতে অস্থির হইতে হয়, তৃতীয়তঃ, অবমাননা তাহার নিত্য-সহচর হইয়া পড়ে, চতুর্থতঃ, ঋণগ্রাহীর মিথ্যা কথার অভ্যাস জন্মে, পঞ্চমতঃ, ঋণদাতার নিকট ঋণী ব্যক্তিকে সদাই ত্রস্ত থাকিতে হয় এবং ষষ্ঠতঃ, সমগ্র পরিবারের উপর বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা হয়। ঋণগ্রহণের ত এত জ্বালা, ঋণ লইবার পূর্ব্বেও যে জ্বালা নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। লোকের স্তাবকতা না করিলে ঋণ পাওয়া দুর্ঘট; সুতরাং সেই স্তাবকতা করিতে যাইয়া নিজের সময় নষ্ট ত হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত নিজেকে হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার উপরি ত মুখনাড়া না দিয়া লোকে কর্জ দেয় না; সুতরাং তাহাও নীরবে সহ্য করিতে হয়।

যত আয় তত ব্যয় করিবে না, বরং আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। সামান্য আয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে, সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক। মিতব্যয়িতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তি জাতির কেন্দ্রস্বরূপ। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কি ধনী, কি গরীব, সকলেরই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অবশ্য ব্যয় করিতেই হইবে। কিন্তু তা বলিয়া অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে। বারিধারার ন্যায় আকাশ হইতে অর্থ পতিত হয় না। অতিকষ্টে তাহা সঞ্চয় করিতে হয়। দিনে যদি এক আনাও জমাইতে পারে তাহাও শ্রেয়। এইরূপে ৩০ বা চল্লিশ বৎসরে তোমার অনেক টাকা জমিয়া যাইবে। অলঙ্কার গড়াইয়া যাহারা মনে করেন যে, কিছু সঞ্চয় করা গেল, তাহারা ভ্রান্ত। স্বর্ণকারের মজুরী ও অলঙ্কারের পান বাদ দিলে, আসল হইতে অনেক টাকা কমিয়া যায়। ইহার উপর কিছুদিন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিতে যাইলে, তাহার যথার্থ মূল্য হইতে আরও কিছু হ্রস্বতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অলঙ্কার গড়াইয়া সঞ্চয় করা অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে মূলধন ত বজায় রহিলই, অধিকন্তু সুদ আসিতে লাগিল। এইরূপ সঞ্চয়ই যথার্থ সঞ্চয়-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের আয় অধিক, তাহারা ধনী নহে, বরং যাহারা আয় হইতে সঞ্চয় করে তাহারাই যথার্থ ধনী।

অগ্রহায়ণ ১৩২৩

শ্রী হেমন্তকুমারী দেবী।

# গৃহিণীপণা

সংসারে গৃহিণীপণা অতিশয় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। একটি রাজ্যের শাসনকর্ত্রীর স্বকীয় রাজ্য-পরিচালনে যত ক্ষমতা, যত পরিশ্রমশীলতা, যত বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন, একটী গৃহিণীর সংসার-পরিচালনে, ততখানি না হউক, অল্প পরিমাণেও যে সেই ক্ষমতা, সেই শ্রমশীলতা ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সংসারের সকলকে একটা পরম স্নেহময় বন্ধনে বন্ধন করিতে হইবে, সকলের অভাব অভিযোগের দিকে সতত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সংসার পরিচালনার্থ সংগৃহীত দ্রব্যাদির এরূপভাবে গুছাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে কোনরূপ অপব্যয় হইয়া সংসারকে অভাবের গ্রাসে মুহূর্তের জন্য ফেলিতে না পারে, কোন দিক্ হইতে অপরিচ্ছন্ন ভাব সংসারকে কোনরূপ মলিন করিতে না পারে, কোনরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস সংসারকে না অভিশপ্ত করে, কোনরূপ অপবিত্রভাব সংসারকে না দূষিত করে, কোনরূপ জড়তা সংসারকে না শিথিল করে, কোনরূপ ত্রুটীবিচ্যুতি সংসারকে না অপূর্ণ করে, কোন বিশৃঙ্খলা সংসারকে না বিচ্ছিন্ন করে। এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপই হইল গৃহিণীপণা। নতুবা গৃহিণীর অভিমানমাত্র লইয়া প্রতিপদে সংসার-পরিচালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করা কেবল লোক-হাসান ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেরূপ গৃহিণীকে কোনরূপেই পাকা গৃহিণী বলা যায় না।

অধিকাংশ স্থলে সংসারের শ্বশ্রূ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া, অথবা কোন ক্ষমতাপ্রাপ্তা অধিকবয়স্কা আত্মীয়া, যেমন পিতৃস্বসা, পিতৃব্যপত্নী বা মাতুলানী বা ঐরূপ অপর কোন স্ত্রীলোক গৃহিণী পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনিই গৃহিণী পদ প্রাপ্ত হউন না কেন, তাঁহার বুঝিতে হইবে যে সংসারের ভার তাঁহার উপর যখন ন্যস্ত আছে, তখন যাহাতে কোনরূপে না সংসারের একটী ত্রুটী লক্ষিত হয়, তাহাই করিতে হইবে। ইহা করিতে গেলে, প্রথমতঃ তাঁহার স্বার্থচিন্তাকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করা কর্ত্তব্য। সমস্ত সংসারকে আপনার বলিয়া ভাবিতে হইবে বটে, কিন্তু নিজের জন্য যে একটা চিন্তা সেটা ত্যাগ করিতে হইবে। মনে করুন, গৃহিণীর হস্তে সংসারের উপযোগী চাউল, ডাইল, তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য অর্পিত হইল। গৃহিণী যদি ভাবেন যে, 'আমি ইহা যেরূপভাবেই ব্যবহার করি না কেন, অভাব হইলেই ত পাইব, তখন আর অত হিসাব করিয়া ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই,' এবং এই ভাবিয়া সেই দ্রব্যাদির অপব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহার পর সংসার চলুক আর নাই চলুক! সংসারের জন্য যাহারা রোজগার করিতেছে, তাহাদের অধিকতর পয়সা রোজগারের জন্য প্রাণ যাউক আর নাই যাউক! অথবা যৌবনকালে যে সময় তাহারা পরিশ্রম করিতে সমর্থ, সেই সময় সংসারের জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া পরিণামে বৃদ্ধাবস্থায় রিক্তহস্ত হউক আর নাই হউক—এই সকল চিন্তা মনে আর স্থানই দিলেন না! তাহা হইলে সংসারে প্রচ্ছন্নভাবে একটা অসন্তোষ বহ্নি উৎপাদিত হয়, যাহা দুই দিন পরে প্রচ্ছন্নভাব ত্যাগ করিয়া ভীষণ সংসারবিধ্বংসী রূপ ধারণ করিতে পারে!

আবার কোন গৃহিণী প্রবল স্বার্থচিন্তার বশীভূত হইয়া নিজের নিকট অর্পিত সাংসারিক দ্রব্য সকল গোপনে পল্লীতে বিক্রয় করিয়া টাকা জমাইতে থাকেন; ইহাতে সংসারের অন্য লোকের অসুবিধা, ক্লেশ বা ক্ষতির কথা একবার ভাবিলেনও না। ইহাতেও একটা

অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য বলিতে হয়, গৃহিণীকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া আপনাকে সমস্ত সংসারের হিতাকাঙ্খিনী মনে করিয়া সংসার-পরিচালন করিতে হইবে। এ বিষয়ে তিনি নিজের বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিবেন। কোনও অপর সংসারের স্বার্থপরা গৃহিণীর পরামর্শ আদৌ শুনিবেন না। কারণ, অনেক স্থলে দেখা যায়, উপরিউক্ত দোষগুলি গৃহিণীর নিবুর্দ্ধিতাদোষেও ঘটিয়া থাকে। গৃহিণী নিবুর্দ্ধিতাবশে সংসারের তাল সামলাইতে না পারিয়া অনেক সময় অপব্যয় করিয়া ফেলেন, আবার অদূরদর্শিতা-দোষে অথবা কেবলমাত্র অন্যের পরামর্শে অকারণে হস্তে টাকা জমাইতে গিয়া ঐরূপ গোপনে গোপনে সাংসারিক দ্রব্যের রপ্তানী আরম্ভ করেন। এইজন্য নিবুর্দ্ধিতাও গৃহিণীর পক্ষে আদৌ উপযোগিনী নহে। এই নিবুর্দ্ধিতার সুবিধা পাইয়া পল্লীবাসিনী সুচতুরা অপর রমণীও অনেক সময় তাহার নিকট হইতে ভোগা দিয়া অনেক দ্রব্য আদায় করিতে পারেন। তাহাতেও সংসারের অস্বচ্ছলতা অবশ্যম্ভাবিনী।

তাহার পর গৃহিণীর অপর এক দোষ পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিনী গৃহিণী সংসারে একজনকে খুব সুনজরে দেখিয়া সংসারের বাছাই বাছাই দ্রব্য তাহাকে কি তাহার স্ত্রী পুত্রগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন, এবং অপর কাহাকে কুনজরে দেখিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মোটা মোটা দ্রব্য দিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে যেন সংসারে আগাছা মনে করিয়া যত্ন করা দূরে থাকুক, নানারূপ উৎপীড়ন করিতেই লাগিলেন। ইহাতে সংসারে পরস্পরের একটা ঈর্ষাজনিত মনোমালিন্য উৎপাদিত হয় এবং একটা দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইয়া সুখের সংসার একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই পক্ষপাতিত্ব কখনও কখনও স্বার্থবিজড়িত হইয়া থাকে। যে বেশী রোজগার করে, তাহার মন রাখিবার জন্য গৃহিণী তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন. এবং যে অল্প রোজগার করে, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ইহাতে অধিক রোজগারী ও অল্পরোজগারীর মধ্যে একটা প্রবল বিদ্বেষ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিক রোজগারী ব্যক্তি গৃহিণীর সহানুভূতিরূপ অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সংসারে অধিক অর্থদানরূপ নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। ফলে অল্পরোজগারীর উপর নির্য্যাতন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সুখের সংসারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, শেষে সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস তুমুল কলহে পরিণত হইয়া কঠোর মর্ম্মব্যথার সহিত সংসারের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। সকল সময়েই যে গৃহিণী স্বার্থপরতাবশে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে একটা অন্ধ স্নেহও তাঁহার এইরূপ পক্ষপাতিত্বের কারণস্বরূপ হয়। ধরুন, একটী সংসারে তিনজন ভ্রাতা আছেন। গৃহিণীর চক্ষুর টান পড়িল ছোট ভাইটীর উপর! তিনি সেই সুনজরের খাতিরে ছোটভাইটীকে সোনার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে 'সন্দেশ' খাইতে দেন, অপর সকলকে খাইতে দেন 'ছোলাগুড়'! তিনি তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে দেন 'ঘনদুগ্ধ', অপর সকলকে খাইতে দেন 'জলদুধ'! তাহার স্ত্রীর অসুখ হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করেন, অপরের অসুখ হইলে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে বিরক্তা হন। তাহার পুত্রকে অনবরত কোলে লইয়া আদর করেন, অপরের পুত্রকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করেন না। এইরূপ আচরণের তারতম্য উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে যে একটা ঘোরতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া সংসারমহীরূহকে ক্রমশঃ উন্মূলতার পথে লইয়া গিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ

নাই। ইহার উপর আবার স্বার্থসম্বন্ধ জড়িত থাকিলে কদাচরিত ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে অভিমানের উষ্মা অতি প্রবলভাবে উৎপন্ন হইয়া সংসার-মহীরূহে অতি ঝটিতি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। মনে করুন, যে ছোট ভাইটী গৃহিণীর সুনজরে পড়িয়াছে, সে বেশী রোজগার করে না। কিন্তু যাহারা কুনজরে পড়িয়াছে, তাহারা বেশী রোজগার করে। এরূপ অবস্থায়, সেই অধিক উপার্জ্জনকারী ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণের সহিত ভাবিল যে, "আমাদের উপার্জ্জন অধিক, আমরা সংসারে টাকা দিই বেশী, অথচ আমাদের প্রতি এরূপ অযত্ন! আমরা ইহা সহ্য করিব কেন? অতএব আমাদের আর এক সংসারে প্রয়োজন নাই।" তাহাদের এই অভিমানপূর্ণ চিন্তার বশে শুধু যে সংসার ভগ্ন হইল, তাহা নহে, সেই পক্ষপাতদোষযুক্তা গৃহিণী তাহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া পূর্ব্বেকার সম্মানের পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন, এবং সুখের জীবন হারাইয়া একটা ক্লেশবহুল জীবন ধারণ করিতেও হয়ত বাধ্য হইলেন।

আর একপ্রকার পক্ষপাতিত্ব গৃহিণীদিগের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেটাকে বলে "নিজের টান"। গৃহিণী নিজের ছেলেকে আপনার বস্তু বলিয়া সুনজরে দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী কি পুত্রের সহিত একটু দূরসম্বন্ধ বলিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্র যেমন "নিজের টান", পুত্রের নিকট পুত্রের স্ত্রী-পুত্রও ত তেমনি "নিজের টান"। সুতরাং পুত্র তাহার স্ত্রীপুত্রগণের এইরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিবে কেন? কাজেই এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, এইরূপ সহিয়া শেষে আর সহ্য করিতে পারিল না। গৃহিণীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। পুত্রের এইরূপ অনাকাঙ্খিত কদাচরণ দেখিয়া গৃহিণীর বৈরনির্য্যাতনসংকল্পে পুত্রবধূ ও পৌত্রদিগের উপর আরও অত্যাচার বাড়াইয়া দিলেন! ফলে পুত্রের তাঁহার প্রতি কদাচরণ আরও বাড়িয়া গেল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস, অভিমান ও অভিশাপ সুখের সংসারকে একেবারে শ্মশানে পরিণত করিতে বসিল।

এই "নিজের টান" অনেক সময়ে গৃহিণীদিগকে পুত্র পুত্রবধূর স্নেহ এড়াইয়া কন্যা জামাতার দিকে চালিত করিয়া থাকে। ভ্রান্ত গৃহিণী মনে করেন যে পুত্র পুত্রবধূর প্রেমে পড়িয়া আর তাঁহাকে সেরূপ ভক্তি করে না, ভক্তি করিতে পারে না। কাজে কাজেই, তিনি সপত্নীক পুত্রকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, আর তাঁহার যত টান পড়িল—তাহার নিজের গর্ভসম্ভূতা কন্যা ও তাহার স্বামীপুত্রের উপর। ফলে সংসারের যত ভাল ভাল জিনিস তিনি পুত্র ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে ভোগ করিতে না দিয়া, গোপনে কন্যা জামাতার নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। গোপনে পুত্রবধূ একথা পুত্রকে জানাইল। পুত্রের গৃহিণীর প্রতি দারুণ অভিমান জন্মিল। ফলে 'খুটীনাটি' 'খুটীনাটি' হইতে হইতে সংসারে এমন একটা জ্বালাময়ী অশান্তি উৎপন্ন হইল, যাহার হয় ত প্রতিবিধান করা সুসাধ্য নহে। যখন আবার জননী ছাড়া অপর কেহ গৃহিণীর পদ অধিকার করেন, যেমন জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া, পিতৃস্বসা, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি, তখন এই "নিজের টান", আরও প্রবলরূপে লক্ষিত হইয়া আরও অধিক সংসারভঙ্গের কারণ হইয়া থাকে। তাই বলি কি স্বার্থপরতাবশে, কি অন্ধস্নেহে, কি "নিজের টানে" কোনরূপেই পক্ষপাতিত্ব করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে পক্ষপাতিত্বের অতীত থাকিয়া সকলের প্রতি সমান সস্নেহ ব্যবহার করিতে হইবে, সকলের অভাব অভিযোগের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, সকলের সুখের জন্য সমান যত্ন করিতে হইবে। তাঁহার বুঝিতে হইবে, সকলেই তাঁহার

স্নেহ সমভাবে পাইবার আশা করে, সুতরাং তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে তারতম্য ঘটিলেই পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মিতে পারে,—পরস্পর ঐক্য নষ্ট হইতে পারে।

তাহার পর গৃহিণীর আর একটী দোষ—তাঁহার সংসার পরিচালনে অক্ষমতা। গৃহিণীর আত্মদৌর্ব্বল্য-বুদ্ধিই এই অক্ষমতার হেতু। সংসার পরিচালনে একটী মহা কঠিন কাজ হইতেছে পরের কন্যা—সংসারে বধূদিগকে সুস্থরূপে চালিত করা। এই কার্য্য করিতে গেলে পূর্ব্বেই আপনাকে তাহাদিগকে অপেক্ষা শক্তিশালিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং তাহাদিগের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ বা ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার নিজের গুরুত্ব বজায় থাকে। নতুবা তাহাদিগের প্রতি লঘুতার সহিত ব্যবহার করিলে নিজের 'রাশ' রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে তাহারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার সুযোগ পায়, এবং ঈদৃশস্থলে সংসারে গৃহিণীর গুরুত্বের অভাবে অসংবৃতরশ্মি অশ্বগণের মত বধূগণ ক্রমশঃ স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে একটা বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত করিয়া থাকে।

এই বধূদিগকে স্ববশে আনিতে গেলে কেবল যে "রাশভারী" হওয়া দরকার, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রীতির বন্ধন চাই, যাহা দ্বারা তাহাদিগকে অনুক্ষণ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, অন্তঃকরণে অধিক পরিমাণে দয়া-মমতা থাকা চাই, যাহা দ্বারা পরের কন্যা হইলেও তাহাদিগকে নিজের বলিয়া ভাবিয়া তাহাদিগের সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী হইতে হইবে। কেবল কর্ত্তব্যবোধেই এইরূপ হইতে হইবে, নতুবা তাহারা যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না করে যে, তাহাদের স্বামীরা উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া গৃহিণী তাহাদের তোষামোদ করিবার জন্য এইরূপ হইতেছেন। তাহা হইলেই ত নিজের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইল—তাহা হইলেই ত সংসারে গোলযোগ উপস্থিত হইল! আমরা দেখিতে পাই অনেক গৃহিণী পরম স্নেহাস্পদ বধূগণের সহিত এক বিজাতীয় পরভাব পোষণ করিয়া অবলাসুলভ অতিরঞ্জন দ্বারা পুত্রদিগের নিকট বধূগণের দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহাতে আমরা পুত্রদিগের খুব 'সু' হইতেছি। কিন্তু পুত্রদিগেব কর্ণ যে প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনীদিগের নিন্দাবাদ শ্রবণে সর্ব্বদাই বধিরায়মাণ, ইহা তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশে বুঝিতে পারেন না। এইজন্য তৎকর্ত্তৃক বধূদিগের নিন্দাকীর্ত্তন প্রায় বিপরীত ফলপ্রসূই ঘটিয়া থাকে। কারণ, তাহাতে বধূগণের ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের উপর একটী ক্রোধভাব হয়, যাহার ফলে তাহারা তাঁহাদের প্রতি আর ভক্তি করিতে চাহে না—তাঁহাদিগকে মানিতে চাহে না এবং সুবিধা পাইলে তাঁহাদের কদাচরণের অপমানকর প্রতিশোধ লইতেও ছাড়ে না। এবং কর্ণেজপা বধূদিগের উত্তেজনায় পুত্রগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি বীতরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া থাকে। ইহা যে গৃহিণীদিগের দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, গৃহিণী সংসারের সকল কার্য্য করিতেছেন, আর বধূগণ খট্টার উপর বসিয়া আরামসুখ উপভোগ করিতেছেন। ইহাতে কেবলমাত্র বধূগণের দোষ দিলে গৃহিণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। ইহা অনেক স্থলে গৃহিণীর দৌর্ব্বল্যদোষেই ঘটিয়া থাকে। গৃহিণী স্বকীয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ বধূদিগের প্রতি কোনরূপ আদেশ করিতে না পারিয়া, নিজেই কার্য্য করিতে থাকেন। অনেক স্থলে আবার বধূগণকে পল্লীসমাজে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার প্ররোচনাতেও নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহিণী সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ বসাইয়া রাখেন। আবার কখনও কখনও বা পাছে সংসারের কর্ম্ম হাতে পাইলে বধূগণ সংসারের

সকল অধিকার ক্রমশঃ দখল করিয়া বসে, এই ভয়ে তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নিজের হাতেই সমস্ত সংসার ভার রক্ষা করিয়া থাকেন। এ সমস্তই গৃহিণীর দৌর্ব্বল্য। কারণ গৃহিণী যদি বুঝেন, 'আমিই এই সংসারের পরিচালিকা এবং সকলের অপেক্ষা শক্তিশালিনী, এবং সকলের উপরে আমার আসন', তাহা হইলে ত বধূদিগকে আদেশ করিতেও তাঁহার সঙ্কোচ হয় না, তাঁহার অধীন পরমস্নেহাস্পদ বধূগণকে বিদ্বেষবশে অসাধু প্রতিপন্ন করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না, কিংবা শক্তিলোপের আশঙ্কায় বধূদিগকে সংসার হইতে দূরে রাখিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না।

তাহার পর গৃহিণীদিগের আর একটী দোষ দেখিতে পাই, সেটী ধৈর্য্যহীনতা। যাহাকে একটী জটিলতাময় বিভিন্ন প্রকৃতির লোকপূর্ণ নানা দায়িত্বসঙ্কুল সংসার পরিচালনা করিতে হইবে, তাঁহার কত না সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দিক্ তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। তাঁহাকে কতদিকে তাল সামলাইতে হইবে, তাঁহার কি কথায় কথায় অধীরা হইলে চলে? সংসারের সমস্ত দ্রব্যের হিসাব-মত ব্যবহার করিতে বিরক্ত হইলাম, সমস্ত লোকের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতে বিরক্ত হইলাম, সংসারস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির দুইজনের মধ্যে পরস্পর বিবাদের সূচনা হইলে তাহার প্রতিবিধান করিতে বিরক্ত হইলাম, অসুখ-পীড়িত সংসারের সেবাশুশ্রূষার ভার লইতে বিরক্ত হইলাম, বুভুক্ষু শিশুদিগের ক্রন্দনরোল শুনিতে বিরক্ত হইলাম, বাক্‌শক্তিহীন সর্ব্বথা দয়ার্হ গৃহপালিত পশুদিগের তত্ত্বাবধান করিতে বিরক্ত হইলাম, সংসারের সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য যেটুকু পরিশ্রম, যেটুকু চিন্তাশীলতা, যেটুকু বিচারনৈপুণ্যের প্রয়োজন—তাহা ঘাড়ে পাতিয়া লইতে বিরক্ত হইলাম,—এই সকল হইল গৃহিণীর অধৈর্য্যের পরিচায়ক। এই অধীরা নারী একেবারে গৃহিণীপদের উপযুক্তাই হইতে পারে না, এবং যদি বা গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে পদে পদে সংসারে অশান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহিণীর ত শুধু অধীন স্ত্রী পুরুষদিগকে আদেশমাত্র করিলেই গৃহিণীপণা হইল না। রোগে, শোকে, কি অন্য কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে সংসারক্ষেত্র যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, গৃহিণীকে তখন বদ্ধপরিকর হইয়া পাঁচজনের চিন্তা একজনে করিয়া, অভয়দায়িনী জগদ্ধাত্রীরূপে সংসারকে রক্ষা করিতে হয়। তাঁহাকে সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত সংসারস্থ সকলের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া এরূপভাবে প্রত্যেকের সন্তোষ বিধান করিতে হইবে, যাহাতে অতৃপ্তি আসিয়া ক্ষণকালের জন্য বৈষম্য উৎপাদন না করে; এবং নিজের সুখের জন্য কিছুমাত্র অধীরা না হইয়া সকলের সুখই আপনার সুখ মনে করিয়া পরম সহিষ্ণুতাসহকারে সুদক্ষ কর্ণধারের মত সতত বিক্ষোভশীল সংসারসমুদ্রে শান্তিতরীটি এমন স্থির করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহা মুহূর্ত্তকালের জন্যও না আন্দোলিত হয়। ইহাই ত হইল গৃহিণীপণা, নতুবা কেবল স্বীয় কর্ত্তৃত্ব রক্ষার জন্য গৃহিণীপদ লইলে প্রতিপদে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, এবং সেই অনুভবশূন্যা গৃহিণী সংসারে আরও অশান্তিরই কারণ হইয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন গৃহিণীকে যখন লোকচরিত্র লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, তখন তাঁহার চরিত্রে কোনরূপই দোষ থাকিলে হইবে না। তিনি সর্ব্বদা মনে করিবেন যে, তাঁহাকে দেখিয়াই এই সংসারের অপর স্ত্রীগণ নিজ নিজ চরিত্রগঠন করিবে। অতএব তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ দোষ থাকিলে, অন্য সকলেরও চরিত্রে সেইরূপ দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে। এই মনে করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শচরিত্রা হইতে হইবে। কোন স্ত্রীলোক

একেবারেই গৃহিণী হয় না। লজ্জাপূর্ণ বধূজীবন কাটিলে তবেই গৃহিণীপদ অধিকার করে। ভাল গৃহিণী হইতে গেলে তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষণীয়, সবই এই বধূজীবনে ঐ গৃহিণীর নিকট শিখিতে হইবে। সুতরাং কেবল সংসার-পরিচালনামাত্র করিয়াই গৃহিণীর কার্য্য পর্য্যবসিত হইল না, তাঁহাকে আবার শিক্ষয়িত্রীর পদও গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষয়িত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই আদর্শচরিত্রা হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রের অল্পমাত্র দোষও কুফলপ্রদ।

স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ বলিতে সাধারণতঃ ব্যভিচার বুঝায়। আমি কেবল 'ব্যভিচার' অর্থে চরিত্রদোষের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বে যে অপব্যয়িতা, পক্ষপাতিত্ব, লঘুত্ব, স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলিও স্ত্রীলোকের চরিত্রগত দোষ। তদ্ভিন্ন আরও অনেক দোষ আছে। যথা—লোভপ্রবণতা, ভোজনপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, নির্দ্দয়তা, অসন্তোষশীলতা, পরনিন্দাপরায়ণতা, ক্রোধশীলতা, বিদ্বেষিতা, কলহপ্রিয়তা, অধর্ম্মশীলতা, নিলর্জ্জতা, গর্ব্ব বা আত্মম্ভরিতা, একলতানিষ্ঠা, অপরিচ্ছন্নতা, আলস্য, অভিমান ইত্যাদি। স্ত্রীলোকগণ গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই যে এই দোষ সকলের অধিকারিণী হয়, তাহা নহে। এগুলি তাহাদের প্রাকৃতিক দোষ। তাহারা উক্ত দোষযুক্ত মাতাপিতার নিকট হইতে উহাই জন্মসূত্রে কিছু কিছু পায়, বাল্যে কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাব-দ্বারা অথবা দূষণীয় সংসর্গেও উহার কিছু কিছু পায়,—ক্রমে বয়সের পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলি স্বভাবগত হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি পরিবর্তন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সেইজন্য ভদ্রবংশের মেয়েকে বধূরূপে গৃহে আনিবার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কারণ ভদ্রবংশের মেয়েরা গুণসম্পন্ন পিতামাতার নিকট হইতে জন্মসূত্রে নানাগুণের ত অধিকারিণী হয়ই, তদ্ব্যতীত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ-দ্বারা তাহাদের সেই গুণগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে গুণই তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। এই ভদ্রঘরের মেয়েরাই সংসারে বধূরূপে প্রবেশলাভ করিয়া ভাল গৃহিণীর হাতে পড়িয়া এক একজন সদ্‌গৃহিণী হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি আবার এইরূপ সৎকুলজাতা সুবিনীতা কন্যা একটি অসৎ প্রকৃতির গৃহিণীর অধীনে পতিতা হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহিণীর দুষ্ট সংসর্গের প্রভাবে তাহার চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাকে সদ্‌গৃহিণীর মহনীয় পদাধিকার হইতে বঞ্চিতা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। বরং দেখিতে পাওয়া যায় অনেক অসৎকুলজাতা অসৎ প্রকৃতি কন্যা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়া সদ্‌গৃহিণীর সংস্পর্শে নিজের আবাল্যসঞ্চিত দোষনিচয় যথাশক্তি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত গৃহিণীর সদ্‌গুণাবলী একে একে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে ক্রমে বয়সে একজন ভাল গৃহিণী হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। এই সকল কারণে বুঝা যাইতেছে, সদ্‌গৃহিণী কিরূপ সংসারের হিতকারিণী। আর সংসারকে সদ্‌গৃহিণী দ্বারা বিভূষিত রাখিতে হইলে বিধিসঙ্গতভাবে ভদ্রঘরে বিবাহ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রমাগত একটী সদ্বধূ ও সদ্‌গৃহিণী বর্ত্তমান থাকিয়া সংসারকে অনুক্ষণ নির্দোষ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখে।

পূর্ব্বে গৃহিণীর যে সকল দোষ থাকিলে সংসারে নানারূপ অশান্তি হইতে পারে, তাহার কতকটা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। একেবারে সমস্ত দোষের সেইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাহা হইতে বিরত হইয়া মোটামুটি এই বলি যে, গৃহিণীর লোভপ্রবণতা ও ভোজনপ্রিয়তা থাকিলে গৃহিণীর আত্মতৃপ্তির খাতিরে অপর সকলের তৃপ্তিলাভ ঘটিয়া উঠে না। তাহার ফল সংসারের অশান্তিকর

অসন্তোষ। গৃহিণীর বিদ্বেষিতা বা খলতা ও কলহপ্রিয়তা থাকিলে, তাঁহার নিজের গর্ভপ্রসূত পুত্রদিগকে বাদ দিলেও পুত্রবধূদিগের সহিত মনোমালিন্য ও কলহ অবশ্যম্ভাবী। তাহাতেও সংসারে অশান্তি সুনিশ্চিত। আবার এই দুইটী দোষ কেবল নিজ সংসারেই অন্তর্লীন নহে;—পল্লীস্থ অপর সংসারেও প্রসারিত হইয়া সংসারে সংসারে বিবাদ লাগাইয়া ঘোরতর অসুখের কারণ হইয়া থাকে। পরনিন্দাপরায়ণতা, ঈর্ষ্যা বা পরশ্রীকাতরতাতেও উক্তরূপ কুফল ঘটিয়া থাকে। একলতানিষ্ঠা থাকিলে গৃহিণী নিজেই সংসারের অপর কাহারও সহিত মিশিতে চাহেন না, সুতরাং অপর সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ফলে সংসারে অশান্তি উৎপন্ন হইতে পারে। নির্দ্দয়তা ও ক্রোধশীলতা থাকিলে তিনি সংসারে কাহারও প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন না, কাজে কাজেই সকলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়ায় সংসারে শান্তির অভাব ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গৃহপালিত অবোধ পশুগণ বারংবার তৎকর্তৃক নির্য্যাতিত হওয়ায় সংসার-মধ্যে পুণ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। গৃহিণীর অসন্তোষশীলতা থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকিয়া সংসারে অনবরতই গালিগালাজ, শাপ, অভিমান ও হাহাকার করিতে থাকেন, তাহাতে সংসারে কাহারও চিত্ত সুখ প্রাপ্ত হয় না। গৃহিণীর অপরিচ্ছন্নতা ও আলস্য থাকিলে তাঁহার অনুকরণে সকলেই ক্রমে অপরিচ্ছন্নতা ও আলস্য অবলম্বন করিতে থাকে; অপরিচ্ছন্নতার ফলে সংসার অস্বাস্থ্যের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং একজন না একজন ক্রমাগত রোগপীড়িত থাকায় সংসারে অধিকতর ব্যয় ও অকালমৃত্যু জনিত অশান্তি ঘটিয়া থাকে। আর আলস্যের ফলে সকলেই পরিশ্রমবিহীন হইয়া বিশ্রামলাভে তৎপর হওয়ায়, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বেতন দিয়া পৃথক লোক নিযুক্ত করিতে সংসারে ব্যয়াধিক্যের পরিসীমা থাকে না। গৃহিণীর নিলর্জ্জতা ও অধর্ম্মশীলতা থাকিলে অপর স্ত্রীগণ তাঁহার অনুকরণ করায় সংসারে নিলর্জ্জতা ও অধর্ম্মশীলতার প্রাবল্য ঘটে, তাহাতে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ অনেক কুফল ঘটিতে পারে। গৃহিণীর গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা বা 'হামবড়ভাব' থাকিলে তিনি নিজের ভাবেই উন্মত্তা থাকিয়া নিজে যাহা করেন তাহাই ভাল মনে করেন, পরে যাহা করে তাহাতে আদৌ আমল দেন না। এই সকল আত্মম্ভরি গৃহিণীদিগের বধূগণ কোন কার্য্যেই ইঁহাদিগের হাসিমুখ না দেখিয়া বা উৎসাহ না পাইয়া ক্রমশঃ সংসারে উদাসীনতা অবলম্বন করে, এবং গৃহিণী ও বধূদিগের মধ্যে মনের খোলসা ভাব না থাকায় সংসারে নিয়তই অশান্তি উৎপন্ন হয়।

এই প্রবন্ধে গৃহিণীদিগের দোষের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। গৃহিণীদিগের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই বটে, কিন্তু এই দোষগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহাদের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহা আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দোষের বিপরীত ভাবগুলিই এক একটি গুণ। এবং সেই গুণাবলীর উল্লেখ করিলে বলিতে হয়, যে মিতব্যয়িতা, বুদ্ধিমত্তা, অপক্ষপাতিত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, গুরুত্ব, নিঃস্বার্থতা, সহিষ্ণুতা, নিলোর্ভতা, দয়ালুতা, মমতাবত্তা, সন্তোষশীলতা, মিষ্টভাষিতা, শান্তিপ্রিয়তা, পরদুঃখকাতরতা, বিনয়, পরিশ্রমশীলতা, নিরভিমানতা, লজ্জাশীলতা, সামাজিকতা, আতিথেয়তা এই সকলই গৃহিণীদিগের গুণ। যে সংসারে গৃহিণীর এই সকল গুণ অধিক থাকে, সেই সংসার অধিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়। গুণবতী গৃহিণী

সংসারের শ্রীস্বরূপা, তাঁহার আলোকে সমস্ত সংসার সমুজ্জ্বল থাকে, তাঁহার মাধুর্য্যে সমস্ত সংসার মধুময় থাকে, তাঁহার কর্তৃত্বে সমস্ত সংসার সনাথ থাকে, তাঁহার মহিমায় সমস্ত সংসার গৌরবান্বিত থাকে। বঙ্গের ঘরে ঘরে এই সদ্‌গৃহিণীর আবির্ভাব হউক, এই সকল বঙ্গকুললক্ষ্মীগণের শান্তিপূর্ণ জীবনে বঙ্গীয় সংসার চিরশান্তিময় হইয়া থাকুক।

ভাদ্র ১৩২৬ — শ্রী ভবভূতি বিদ্যারত্ন।

## বঙ্গ-বধূ

মধুর স্বপ্নঘোর তন্দ্রাজড়িত তরুণী-নয়নে তখনও লাগিয়া আছে; পার্শ্বে কুসুমকোরক সম সুকুমার শিশু শায়িত। সহসা জননীর বক্ষ আচ্ছাদন কোমল ক্ষুদ্র হস্তের তপ্তস্পর্শে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিল। সে স্পর্শে মাতার নিদ্রা টুটিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, গবাক্ষ ভেদ করিয়া প্রত্যুষের পিঙ্গল আভা কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেই আধ আলোক ও আধ-অন্ধকারের খেলায় শিশু যোগ দিতে চাহে। তাই তাহার সেই স্নেহপিপাসু নীরব আহ্বানে তরুণী জননী শিশুর নিকট সরিয়া আসিল;—সঞ্চিত ক্ষীরভারফুল্ল পয়োধর তনয়ের পুষ্পপুটসম ওষ্ঠাধারের মধ্যে বিলীন হইল। তৃপ্তির মাঝে শিশুর লোচন আবার আপনা হইতেই মুদিত হইয়া গেল।

ঊষার আলোকরেখা ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুকুর ও চিত্রপট-শ্রেণী, গৃহকোণে বিলম্বিত রৌপ্যমণ্ডিত যষ্টি ও জলপূর্ণ ধাতুপাত্র হইতে আলোক প্রতিফলিত হইল। লোহিত বর্ণের সিন্ধুকটি আরও লোহিত দেখাইল।—প্রাঙ্গণের আম বৃক্ষের ঘন পল্লবে দেহ আবৃত করিয়া দোয়েল অত ডাকিতেছে কেন? হোক না তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কিন্তু সে কাকলীতে সে কলকোলাহলে যদি খোকা জাগিয়া উঠে! চির নব চির পুরাতন অভ্যাগতের মত যে কিরণচ্ছটা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ত' বিধাতারই আশিস্; কিন্তু শান্ত তরঙ্গসম সুখশয্যায় শয়ান ঘুমন্ত তনয়ের ঘুমঘোর ঐ কিরণস্পর্শে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে? ভাবিতে ভাবিতে তরুণী শিশুর শিথিল ওষ্ঠপুট হইতে অতিধীরে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার পর আরও ধীরে ধীরে উঠিয়া ভিত্তি গাত্রস্থিত স্বর্গগত শ্বশুরের পটের নিম্নে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। নিঃশব্দে গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, আর একবার স্নেহোৎকণ্ঠজড়িত সতৃষ্ণ নয়নে সুপ্ত সন্তানের বদন-পানে চাহিয়া দেখিল, আলোকহীন কক্ষে শায়িত শিশুর মুখখানি নীল সরোবরের বক্ষঃস্থিত ফুল্ল কমলের ন্যায়ই ভাসিতেছে। তাহার ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্য-আভাসটুকু সেই আঁধার কক্ষে স্তিমিত দীপালোকের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষ-দ্বার ও গৃহ প্রাঙ্গণে মঙ্গল-বারি সেচিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি গোময় লিপ্ত হইল। পরে হস্ত ধৌত করিতে করিতে জননী আর একবার উৎকর্ণ হইয়া রহিল—সন্তানের ক্রন্দন আহ্বান শুনিবার জন্য। না সে ত' এখন উঠিবে না, এখনি ত' তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসা হইয়াছে। গতরাত্রের ব্যবহৃত তৈজসপত্র নিপুণ হস্তের ত্বরিত মার্জ্জনে

ঝক ঝক করিয়া উঠিল; দৈনিক যজ্ঞারম্ভোপযোগী কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল, আর অমনি তনয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। এই আহ্বানের জন্য মাতৃহৃদয় যেন এতক্ষণ ক্ষুধিত হইয়া ছিল। বৈশাখের শেষে দিনের আলো যখন স্তব্ধ হইয়া থাকে, বাষ্পাঞ্চলা ধরণীর স্তব্ধ হৃদয় তখন এমনি আকুল উৎকণ্ঠার সহিত মেঘের ডাকের প্রতীক্ষা করে।

এতক্ষণে খোকার পিতামহী গঙ্গাস্নান, জপ-পূজা সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বধূর নিকট গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া যায় নাই শুনিয়া প্রত্যহ সকালে যে বিরক্তি-বাক্য উচ্চারণ করেন, সেগুলি যথারীতি উচ্চারণ করিয়া খোকাকে লইবার জন্য উপবেশন করিলেন। শিশু তখন তৃপ্ত। গিরিশিখর বহিয়া চঞ্চল জলধারা যেমন উপত্যকার উপলখণ্ডে আঘাত করে, মাতৃক্রোড় হইতে আসিবার সময় তেমনই মধুর হাসি হাসিয়া সে স্থুল হস্তদুটি প্রসারিত করিল। তখন নবীন-পুরাতনের অস্ফুট আলাপ আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যুগযুগান্তের প্রাচীন যামিনী-অঙ্ক আলোকিত করিয়া শিশু-তপন হাসিয়া উঠিয়াছিল; মহাকাশের বিশাল হৃদয় ভরিয়া হেম-বিদ্যুৎপ্রভা এখনও হাসিয়া থাকে; প্রাচীন বৃক্ষকাণ্ড ঘেরিয়া প্রতিবর্ষেই নবপল্লব নৃত্য করে। নূতন-পুরাতনের এ আলাপন জগতের চিরন্তনী প্রথা। বৃদ্ধার ক্রোড়ে শিশুর শয়ন সেই প্রথারই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

আবার সংসারে দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হইল। স্নানের পরে শুচিস্মিতা হইয়া বধূ গৃহদেবতা রাধাশ্যামের পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া দিল। তাহার পর রন্ধনের পালা। দুইটি উনুন জ্বালা হইল, শীঘ্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবর আহার করিয়া পড়িতে যাইবে, ক্ষিপ্র-হস্তের ঘন সঞ্চালনে শঙ্খ ও হেম-বলয় শিঞ্জিনী-গুঞ্জন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মর্ম্মপ্রস্তর-সম মসৃণ ভালে চূর্ণকুণ্ডল স্বেদবিজড়িত;—রক্তিম গণ্ড অগ্নিতাপে আরও রক্তিম, তরুণী রমণী এখন অন্নপূর্ণা।

শ্বশ্রূ শিশুকে লইয়া নিকটস্থ বাটীতে গৃহোৎপন্ন কুষ্মাণ্ডের অংশ দিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া দেবর রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল;—তাহার হস্তে পত্র। সে পত্র খুলিয়া দেখার তখন সময় নাই। সময়াভাব না লজ্জার প্রাবল্য? অন্ন প্রস্তুত!—দেবরের সম্মুখে অন্নের পাত্র স্থাপন করা হইল, দেবরের আগ্রহ-অনুরোধ সত্ত্বেও পত্রাবরণ ছিন্ন হইল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক যখন আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, তখন সে পত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ অতিশয় দ্রুত হইলেও, বালক সন্তুষ্ট। দাদার কুশল সংবাদ ও আগমনের দিনকাল জানিয়া লইয়া প্রফুল্লচিত্তে বালক যখন চলিয়া গেল, তখন পত্রখানির উপর আর একবার ব্যগ্র দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বধূ সেই সুদূরাগত বন্ধুকে সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিল। আজ শুভদিন, প্রভাতের বার্ত্তা বড়ই মধুর।

ক্রমে শ্বশ্রূর রন্ধনের আয়োজন, সন্তানের দুগ্ধ-জ্বাল, বাটীর অবশিষ্ট প্রাণী কয়টির ভোজন ও আহার-পাত্র পরিষ্কার যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর তনয়কে স্তন্যদান করিবার সময় বিশ্রাম। পাড়ার সমবয়সী সখীর দল কেহ আসে নাই। বধূ তনয়কে আজ তাহার পিতামহীর নিকটে রাখিয়া ছিন্ন-বসন-সংস্কার ও সন্তানের শয্যাবস্ত্র বা অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে শ্বশ্রূকে রামায়ণের কতক অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া বধূ যখন উঠিল, তখন অপরাহ্ন।

দেবর বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছে। তাহাকে আহার্য্য দেওয়া হইল। শ্বশ্রূর আদেশে অযত্নরক্ষিত কেশের যথোচিত সংস্কার-বিন্যাস করা হইল। তাহার পর বধূ তনয়ের সিন্দূর চর্চিত অঙ্গুলি ও মুখমণ্ডল অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া দিল। শিশুর এই নির্বিকার উপদ্রব

জননীর কেশ প্রসাধনের প্রধান অন্তরায়, কিন্তু এই উপদ্রব না থাকিলে প্রসাধনের অর্দ্ধেক সুখ, অর্দ্ধেক মাধুর্য্য চলিয়া যায়।

এখন সন্ধ্যা। শঙ্খ-নিনাদে মণিকুন্তলা সন্ধ্যাকে অভিবাদন করিয়া তুলসী বেদীর মূলের ক্ষুদ্র দীপটি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গৃহের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া, বধূ রজনীর আহার্য্য প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করিল। সকলের আহার শেষ হইলে পর মন্থর চরণে বধূ শয়নগৃহে গমন করিল। পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে তখনও দেবরের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। শ্বশ্রূ জপমালা তুলিয়া রাখিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি শয়ন করিলেন, পদপ্রান্তে বসিয়া বধূ নিয়মিত কর্ত্তব্য পালন করিল, অবশেষে শ্বশ্রূর শয্যা হইতে নিদ্রিত সন্তানকে তুলিয়া সে শয়নগৃহে আসিল, শিশু আপন শয্যায় ঘুমাইতে লাগিল। জননী গবাক্ষদ্বার সমীপে দাঁড়াইল, তখন ক্ষীণ চন্দ্রকর গগন হইতে লুপ্ত হইয়াছে। উর্দ্ধ আকাশে তারার মেলা, দূরে কাননে খদ্যোতের নৃত্য, বৃক্ষমূলে একরাশ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া জোনাকি বালা আলোক বিম্ব পরিধান করিয়া লুব্ধ প্রণয়ীর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। পার্শ্ব হইতে একটা ঝিল্লীর অশ্রান্ত ঝঙ্কার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। আবার প্রদীপ পার্শ্বে আসিয়া বধূ প্রভাতের সেই পত্র বাহির করিল। পাঠ সমাপন হইলে প্রীত নেত্রে সন্তানের প্রতি ধাবিত হইল, জননী দেখিল, নিদ্রিত শিশুর হস্ত আপনা হইতেই মুষ্ঠিবদ্ধ হইতেছে, আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতেছে, সহসা তাহার পিপাসিত অধর নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শিশু জননী অঙ্কে স্থাপিত হইল, আর জননী বক্ষ হইতে স্নেহধারা কোমল টানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সারা বঙ্গের হৃদয় এখন নিদ্রিত, বঙ্গের জননী ও বঙ্গের আশা মুদিত পদ্মের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের ঘনকৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে নিদ্রা আসিয়াছে। স্পর্শকোমল মায়াময় অঙ্গুলি বুলাইয়া তাহাদের চক্ষের চেতনা অপহরণ করিয়াছে। নীলাম্বর লক্ষ নেত্র মেলিয়া অপলকভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। জগৎ স্তব্ধ! তাহার বিরাট হৃদয় স্পন্দনহীন। চতুর্দ্দিকে অসীম শান্তি বিরাজমান। তাহারি মাঝে পৃথিবীর সুপ্ত জীব তৃপ্তির সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। সে সন্ধান সার্থক হউক। তাহাদের নিদ্রা রজনীর নীরবতায় গাঢ় হউক। অগণিত তারার উৎফুল্ল হাস্যের ন্যায় তাহাদের অন্তর পবিত্র হউক। আর যে বসন্ত নিঃশ্বাস সুরভিত নৈশ সমীরণের মৃদু চঞ্চলগতিবেগে ক্লান্ত জননীর বস্ত্রাঞ্চল কম্পিত হইতেছে, শিশুর অনিবিড় লঘু কেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই স্নিগ্ধপ্রফুল্ল সমীরণের মতই মাতাপুত্রের জীবন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হউক। এ কক্ষ বঙ্গের হৃদয়, ঐ তরুণী বঙ্গের জননী, আর ঐ শিশু বঙ্গের ভরসা।

কার্ত্তিক ১৩২৮

# আমাদের সম্বন্ধে দু' একটী কথা

সকলেই নারী-জাতির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে লেখনী ধরেছেন। নারী ত চিরকালই সৃষ্টির আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সহসা তাহার কথা এত বিশদভাবে আলোচনা হওয়াতে মনে হইতেছে, বুঝি বা নারীর দুর্গতি এইবার অবসান হইবে। কিন্তু অনেক ভ্রান্তি এখনও নিজেদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটা কাগজে পড়ি যে, "কন্যা বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে পতির অধীনে ও বার্দ্ধক্যে সন্তানের অধীনে থাকিবে।"—এই যে সনাতন প্রথা ইহা অতি লজ্জাকর ও গর্হিত প্রথা। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের এরূপ মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাকবি মিল্টন বলিয়া গিয়াছেন— "Liberty means not License.," স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা বুঝায় না।" ঠিক কথা। বাল্যে পিতার অধীনে বা যৌবনে পতির অধীনে ও বার্দ্ধক্যে সন্তানের অধীনে যদি থাকা যায়, তবে কি নারীত্বের হানি হয়? বরংচ একাধিক স্থানে দেখা গিয়াছে, ইহার বিপরীত হইলেই অশুভজনক ফল হয়। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া আমরা যতই চীৎকার করিব, ততই সে চীৎকারের অধীন হইয়া পড়ি, তাহা বুঝি না কেন? এ পৃথিবীতে একেবারে কোন জিনিসে সম্পর্ক-রহিত হইয়া স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীনতা তো মনের,— ভাষার, বাক্যের কার্য্যের শুধু নয়, সে সব তো পিতা-পুত্র-স্বামীর অধীনে থেকেও করা যায়। স্বাধীনতা মানে ইহা নয় যে, সমস্ত দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা করিবে হইবে এবং অধীনতা মানে ইহা নয় যে, দুনিয়াকে গ্রাহ্য করিয়া পিতা পুত্র পতির অধীনে কথায় উঠিতে ও বসিতে হইবে। আমার সন্দেহ হয়, যাঁহারা এ সকল বিষয়ে লেখেন তাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া লেখেন না। শান্তি সুখ তো পিতার কাছে কন্যার বাধ্যতায়—পতির কাছে পত্নীর নম্রতায়— উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, কন্যা যদি উচ্ছৃঙ্খল-ভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে তরুণ বয়সে একজন তাহার উপরে না থাকিলে তাহাকে জীবন-পথে নানা প্রলোভনে পড়িতে হয়। কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হইলে উভয় পক্ষেরই অশান্তি। সে পিতার দারুণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যদি কন্যার এই বাধ্যতাকে অধীনতা বলা যায়, তাহাতেও তো ক্ষতি নাই, তাহাতেই তো শান্তি পাওয়া যায়। মাতাপিতার ঋণ আজীবন শোধ করা যায় না। সামান্য বাধ্যতারূপ অধীনতা স্বীকার করিলে যদি তাঁহাদের সুখী করা যায়, তবে কি তাহা করা উচিত নহে? হইতে পারে, স্থলবিশেষে পিতার মত ভুল, স্থল বিশেষে তাঁহার কথা রুচিকর নয়, কিন্তু তিনি পিতা অর্থাৎ পালনকর্ত্তা, এই হিসাবে কেন তাঁহার কথা শুনিয়া চলিব না। যেখানে কন্যা অধীন নয়, সেখানেই তাহার দুর্গতি, কিন্তু যেখানে অধীনতা আছে, সেখানে কন্যা পরম সুখী। পিতামাতা কখনো সন্তানের অহিতাচারণ করেন না। তরুণ বয়সে নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন অন্যায় পথে চলিতে যাই, তখন তাঁহারাই তো আসিয়া রক্ষাকর্ত্তা হন ও সে অধীনতা শুভ হইয়া যায়।

তৎপরে স্বামীর অধীনতা। বুঝিতেই পারি না, এখানে এই অধীনতা কোথায়? পরস্পর পরস্পরের কথাবার্ত্তার মতামতের আদানপ্রদান ও সাহায্য করেন। এখানে কোন্ পক্ষ অধীন? দুই দিকেই তো সমান ভাব দেখা যায়। আর যদিই পত্নী পতির অধীন হন, সে তো শ্লাঘার বিষয়, বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন না হয়ে চলাই তো অশান্তির মূল। সেখানে

পত্নী পতির বশবর্ত্তী না হইয়া স্বকীয় অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে চলেন, সেখানে কি অশান্তি বর্ত্তমান! ইহার কত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা সকলেই জানেন। স্বাধীনতা চাই, ভোট চাই, কিন্তু সে সব এইদিক বাঁচিয়ে চাওয়া চাই। ইহার একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, নয় তো ইহা হইতে অনর্থের সূচনা হয়। নিজের সংসারে শান্তি বজায় রাখিয়া জগতের কার্য্য করাটা ঠিক, না ব্যক্তিগত জীবনে রীতিমত অশান্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার খোঁজে বেড়ান পত্নীর পক্ষে ঠিক?

আমি জানি, অনেকে আমাকে দোষ দিবেন, কিন্তু তাহাতে কি করা যায়। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই অপ্রিয়। বিবাহিত জীবনে তো স্বাধীন থাকা যায়। নিজের সংসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব থাকে; বাক্যে কার্য্যে সবেতেই তো পত্নী স্বাধীন।—অধীনতা কেবল যেখানে চরম কর্ত্তব্য সেখানে আসে। সেটা না মেনে চলাই পত্নীর অন্যায়।

বার্দ্ধক্যে মাতা পুত্রের অধীন। ইহা প্রথম শুনিতে বিশেষ ভাল লাগে না। কিন্তু এই অধীনতা যে স্বেচ্ছার, ইহাতে দোষ নাই। যদি বাল্যে সন্তান মাতার অধীনে থাকেন, মাতা শেষ বয়সে স্বেচ্ছায় সেই উপযুক্ত পুত্ররত্নের কথানুযায়ী চলিবেন। ধন্যা সেই জননী, যাহার পুত্র চিরকাল মাতার বশবর্ত্তী ছিল এবং মাতাও বার্দ্ধক্যে স্বেচ্ছায় উপযুক্ত পুত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করেন না।

এই অধীনতা ও নম্রভাব, সেটীকে ইংরাজীতে Submissive mood বলে, তাহার অভাব যেখানে সেখানেই কন্যা পিতার অধীনতাকে অস্বীকার করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হন। শেষে এমন অবস্থা আসে যে যদিও অনুতাপ হয়, তখন সেই স্বেচ্ছাচারিণী কন্যা পিতার কাছে মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ-স্থলে পত্নীর এই স্বেচ্ছাচারিতার পর পতি আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করেন না। দুই পক্ষের জীবন বিষময় হইয়া উঠে। এজন্য দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অধীনতাই ভাল, এরূপ স্বাধীনতা অপেক্ষা। হিন্দুসমাজ এই অধীনতার ধর্ম্ম পালন করেন বলিয়া হিন্দু নারীর স্বামিভক্তি বিখ্যাত। যাঁহারা স্বেচ্ছায় এ ধর্ম্মের বিপরীত পথে যাইবেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া লইবেন, কোন্ পথ ভাল।

ফাল্গুন ১৩২৮ — শ্রী মণিকা রায়, বি. এ।

## শ্বশ্রূ ও বধূ

আমাদের দেশের সংসার সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে অতিশয় অল্পসংখ্যক সংসারেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত অশান্তি বিদ্যমান নাই। এই অশান্তির কারণ যে কেবলমাত্র বধূ বা কেবলমাত্র শ্বশ্রূ, তাহা বোধ হয় না। কারণ, উভয়েরই কিছু না কিছু দোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিসংবাদস্থলে কেবল একজনের যদি দোষ থাকে, এবং অপরজন যদি ক্ষমাশীল হয়, তবে বিসংবাদ ঘটিতে পারে না। সেইজন্য উভয়েরই দোষ বুঝিতে হইবে। তবে কোন স্থলে হয় ত বধূর অধিক দোষ, শ্বশ্রূর দোষ

অল্প, আবার কোন স্থলে হয় ত শ্বশ্রূর দোষ অধিক, বধূর দোষ অল্প।

প্রথমতঃ, বধূগণের কি কি দোষে শ্বশ্রূগণের সহিত বিসংবাদ ঘটিয়া সংসারে অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি প্রধানভাবে দেখা যায়।

১। বধূগণের অবিনয় বা ঔদ্ধত্য। উদ্ধত বধূগণ স্বামীর উপার্জ্জন-হেতু আপনাদিগকে সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী মনে করিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূদিগকে সংসারের গলগ্রহস্বরূপ সামান্য পরিজনরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে না; এবং এইজন্য নিজে গৃহিনীর মত বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে দিবারাত্র সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত করাইয়া থাকে।

২। বধূগণের স্বার্থপরায়ণতা। স্বার্থপরায়ণা বধূ শ্বশ্রূ প্রভৃতি অন্য পরিজনবর্গকে স্বামীর উপার্জ্জনের অংশভাগী দেখিতে চাহে না। এইজন্য বৃদ্ধা শ্বশ্রূ বাঁচুন কি মরুন, ইহা না ভাবিয়া, সে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়াও নিজের স্বামী ও সন্তানগুলিকে লইয়া পৃথকভাবে বাস করিতে ভালবাসে।

৩। সংসারের অশান্তির কারণ হিসাবে বধূগণের ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা প্রধানরূপে গণ্য হইলেও তাহাদের মুখরতা, নির্লজ্জতা, লোভ, কুটিলতা, আলস্য, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অন্যান্য দোষ-সকলও আনুষঙ্গিকভাবে শ্বশ্রূ ও বধূঘটিত মনোমালিন্যের কারণ হইয়া থাকে। কারণ বধূগণের ঐ দোষগুলি সংসার শান্তির অনুপযোগী হওয়ায় কখনও লোকতঃ কখনও বা ধর্ম্মতঃ শ্বশ্রূগণের চিত্তে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে, ফলে পরস্পর কলহজনিত অশান্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। যেমন, নির্লজ্জা বধূ অবগুণ্ঠণ উন্মোচন করিয়া ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলেন; তাহাতে শ্বশ্রূ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। বধূ উদ্ধতভাবে তাঁহার কথা ত শুনিলেনই না, বরং মুখরতাবশতঃ শ্বশ্রূর তিরস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ফলে উভয়ের কলহ হইল। লোভপরায়ণা বধূ সংসারের উত্তম আহার্য্য দ্রব্যের অংশ কাহাকেও না দিয়া, নিজে লুকাইয়া লুকাইয়া খাইতে লাগিলেন। শ্বশ্রূ তিরস্কার করিতে গেলে, অসহিষ্ণু বধূ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখরতা অবলম্বন করিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-দাবানল প্রজ্বলিত হইল; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক, শ্বশ্রূগণ কিরূপে বধূদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং অশান্তির কারণ হইতে পারেন।

১। শ্বশ্রূগণের বধূদিগের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা। অনেক শ্বশ্রূ মনে মনে আশা করেন যে, তাঁহারা যখন দশমাস দশদিন জঠরে ধরিয়া প্রাণপণে যত্ন করিয়া পুত্রগণকে পালন করিয়াছেন, তখন তাঁহারাই একমাত্র পুত্রদিগের সকল স্নেহের অধিকারিণী; সেই স্নেহের অংশীদার অন্য কেহই হইতে পারে না। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে এই হয়, যে যখন পুত্রগণ নিজের অর্দ্ধাঙ্গিকে প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সমগ্র পুত্রস্নেহাকাঙ্ক্ষিণী জননীর মনে বধূর প্রতি একটা ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহারা নানা উপায়ে বধূদিগের প্রতি নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন।

২। শ্বশ্রূগণের অসহিষ্ণুতা। বধূগণ যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা পরকন্যামাত্র। শ্বশুর-বাটীর প্রতি তখন তাহাদের কোনরূপ আকর্ষণ হয় নাই,

বুঝিতে হইবে। সেই পরের কন্যাকে নিজের করিতে হইলে কতদুর সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। বিশেষতঃ বধূগণ যখন অপর ব্যক্তিগণের দুহিতা, এবং অপর স্থানে প্রতিপালিতা, তখন পিতৃগৃহে প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারেই তাহাদিগের চরিত্র সংগঠন হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের চরিত্রের উপাদানগুলি শ্বশুরবাটীর ব্যক্তিগণের চরিত্রোপাদানগুলির সহিত একরূপ হইতে পারে না। কাজে-কাজেই, বধূগণ যে শ্বশুর-বাটীতে আসিয়াই একেবারে শ্বশুর-বাটীর অনুরূপা হইতে পারিবে, তাহা আশা করাই অনুচিত। যতদিন না বধূগণ সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ধাতুর অনুরূপা হয়, ততদিন শ্বশ্রূদিগের সহিষ্ণুতা-অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বপথে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি শ্বশ্রূগণ সেটুকু সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করিয়া বধূদিগের প্রতি একটা অন্যায় জোর করিতে যান, তাহা হইলে বধূগণের শ্বশ্রূদিগের প্রতি বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে পরস্পরমধ্যে বিবাদ সুনিশ্চিত। মনে করুন, কোন বধূ একজন পদস্থ ব্যক্তির কন্যা হওয়ায় পিত্রালয়ে তেমন সংসারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করে নাই; কিন্তু সে এমন এক গৃহস্থ শ্বশুরের বাটীতে পড়িল, যেখানে সংসারের সমুদায় কাজকর্ম্ম নিজেদেরই করিতে হয়। সে অবস্থায় শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য পরম-সহিষ্ণুতা-সহকারে তাহাকে একটু একটু করিয়া কর্ম্মপথে আনয়ন করা। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া যদি একেবারেই তাহাকে কর্ম্মনিপুণা দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে বধূর চরিত্র আবাল্য কর্ম্মের বিরুদ্ধপথে চালিত হওয়ায়, তাঁহার সে অভিলাষ ব্যর্থ ত হইয়াই থাকে, এতদ্ব্যতীত তাঁহার বধূকে সত্বর কর্ম্মনিপুণা দেখিবার যে প্রচেষ্টা, তাহা বধূর পক্ষে নির্য্যাতনস্বরূপ হওয়ায় নির্য্যাতিত বধূর শ্বশ্রূর প্রতি একটা বিদ্রোহ-সঞ্চার ঘটিতে পারে, এবং সেই বিদ্রোহ সংসারে নানারূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

৩। শ্বশ্রূগণের নির্দ্দয়তা। শ্বশ্রূগণ যদি দয়াহীন হন, তাহা হইলেও পরদুহিতা বধূদিগকে আপনার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, নির্দ্দয়া শ্বশ্রূ বধূগণের প্রতি স্বকন্যোচিত মধুর ব্যবহার না করিয়া যদি প্রতিপদেই তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ আচরণ করিতে যান, তাহা হইলে তাহারা শ্বশ্রূর বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না; বরং নির্য্যাতনের ফলে বধূগণের চিত্ত এত বিকৃত হইয়া পড়ে যে তাহারা অবশেষে প্রকাশ্যভাবেই শ্বশ্রূর সহিত বিবাদ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কুচিতা হয় না। এতদ্ভিন্ন শ্বশুর-শ্বশ্রূ যেরূপ নির্ম্মমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কন্যার পিতাকে নষ্টসর্ব্বস্ব করিয়া বধূকে ঘরে আনয়ন করেন, তাহাতেও স্বকীয় জনকজননীর উৎপীড়কের সংসারে বধূদিগের একটা মমতাবুদ্ধি সহজে আগমন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর অনেক শ্বশ্রূ বধূদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াও তাহাদিগকে যে উপায়ে আপনার করিয়া লইতে হয় তাহা করেন না। অর্থাৎ পরের কন্যা বলিয়া মমতাহীনভাবে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল নির্ম্মমহৃদয় শ্বশ্রূগণ নিজের পুত্রকে বা নিজের কন্যাকে যেভাবে দর্শন করেন, পরদুহিতা বধূকে সে-ভাবে দর্শন করেন না। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তাহা নহে; কিন্তু পরের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই কারণে দেখা যায় যে, সংসারের যত উত্তম উত্তম উপভোগ্য দ্রব্য তাহা তাঁহারা নিজ পুত্র বা কন্যাদিগকে দিয়া, বধূদিগকে ক্রীতদাসী মনে করিয়া সেই সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। শ্বশ্রূ-কর্ত্রী এইরূপ নির্ম্মমভাবে দুষ্ট হইলে কোন বধূরই শ্বশ্রূর প্রতি মমত্বমূলক জননীজ্ঞান আসিতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা

মনোমালিন্য থাকায় প্রতিপদেই পরস্পর কলহজনিত অশান্তি ঘটিতে পারে। শ্বশ্রূদিগের এই নির্ম্মমতার সহিত যদি আবার স্বার্থপরতা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। স্বার্থপরায়ণা শ্বশ্রূ বধূ-জনকের নিকট প্রভূত পণগ্রহণে নিজপুত্রকে বিক্রয় করিয়া স্বকীয় স্বার্থসাধনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হয়েন না; বধূকে আনয়ন করিবার পরও তাহার হতভাগ্য জনকজননীর নিকট হইতে নানা প্রকারে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। "আজ অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "কাল অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "তোমাদের কন্যার অসুখ হইয়াছে, তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়ে যাও," "তোমাদের কন্যা পূর্ণগর্ভা, অতএব তাহাকে বাটীতে লইয়া প্রসবের বন্দোবস্ত কর" ইত্যাদি প্রকার স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য শ্বশ্রূ বৈবাহিক-দম্পতির উপর জুলুম করিয়া থাকেন। আর বৈবাহিক-দম্পতি যদি অবস্থার প্রতিকূলতা-হেতু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পাবেন, স্বার্থনিষ্ঠা শ্বশ্রূ তখন বধূর মা-বাপের 'খোঁটা' দিয়া অনবরতই তাহার সহিত নির্ম্মমভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; কখনও কখনও বা নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাব ফলে বধূ কদাচই শ্বশ্রূকে স্বকীয় জননীরূপে সম্মান করিতে চাহে না, বরং শ্বশ্রূর কদাচরণে তাহার হৃদয়ে যে একটু একটু বিদ্রোহধূম জ্বলিতে থাকে অবসর প্রাপ্ত হইলে সেই ধূম অতি ভীষণ বিবাদানলে পর্য্যবসিত হয়।

আরও দেখা যায়, এই স্বার্থপরায়ণা শ্বশ্রূগণ তিন চারি পুত্রের জননী হইলে, যে পুত্র অধিক উপার্জ্জন করে তাহারই নিকট স্বার্থসিদ্ধির অধিক সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার ও তাহার পত্নীর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এমন কি, যে বধূ ধনী লোকের কন্যা, তাহার পিত্রালয় হইতে ভারে ভারে জিনিষপত্র আসে বলিয়া তাহার প্রতি তিনি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; আর যে সকল পুত্র স্বল্পোপার্জ্জক বা মৃত, তাহাদের পত্নীদিগের প্রতি অথবা দরিদ্রদুহিতা পুত্রবধূদিগের প্রতি অল্প স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই স্নেহ-তারতম্যে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মনে পরস্পর এমন একটা ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে যে, সংসারে অশান্তির সীমা থাকে না।

কখন কখন শুধু যে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূগণেব প্রতি স্নেহ-তারতম্য প্রদর্শন করেন, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রকৃতিগত পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকায় তাঁহারা পাঁচটীর মধ্যে সকলকে সমানভাবে স্নেহ করিতে পারেন না। ফলে, তাহাতেও স্নেহ তারতম্যবশতঃ সংসারে শান্তি থাকে না।

৪। শ্বশ্রূগণের গাম্ভীর্য্যের অভাব। অনেক শ্বশ্রূর স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্য না থাকায় তাঁহারা পুত্রবধূদিগের উপর কোনরূপ কর্ত্রীত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না এবং নিজ অক্ষমতার বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবন বধূদিগের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। ফলে সংসার অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্বশ্রূ ও বধূদিগের চরিত্র সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, যে শুধু বধূদিগের নহে, শ্বশ্রূদিগের দোষেও সংসারে অশান্তি আসিতে পারে। বিশেষতঃ বধূজীবন ও শ্বশ্রূজীবন যখন একই নারী-জীবনের অবস্থান্তর মাত্র, তখন বধূ অবস্থায় নারীগণের যে দোষ থাকে, শ্বশ্রূ অবস্থায় সেই সেই দোষগুলি অবশ্যই সংক্রমিত হইতে পারে । এই জন্য যে নারী বধূ অবস্থায় নিন্দিতা হয়, সে কখনও শ্বশ্রূ-অবস্থায় প্রশংসিতা হইতে পারে না। এবং সে নারী বধূ অবস্থায় শ্বশ্রূর সহিত কলহদ্বারা সংসারে অশান্তি উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন অনেকস্থলে দেখা যায় যে, বধূ-কর্ত্তৃক শ্বশ্রূ

নির্য্যাতন শ্বশ্রূকৃত পূর্ব্ব-নির্য্যাতনের প্রাপ্তাবসর প্রতিশোধমাত্র, অতএব সংসারের শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সকল অশান্তি দূরীকৃত করার একমাত্র উপায় নারীগণের চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন। যাহাতে নারীগণের হৃদয়ে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যাহাতে তাহাদের চিত্ত স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, মমতা প্রভৃতি কোমল গুণের অধিকারী হয়, যাহাতে তাহারা লৌকিক ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে নিপুণা হয়, যাহাতে নিঃস্বার্থতা দ্বারা তাহারা অপরকে আপনার করিয়া লইতে পারে,—এইরূপ শিক্ষাদ্বারা শৈশব হইতেই তাহাদের জীবন গঠিত করিতে পারিলেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সাংসারিক অশান্তির বিলোপ হইতে পারে।

আষাঢ় ১৩২৯ — শ্রী ভবভূতি বিদ্যারত্ন।

# পরিশিষ্ট

# পরিশিষ্ট ক

## ব্যক্তি পরিচিতি

**উমেশচন্দ্র দত্ত:** চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুরে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৪০ সালে জন্ম। পিতা হরমোহন দত্ত। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৫৯ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের সান্নিধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সাল থেকে স্কুলে শিক্ষকতা। ১৮৭৯ সালে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। কেশব বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৮৯৩ সালে বন্ধুবর্গের সহায়তায় মুক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। *বামাবোধিনী, ধর্মসাধন, ভারত সংস্কারক* প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হল *বামারচনাবলী* ও *স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার আবশ্যকতা*। ১৯ জুন ১৯০৭ সালে মৃত্যু।

**কৃষ্ণভাবিনী দাস:** ১৮৬৪ সালে নদীয়ায় জন্ম। ন বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীর আগ্রহে লেখাপড়া শেখেন। স্বামী বিলাতে গেলে আত্মীয়দের নিষেধ অগ্রাহ্য করে স্বামীর সঙ্গ নেন। ১৮৮৫-তে 'ইংলণ্ডে ভদ্রমহিলা' ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ *বামাবোধিনী পত্রিকা, সাহিত্য, প্রবাসী* প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। মেয়েদের শিক্ষা ও মনের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন। সরলাদেবী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল-এর সেবাকাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।

**কেশবচন্দ্র সেন:** ১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ সালে কলকাতায় জন্ম। পিতা প্যারীমোহন সেন। শিক্ষা যথাক্রমে হিন্দু কলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে। ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন। পরে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে (১৮৬২) নিয়োজিত হন। নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে বরাবর সোচ্চার ছিলেন। মদ্যপান, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরই উদ্যোগে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫) স্থাপন ও *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৯৬৩) প্রকাশিত হয়। 'এলবার্ট হল'-এরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। 'কোরান শরীফ'-এর প্রথম বঙ্গানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ সালে মৃত্যু।

**কৈলাসবাসিনী দেবী:** জন্ম ১৮৩৭। স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত। বিবাহের পর লেখাপড়া শেখেন। তিনটি গ্রন্থরচনা করেন—*হিন্দু ফিমেলস* বা *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* (১৮৬৩), *হিন্দু মহিলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি* (১৮৬৫) এবং *বিশ্বপ্রভা* (১৮৬৫)।

**জ্ঞানদানন্দিনী দেবী:** জন্ম ১২৫৮ বঙ্গাব্দে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। মেয়েদের পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে প্রবল আন্দোলন করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে জোড়াঁসাকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত প্রথম শিশু মাসিক পত্রিকা *বালক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৫ আশ্বিন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যু।

**নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, সরস্বতী:** হুগলী জেলার পালপাড়ায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জন্ম। পিতা নৃত্যগোপাল সরকার। স্বামী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তাফী। নিজের চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত ও ওড়িয়া শেখেন। *বামাবোধিনী, নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য,* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর রচিত *প্রেমগাথা* গ্রন্থটি হেয়ার প্রাইজ এসে ফান্ডের দ্বারা পুরস্কৃত হয়। *অমিয়গাথা* গ্রন্থটির জন্য 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে মৃত্যু।

**প্যারীচরণ সরকার**: ২৩ জানুয়ারি ১৮২৩ সালে কলকাতায় জন্ম। পিতা ভৈরবচন্দ্র সরকার। শিক্ষা যথাক্রমে পটলডাঙ্গা স্কুল ও হিন্দু কলেজ। ১৮৪৩ সালে হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হন। এরপর বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন (১৮৪৬-৫৪) নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণের উদ্যোগে এখানে ভারতীয় পরিচালিত প্রথম বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৭) স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও বিধবা বিবাহে উদ্যোগী ছিলেন আমৃত্যু। কিছুকাল *এডুকেশন গেজেট* সম্পাদনা করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক বই হিসেবে তাঁর *First Book of Readings এবং Second book of Readings* একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সালে মৃত্যু।

**প্যারীচাঁদ মিত্র:** ২২ জুলাই ১৮১৪ সালে কলকাতায় জন্ম। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম সদস্য। ১৮৩৮ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ সভা'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'বেথুন সোসাইটি' ও 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র'উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। *ক্যালকাটা রিভিউ, ইংলিশম্যান, হিন্দু প্যাট্রিয়ট* প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন প্যারিচাঁদ। ১৮৫৪ সালে বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সঙ্গে মহিলাদের পড়ার উপযোগী *মাসিক পত্রিকা* প্রকাশ করেন। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে বাংলা কথ্য ভাষায় রচিত তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৯৫৮) একটি অনন্য রচনা। ২৩ নভেম্বর ১৮৮৩ সালে মৃত্যু।

**প্রসন্নময়ী দেবী:** ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলায় জন্ম। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী। স্বামী কৃষ্ণকুমার বাগচী। ১২ বছর বয়সে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আধ-আধ-ভাষিণী*। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। *ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী* ও *মাতৃমন্দির* পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণ *পূর্বকথা* অনবদ্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর অনুজ এবং তাঁর কন্যা হলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। ২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ সালে মৃত্যু।

**বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী:** নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ২ আগস্ট ১৮৪১ সালে জন্ম।

শান্তিপুরের টোলে অধ্যয়ন করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে বেদান্তপাঠ শুরু করেন। এরপর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়েছিলেন। উপবীত ত্যাগ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম হন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদ পেয়ে ১২৭০ বঙ্গাব্দে পূর্ববঙ্গ গিয়েছিলেন। এবং সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দুটি গানের রচয়িতা হলেন বিজয়কৃষ্ণ। এরপর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। এবং ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আবার হিন্দু হন ও উপবীত গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি হলেন হরিভক্ত বৈষ্ণব। ১৮৯৯ সালে মৃত্যু।

**ভুবনমোহন দাস:** (১৮৪৪-১৯১৪) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর জন্মস্থান। স্বদেশ প্রেমিক ও সুলেখক। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা। *ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন* ও *বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন*-এর সম্পাদক ছিলেন।

**মানকুমারী বসু:** যশোহর জেলার সাগরদাঁড়িতে ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ সালে জন্ম। পিতা আনন্দমোহন দত্ত। স্ত্রী বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে ১৮৭৩ সালে বিবাহ। নারীসমাজের উন্নতির বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় তিনি ছিলেন অন্যতম লেখিকা। অন্যতম এই মহিলা কবির খুল্লতাত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *প্রিয় প্রসঙ্গ, কাব্যকুসুমাঞ্জলী, কনকাঞ্জলী, বাঙ্গালী রমণীদের গৃহধর্ম, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য, বীরকুমার বধ কাব্য* অন্যতম। তাঁর রচিত ছোটগল্প কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেছিল। তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ সালে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৪১ সালে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' প্রদান করে। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে মৃত্যু।

**রাসসুন্দরী দেবী:** পাবনা জেলার পাতাজিয়াতে ১৮০৯ সালে জন্ম। পিতা পদ্মলোচন রায়। ১২ বছর বয়সে বিবাহ। ২৫ বছর বয়সে নিজের পুত্রের সঙ্গে পড়াশুনা শুরু করেন এবং ৫০ বছর বয়সে লিখতে শেখেন। এরপর তিনি লেখেন আত্মজীবনী *আমার জীবন*। ১৮৬৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিশোরীলাল সরকার হলেন তাঁর পুত্র। ১৮৯৯ সালে মৃত্যু।

**রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন:** ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দে জন্ম। পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে রাত্রে বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শেখেন। সারাজীবন নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কলকাতার 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী। মহিলা সমিতি 'অঞ্জুমান খাওয়াতীন ইসলাম'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী। বহু অসামান্য প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। *মতিচুড়, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী* এবং *Sultana's Dream* বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

**লাবণ্যপ্রভা বসু, সরকার:** ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল-এ জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। স্বামী হেমচন্দ্র সরকার। বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর ভ্রাতা। কিছুকাল *মুকুল* পত্রিকা

সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২ খণ্ডে *আনন্দমোহন বসুর দৈনিক জীবনী, মাতা ও পুত্র* প্রভৃতি। ১৯১৯ সালে মৃত্যু।

**শরৎকুমারী চৌধুরাণী:** ১৮৬১ সালে জন্ম। পিতা শশিভূষণ বসুর কর্মস্থল লাহোরে স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লাহোরিণী' নামে উল্লেখ করতেন। *ভারতী, সাধনা, সবুজপত্র, বঙ্গদর্শন* ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *শুভবিবাহ* পুস্তকটি (১৯০৬) পারিবারিক চিত্রের বাস্তব অঙ্কন। স্বামী অক্ষয় চৌধুরী ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

**শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়:** চব্বিশ পরগণা জেলার বরাহনগরে ১৮৪০ সালে জন্ম। পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। নিজ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বরাহনগরে একটি মহিলা বিদ্যালয় চালু করেন। বরাহনগরে বহু সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি শ্রমিক শিক্ষণ কেন্দ্র 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠা (১৮৭০) এবং *ভারত শ্রমজীবী* পত্রিকা প্রকাশ (১৮৭৪)। বিধবা বিবাহের সপক্ষে বরাবর সোচ্চার ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে মৃত্যু।

**শিবচন্দ্র দেব:** হুগলি জেলার কোন্নগরে ২০ জুলাই ১৮১১ সালে জন্ম। পিতা ব্রজকিশোর দেব। হিন্দু কলেজের ডিরোজিয়োর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। স্ত্রীশিক্ষায় ছিলেন অগ্রণী। ১৮৬০ সালে নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোন্নগরে ইংরেজি ও ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই উদ্যোগে কোন্নগরে রেলস্টেশন স্থাপিত হয়েছিল। *শিশুপালন* ও *আধ্যাত্মবিজ্ঞান* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২ নভেম্বর ১৮৯০ সালে মৃত্যু।

**শৈলবালা ঘোষজায়া:** ১৮৯৪ সালে বর্ধমানে জন্ম। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী। স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ। বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখিকা। দুঃসাহসী উপন্যাস *শেখ আন্দু* (১৯১৫) পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল। গবেষণামূলক নিবন্ধের জন্য 'সরস্বতী' উপাধি পান। সাহিত্যচর্চার জন্য 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি লাভ করেন।

**সরযূবালা দত্ত:** আসামের নওগাঁ শহরে ২৪ নভেম্বর ১৮৭৯ সালে জন্ম। পিতা রামদুর্লভ মজুমদার। শিক্ষা যথাক্রমে নওগাঁ প্রাইমারি স্কুল ও কলকাতার বেথুন স্কুলে। ১৯০৫ সালে বিবাহ। স্বামী হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। বিবাহের পর ঢাকার উয়ারিতে বসবাস শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। 'ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম' স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *ভারত মহিলা* পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন। ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে (১৩১৭ ব.?) "সাহিত্য সেবা ও বঙ্গনারী" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল। ১৩ জুন ১৯৬৩ সালে মৃত্যু।

**সরলাদেবী চৌধুরাণী:** কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ সালে জন্ম। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। শিক্ষা বেথুন স্কুলে। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী। *ভারতী* পত্রিকা এবং লাহোরে থাকাকালীন উর্দু পত্রিকা *হিন্দুস্থান* সম্পাদনা করেন। ১৯০৩ সালে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এবং 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালন করেন। তাঁর চেষ্টাতেই 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' স্থাপিত হয়। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী গানের সংকলন *শতগান* এবং স্মৃতিকথা *জীবনের ঝরাপাতা* উল্লেখ্য। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে মৃত্যু।

**সৌদামিনী খাস্তগিরি:** বরিশাল জেলার লাখুটিয়াতে জন্ম। স্বামী জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৮৬৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং স্বামীসহ সম্পত্তিচ্যুত হন। পরে অবশ্য সম্পত্তি ফিরে পান। বরিশালে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রবল আন্দোলন করেন। নিজের ধর্মীয় মতামত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ সালে মৃত্যু।

**স্বর্ণকুমারী দেবী:** ২৮ আগস্ট ১৮৫৫ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবিকা রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। কিশোরদের জন্য *বালক* নামে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন 'সখিসমিতি' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস *দীপ নির্বাণ* (১৮৭৬) জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারে সহায়তা করেছিল। ৩ জুলাই ১৯৩২ সালে মৃত্যু।

**স্বর্ণপ্রভা বসু:** পিতা শিক্ষাব্রতী ভগবানচন্দ্র বসু, ভ্রাতা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী আনন্দমোহন বসু। গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীশিক্ষাকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। জনহিতকর সমাজসেবায় যুক্ত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ও 'বঙ্গ মহিলা সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী। সুবিদিত প্রবন্ধলেখিকা।

**স্বর্ণময়ী, মহারাণী:** বর্ধমান জেলার ভট্টকোলে ১৮২৭ সালে জন্ম। বিবাহ কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সঙ্গে ১৮৩৮ সালে। ১৭ বছরে স্বামীর মৃত্যুতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। সমাজ উন্নয়নে বহু অর্থ দান করেন। এইজন্য ১৮৭১ সালে 'মহারাণী' উপাধি পান। ১৮৯৭ সালে মৃত্যু।

**হেমন্তকুমারী দেবী:** পাঞ্জাবের লাহোরে ১৮৬৮ সালে জন্ম। আদিনিবাস বর্ধমান। পিতা নবীনচন্দ্র রায়। ১৮৮০ সালে কলকাতার বেথুন স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি হন। ১৭ বছর বয়সে রাজচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ। স্বামীর কর্মস্থল শিলং-এ থাকাকালীন নারী সমাজের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দী ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮৮ সালে হিন্দীতে *সুগৃহিণী* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৩০৭ থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত *অন্তঃপুর* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে *আদর্শমাতা, নবীন শিল্পমালা, নারী পুষ্পাবলী* অন্যতম। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ সালে মৃত্যু।

**বঙ্গ মহিলা সমাজ:** বঙ্গীয় মহিলাদের উন্নতিকল্পে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১ আগস্ট ১৮৭৯ সালে 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' স্থাপন করে। এই সমাজের চেষ্টায় নারীসমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে বহু কাজ হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল ১৮৯০ সালের ১৬ মে মাসে 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা।

# পরিশিষ্ট খ

## সংকলনে অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী

| | | |
|---|---|---|
| স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য | | আষাঢ় ১২৭৫ |
| পতিব্রতা ধর্ম্ম | | ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১২৭৬ |
| দাম্পত্যপ্রেম | | আশ্বিন ১২৭৬ |
| স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব | | ফাল্গুন ১২৭৬ |
| পতিব্রতা এবং সতী | | জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ |
| বামাগণের রচনা | শ্রীমতি কুন্দবালা দেবী | আশ্বিন ১২৭৭ |
| বামাগণের রচনা | কৃষ্ণভামিনী | পৌষ ১২৭৭ |
| বামাগণের রচনা | নীরদা দেবী | ফাল্গুন ১২৭৭ |
| স্ত্রীজাতির পরিশ্রম | | চৈত্র ১২৭৭ |
| বামাগণের রচনা | কুমারী সৌদামিনী | আষাঢ় ১২৭৮ |
| বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ | শ্রীমতী সৌদামিনী খাস্তগিরি | ভাদ্র ১২৭৮ |
| কৌলীন্য প্রথা | শ্রীহেমচন্দ্র মোহিনী | আশ্বিন ১২৭৮ |
| নারীদিগের কোমলতা | | কার্ত্তিক ১২৭৮ |
| বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ | শ্রী... দেবী | কার্ত্তিক ১২৭৮ |
| আদর্শ রমণী | | অগ্রহায়ণ ১২৭৮ |
| আদর্শ জননী | | পৌষ ১২৭৮ |
| নারীদিগের ধর্ম্মভাব | | মাঘ ১২৭৮ |
| দম্পতির প্রতি উপদেশ | | মাঘ ১২৭৮ |
| দম্পতির প্রতি উপদেশ | | ফাল্গুন ১২৭৮ |
| গার্হস্থ্য দর্পণ | | বৈশাখ-আষাঢ় ১২৭৯ |
| নারীজীবনের কর্ত্তব্যভার | | জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ |
| আদর্শ ভার্য্যা | | অগ্রহায়ণ ১২৭৯ |
| বঙ্গমহিলা | | বৈশাখ ১২৮১ |
| স্ত্রী ও পুরুষজাতির সম্বন্ধ | শ্রীপূ | বৈশাখ ১২৮১ |
| স্বামী ও স্ত্রীগ্রহণ | | আষাঢ় ১২৮১ |
| বামাগণের রচনা | শ্রীশ্যামসুন্দর | আশ্বিন ১২৮১ |
| ধৈর্য্য | | কার্ত্তিক ১২৮১ |
| মাতার উচ্চপদ | | পৌষ ১২৮২ |

বামাগণের রচনা:

| | | |
|---|---|---|
| বাল্য বিবাহের ফল | কোন হিন্দু মহিলা | মাঘ ১২৮৬ |
| সৎমা কর্ত্তৃক সৎমার প্রতিবাদ | | আষাঢ় ১২৮৭ |
| সৎমার প্রতিবাদের প্রতিবাদ | | শ্রাবণ ১২৮৭ |
| স্ত্রীসঙ্গিনী | | অগ্রহায়ণ ১২৮৭ |
| সতীমণ্ডপ | শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত | শ্রাবণ ১২৯১ |
| রমণী পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী | | ভাদ্র ১২৯১ |
| গৃহকার্য্য | | ভাদ্র ১২৯৪ |
| মা ও ছেলে | | ফাল্গুন ১২৯৪ |
| স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত | | চৈত্র ১২৯৫ |
| মেয়েদের নীতিশিক্ষা | | আশ্বিন ১২৯৮ |
| স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান? | | আষাঢ় ১২৯৯ |
| বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ | | জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ |
| স্বর্গীয় অম্বিকাদেব জায়া | | শ্রাবণ ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | ভাদ্র ১৩০১ |
| বামারচনা: সঙ্গীতবাদ্য | | |
| স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক | নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী | ভাদ্র ১৩০১ |
| শিশু পালন | | আশ্বিন ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | আশ্বিন ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | কার্ত্তিক ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | অগ্রহায়ণ ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | পৌষ ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | | মাঘ ১৩০১ |
| মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি | শ্রীমা | মাঘ ১৩০১ |
| বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা | | জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ |
| বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা | | আষাঢ় ১৩০২ |
| বিগত শতবর্ষে ভারত- | | |

| | | |
|---|---|---|
| রমণীদিগের অবস্থা | | শ্রাবণ ১৩০২ |
| গৃহীর ধর্ম্ম | শ্রী ইন্দিরা দেবী | শ্রাবণ ১৩০২ |
| বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেম | | মাঘ ১৩০৩ |
| বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেম | শ্রী চ চ | ফাল্গুন ১৩০৩ |
| রমণীর অপরাজেয় শক্তির উৎস কোথায় | | শ্রাবণ ১৩০৪ |
| সন্তানপালন | | পৌষ ১৩০৪ |
| মাতার চতুর্থীতে কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ | | বৈশাখ ১৩০৫ |
| গার্হস্থ্য বিষয়ে নরনারীর কর্ত্তব্য | | জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ |
| গার্হস্থ্য প্রবন্ধ | | ভাদ্র ১৩০৫ |
| গার্হস্থ্য প্রবন্ধ | | আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৫ |
| গার্হস্থ্য প্রবন্ধ | | পৌষ ও মাঘ ১৩০৫ |
| গার্হস্থ্য বিষয়ে নরনারীর কর্ত্তব্য | | ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫ |
| জননী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে | | ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫ |
| পরলোকগতা নীরদবরণী | শ্রীবঃ | শ্রাবণ ১৩০৬ |
| আত্মার সতীত্ব | | ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৬ |
| নারীজীবনের কর্ত্তব্য | | পৌষ ও মাঘ ১৩০৬ |
| সরযূ ও সলার কথোপকথন | | পৌষ-মাঘ ১৩০৬ |
| কুলবধূ | শ্রীনরেশ | ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬ |
| গার্হস্থ্য প্রবন্ধ | | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৭ |
| সহধর্ম্মিণী | | শ্রাবণ ১৩০০ |
| মাতৃদেবী বামাসুন্দরী বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী | | আষাঢ় ১৩০৮ |
| মাতৃদেবী বামাসুন্দরীর জীবনী | | শ্রাবণ ১৩০৮ |
| সুকন্যা বিজুবালা | | আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৮ |
| বঙ্গীয় হিন্দুমহিলার পরিচ্ছদ | | অগ্রহায়ণ ১৩০৮ |
| প্রীতিই নারীর প্রকৃত বল | | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৯ |
| স্ত্রী-নীতি চতুষ্টয় | | বৈশাখ ১৩১১ |
| নবদম্পতীর প্রতি উপদেশ | | বৈশাখ ১৩১১ |
| আদর্শ দাম্পত্যজীবন | | অগ্রহায়ণ ১৩১২ |
| ভারতীয় আর্য্য সহধর্ম্মিণীর দায়িত্ব | | মাঘ ও চৈত্র ১৩১৫ |
| আদর্শ রমণী স্বর্গতা শ্রীমতি নীলমণি দত্ত চৌধুরী | | বৈশাখ ১৩২০ |
| আদর্শ রমণী স্বর্গতা নীলমণি দত্ত চৌধুরী | শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ |

| | | |
|---|---|---|
| কুলবধূ | ভবভূতি বিদ্যারত্ন | আষাঢ় ১৩২৫ |
| পাতিব্রত্য | | শ্রাবণ ১৩২৫ |
| পাতিব্রত্য | শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন | ভাদ্র ১৩২৫ |
| গৃহিণীপণা | | শ্রাবণ ১৩২৬ |
| নারীর কার্য্যক্ষেত্র | | বৈশাখ ১৩২৮ |

---